ইসমাইল হোসেন সিরাজী : জীবন ও সাহিত্য

মোহাম্মদ বদিউজ্জামান

পি-এইচ,ডি, ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

জুলাই, ১৯৮০

Dhaka University Library
A197884

রেজিস্ট্রেশন নং ১০২/১৯৭৬ - ৭৭

বাংলা বিভাগ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনা করার ক্ষেত্রে আমি প্রথমেই আমার তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর আহমদ শরীফ সাহেবের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁর মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ এ অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ সহজ করেছে।

ডক্টর আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও নানা ভাবে আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, আমি তাঁর নিকটও কৃতজ্ঞ। শিরাজীর পরিবারের সকল সদস্যের নিকট থেকে আমি যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের অনুগ্রহেই শিরাজীর বাসভবন সিরাজগঞ্জের বানীকুঞ্জে শিরাজীর নিজের প্রতিষ্ঠিত "শিরাজী ফ্যামিলী লাইব্রেরী"র (১৮৯৪) যাবতীয় গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র ইত্যাদি অনেকবার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, আমার কাজে এটা অত্যন্ত সহায়ক হয়।

বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, ঢাকা কেন্দ্রীয় সাধারণ গ্রন্থাগার, সিরাজগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগার, সরকারি ইসলামিক ইন্টার মিডিয়েট কলেজ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বই, পত্র-পত্রিকা ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছি, এদের সকলের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সিরাজগঞ্জের বি,এল, হাই স্কুল এবং জ্ঞানদায়িনী হাই স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁদের দুষ্প্রাপ্য ও প্রাচীন রেকর্ড পত্র ব্যবহার করতে দিয়ে কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। যাঁরা অনুগ্রহ করে ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে দিয়েছেন তাঁদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

বাংলা একাডেমীর গবেষণা বিভাগে আমার সহকর্মীবৃন্দ আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, বিশেষ করে মুদ্রাক্ষরিক নূর মোহাম্মদ মিয়া যত্নের সঙ্গে টাইপ করে না দিলে কাজটি এত দ্রুত শেষ হত না। আমি এঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ বদিউজ্জামান

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

১। অবতরণিকা ঃ এক - আট।

২। প্রথম অধ্যায় ঃ পটভূমি। পৃঃ ১ - ৩১।

৩। দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ জীবন ও মানস প্রকৃতি।

বাল্য, শিক্ষা ও সংসার জীবন, পৃঃ ৩২-৩৭, প্রচার ও কর্মজীবন, পৃঃ ৩৭-৫২, রাজনৈতিক জীবন, পৃঃ ৫৩-৭২, সাহিত্যিক জীবন, পৃঃ ৭২-৯৩।

৪। তৃতীয় অধ্যায় ঃ উপন্যাস।

রায়নন্দিনী, পৃঃ ৯৪-১১৬, তারাবাঈ, পৃঃ ১১৬-১৩৪, ফিরোজা বেগম, পৃঃ ১৩৪-১৪৬, নূরউদ্দীন ও তুলনামূলক আলোচনা, ১৪৬-১৬৫, উপন্যাসের মূল্যায়ন, পৃঃ ১৬৫-১৭০।

৫। চতুর্থ অধ্যায় ঃ কাব্য ও কবিতা।

অনল প্রবাহ, পৃঃ ১৭১-১৮২, উচ্ছ্বাস, পৃঃ ১৮৩-১৮৫, নবউদ্দীপনা, পৃঃ ১৮৫-১৮৯, উদ্বোধন, পৃঃ ১৯০-১৯১, সঙ্গীত সঞ্জীবনী, পৃঃ ১৯১-১৯৪, প্রেমাঞ্জলি, পৃঃ ১৯৪-২০১, মহাশিক্ষা কাব্য, পৃঃ ২০১-২২১, স্পেনবিজয় কাব্য, পৃঃ ২২১-২৩২, বিচ্ছিন্ন কবিতা, পৃঃ ২৩২-২৩৭, অপ্রকাশিত কাব্য ও কবিতা, পৃঃ ২৩৮-২৪০, কবিতার মূল্যায়ন, পৃঃ ২৪০-২৫৪।

৬। পঞ্চম অধ্যায় ঃ প্রবন্ধ ও বিবিধ রচনা।

ভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ২৫৫-২৬৪, শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা, পৃঃ ২৬৪-২৭০, ধর্ম, পৃঃ ২৭০-২৮০, সমাজ ও রাজনীতি, পৃঃ ২৮০-৩০০, আত্মজীবনীমূলক রচনা ও ভ্রমণ কাহিনী-আত্মকাহিনী, পৃঃ ৩০০-৩০১, তুরস্ক ভ্রমণ, সিরিয়া পরিভ্রমণ, পৃঃ ৩০১-৩০৯, জেলের রোজ নামচা, পৃঃ ৩০৯ - ৩১০, স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা, পৃঃ ৩১১-৩১৩, তুর্কী নারী জীবন, পৃঃ ৩১৩-৩১৪, আদব - কায়দা শিক্ষা,
গদ্য রচনার
পৃঃ ৩১৪-৩১৮, গদ্য রচনার বৈশিষ্ট্য, পৃঃ ৩১৮-৩২৩, / মূল্যায়ন, পৃঃ ৩২৩-৩২৭।

৭। ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ উপসংহার। পৃঃ ৩২৮-৩৩২।

৮। গ্রন্থপঞ্জী ঃ এক - আটাশ।।

৯। পরিশিষ্ট ঃ উনত্রিশ - পঁয়ষট্টি।।

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

ইসমাইল হোসেন সিরাজীর জীবন ও সাহিত্য কালবিচারে মোটামুটিভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে ইংরেজ শাসনের সূচনা হবার পর নতুন বিত্ত হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন প্রক্রিয়াকে যেভাবে ত্বরান্বিত করেছিল, মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। ফলে বাংলায় মুসলমান সমাজ বরাবর হিন্দুকে অনুসরণ করেছিল, কিন্তু অনেক পরে এসে। সাহিত্যেও প্রায়ই এর অন্যথা হয়নি। এ সময়ে মুসলমান রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস, জাতীয় আখ্যান কাব্য, জাগরণমূলক কবিতা ইত্যাদি এ আলোকে বিচার্য। সিরাজীর সাহিত্যকর্মের মধ্যে এসবের স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে।

সিরাজীর উপন্যাসকে 'প্রতিক্রিয়ার ফসল' এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য হিন্দু লেখকের রচনায় প্রকাশিত মুসলিম বিদ্বেষের জবাব বলে মনে করা হয়, রায়নন্দিনী উপন্যাসটি দুর্গেশনন্দিনীর প্রত্যুত্তর এ ধারণাটি অত্যন্ত ব্যাপক। কোন কোন হিন্দু ঔপন্যাসিকের মুসলিম বিদ্বেষমূলক উপন্যাসের দাঁত-ভাঙা জবাব হিসাবে তাঁর উপন্যাসগুলো লিখিত, নিজে উপন্যাস সাহিত্যের সমর্থক নন ; এ অর্থে সিরাজীর দম্ভোক্তিও তাঁর উপন্যাসগুলো মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। অধিকাংশ সমালোচক তাঁর এসব উক্তির উচ্চারণগত মূল্যকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সিরাজীর উপন্যাসে বাহ্যিকভাবে হিন্দু রমণীকে মুসলমান নায়কের অনুরাগিনী করে তোলা হলেও লেখকের শিল্পী সত্তা সম্পূর্ণ অপ্রকাশ্য থাকেনি।

সিরাজী অনেক কবিতা রচনা করেছেন, এমন কি মহাকাব্যের যুগ অতিক্রান্ত হবার পরও দুটি আখ্যান কাব্য রচনা করেছেন। আখ্যান কাব্যের প্রতি অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করলেও আখ্যান কাব্য রচনা করেছেন মাত্র দুটি, কিন্তু উপন্যাসের প্রতি অনাগ্রহ প্রদর্শন করলেও চারটি উপন্যাস রচনা করেছেন। উপন্যাস, আখ্যান কাব্য, গীতি কবিতা, প্রবন্ধকে সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শের বাহন করে তুলেছেন। এসব আদর্শ সমকালীন পটভূমিতে গুরুত্বপূর্ণ, মুসলিম সমাজ ও সাহিত্যের বিচারে উজ্জ্বলতামণ্ডিত। তিনি নানা অর্থেই সাহিত্য রচনাকে বাস্তব সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেন। ঊনিশ শতকের শেষভাগের হিন্দু কবি সাহিত্যিকদের প্রয়াস যেমন হিন্দুর ঐতিহ্য, উন্নতি ও জাগরণ লক্ষ্যে নিবদ্ধ ছিল, সিরাজীও মুসলমান সমাজের জাগরণ ও উন্নতির লক্ষ্যে লেখনী ধারণ করেন। এ সূত্রে তিনি

প্র

Dhaka University Institutional Repository

দুই

প্যান ইসলামী ভাবধারার দ্বারা যুক্ত হয়েছিলেন। সাহিত্যে মুসলিম জাগরণকে প্রাধান্য দিলেও সমন্বিত জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতবর্ষই তাঁর কাম্য ছিল। প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য তিনি পুনরাবৃত্ত করেছেন, তাঁর সকল শ্রেণীর রচনায় বক্তব্যধর্মিতা বেশী। তিনি বাংলার মুসলমানদের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু বাংলা ও ভারতে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত জাগরণকে উপেক্ষা করেননি। পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে মুসলমানদের জন্য আন্তরিক প্রীতি প্রদর্শন করতে গিয়ে প্রতিবেশী সমাজের প্রতি উষ্মাও প্রকাশ করেছেন কখনো। ধর্ম ও চিন্তায় এরূপ সমন্বিতি তৎকালের লেখক বা রাজনীতিকদের মধ্যে দুর্লভ ছিলনা। সিরাজীর প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে সমসাময়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক, রাজনীতি, সমাজচিন্তা, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য রচনা ও সংগঠন ইত্যাদি সবই বিচার করতে হবে। বস্তুতঃ হল, তিনি রাজনীতিতে কংগ্রেস করতেন, রাজনীতিতে এমন কি সামাজিক জীবনেও হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রয়াসী ছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ ধারণা থেকে বিচ্যুত হননি। সেকারণে কূপমণ্ডূক মোল্লাতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক হিন্দুর মত সমমনা মুসলমানদের প্রতিও তিনি একই প্রকার নির্মম ছিলেন। জীবনে ও সাহিত্যে তিনি এদের সকলকেই প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছেন, অথচ তাঁর সাহিত্যে বাহ্যতঃ হিন্দুর মুসলমানের মধ্যে [illegible] দ্বেষ-দ্বন্দ্বই চিত্রিত এবং মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হয়েছে। প্রচারক, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জীবনের কোন একস্থানে তাঁর নিজের মধ্যেই সংঘাত ছিল বলে সাহিত্যে প্রকাশের মধ্যে এ অসংগতি ও দ্বিধা রয়ে গেছে। এ কারণে সিরাজীর আত্মপ্রকাশের মধ্যে কোথাও কোথাও বৈপরীত্য রয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি যে প্রতিকূলতা অতিক্রম করে গেছেন, সাহিত্যে তা সর্বত্র পারেননি। এ পরিপ্রেক্ষিতে সিরাজীর জীবন ও সাহিত্যকে বিচার করে এসবের একটি যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বর্তমান প্রয়াস হল সিরাজীর সাহিত্যের সমালোচনা নয়, বরং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পটভূমিতে সাহিত্যে প্রতিফলিত মানস প্রবৃত্তির বিচার বিশ্লেষণ এবং সিরাজীর ভূমিকা সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা প্রদান।

আমাদের পূর্বসূরীরা এ ব্যাপারে সিরাজীকে প্রায়ই খণ্ডিতভাবে বিচার করেছেন। পূর্বসূরীদের উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে অন্যতম ~~[illegible]~~ সাহিত্যিকে ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় এবং পরে মুসলিম বাংলা সাহিত্য পাঠ পরিক্রমা গ্রন্থে প্রকাশিত ডক্টর মুস্তাফা নূরউল ইসলামের "[illegible]" প্রবন্ধটি নানা দিক দিয়ে মূল্যবান, কিন্তু মানস প্রবৃত্তি বিচারের বিস্তৃত পটভূমি এখানে অনুপস্থিত। ফলে সিরাজী সম্পর্কে লেখকের সাধারণ সিদ্ধান্ত হল, সিরাজীর সাহিত্য প্রায় অতীত যুগের পুনরুজ্জীবনের ভাবে পরিপুষ্ট, তিনি

Dhaka University Institutional Repository

তিন

তাঁর যুগকে অতিক্রম করে আসতে পারেননি। কেবল তাই নয়, শিরাজী অতীত সময়কে এবং উপলব্ধিকেই আঁকড়ে ছিলেন।

ত্রৈমাসিক বাংলা একাডেমী পত্রিকা ১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যায়, পরে মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এবং ত্রৈমাসিক সাহিত্যিকী ৫ম বর্ষ : ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'শিরাজী-মানস-পরিক্রমা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ডঃ গোলাম সাকলায়েন শিরাজীর জাগরণ ও প্রত্যক্ষ প্রভাবকে গুরুত্ব দিয়েছেন। শিরাজীর জীবনী সম্পর্কে তাঁর তথ্যের উৎস সম্ভবতঃ এম, সেরাজুল হকের শিরাজী চরিত। সুতরাং শিরাজী-চরিত গ্রন্থের ত্রুটিও এখানে গৃহীত হয়েছে। শিরাজীর রচনাবলীর যে তালিকা তিনি দিয়েছেন আমরা সে সম্পর্কেও ভিন্নমত পোষণ করেছি।

বাংলা একাডেমী পত্রিকা ১৬শ বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত সানোয়ার জাহানের 'শিরাজীঃ জীবন ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধটি শিরাজীর জীবনালেখ্য ও কবিতায় শিরাজী মানসের মূল্যায়ন এবং বাংলা একাডেমী পত্রিকা ২২শ বর্ষঃ ৩-৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রতিক্রিয়ার ফসল, শিরাজীর উপন্যাস' প্রবন্ধটি উপন্যাসের আলোচনা। শিরাজীর প্রচলিত জীবনীর কিছু অংশ গ্রহণ করেছেন বলে সানোয়ার জাহান ও পূর্বোক্তর মত এক ধরণের ভুল তথ্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন। শিরাজীর সমকালীন পত্র পত্রিকার বিভিন্ন সংবাদ থেকে উদ্ধৃত করে শিরাজীর জীবনের উত্তরকালের যে অংশটুকু তিনি দাঁড় করিয়েছেন তা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তাঁর প্রদত্ত রচনা তালিকাটি নির্ভুল নয়, আমরা এ সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। শিরাজীর উপন্যাসের পরিবেশে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল, এটাকে উপন্যাসের একমাত্র সত্য হিসাবে গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। অনেকের মতই সানোয়ার জাহান প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে গ্রহণ করেছেন।

১৯৭০ সালে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী' শীর্ষক জীবনীগ্রন্থে ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান শিরাজীর জীবনী ও সাহিত্য মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। শিরাজীর জীবনের প্রারম্ভকালীন ভুল তথ্য এখানেও পুনরাবৃত্ত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, তুরস্ক ভ্রমণ প্রয়াস ব্যর্থ হবার পর শিরাজী আর স্কুলে পড়েননি এ সিদ্ধান্ত তথ্য নির্ভর নয়।

আনিসুজ্জামান 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন, শিরাজী সমন্বয়ধর্মী জাতীয়তাবাদীর রাজনীতি মোটামুটি মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যবাদী। বক্তব্যটি আংশিক

Dhaka University Institutional Repository

চার

সত্য, আমরা এ সম্পর্কে অপেক্ষাকৃতভাবে বিস্তৃত ব্যাখ্যাদানের প্রয়াস পেয়েছি। তিনি আরো একটি তথ্য দিয়েছেন যে, তুরস্কের দৃষ্টান্ত থেকে শিরাজী আদব কায়দা শিক্ষা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তুরস্কের দৃষ্টান্ত তিনি গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক যে গ্রন্থটি তুরস্ক ভ্রমণের অনেক আগে লিখিত। আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি, তুরস্কের দৃষ্টান্ত থেকে নয়, বরং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' শিরাজীর এ গ্রন্থ রচনায় অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া শিরাজীর এ গ্রন্থ রচনার পশ্চাতে গভীরতর সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল। কেবল এ গ্রন্থ নয়, তাঁর সকল রচনাই স্পষ্ট লক্ষ্যাভিসারী।

১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত শিরাজী রচনাবলীর (উপন্যাস খণ্ড) ভূমিকা হিসাবে লিখিত আবদুল কাদিরের প্রবন্ধটিতে তেমন নতুন কোন বক্তব্য নেই। শিরাজীর পূর্ণাংগ জীবনী গ্রন্থ মাত্র একটি, ১৯৩৫ সালে শিরাজী লাইব্রেরী কলিকাতা থেকে প্রকাশিত এম, সেরাজুল হকের শিরাজী-চরিত। গ্রন্থে ভক্তির আধিক্য রয়েছে, বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখার প্রচেষ্টা তেমন নেই। তাছাড়া তথ্যের ভ্রান্তিও রয়েছে, যেমন লেখক বলেছেন, বি,এল, হাইস্কুলে পাঠরত থাকাকালেই শিরাজী তুরস্কে পলায়ন করে যাবার চেষ্টা করেন। ব্যাপারটি সত্য নয়, এবং এ জীবনী গ্রন্থটি অনুসরণ করার ফলেই পরবর্তীকালে শিরাজীর জীবনী সম্পর্কে যারাই আলোকপাত করতে চেয়েছেন তাঁরাই এ ভুলটির পুনরাবৃত্তি করেছেন। আমরা বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের মাধ্যমে ভালোমত পরীক্ষা করেই মাত্র কোন মতামত গ্রহণ করার এবং তা বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছি। তুরস্কে পলায়ন প্রয়াস সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য হল, তিনি জ্ঞানদায়িনী হাইস্কুলে থাকা কালে এ গৃহত্যাগ করেন, এবং বি,এল, হাইস্কুলে ভর্তি হন এ ঘটনার অনেক পরে, ১৮৯৭ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী। আমরা বি,এল, হাই স্কুল রেকর্ড থেকেই এর প্রমাণ পেয়েছি জ্ঞানদায়িনী স্কুলটি ১৯০৯ সালে হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়। ১৯০৯ সনের আগে, অর্থাৎ মাইনর স্কুল থাকাকালে এ স্কুলের কোন রেকর্ড নেই। উল্লেখযোগ্য, আমাদের বর্তমান প্রয়াসের আগে অন্য কোন গবেষক তাঁর জীবনী সম্পর্কিত তথ্য এভাবে প্রমাণের চেষ্টা করেননি, এবং একারণে জীবনী গ্রন্থের একটি বিরাট ভুল তথ্যও স্বীকৃত মর্যাদা পেয়ে আসছিল।

এগুলোকে অধিকতর প্রমাণ সাপেক্ষ করে তোলবার জন্য শিরাজীর প্রায় সমকালীন এবং প্রত্যক্ষদর্শী বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। স্মৃতি প্রতারিত করতে পারে এ আশংকা মনে রেখেই সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অত্যন্ত সতর্কতার সংগে অন্যান্য প্রমাণের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে মূল্যবান সাক্ষাৎকারটি পাওয়া গেছে কবির সর্বকনিষ্ঠ ভাইয়ের নিকট থেকে। তথ্যটি হল কেন এবং কিভাবে শিরাজী স্কুলের পড়াশুনা পরিত্যাগ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। শিরাজীর জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

বেশ কিছু অনালোচিত দিক ব্যাখ্যা করায় এটা সহায়ক হয়েছে।

সাধারণভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক সূত্রকেই সব চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে ধরা হয়েছে। প্রাথমিক সূত্র অপর্যাপ্ত মনে হলেই কেবলমাত্র পরোক্ষ সূত্র থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। সেখানে পরোক্ষ সূত্রের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রায় নিঃসংশয় হবার পর কেবল সীমাবদ্ধভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সকল ক্ষেত্রেই মূল্যায়ন এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমাদের নিজস্ব। আমাদের আগে সিরাজী সম্পর্কে এত ব্যাপকভাবে প্রাথমিক সূত্রের ব্যবহার আর কেউ করেননি, এরকম বিস্তৃত এবং নতুন মূল্যায়ন সম্ভবতঃ আর কেউ করেননি। সিরাজী সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্যও আমাদের আবিষ্কার। উদাহরণ স্বরূপ বি,এল, হাই স্কুল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উল্লেখ করা যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সিরাজী সম্পর্কে অনেক সংবাদ আমরাই প্রথমে সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পেরেছি। সুতরাং এ অভিসন্দর্ভে সিরাজী সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য এবং মূল্যায়ন রয়েছে।

সিরাজগঞ্জে সিরাজীর বাসগৃহ বানীকুঞ্জে ১৮৯৪ সালে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ক্যাথিলা লাইব্রেরীতে রক্ষিত যাবতীয় বই, পত্র পত্রিকা, কবির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনাবলী অনেকবারই দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। এখানে প্রাপ্ত কাটিং বই সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক। কাটিং বই সর্বমোট ছয়টি এর মধ্যে একটি সিরাজী নিজেই প্রস্তুত করে রেখে যান। বাকীগুলি তাঁর মরণোত্তরকালের, ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সংবাদ সংগ্রহ। নিজের প্রস্তুত কাটিং বইয়ে কন্যার বিয়ের জন্য মুদ্রিত আমন্ত্রণপত্র থেকে শুরু করে নিজের রাজনীতি ও প্রচার জীবনের সংবাদ, প্রকাশিত অনেক রচনা, পত্র পত্রিকায় তাঁকে নিয়ে বিতর্ক ইত্যাদি রচনা কাটিং রয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, পরবর্তীকালে বাঁধাই করার সময় সম্ভবতঃ অনেক গুলি পত্রিকার নাম, প্রকাশের তারিখ, ইত্যাদি কেটে বাদ পড়ে গেছে। এসব পত্রিকা দুষ্প্রাপ্য বলে এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য আবিষ্কার করা কঠিন। যেসব রচনা ও সংবাদের প্রকাশ স্থানের ও তারিখের তথ্য নিশ্চিত-ভাবে জানা সম্ভব হয়নি তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ না হলে গ্রহণ করা হয়নি। ব্যবহৃত এরকম তিনটি তথ্য হল, সিরাজী ভারতীয় মুসলমানদের আহবান জানান, আফগানিস্থানের আমীর জেহাদ ঘোষণা করলে তাঁর পতাকাতলে ভারতীয় মুসলমানদের সমবেত হতে হবে। আর একটি হল, কলিকাতার গড়ের মাঠের এক জন সভায় তিনি মওলানা মহমদ আলীর সংগে তুমুল বাদ বিতন্ডার মাধ্যমে দাবী করেন যে, এটা বাঙালী মুসলমানদের সভা। সুতরাং এ সভায় মহম্মদ আলী প্রমুখের অধিকার সীমিত। হিতৈষী পত্রিকায় অত্যন্ত বড় হরফে শিরোনাম দিয়ে এ সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্যান ইসলাম সম্পর্কে সিরাজীর ধারণা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাখ্যার জন্য এ দুটো তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রধান হিসাবে কাটিং বইয়ের সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। এরকম আর একটি তথ্য হল, মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত চাঁদা আদায় সম্পর্কে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক।

শিরাজীর সমকালের দুর্লভ সব সম্পাদিত পত্র পত্রিকার সকল সংখ্যা না পাওয়া গেলেও প্রায়ই দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে। এ ছাড়া প্রবাসী, বসুমতী, ভারতী, নব্যভারত, সুপ্রভাত ইত্যাদি পত্রিকার কিছু সংখ্যা আমরা দেখেছি। অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত গ্রন্থ ও এসব পত্র পত্রিকার একটি গ্রন্থপঞ্জী শেষে দেয়া হয়েছে।

শিরাজী সম্পাদিত নূর পত্রিকার সকল সংখ্যা, নবপর্যায় সোলতান পত্রিকার ১৩৩০ সালের সকল সংখ্যা এর আগে শিরাজীর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বোধ হয় কেউ ব্যবহার করতে পারেননি। এ ছাড়া মিহির ও সুধাকর, ইসলাম দর্শন, কহিনূর, আল এসলাম, মোহাম্মদী ইত্যাদি পত্রিকায় শিরাজীকে নিয়ে চমৎকার বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, এগুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় স্থানে আলোকপাত করা হয়েছে।

রচনা তথ্য সমৃদ্ধ ও মূল্যায়ন আরো প্রামাণ্য করে তোলার জন্য পরিশিষ্ট আকারে শিরাজীর বিভিন্ন গ্রন্থের প্রাপ্ত প্রথম সংস্করণের নাম পৃষ্ঠার আলোকচিত্র, তাঁর সম্পাদিত দুটো পত্রিকার কভার পৃষ্ঠার আলোকচিত্র, শিরাজীর স্বহস্তে লিখিত একটি মূল্যবান চিঠির আলোকচিত্র, ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচার-সংবাদের আলোকচিত্র, গৃহীত সাক্ষাৎকার, ইত্যাদিও রয়েছে। ব্যক্তিগত চিঠিটি সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রী কৃষ্ণকুমার মিত্রকে লিখিত। সরকারী চাকুরীর ব্যাপারে তাঁর অনীহা কেবল মুখের কথা নয়, এটা তাঁর অন্তরের বিশ্বাস, যে তথ্য এখানে প্রতিফলিত। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এ পত্রটিতে শিরাজীর নিজের সম্পর্কে আড়াল করার কিছুই ছিল না।

মাত্র বাইশ বছর বয়সেই বক্তৃতায় খ্যাতি কিভাবে শিরাজীর নিজের ব্যক্তিত্বকে ঘিরে রোমান্টিকতার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল তার পরিচয় রয়েছে এ প্রচার সংবাদের মধ্যে। এ খ্যাতির রোমান্টিকতা শিরাজীর রাজনৈতিক জীবন, প্রচারক ও কর্মজীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক কিভাবে সৃষ্টি করেছিল তারও ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় স্থানে করা হয়েছে।

শিরাজীর সকল গ্রন্থের সকল সংস্করণ আমরা পাইনি, এগুলো এখন সহজলভ্য নয়। তা সত্ত্বেও প্রাপ্ত সংস্করণগুলোর মধ্যে তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ পাঠ পরিবর্তন কিংবা সংযোজনের প্রতিও কোন কোন ক্ষেত্রে আলোকপাত করা হয়েছে। উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত শিরাজীর বানানের এবং অন্যান্য বানান যথারীতি

Dhaka University Institutional Repository

রাখা হয়েছে।

সিরাজীর রচনা সংগ্রহ, তাঁর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়নের জন্য বাংলা একাডেমী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত সিরাজীর সমকালীন মুসলমান সম্পাদিত সকল পত্র পত্রিকা আমরা দেখেছি। এ ছাড়া গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকার জন্য বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, সিরাজী ফ্যামিলী লাইব্রেরী, সিরাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী, ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরী, সাবেক ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ গ্রন্থাগার, ব্যবহার করেছি। মরহুম মুহম্মদ ইদরিস আলী, সিরাজীর সর্বকনিষ্ঠ জামাতা মরহুম ইজাব উদ্দীন আহমেদ, জ্যেষ্ঠা কন্যা সৈয়দা ফেরদৌস মহল সিরাজী, পৌত্রী সৈয়দা গুলগুল মহল সিরাজী, ডক্টর মুহম্মদ নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক আলী আহমদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছি। অভিসন্দর্ভটিকে যতদূর সম্ভব পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে প্রাপ্ত সকল উৎস ব্যবহার করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটিকে সর্বমোট সাতটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে দেশ-কালের যে প্রতিবেশে সিরাজীর মন-মনন গড়ে উঠেছিল তার রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি সিরাজীর জীবন পরিচিতি ও মানস-প্রকৃতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কিত। তাঁর জীবন সম্পর্কে পূর্বে অনাবিষ্কৃত বহু তথ্য এখানে স্থান পেয়েছে, এ সবের মধ্য দিয়ে তাঁর বাল্য, শিক্ষা ও সংসার জীবন, প্রচারক জীবন ও কর্মজীবন, রাজনীতি, সাহিত্যিক জীবন এবং এ পটভূমিতে তাঁর মনোজীবনের স্বরূপ সন্ধানের প্রচেষ্টা আছে।

তৃতীয় অধ্যায়টি তাঁর উপন্যাসের আলোচনা। সাধারণ ধারণা প্রচলিত যে, হিন্দু সাহিত্যিকদের প্রত্যুত্তর দানের মধ্য দিয়েই সিরাজীর উপন্যাসের সৃষ্টি। এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের, বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের আলোকে এবং সমকালীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রতাপাদিত্য উৎসব, শিবাজী উৎসব প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সিরাজীর উপন্যাসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়টি সিরাজীর কবিতা সম্পর্কে আলোচনা। প্রচারক জীবনের সঙ্গে সাহিত্যিক জীবনের সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনল প্রবাহ কাব্য কিভাবে সেতুবন্ধন করে দিয়েছে, নতুন দেশাত্মবোধের মধ্যেও তিনি

কিভাবে অনুসরণপূর্বক কবিতা রচনার প্রয়াস করেছিলেন, আখ্যান কাব্য, খণ্ড কবিতা ইত্যাদি কিভাবে কবির মনোভাবনের বিভিন্ন দিকের পরিচয় বহন করছে সে সম্পর্কে প্রধান দিক আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়টি প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্য রচনা সম্পর্কিত। ভাষা ও সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি চিন্তার মধ্যে কিভাবে তাঁর মন আলোড়িত ও আন্দোলিত হয়েছিল, এখানে তার প্রকৃতি অনুসন্ধানের প্রয়াস রয়েছে। [illegible] এবং অন্যান্য গদ্য রচনাতেও তাঁর চিন্তার স্বরূপ পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হয়েছে। শিরাজী অনেক সময়ই তাঁর বক্তব্য পুনরাবৃত্ত করেছেন, ফলে আলোচনার ক্ষেত্রে সর্বত্র কালানুক্রমিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

শেষ অধ্যায়, উপসংহারে পূর্বে আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য এবং উপলব্ধ তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পটভূমি

এক

১৭৫৭ সনে পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতে ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়। ভারতে ইংরেজ শাসনের ফলে পরিবর্তন এসেছিল। এ পরিবর্তনটি প্রধানত ছিল অর্থনৈতিক, পরে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তা পরিব্যাপ্ত হয়েছে, এবং কার্যত হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কটি সবচেয়ে বেশী বিচলিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় মোঘল রাজশক্তির দুর্বলতা, মুর্শিদ কুলিখাঁ, আলীবর্দী খাঁ প্রমুখের ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টার ফলে দরবার এলাকাতে বিত্তবান হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক তিক্ত থাকলেও[১] বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সে সময় তা স্পর্শ করতে পারেনি। ইংরেজী শিক্ষার ফলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দু মধ্যবিত্ত এবং শেষ তিন দশকে মুসলিম মধ্যবিত্ত কর্তৃক সামাজিক নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর উভয়ের স্বার্থ সংঘাত যত তীব্র হয়েছে, সাম্প্রদায়িক সম্পর্কে তত ফাটল ধরেছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও তা ক্রমে বিস্তৃত হয়েছে। তৃতীয় পক্ষ ইংরেজের উপস্থিতিতে এটা আরো জটিল হয়ে উঠেছে।

দুই

ইংরেজরা এদেশে এসেছিল বাণিজ্য বহর নিয়ে, লক্ষ্য ছিল মুনাফা অর্জন। ভাগ্যদেবীর কৃপায় তারা পৃথিবীর অন্যতম সম্পদশালী দেশে সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়ে বসল।[২] কোম্পানীর সহায়ক, সমর্থক, বাণিজ্যের

১। "This was due principally to two inportant changes which greately influenced the political conditions of Bengal, one was the gradual weakening of the Imperial Authority at Delhi and the consequent rise of upstarts and Adventurers like Murshid-Quli-or Alivardi as provincial Governors and the other was the emergence and active participation of great European powers in the field of Indian politics."-Kalikinkar Datta -Studies in the History of the Bengal Subah 1740-70, Vol.I. Calcutta, University of Calcutta, 1936, P.99.

২। Buchanan-The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, Vol. III, London, Wmh, Allen and co. Introduction.

শহরের মধ্যে একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়[৬], এদের মূলে ছিল অভিজাতদের সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা। এ ছাড়া অর্থব্যবসায়ী মহাজনশ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল এবং প্রায় সকলেই হিন্দু[৭]। মুসলমান অর্থের অভাবে বাঙালী মুসলমানেরা এ সুযোগ নিতে পারেনি। ইংরেজদের আগমন পুরানো সমাজ কাঠামো ভেঙে দেয় ও নব শিক্ষিত মধ্য বিত্তবান শ্রেণীর আগমন ঘটে, ফলে সামাজিক মর্যাদা ভূমি থেকে মুদ্রায় রূপান্তরিত হয়[৮]।

১। (ক) Studies in the History of the Bengal subah, P. 104.
(খ) Abdul Karim-Murshid Quli Khan and His Times, Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1963, pp. 235-36.

২। Narendra K. Sinha-The Economic History of Benghl, Vol-I, Calcutta, published by the Author, 1956, p. 211.

৩। Ibid, p. 93.

৪। "Bengal" Encyclopaedia of Islam I (Leyden, 1913), 696: "India" Encyclopaedia of Islam, II (leyden, 1927), 479; উদ্ধৃত, আমিনুজ্জামান-মুসলিম সমাজ ও বাংলা সাহিত্য ১৭৫৭-১৯১৮, ঢাকা, [illegible], ১৯৬৪, পৃঃ ৮।

৫। Murshid Quli Khan and His Times, p. 70.

৬। A.R. Desai-Social Background of Indian Nationalism, Bombay, popular prokasan, 1976, p. 177.

৭। Azizur Rahman Mallick-British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856), Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1961, p. 52.

৮। (ক) A.K. Nazmul Karim-Changing Society in India and Pakistan. Oxfor University press, 1956, p. 1.
(খ) [illegible], [illegible], ১৯৬৬, পৃঃ ১১।

সহযোগী প্রায়ই ছিল হিন্দু ও তাদের বাড়ির বসতিগুলো। বিনা শুল্কে বাণিজ্যের সুবিধা দিয়ে কোম্পানীও তাদের বিত্তশালী করেছে। কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা বাড়ার সঙ্গে অধিক সংখ্যায় উচ্চবর্ণের হিন্দুকে বেনিয়া হিসাবে আসতে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু মুসলমানদের নাম পাওয়া যাচ্ছে না।

নবাবী আমলে সরকারী সুবিধাভোগী উচ্চবর্ণের মুসলমানদের সঙ্গে বাংলার সংখ্যাগুরু মুসলমানদের সম্পর্ক তেমন ছিল না। এরা অনেকেই বহিরাগত বা তাদের উত্তর পুরুষ। অন্যদিকে, বাংলার বৃহত্তর মুসলমান সমাজ গড়ে উঠেছিল কৃষক, তাঁতী এবং অন্যান্য পেশাজীবীদের নিয়ে। এদের অবস্থা মোটামুটিভাবে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের সমানুপাতে ছিল, জমিদার, মহাজন, নীলকর, কোম্পানীর শোষণ ও নির্যাতনের প্রধান শিকার ছিলেন এরাই।

নবাবী আমলে রাজস্ব বিভাগে হিন্দু অফিসারদের প্রাধান্য ছিল। অভিজ্ঞতার কারণেই কোম্পানী আমলেও তাদের সে প্রাধান্য বজায় থাকল। কেবল তাই নয়, তাদের অধিকাংশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর নতুন তালুক বিধানের সহায়ক হয়ে উঠল। সমাজে এদের ভূমিকা আগের তুলনায় প্রবল হয়েছে। পুরানো জমিদারের ঘরে প্রজার সুখ দুঃখের সঙ্গে অবস্থান করতেন, নতুন জমিদার প্রজার নিকট থেকে অনুপস্থিত থাকতেন, ফলে প্রজা ও জমি-

Dhaka University Institutional Repository

১৮২৮ সনে রাষ্ট্রের সম্পত্তির মত দেবোত্তর সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, রাজস্ব বাজে-য়াপ্তি ইত্যাদির ফলে সামাজিক মুসলমানও দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হলেন, যারা সমাজের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তারা নেমে আসলেন ধুলায়।

সেনাবাহিনী, পুলিশের মধ্যে মুসলমান অফিসারেরা চাকুরীচ্যুত হলেন, ১৮৩২ সন থেকে ইংরেজীর আইন প্রয়োগ শুরু হলে বিচার বিভাগেও তাদের স্থান ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসল। পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন এবং ইংরেজী শিক্ষিতের জন্য চাকুরীর সুযোগ বাড়ানো হলে মুসলমানেরা আরো পিছিয়ে পড়লেন।

শিক্ষা [illegible]

এদেশে ইংরেজী শিক্ষাদানের প্রথম প্রচেষ্টা পাশ্চাত্য [illegible] মিশনারীদের দ্বারা শুরু হয়।[৮] নবাব দরবারে মুসলমানদের মধ্যে ফারসী ভাষার সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষা প্রথমও প্রচলিত ছিল। যেমন নবাবের পুত্র হোসেন আলী খান মুর্শিদাবাদের ইংরেজ রেসিডেন্ট ভেরেলস্টকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন,

"Husain Ally Khan, presents his compliments with his first essay of English writing to his good friend Mr. Verelst in wishing him a happy new year."[৯]

১৮০৭ থেকে ১৮১৪ সালের মধ্যে প্রণীত রিপোর্টে বুকানন বাংলাদেশে আরবী ও ফারসীতে উচ্চ শিক্ষা প্রচলিত, এমন কি নবাবদের শিক্ষাক্রমেও এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখা যায়নি।[১০] পরবর্তীকালে অবশ্য ক্যালকাটা মাদ্রাসায় মুসলমান ছাত্রদের আরবীর তুলনায় ইংরেজীতে উচ্চ শিক্ষার প্রতি কিছুটা আগ্রহ দেখা গেছে।[১১]

মুসলিম বিদ্যার্থীরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নেন, সেই সঙ্গে এ শিক্ষাকে তারা দুটি দৃষ্টি-ভঙ্গির বাহন হতে দেখেন।[১২] এ পরিস্থিতিতে বেনটিংকের প্রতি প্রথম ও সরকারী অনুদান সম্পূর্ণ ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলে ৮০০০ মুসলমান স্বাক্ষরিত একটি আবেদন পত্র দেয়া হয়, সরকারের এ উদ্যোগ অসাধারণভাবে দুটি অর্থ বহন করার অভিযোগে।[১৩] এই প্রচেষ্টার ব্যাপারে বিদ্যার্থীদের ভূমিকা থেকে একথা আমরা বুঝতে পারি।

৮। Lon's selection from the unpublished records of the Government Vol.I, pp.48-49, Quoted, Studies in the History of the Bengal subah, pp-24-25.

৯। India office London, M.M.S. 739, Quoted Abdul Majed Khan-The Transition in Bengal 1756-1777, Cambridge, At the University press, 1969, pp-138-39.

১০। Eastern India, Vol. I.p.133.

১১। S.C. Sanial- History of the Calcutta Madrassa, Bengal past and ~~present Vol.III, Jan-June, 1914, p.222.~~

১২। [illegible] বাংলা একাডেমী, ১৩৬৮, পৃ ১৬৮।

১৩। Bimanbehari Majumdar-History of political Thought, Vol.I, University of the Calcutta, 1934, pp.390-98.

তাসত্ত্বেও ইংরেজদের শাসন কায়েম হওয়ার পর ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ যেমন ব্যাপকভাবে প্রবল অনুভূতির ভার চিত্র দিয়েছেন রাজনারায়ণ বসু[১] ও শিবনাথ শাস্ত্রী[২]। একেত্রে স্মরণীয় যে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি শ্রেণী রক্ষণশীলতা থেকেই ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিরূপ ছিলেন। কেবল তাই নয়, ইংরেজকে তাঁরা উদ্ধত্যমান শত্রু হিসেবেই দেখেছিলেন, ইংরেজের নিকট থেকে সুবিধা গ্রহণ করতে অনাগ্রহী ছিলেন। একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ চিরকালই বিত্তবান ছিল, তবে নতুন বিত্ত হিন্দু সমাজে পুনর্গঠন প্রক্রিয়াকে যেভাবে ত্বরান্বিত করেছিল, দেশী মুসলমানদের পক্ষে সে সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। দেশী মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনীহার অন্যতম কারণ ছিল, কলিকাতা থেকে দূরবর্তী বলে পশ্চিম বাংলার তুলনায় পূর্ব ও উত্তর বাংলার জনসাধারণকে শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর থাকতে দেখা যায়[৩]। তাছাড়া দেশী মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার অভ্যাসটিই গড়ে ওঠেনি, তাদের শিক্ষার অবস্থা দেখেও একথা অনুমান করা যায়।

১৭৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা মাদ্রাসায় ১৮২৯ থেকে ১৮৫১ সালের মধ্যে মাত্র দুজন ছাত্র-আবদুল মজিদ এবং ওয়াহিদুন্নবী জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ সময়ে ১৭৮৭ জন ছাত্রের জন্য ১,০০,৭৯৪ টাকা ব্যয়[৪] এবং মাত্র দুজন ছাত্রের সাফল্য এখানে শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা প্রতিপন্ন করে।

১৮৩৬ সালে হুগলী কলেজ খোলার তিন দিনের মধ্যেই ইংরেজী বিভাগে ছাত্র সংখ্যা হয় বারোশো[৫] এবং প্রাচ্য বিভাগে হয় তিনশো জন। এর মধ্যে মুসলমান ও হিন্দুর আনুপাতিক হার হয় প্রথমটিতে ৩১ এবং ১১৮ শেষোক্তটিতে ১০৮ এবং ৮৬ জন। হুগলী কলেজ চলত মহসিন ফান্ডের অর্থ দিয়ে, একারণে এটা নিয়ে মুসলমানদের অনেক অভিযোগ ছিল।[৬] ১৮৭৮ সালে এখানে ৪৪২ জন ছাত্রের মধ্যে ১১ জন খৃষ্টান, ৪ জন মুসলমান

১(ক) রাজনারায়ণ বসু-সে কাল আর এ কাল, কলিকাতা, নতুন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। শক ১৮০০, পৃঃ ২২-২৩।

(খ) "আমি going হুজুর, গোবিন্দ সরকার যায়
কহে Your akroor is a great rascal".
আমরা কৌতুকের জন্য নহে, গম্ভীরভাবে ঐরূপ ভাষায় কথা কহি। কিন্তু আমরা নিজেরা বুঝিতে পারি না তাহা কত হাস্যাস্পদ।" প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।

২। শিবনাথ শাস্ত্রী-রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৪, পৃঃ ৬৬-৬৭, ৭৪।

৩। British Policy and the Muslims in Benglal, p.276.

৪। History of the Calcutta Madrassa, p.98.

৫(ক) K.Zachariah- History of the Hooghly College, 1836-1936. Alipore, superintendent, Bengal Government press, p.11.

(খ) F.B. Bradley Birt- Twelve Men of Bengal. Calcutta, S.K. Lahiri and co. Fourth edition, pp. 57-58.

৬। Abdul Karim- Muhammadan Education in Bengal, Calcutta, Metcalfe Press, 1900, pp.13-14.

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫৭ সালের মে মাসে ৪৭৪ জন ছাত্রের মধ্যে ৪ জন খৃষ্টান এবং ৮ জন মুসলমান, ১৮৮০ সালে মুসল-মান ছাত্র ৩৩ জনে উন্নীত হয়েছে।[১] হুগলী মাদ্রাসায় এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগেও ছাত্র প্রধানত ছিল হিন্দু। ১৮৪০ সালে এ বিভাগে ৫৮ জন ছাত্রের মধ্যে ২৪ জন মুসলমান ছিল। এখানে ছাত্রদের জন্য কোন বেতন লাগত না, অধিক বয়স্ক মুসলমান ছাত্রের ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রগতিও ছিল অত্যন্ত মন্থর। প্রিন্সিপাল এজন্যে অভিযোগ করেন, স্কুলটি উঠিয়ে দেয়া হোক, অথবা মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষকদের বাদ দেয়া হোক[২]।

হিন্দু জনগোষ্ঠীর জন্য হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা বেশী হলেও মুসলমান ছাত্রের শিক্ষার একটি চিত্রও এখানে পাওয়া যায়। সাম্প্রিকভাবে তারা শিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিল এরকম সিদ্ধান্ত নেয়া চলে না।

১৮৫০ সালের পর হুগলী কলেজে এবং কলকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় এবং প্রকৃতপক্ষে মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী মনোযোগ আসে সিপাহী বিদ্রোহের পর, সত্তরের দশকে। ইতিমধ্যে হিন্দু সমাজ নতুন বিত্তের উদ্ভবের সঙ্গে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর হয়েছিল।

১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর বাংলা গদ্যের সূচনা যদিও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কেবলমাত্র বাংলা ভাষা চর্চার জন্য নিবেদিত ছিলনা, উপমহাদেশে বোম্বে-মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষাও এখানে শিক্ষা দেয়া হত। কর্মচারীও হিন্দু মুসলমান উভয়েই ছিলেন। এখানে রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র প্রকাশিত হয় ১৮০১ সালে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ বাংলা গদ্যকে সচল করে তোলেন। বাঙালী মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা এখানেই চিহ্নিত করা যায়, প্রথম বাংলা গদ্যের লেখক খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকীর (১৮০৮–১৮৭০?) 'উচিৎ শ্রবণ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে[৩]। অর্থাৎ বাংলা গদ্য সৃষ্টির সময় "মুসলমানেরা তখনো মিশ্র ভাষায় কাব্য সৃষ্টি করছেন গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে[৪]" এবং 'উচিৎ শ্রবণ' যখন রচিত হলো তখন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত(১৮১২–১৮৫৯), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪–৮৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর(১৮২০–৯১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ – ১৮৭৩)

১। History of the Hooghly College, p. 48.

২। Ibid, p. 35.

৩। মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১০৯।

৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৮, ১৫৮।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪), প্রমুখের সাহিত্য চর্চার ফলে প্রশস্ত হয়ে গেছে।

মুসলমান সাহিত্যিকদের তুলনায় মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১) যে যুগের ব্যতিক্রমী প্রতিভা। তাঁর রত্নবতী প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে, বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) প্রকাশের চার বছর পরে এবং মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১) প্রকাশের আট বছর পরে। রত্নবতী সম্পর্কে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় সমালোচক প্রশংসা না করলেও মনে করেছেন মুসলমানের অপেক্ষা যে কোন হিন্দু লেখক কর্তৃক এটা রচিত।[১] মুসলমানদের এ পশ্চাৎপদতাই তাদের প্রতিক্রিয়াবাদী করে তুলেছে, রাজনীতি, সমাজচিন্তা ও সাহিত্যে।

চার

ভারতে ইংরেজের বাণিজ্য ছিল লুণ্ঠনের নামান্তর;[২] এভাবে নির্মম শোষণের ফলে ভারতে দুর্ভিক্ষই নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়ায়।[৩] কোন কোন দিক দিয়ে এদেশের প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এবং বাংলায় বর্ণ ও বর্ণ নির্বিশেষের মধ্য থেকে সময় সময় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের লক্ষ্য ছিল হিন্দু মহাজনের শোষণের হাত থেকে মুক্তি।[৪] বুকানন লক্ষ্য করেছিলেন, গ্রামাঞ্চলে নায়েব, জমিদার ও চাষীদের মধ্যেকার সম্পর্কের অবনতি ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই।[৫] নীল বিদ্রোহে হিন্দু মুসলমান উভয়েই অংশ নিয়েছিল, বাঙালী নায়কদের অত্যাচার সম্পর্কে সব পত্রিকা [illegible]।[৬] নীল বিদ্রোহে উস্কানী দিচ্ছেন এ অভিযোগে তরুণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নবাব আবদুল লতিফকে বারাসতের কালারোয়া থেকে অন্যত্র বদলী করে দেয়া হয়।[৭]

বাংলায় মুসলমানদের সংস্কার আন্দোলন হয়েছে দুটো, তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া এবং ফরায়েজী আন্দোলন। কিছুটা বহিরাগত সাদৃশ্যের কারণে প্রথমটি ওহাবী আন্দোলন নামেও পরিচিত হয়েছিল।

১। Calcutta Review, No.99, 235... উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২২।

২। Jawharlal Nehru-The Discovery of India. Calcutta, The Signet press 1949, p.349.

৩। Romesh Dutta. C.I.E.-The Economic History of India under early British Rule, London, Routledge & Kegan paul ltd, 1950, p.420.

৪। (ক) Kalikinkar Datta-The Santal Insurrection, University of Calcutta, 1940, pp.5-9.
(খ) William Wilson Hunter-Annals of Rural Bengal, London, Smith, Elder and Co. 1868, PP. 228-60

৫। Eastern India, Vol. II, pp. 995-96.

৬। বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত ও সংকলিত)-সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২, পৃঃ ৫৮, ৫৯, ৬২, ৯৮-৯৯, ১০২, ১০৯ ইত্যাদি।

৭. Blair B. Kling-The Blue Mutiny, philadelphia, University of Pennsylvania press 1968, pp.68-69.

Dhaka University Institutional Repository

১৮২৭-৩১ সালে তিতুমীরের সংগ্রাম বাংলায় ওহাবী আন্দোলনের একটি অংশ।[১] ১৮৩৭ থেকে ১৮৬১ সালের মধ্যে পাটনার ইনায়েত আলী ও বিলায়েত আলী এটাকে আরো রাজনৈতিক রূপ দেন।[২] ইংরেজ সরকার ওহাবীদের বিরুদ্ধে ১৬টি অভিযান পরিচালনা করে।[৩] ইসলাম ধর্ম সংস্কারের প্রয়োজনে ধর্ম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেহেতু বিধর্মী রাষ্ট্র শক্তির সংগে ওহাবীদের বিরোধ সৃষ্টি হয়।[৪] তিতুমীরের সংগ্রাম ছিল মূলতঃ জমিদারের বিরুদ্ধে। কৃষক মুসলমান, জমিদার মহাজন হিন্দু, সুতরাং অতি সহজেই এটা সাম্প্রদায়িক রূপ পেয়েছিল। তাঁর বিদ্রোহ দমন করতে হিন্দু জমিদার, ইংরেজ নীলকর, কলিকাতার সরকার ও অভিজাত মুসলমান সকলেই সহযোগিতা করেছিল।[৫] তিতুমীরের বিদ্রোহের মধ্যে বাংলার একটি জাতীয় সংগ্রামের আন্দোলনের চরিত্রও ছিল। ওহাবী আন্দোলনে বাংলা ও বিহারের মুসলমানরা যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেন, অধিকাংশ প্রভাবশালী ওহাবী ছিলেন বাঙালী।[৬] ওহাবীদের প্রচারের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বাংলায় তাঁদের প্রভাব বিস্তারের কারণ সেখানে নিহিত। প্রচারের মধ্যে তিন প্রধান দিক ছিল, (ক) নিজের ধর্মবিশ্বাসের ত্রুটি সংশোধন করে নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদে অংশ গ্রহণ, জেহাদের জন্য টাকা বা অর্থ সাহায্য দান ও খাজনা বর্জনের পথ, (খ) ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদের ফলে মুসলমান শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং (গ) খাজনাবিহীন জমি ভোগ করার প্রতিশ্রুতি।

ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদের অনিবার্য ফল হবে মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠা, এবং খাজনা বিহীন জমি পাবার সম্ভাবনায় হিন্দু কৃষকও মুসলমান শাসন সম্পর্কে সহনশীল ছিল। কৃষক জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজের বিভিন্ন সংস্কারনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব এখানে লক্ষ্যণীয়।

১। Abdul Bari-The Reform Movement in Bengal, A History of the Freedom Movement, Vol.I, Karachi, The Board of Editors, 1957, p.550.

২। Qeyamuddin Ahmed - The Wahabi Movement in India. Firma K.L. Mukhopadhyay, First Edition, 1966, p.324.

৩। অমলেন্দু দে-বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলিকাতা, রত্না প্রকাশন, ১৯৭৪, পৃঃ ১১৮।

৪। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ-সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪, পৃঃ ১১৭।

৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭।

৬। Muin-ud-din Ahmed Khan-Selections from Bengal Government Records on Wahabi Trails, (1863-1870), Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1961, p.66.

৭। Ibid, pp. 280-352.

Dhaka University Institutional Repository

ওহাবী আন্দোলনের মধ্যে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ চেতনা যুক্ত ছিল বলে এবং সামাজিক ভূমিকা নেতিবাচক হয়েছে। মুসলমানের রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটা বেশ অগ্রসর ছিল, কিন্তু সামাজিক দিক দিয়ে পশ্চাৎমুখী। সেকারণে বাংলায় ওহাবী আন্দোলন সার্বিকভাবে মুসলমানদের পশ্চাৎমুখীন করে তুলেছে এবং আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর তাঁরা অনেকে ইংরেজকেই ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী বলে মনে করেছে। অনেকটা ওহাবী আন্দোলনের মত বিধর্মী শাসিত ভারতবর্ষ থেকে বিশ্বের মুসলমানদের হিজরতের আকাঙ্ক্ষা আর একবার প্রকাশিত হয়েছিল খিলাফত আন্দোলনকালে, সিভার্স চুক্তি স্বাক্ষরের পর। খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হলে সাম্প্রদায়িক সংঘাত বৃদ্ধি পায়, ওহাবী আন্দোলনের পর এমন হয়নি। পরবর্তীকালে বিচার পর্বের মধ্য দিয়ে ওহাবী আন্দোলন শেষ হয়ে যায়।

হাজী শরীয়তুল্লাহর (১৭৮০-১৮৩৯) নেতৃত্বে মুসলমানদের আত্মশুদ্ধিকরণের মুখ্য ফরায়েজী আন্দোলনও একভাবে তাঁর পুত্র দুদু মিয়ার (১৮১৯-১৮৬০) হাতে রাজনৈতিক চরিত্র পেল। ফরায়েজীরা ছিলেন হানাফী মযহাবের; ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষকে দার-উল-হরব, এবং তাতে ঈদ বা জুম্মার নামাজ হতে পারে না বলে তাঁরা মনে করতেন। দুদু মিয়া অবশ্য পীরের শাসনত স্বীকার করতেন, যদিও তাঁরা পীর পূজা, গোরপূজা ইত্যাদির বিরোধী ছিলেন।[২] ওহাবদের তুলনায় ফরায়েজীদের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল অনেক বেশি সীমিত[৩]। দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর আন্দোলনের বল নষ্ট হয় ও নেতৃত্বের অভাবে ক্ষীণ, ফলে ফরায়েজীরা কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় গ্রুপ হিসেবেই টিকে থাকলেন[৪]।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিঙ্গ বাংলায় ব্যারাকপুর ও বহরমপুরে হলেও প্রধান উত্তাপটি ছিল দেশের উত্তর ভারতে। বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয় এবং দিল্লীর পতনের পর বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ নিজ নিজ স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্রোহে অংশ নেয় কিংবা এটা থেকে দূরে থাকে। বাংলায় নতুন মধ্যবিত্ত এ বিদ্রোহ থেকে দূরে ছিল। বাঙালীরা সিপাহী বিদ্রোহকে ঠিক জাতীয় আন্দোলন বলে মনে করতে পারেনি।[৫]

১। Muin-ud-din Ahmad Khan-History of the Faraidi Movement in Bengal 1818-1906, Karachi, Pakistan Historical Society, 1965, p.XLIX.

২। M.A.Bari-The Reform Movement in Bengal-A History of the Freedom Movement, Vol.I, pp.546-49.

৩। H.Beverage-The District of Bakarganj, Lond. Trubner & co.1870. Reprint, Bakerganj District Council, 1970, p. 227.

৪। History of the Faraidi Movement in Bengal, p.XXXV.

৫। [illegible], ... পরে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড পৃঃ একত্রা।

Dhaka University Institutional Repository

তারা উল্লসিত হবার পরিবর্তে শঙ্কিত হয়েছিল ? অনেকে পুনরায় ইংরেজ রাজত্ব কামনা করেছিলেন ।[২] সমকালীন পত্র পত্রিকায় সিপাহীদের নিন্দা ও তাদের পরাজয়ে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়,[৩] পলাতক সিপাহীদের বিদ্রুপ করা হয়[৪], মুসলমানদের ইংরেজ বিদ্বেষের জন্য দোষারোপ করা হয়[৫]। সিপাহী বিদ্রোহকালে সংবাদ ভাস্কর সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মৃতি মনে করে ভীত হয়েছে[৬], কিন্তু বিদ্রোহের পর ইংরেজ প্রদত্ত সুবিধায় লাভবান হয়েছেন নতুন সমাজ, ইংরেজের নিকট থেকে তাঁরা এটা কৃতজ্ঞতার সংগেই গ্রহণ করেছেন[৭]। সিপাহী বিদ্রোহে হিন্দু মুসলমান সিপাহী নির্বিশেষে অংশ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু সমকালীন ইংরেজরা বিদ্রোহে মুসলমানদের ভূমিকাই বেশী বড় মনে করেছিল[৮]।

পাঁচ

সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত নতুন ভূমিকা নিয়ে জাতীয় আন্দোলনে এগিয়ে আসলে মুসলমানদের সম্পর্কে ইংরেজ নতুনভাবে ভাবতে শুরু করল । সরকার মুসলমান উচ্চবিত্তকে গ্রহণ করল হিন্দুর সামনে দাঁড় করানোর জন্য[৯]। ইংরেজ সুযোগ দিতে চাইল এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) সুযোগ নিতে চাইলেন এখানে উভয়ের আকাঙ্ক্ষার মিলন ঘটল । তাঁর ভূমিকা প্রসংগতঃ রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) সংগে তুলনীয়[১০]। প্রথম দিকে সৈয়দ ছিলেন অসাম্প্রদায়িক, তিনি মনে করেছেন ধর্মীয় পার্থক্যের কোন রাজনৈতিক ও জাতীয় তাৎপর্য নেই[১১]। কিন্তু শেষের দিকে তাঁর মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল[১২] তিনি নানা উপায়ে ইংরেজের সংগে মুসলমানদের সখ্যতা স্থাপনের পথ প্রশস্ত করে দেন[১৩]। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ১৮৭৭ সালে আলীগড় কলেজ , ১৮৯০ সালে এটা বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। তাঁর

১(ক) সুকুমার সেন-বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ষষ্ঠ সং, ১৩৭৭ পৃঃ ২১৩ ।
(খ) রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা, চ.সং ১৯৫২, পৃঃ১৩৩ ।
২। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-বিদ্রোহে বাঙ্গালী বা আমার জীবন চরিত, কলিকাতা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ নূতন সং, ১৯৫৭, পৃঃ ৬৬, ৯৪, ১৭৪, ২৭৪।
৩। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪৩, ১৫৭ ।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৭ ।
৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৪-৫৩ ।
৬। প্রাগুক্ত, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, বীক্ষণ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬, পৃঃ ২৯৯-৩০০।
৭(ক) প্রাগুক্ত, চতুর্থ খণ্ড, কলিকাতা, পাঠভবন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬, পৃঃ ৩৭৭।
(খ) শিবনাথ শাস্ত্রী - রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বি- সং, ১৯৫৭, পৃঃ ১৯৭ ।
৮। Jawaharlal Nehru-An Autobiography,London.John lane the Bodley Head,First published,1936,p. 460.
৯। Wilfred Cantwell Smith-Modern Islam in India.Lahore,Minerva Book shop,Second ed. 1946,pp.199-200.
১০। মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৬৯-৭০ ।
১১। দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু মোহন চৌধুরী, বিভক্ত ভারত, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৫, পৃঃ৭-৮।
১২(ক) Modern Islam in India,p.8.
(খ) J.M.S.Baljon,-The Reform and Religious Ideas of sir Sayyid Ahmed Khan. Lahore,orientalia,Second ed. 1958,p.23.
১৩। Lieut.Colonel G.F.I.Graham-The life and work of Syed Ahmed Khan ,Delhi,Idarah-i-Adabiyat-i-Delhi,Reprint,1974,pp.245-288.

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স (১৮৮৬) সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল[১], এটা সম্প্রসারিত আকারে রাজনৈতিক রূপও পেয়েছিল। জীবদ্দশায় সৈয়দ আহমদ খানের কণ্ঠস্বর বাংলা পর্যন্ত পৌঁছায়নি, তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে, ঢাকায় ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের বৈঠকেই মুসলিম লীগ গঠিত হয়। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু মুসলমান সদস্য এ বৈঠকে অংশ নেন[২]।

বাংলায় মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নবাব আবদুল লতিফ। ১৮৫৩ সালে তিনি মুসলমান ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা সম্পর্কে মুসলমানদের নিকট থেকে প্রতিযোগিতামূলক রচনা আহ্বান করেন এবং একশো টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন[৩]। এজন্য যে সাড়া পান তা আশাব্যঞ্জক নয়। মহসিন ফান্ড নিয়ে বিতর্কেও তিনি অংশ নেন, ১৮৭২ সালে মহসিন ফান্ডের অর্থ মুসলিম শিক্ষার জন্য ব্যয় করা সম্ভব হয়[৪]। নবাব আবদুল লতিফ সৈয়দ আহমদ খানের তুলনায় শুরু করেন আগেই[৫], কিন্তু সৈয়দ আহমদ খান ইংরেজী ভাষার পাশাপাশি মাতৃভাষার চর্চাকে যেভাবে গুরুত্ব দেন নবাব আবদুল লতিফ তা করেননি বলেই পিছিয়ে পড়েন। আবদুল লতিফের পারিবারিক কথোপকথনের ভাষা বাংলা নয়, সম্ভবতঃ এ কারণেও বৃহত্তর বাঙালী মুসলমান সমাজের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি।

নবাব আবদুল লতিফ প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির (১৮৬৩) বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে[৬] বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক উপস্থিত থেকেছেন, প্রায় একই সময়ে অনুষ্ঠিত হিন্দু মেলায় কোন মুসলমানকে দেখা যায় না[৭]। ওহাবীদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা যখন ব্যবস্থা গ্রহণ করে তখন নবাব আবদুল লতিফ এগিয়ে

১। Modern Islam in India, pp.10-11.

২। Sufia Ahmed-Muslim Community in Bengal, 1884-1912, Dacca, published by the Author, 1974, pp.85-89.

৩। A short account of my public life, Nawab Bahadur Abdul Latif C.I.E. Calcutta Thacker Spink & co. p.178.

৪। Mohammadan Education in Bengal, pp.68-69.

৫। History of political Thought, pp.392-94.

৬। A Quarter Century of the Mohamedan literary society of Calcutta, Dr. Md. Mohar Ali(ed)-Autobiography and other writings Nawab Abdul Latif Khan Bahadur. Dacca, The Meharab publications, 1968, p.147.

৭। আনোয়ার পাশা-মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি ও হিন্দু মেলা, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭৫, পৃঃ ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

এসেছেন সরকারকে সহায়তা করার জন্য। সোসাইটির ২৩শে নভেম্বর ,১৮৭৩ এর সভায় কেরামত আলী জৌনপুরী মুসলিম আইন শাস্ত্র ঘেটে প্রমান করতে চেষ্টা করেন যে, ইংরেজ শাসনে ভারত দার-উল-ইসলাম, এখানে শাসকের বিরুদ্ধে জেহাদ করা মুসলমানদের জন্য ধর্ম সম্মত নয়। সভায় নবাব আবদুল লতিফও ওহাবীদের প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন করেন।[১] কংগ্রেস রিসেপশন কমিটির উত্তরে ২২শে ডিসেম্বর,১৮৮৬ আবদুল লতিফ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেও সেখানে যোগদানে অসম্মতি জানান।[২]

সৈয়দ আমীর আলীর ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশনে হিন্দু পার্সী, খৃষ্টান সদস্যও ছিলেন।[৩] পরবর্তীকালে তিনি মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঝুকে পড়েন এবং ১৯০৮ সালে লন্ডন মুসলিম লীগ স্থাপন করেন।[৪] ১৮৮৩ সালে মুহম্মদ ইউসুফ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মুসলমান সহ সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবী করেন এবং নারীর ভোটাধিকার দানের পক্ষেও মত প্রকাশ করেন।[৫]

ছয়

আলীগড়ের মত দেওবন্দ মাদ্রাসারও মুসলমানের জনমত গঠনের ব্যাপারে ভুমিকা ছিল, দেওবন্দে শিক্ষিত উলেমারা ১৯১৯ সালে জমিয়ত-উল-উলেমা-ই-হিন্দ গঠন করেন। দেওবন্দ মাদ্রাসা নতুন মুসলমানের আর্থিক জীবনকে উপেক্ষা করেছে, আলীগড় পুরানো মুসলমানের ধর্মানুভুতির মর্যাদা দেয়নি। দেওবন্দের বৈশিষ্ট্য হল এখানকার ইংরেজ বিরোধী মনোভাব বজায় ছিল। তারা এমনও মনে করেছিল, পার্থিব ব্যাপারে ইসলামের মৌলিক নীতি সমূহ লঙ্ঘিত না হলে হিন্দুর সংগেও সহযোগিতা করতে অসুবিধা নেই।[৬] দেওবন্দে শিক্ষিত মুসলমানদের জীবিকা ছিল ধর্মীয় কাজ, এজন্য তাদের সংগে শিক্ষিত হিন্দুর কোন প্রতিযোগিতা হয়নি। "যে প্রয়োজনে মুসলিম লীগের জন্ম সে প্রয়োজনের অভাবেই দেওবন্দের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা। তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ এ জন্যেই ছিল

১। Abstract proceedings of the Mahamedan literary Society,the 23rd November,1970; Autobiography and other writings Nawab Abdul Latif Khan Bahadur,pp.129-32.

২। Enamul Huq(Ed) Nawab Bahadur Abdul Latif.Dacca,Samudra prokashani,1968,p.250.

৩। Muslim Community in Bengal,pp.225-27.

৪। Syed Razi Wasti(ed)-Memoirs and other writings of Syed Ameer Ali.Lahore,peoples publishing House,First Edition,1968,pp.74-75.

৫। শ্রী যোগেশ চন্দ্র বাগল— মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নবজাগরণের ইতিবৃত্ত, কলিকাতা ,এস,কে, মিত্র এন্ড ব্রাদার্স,১৯৫২,পৃঃ ১৯৭।

৬। Ziya-ul-Hassan Faruqi --The Deoband School and the Demand for Pakistan. Bombay,Asia publishing House,1963,pp.24-25.

Dhaka University Institutional Repository

অসাম্প্রদায়িক। এ জন্যই তার সঙ্গে ছিলো ভারতীয় আন্দোলনের ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ।[২] দেওবন্দপন্থীরা মুসলিম লীগের সঙ্গে মিলতে পারেননি, কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে একত্রে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হননি।[২] মুসলিম লীগ সম্পর্কে তাঁদের বিশেষ অভিযোগ ছিল, লীগ হিন্দুকে শত্রু কিন্তু ইংরেজকে মিত্র বলে মনে করেছে, হিন্দু ও কংগ্রেসের নিকট থেকে ইসলামের বিপদ মনে করেছে কিন্তু ইংরেজের নিকট থেকে তেমন আশঙ্কা করেনি।[৩] দেওবন্দের দুই মওলানা ওবায়দুল্লাহ ও মাহমুদুল হাসান আফগানিস্তানে স্বাধীন সরকার গঠন ও সিল্ক লেটার ষড়যন্ত্রে অংশ নেন।[৪] জমিয়তের বাংলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী[৫] (১৮৭৫-১৯৫০)। দেওবন্দপন্থীরা একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদ ও প্যান ইসলামী ধারণাকে মেলাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা হিন্দু জাগরণের ভিত্তি কি তা ধরতে পারেননি এবং জাতীয় রাজনীতিতে মুসলমানদের ভূমিকা সম্পর্কে ইকবাল কর্তৃক ব্যাখ্যাদানের পর ভারতীয় শিক্ষিত মুসলমানদের ধর্মবোধ আরব থেকে কখন ভারতে এসে গেছে তা তাঁরা অনুভব করতে পারেননি।[৬]

দেওবন্দপন্থীরা পরবর্তীকালে কংগ্রেস আন্দোলন সমর্থন করে এক হিসেবে ভালো প্রমাণিত হয়ে গেল এবং অনেক জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে এর সঙ্গে যুক্ত করে রাখার মত তাত্ত্বিক অবস্থা সৃষ্টি করেন। পুনর্জাগরণবাদী যেসব মুসলমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সমর্থন করেন তাঁদের নিকট এরকম একটি দর্শন কার্যকর ছিল মনে হয়। এদের মধ্যে সরকারী চাকুরীপ্রার্থী মুসলমান কম ছিল বলে সাম্প্রদায়িক বিক্ষুব্ধ ভাবের পীড়িত হলেও হিন্দুর সঙ্গে একত্রে রাজনৈতিক মঞ্চে নেমে অংশগ্রহণ করতে তেমন বিপুল কোন সমস্যা দেখা যায়নি। মুসলমান সাহিত্যিকরাও একই সঙ্গে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ চিন্তা করেছেন তুরস্ক, আরব, পারস্য, মিশরের স্বপ্ন দেখেছেন, প্রাচীন মুসলমানের গৌরবময় ইতিহাসের পুনরাবির্ভাব কামনা করেছেন, কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্বাসে ইংরেজ বিরোধিতা ও জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রতিই নিষ্ঠাবান ছিলেন। এমন কি এর সঙ্গে হিন্দুদের সংযোগ গভীরতর হলে তা তাঁদের বিচলিত করলেও দূরে সরাতে পারেনি।

১। [illegible]- সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা, ঢাকা, [illegible], প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৯, পৃঃ ৬-৭।

২(ক) The Discovery of India, p. 462.

(খ) Hussain Ahmed Madni-An open letter to Moslem League, Lahore, Dewan's publication, 1946, pp.72-73.

৩। Ibid, pp.57,71.

৪। Sedition committee Report, 1918, Calcutta, Superintendent Government printing, Clause 164.

৫। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চট্টগ্রাম, বইঘর, চতুর্থ সং, ১৩৮১, পৃঃ ১২২।

৬। (ক) Modern Islam in India, pp.313-14.

(খ) The Deoband School and the Demand for Pakistan, p.85.

(গ) Presidental Address by Dr. Mohammad Iqbal at Allahabad in 1930. Syed Rais Ahmed Jafri (Nodvi) (ed.& com) Rare Documents, part II, Lohore, Muhammad Ali Academy, 1967, pp.11-12.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় মুসলমানদের ক্ষেত্রে আরো একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশ উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের তুলনায় বিলম্বিত হয়েছে, বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের তুলনায় আগে থেকেই অনেক পশ্চাৎপদ ছিল। এ দ্বিবিধ অসম অবস্থার মধ্য দিয়ে তাদের সামনে যাত্রা হয়েছে বলে একদিকে অগ্রসর হিন্দুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে, আবার অনেক সময় উত্তর ভারতীয় মুসলমানকেও প্রতিরোধ করতে হয়েছে। ফলে শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের জন্মগত দ্বিধা, এমন কি বহুধাবিভক্ত হয়েছে, হিন্দু এবং অবাঙালী সুধীবৃন্দের মধ্যে অনবরত আন্দোলিত হয়েছে। রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনে অনেক ক্ষেত্রে বৈপরীত্যও দেখা দিয়েছে স্বাভাবিকভাবে। মাইকেল, ভূদেব, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখের অনেক পরবর্তীকালেও মাইকেল, বঙ্কিমের বিকাশ ঘটানো, এমন কি তাঁদের অতিক্রম করে যাবার ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে দেখা গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে যেভাবে তাঁরা বিরোধিতা করতে চেয়েছেন তা প্রকৃতই তার "অনুকরণ"।[১] মুসলমান রচিত জাতীয় আখ্যানকাব্য এবং প্রতিবাদী উপন্যাসসমূহ এ আলোকে বিচার্য। মুসলমান সমাজের এ স্বতন্ত্রবোধ অনেকটা মেটেছিল নজরুলের মধ্য দিয়ে, সেজন্য আবির্ভাবের পর পরই নজরুল মুসলমান সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তাঁকে নিয়ে মুসলমানরা যেমন গৌরব বোধ করেছেন, তেমনি ধর্ম ও সম্প্রদায় সম্পর্কে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য মুসলমান সমাজের একাংশের নিকট নজরুল নিন্দিতও হয়েছিলেন।[২]

সাত

মুসলিম শিক্ষার জন্য সরকারকে সক্রিয় হতে দেখা যাচ্ছে সত্তরের দশক থেকে, সত্তরের শিক্ষা বিষয়ক সিদ্ধান্তেও এটা প্রতিফলিত। এখানে মুসলমানের শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ সুবিধা দেবার, হিন্দুর সমান করার কথা বলা হয়।[৩] মুসলমান ইংরেজের নিকট কৃপা প্রার্থনা করলেও কার্যতঃ হিন্দুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই তা নিতে হয়েছে এবং শিক্ষিত হিন্দুর সঙ্গে শিক্ষিত মুসলমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে প্রত্যক্ষ। ১৮৮৫ সনের শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে সরকার মুসলমানের জন্য বিশেষ সুবিধার বিষয় বাতিল করা হয়।[৪] চাকুরীতে মুসলমানের বিশেষ সুবিধা দিতে সরকারও সম্মত হয়নি।[৫] এজন্য সোমপ্রকাশ পত্রিকা ছোট লাটকে ধন্যবাদ প্রদান করেছে এবং মুসলমানদের দাবীকে হিন্দু জাতির ওপর "[illegible] ভাব" বলে মনে করেছে।[৬]

১। কাজী আবদুল ওদুদ—শাশ্বত বঙ্গ, কলিকাতা, কাজী [illegible], প্রথম সং, [illegible], পৃঃ ২০১।
২। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম—সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত ১৯০১–১৯৩০, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭, পৃঃ ৪৭২–৭৯।
৩। C.H. Philips(ed)-Select Documents on the History of India and Pakistan, Vol.II, London, Oxford University press, Reprinted, 1964, pp.480-180-83.
৪। Resolution of the Government of India in the Home Department (Education) No 7/215-25, Dated 5th July, 1885, Quoted, History of Political Thought, p. 397.
৫। Select Documents, p.187.
৬। সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৮–১৯।

শিক্ষা বিভাগে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম ছিল, সরকারী শিক্ষার সুযোগ মুসলমানদের নিকট পৌঁছেছিল প্রধানত হিন্দু কর্মচারীদের মাধ্যমে। সরকারী মাধ্যমগুলো স্কুল সমূহ হিন্দু প্রধান গ্রাম ও এলাকায় স্থাপিত হয়েছিল, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলেও এরূপ হতে দেখা গেছে।[২] এর অন্যতম কারণও এখানে যে, শিক্ষা কর্মচারীরা হিন্দু হলে মুসলমানের মুখে পাঠগ্রহণ করা সম্ভব হত না। এমন ঘটনা সার্বজনীন না হলেও কম নয়।[৩] নওয়াব আলী চৌধুরী ১৮৯৮ সালে কলিকাতায় মুসলমান শিক্ষা সমিতির অধিবেশনে পুস্তিকাটি প্রস্তাব আকারে পাঠ করেন। এটার অনুলিপি ও মুদ্রিত কপি হিন্দু সম্পাদিত পত্র পত্রিকায় সমালোচনার জন্য পাঠানো হয়।[৪]

কেউ কেউ মনে করেন, মুসলিম শিক্ষার উন্নতির জন্য পাট চাষের কিছু প্রভাব পড়তে পারে।[৫] তবে সাময়িকভাবে কৃষিজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছিল।[৬] এতে নগদ অর্থের সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, মুসলিম শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কিছুটা ইংরেজের সহায়তা এবং মুসলমান শিক্ষাবিদদের উদ্যোগ। কিন্তু দারিদ্র্য তখনো প্রতিবন্ধকতার কারণ ছিল। ১৮৭০ সালে পাবনার কালেক্টর বলেছেন, মুসলিম শিক্ষা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়েছে। শিক্ষা গ্রহণকারী মুসলমান ছাত্রের হার মাত্র ১০.৭৪,[৭] অথচ মুসলমান জনসংখ্যাধিক্য ছিল, ১৮৭২ সালে পাবনায়

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু মুসলমান জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যান দেখা গেল যথাক্রমে মুসলমান ৬৯.৯২ এবং হিন্দু ২৯.৮২[৮]।

সিরাজগঞ্জ মহকুমা পাট চাষের জন্য উল্লেখযোগ্য হলেও পাকিস্তানী ভূস্বামীদের জমিদার মহাজনের ক্রমবর্ধমান

দাবী ও নির্যাতনের মুখে কিছুটা বন্ধ হয়েছিল, এদের কারণ ছিল অর্থনৈতিক[৯] ১৮৯৭ সালের দিকে সাধারণ-

ভাবে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা কমে যাবার কারণ শস্যহানি ও আর্থিক সংকট[১০] এমন কি ১৯১০ সালে বাংলা

১। Muhammadan Education in Bengal, pp.25-26,71-72.

২।(ক) Ibid, pp.70-71.

(খ) Moslem Chronicle, 18th April, 1896, Quoted, Muslim Community in Bengal, p.63.

৩। Syed Nawab Ali Choudhury-Vernacular Education in Bengal, Calcutta, W.Newman & co. 1900 pp.4-5.

৪। হিন্দু মাহিত্য হেমেন্দ্র শিরাজী-মুসলমান জাতি ও হিন্দু লেখক, ইসলাম প্রচারক, নজরুল-জিলক্বদ ১৯০০। শিরাজী কামরেন, কোন পত্রিকায় সমালোচনা প্রকাশ করেননি। কিন্তু শিরাজীর এ মন্তব্য সঠিক নয়, ১৯০৬ সালের কার্তিক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ এর সমালোচনা করেন। এ সমালোচনা অন্য এক জন মুসলমান লেখককেও বিচলিত করেছিল। দ্রঃ কাজী ইমদাদুল হক-হিন্দু-মুসলমান ও বঙ্গ সাহিত্য, ভারতী, বৈশাখ-১৩১০।

৫। মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৮৮।

৬। Muslim Community in Bengal, pp.112,114,120.

এর বিশেষত্ব এত বেশ সম্পদ ভূমির সঙ্গে যুক্ত মনে করেন, শিক্ষা সম্পদ অর্জনের পথ নয়, সুতরাং শিক্ষা অর্জন করেন। [দ্রঃ] Rare Documents .pp.242-43.

৭। L.S.S.O'Malley-Bengal District Gazetetter, Pabna, Calcutta, The Bengal Secretariate Book Depot, 1923, p.III.

৮। W.W.Hunter- A Statistical Account of Bengal, Vol.IX, London, Trübner & co.1876, p.294.

৯। C.E. Buckland-Bengal under the Lieutenant Governors, Vol.II Calcutta, Kedarnath Bose, B.A. 1902, pp. 631-2 etc.

১০। Muhammadan Education in Bengal, pp. 60-61.

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের রেজুল্যুশনেও মুসলিম শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা হিসাবে দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১] তবে মুসলিম শিক্ষার অগ্রযাত্রা মন্থর হলেও কোথাও স্থির হয়ে বসে থাকেনি।

এ সবের পাশাপাশি মুসলমান সমাজে খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচারকে প্রতিরোধ করার প্রশ্নও এসে যায়, যার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেও মুসলমানদের মধ্যে সার্বক্ষণিক ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব ঘটতে দেখা যাচ্ছে। মুন্সী জমিরুদ্দীন একবার খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং পরে আবার ইসলাম ধর্মে ফিরে আসেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহ ও মুন্সী জমিরুদ্দীনের গ্রন্থ রয়েছে পাদ্রীদের সঙ্গে খৃষ্ট ধর্মের বিচার সম্পর্কিত। কেউ কেউ মুন্সী মেহেরুল্লাহকে মুসলিম বাংলার রামমোহন বলেও মনে করেছেন।[২] মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ বাংলায় মুসলমান সমাজে ধর্মসভা এবং আনজুমানের অধিবেশনের প্রথম সূত্রপাত করেন। ১৩০৪ থেকে ১৩১৩ সাল পর্যন্ত মুন্সী জমিরুদ্দীনের সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্ম সভায় বক্তৃতা করে বেড়ান, নতুন বক্তা ও লেখকদের উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁরা ধর্ম প্রচারকে একটি পেশা ও আন্দোলন আকারে গড়ে তুলেছিলেন, মুসলমান জনমনে এসবের একটি প্রভাবও পড়েছিল।[৩]

একই সমস্যা হিন্দু সমাজেও ছিল।[৪] পাদ্রীদের ধর্মপ্রচারের ফল নিয়ে হিন্দু সম্পাদিত পত্র পত্রিকায় বিতর্ক চলতে দেখা যাচ্ছে।[৫] সংবাদ প্রভাকর সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলেছে, পাদ্রীরা বাঘ ও দস্যুর চেয়েও ভয়ংকর।[৬] বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেও পরিবর্তন এসেছিল পাদ্রী হেস্টির সঙ্গে বিতর্কের পটভূমিতে।[৭] এরপর বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য রচনা করতে যা করেছেন তা হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন, শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, হিন্দু ধর্মের আলোকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার ব্যাখ্যা ইত্যাদি, দেবীচৌধুরানী, রাজসিংহ, সীতারাম ইত্যাদি এ পর্যায়ের সৃষ্টি।

তুলনামূলক ধারণা পাবার জন্য পাশাপাশি হিন্দু সমাজের দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। হিন্দুর এ পর্যায়টিকেই পরবর্তীকালে মুসলমান সমাজের একাংশ নানাভাবে অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছে।

১। Select Documents, p. 197.

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১৭।

৩। (ক) মোহাম্মদ আছির উদ্দীন প্রধান–মেহেরুল্লার জীবনী, জলপাইগুড়ি, গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত, ১৯০৯, পৃঃ ১০-১৭।
(খ) সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, পৃঃ ১০৫-০৯।

৪। সুধীর কুমার গুপ্ত–ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালার নব জাগরণ, কলিকাতা, এ, মুখার্জী এ্যান্ড কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১৯৫৯, পৃঃ ২০-২১।

৫। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র–প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৭।

৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬২।

৭। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল – সাহিত্য প্রসঙ্গ, ক–র, দ্রঃ বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, (আমাদের সংকলিত), কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৭৬, পৃঃ পনর।

Dhaka University Institutional Repository

আট

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম সংঘাত হিন্দু সমাজে আসে তার পরিচয় পাওয়া যায় ডিরোজিওর অনুসারী ইয়ং বেঙ্গলদের আচরণে। তাঁদের সমগ্র দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল 'দেবলোক বিভ্রাট'[১]। শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকে ধর্ম পরিত্যাগ করেন, স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু সমাজে এ সবের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।[২] রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম ধর্ম আন্দোলনও এ সব প্রতিক্রিয়ার ফল। হিন্দুত্বের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দাঁড়াল, এবং 'ব্রাহ্ম ধর্ম সেই সাধারণ হিন্দু ধর্ম'।[৩] হিন্দু সমাজ ক্রমে স্থিতিশীল হয়ে আসলে, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, প্রাচ্য বিষয়ক অতীত গবেষণা, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিক্রিয়া, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবে হিন্দুত্বের দিকেই শিক্ষিত হিন্দুর আগ্রহ বাড়ল।[৪] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আদি ব্রাহ্ম সমাজকে হিন্দুত্বের মধ্যেই আবদ্ধ করতে চেষ্টা করেন।[৫] ১৮৯১ সালে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথ সেকালে অন্যত্রও জানান " The members of the Adi Brahmo Samaj are really Hindus. "[৬] হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্র আদি ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য ছিলেন,[৭] ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু পুনরুত্থান বলেও অভিহিত হল।[৮] এক সময়কার বিদ্রোহী রাজনারায়ণ বসু হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য ধারাবাহিক বক্তৃতা করেছেন[৯], ১৮৬১ সালে জাতীয় গৌরব সম্পাদনী এক সভা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই হিন্দু মেলা স্থাপিত হয়।[১০] মাইকেল যে প্রজ্ঞাদিত দৃষ্টি-ভঙ্গী গ্রহণ করেন অন্যের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। ভূদেব ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু, বঙ্কিমচন্দ্রও তাই। প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্রই হিন্দু সমাজকে নাড়া দিয়েছিলেন। শশধর, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যে হিন্দুত্ববোধেরই প্রচার ঘটালেন। কমবেশী এদের ভূমিকা সাম্প্রদায়িক, মননশীল, অপেক্ষাকৃত অরাজনৈতিক, এবং দৃষ্টি অতীত ঐতিহ্যের দিকে। তবে ঘটনা এখানে থেমে থাকেনি, হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে যেয়ে প্রতিপক্ষ দাঁড় করাতে হল। ইংরেজকে তাঁরা যেমন ভক্তি করতেন, তেমনি ভয়ও করতেন, ইতিহাস থেকে প্রতিপক্ষ হবার

১। সে কাল আর এ কাল, পৃঃ ৬১।

২। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নব জাগরণ, পৃঃ ১৯৭-২১৪।

৩। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৩।

৪।(ক) History of Political thought, p.253.

(খ) সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৬৫।

৫। বিপিনচন্দ্র পাল—নবযুগের বাংলা—কলিকাতা, যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড, ১৩৬১, পৃঃ ১৪৩।

৬। শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৭০, পৃঃ ১৫১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, যোগেশচন্দ্র বাগল, হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, মৈত্রী, ১৩৭৫।

৭। Bipin Chandra Pal—Memories of my life and Times, Calcutta, Moder Book Agency, 1932, p. 259.

৮। নবযুগের বাংলা, পৃঃ ১১১।

৯। সেকাল আর একাল, পৃঃ ১

১০। রবীন্দ্র জীবনী, ১ রবীন্দ্র সাহিত্যপ্রবেশক, পৃঃ ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতীক মুসলমানকেই গ্রহণ করে নিয়ে আসলেন মুসলমান বলে নয়, অতীত রাজশক্তির অধিকারী ছিল বলে। অবশ্য কেউ কেউ এটাকে "কেবলমাত্র অংশত সত্য" মনে করেছেন।[২]

১৮৬০ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত বাংলায় প্রকৃত অর্থে সাহিত্যিকের যুগ। এ যুগের সাহিত্যিকেরা জনমত গঠনে সহায়তা করেছেন, পরবর্তীকালের রাজনৈতিক আন্দোলন ও এটা থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছিল।[৩] জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির জন্য এ সময়ে ইতিহাস চর্চা হয়েছে বেশী মাত্রায়, ইতিহাস সম্পর্কে ভ্রমভিত্তিক ধারণারও সৃষ্টি হয়, এদশকের শ্রেষ্ঠ রচনা সবই প্রায় ইতিহাস নির্ভর। এদের অনেকের ইতিহাসের নিজস্ব ব্যাখ্যা আছে, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার পরাভবের ইতিহাস শুরু করেছেন মোগল আমল থেকে,[৪] বখতিয়ার খিলজীর সতেরো জন অশ্বারোহী নিয়ে বঙ্গদেশ বিজয়ের কাহিনীকে বিশ্বাস করতে চাননি,[৫] পরাধীন যুগকেও তত খারাপ ও নিন্দিত উপন্যাস করেছেন।[৬] বাঙালীর ইতিহাস নেই বলে তিনি দুঃখ করেছেন,[৭] এবং উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ইতিহাস পুনর্গঠনের ও ইতিহাসের অভাব পূরণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ইতিহাস তাঁর সে উদ্যোগকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।[৮] ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও বখ্‌তিয়ার সম্পর্কে মিনহাজের বিবরণকে সত্য বলে মেনে নিতে সংশয় প্রকাশ করেছেন।[৯] ভূদেব মুখোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিলেন পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ ক্ষমতা নিয়েছে মুসলমান নয়, হিন্দুর নিকট থেকে।[১০] ভূদেব অবশ্য এটাও মনে করেছেন, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের অবনতির কারণ হল ইংরেজ কর্তৃক ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন।[১১] নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়েও ভূদেবের উদারতাবোধ সমকালের ইতিহাসে বেশ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর অনেক পরে কোন কোন মুসলমান সাহিত্যিকও ভূদেবের মত ভেবেছেন, সেই সঙ্গে এমন অভিযোগ অবশ্য করেছেন যে, অনেক হিন্দু লেখকও মুসলমানের জাতীয় গৌরব খর্বিত করেছেন।[১২]

১। নবযুগের বাংলা, পৃঃ ২১৭।
২। মুনীর চৌধুরী-ইমদাদুল হোসেন সিরাজী-কয়েকটি প্রবন্ধ, ঢাকা, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, পৃঃ১৬৮-৯
৩। শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল(?) -ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, অন্যান্য প্রকাশ মন্দির, ১৩৩৪, পৃঃ ১০।
৪। (ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -বাঙ্গালার ইতিহাস, ব-র, দ্বি, পৃঃ ৩০২।
(খ) বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪১।
৫। (ক) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩১।
(খ) মৃণালিনী, ব-র, প্র(বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, যোগেশের সম্পাদিত) কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৯, পৃঃ ২২৫।
৬। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, ব-র, দ্বি, পৃঃ ৩৩৫।
৭। (ক) ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? - প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৬।
(খ) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৩।
৮। বঙ্কিম মানস, পৃঃ ৫৯।
৯। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (প্রথম সং ১৩২১), কলিকাতা, নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৭১, পৃঃ ২৭৩- ৭৯।
১০। ভূদেব মুখোপাধ্যায় -স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের কথা, ভূদেব রচনা সম্ভার, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৯, পৃঃ ১৮৭।
১১। জাতীয় ভাব-ভারতবর্ষে মুসলমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ১৩-১৪।
১২। মোহাম্মদ গোলাম হোসেন-বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলমান, কলিকাতা, হাসেমিয়া প্রেস, ১৩১৭, পৃঃ৮, ১৬,

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের অবনতির অন্যতম কারণ অবশ্য ভারতের ইতিহাসকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন,[১] এবং বঙ্কিম যুগেই ইতিহাসের বিকৃতি সংশোধন করতে যেয়ে নতুনভাবে বিকৃতি ঘটল। হিন্দু মুসলমানের সাম্মিলিত জীবনের পরিবর্তে দ্বন্দ্ব সংঘাত বড় হয়ে দেখা দিল এবং মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে মনে করা হল মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ।[২] ভারতের এ বিকৃত ইতিহাসই হল ভারতে জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি।[৩] একারণে জাতীয় চৈতন্য সৃষ্টিতে নিবেদিত মুসলমান সাহিত্যিকগণ মুসলমান চরিত্রের কালিমা মোচনের জন্য, বিকৃত ইতিহাসের প্রত্যুত্তর দেবার জন্য নতুন বিকৃতির আশ্রয় নিলেন, এ ক্ষেত্রে ইতিহাস তাঁদের উদ্দেশ্যকে অধিকতর ব্যর্থ করে দিয়েছে, তাঁরা যুক্তি শক্তিহীন বিকৃত আক্রোশ প্রকাশ করেছেন। বলা চলে, হিন্দু মুসলমান উভয়েই ইতিহাসকে নিজ নিজ পক্ষে নেবার যে চেষ্টা করেছেন, তার ফলে ইতিহাসের বহিরাবরণ কোথাও কোথাও পেয়েছেন মাত্র। আত্মরক্ষার জন্যও দুর্বল ও হীনমন্য মুসলমানরা প্যান ইসলামের অনুরক্ত হয়ে পড়ে, জামাল উদ্দিন আফগানী -এর যোগসূত্র হয়ে উঠেন।

১৮৫০ থেকেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সুখ স্বপ্ন ভাঙতে আরম্ভ করেছিল এবং বঙ্কিমের যুগটিই ছিল "দেবলোক" সম্পর্কে আশাভঙ্গের যুগ।[৪] এর কারণ বোঝাও কঠিন নয়, "ইংরেজী শিক্ষার ফলে হৃদয়ে বাসনার উদ্রেক হচ্ছে, কিন্তু রাজপুরুষগণ তা পূরণ করছে না"[৫] বলে এ অনুভূতি।

বঙ্কিমের শিল্পী সত্তা শেষ পর্যায়ে বিমুক্ত অস্তিত্ব রাখতে পারেনি। ভূদেব, বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীন সেন প্রমুখের হিন্দুত্ববোধ ও ভারত ইতিহাসের সব রূপায়ন বছর কুড়ি পরবর্তী রাজনীতিতে বাস্তব রূপ নিল,[৬] এদের সাহিত্যে কল্পিত ইতিহাস কাহিনীর আদর্শে হিন্দুর সামাজিক রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করেছেন নেতৃবৃন্দ। ইতিহাসের হিন্দু মুসলমান বিরোধ স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে বাস্তব রূপ নিল, এখানেই বিপুল সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের তরঙ্গ মুসলমান সমাজের সচেতন অংশকে স্পর্শ করল। তাঁরা এদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন, সাহিত্যে ইতিহাস চর্চা করেছেন হিন্দুরা যখন তা পরিত্যাগ করে এসেছেন, একারণেও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার যুগ শেষ হবার পর সামাজিক উপন্যাসের

১।(ক) Humayun Kabir-Muslim politics 1906-47 and other Essays, Calcutta, Firma K.L. Mukhopadhyay,1967,p.15.
(খ) Nirad C.Choudhury-The Autkobiography of an unknown Indian. London, Macmillan and co. Ltd. 1951,p.230.

২। হুমায়ুন কবির-বাংলার কাব্য, কলিকাতা, চতুর্থ, দ্বি-সং, ১৩৬৬, পৃঃ৬০।

৩। নবযুগের বাংলা, পৃঃ ২২২-২৩।

৪। বঙ্কিম মানস, পৃঃ ৬২, ৭১।

৫। সেকাল আর একাল, পৃঃ ৭৯।

৬। The Autkobiography of An unknown Indian,p.232.

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্কিমের প্রতিকূলে মুসলমান সাহিত্যিকদের অনেকেই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন। এদের প্রতিপাদ্য হল দেশ ভক্তি ও হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, এগুলো প্রায়ই হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষের ওপর সৃষ্ট, হিন্দুর তুলনায় মুসলমানের প্রাধান্য, সমধর্মীগত রূপ হল মুসলমান নায়কের প্রতি হিন্দু নারীদের প্রণয়মুগ্ধতা, প্রণয়ানুরাগ, ধর্মান্তর, বিবাহ ইত্যাদি। এজন্য মুসলমান সমাজ কর্তৃক বঙ্কিম সাহিত্যের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ হয়েছে বঙ্কিমের সমকালে নয়, তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে, স্বদেশী, সন্ত্রাসবাদ, অসহযোগ ইত্যাদি আন্দোলনের পটভূমিতে। বঙ্কিমের অনুসরণ বেশী হয়েছিল বলে প্রতিবাদের মাত্রাটিও একটু বেশী। এ সময়েই বঙ্কিম রচনাবলী সহজলভ্য হয়েছে, এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর উপন্যাস নতুন করে বেঁচে উঠলেন তাঁর মৃত্যুর পর, একে রাজনৈতিক পুনর্জন্ম বলা যায়।

জাগরণের হিন্দুত্ব ও পাশ্চাত্য মানবতাবাদ মিলে যে আদর্শের জন্ম সূচিত করল তাই হল নতুন ভারতের পথ প্রদর্শক, যেমন সাহিত্যে, তেমনি রাজনীতিতে। এক্ষেত্রে সাহিত্য ও রাজনীতি বহুলাংশে অবিচ্ছিন্নভাবে পারস্পরিক প্রভাব সৃষ্টিতে সক্রিয় থেকেছে, রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকার কারণে সাহিত্যের মধ্যেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে রাজনীতির চর্চা দেখা দিয়েছে।[১] বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য ও রাজনীতির অপরূপ সংযোগ ঘটিয়েছিলেন, তাঁর সাহিত্যের অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণও এখানে। সাহিত্য এবং রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যদি হিন্দুত্বের ভক্তি দেখিয়েছিলেন, পরবর্তীকালের রাজনীতিতে ধর্মের সংমিশ্রণ ঘটায় এটা আরো স্পষ্ট হয়েছিল। এরই কারণে বঙ্কিম সাহিত্যের বিপুল প্রচারও হয়েছিল।

ছয়

সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজ সরকার এবং শিক্ষিত ভারতীয় উভয়ের দৃষ্টি ভঙ্গিতেই পরিবর্তন এসেছিল। ইংরেজী শিক্ষার ফলে হিন্দু যে শ্রেণীর জন্ম প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছিল বিদ্রোহ পরবর্তী ভারতে তারা কোন কোন দিক দিয়ে ইংরেজের স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ান। এদের মধ্যে যুক্ত হল দেশীয় বুর্জোয়া শিল্পপতিদের স্বার্থ সংঘাত। ফলে বিক্ষোভকারীদের দুই দশক পরে সেই মুহূর্তেই শুরু হল নতুন জাতীয়তাবাদের যুগ নির্মাণের উত্থান। দেশাই বলেছেন,

"It was the outcome of the objective conflict of interests, of Britain to keep India politically and economically subjected to her and the interest of the Indian people for a free political,

---

১। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ, পৃঃ ২২৬-২৯।

Dhaka University Institutional Repository

economic and cultural evolutions of the Indian society unhindered by the British Rule[১]."

ভারতীয় অর্থনীতি ও জীবনযাত্রায় প্রতিযোগিতা ও সংকট যত বৃদ্ধি পেয়েছে এসব দাবীও তত বেড়েছে এবং সূচনা হয়েছে প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা আন্দোলনের। এর সাংগঠনিক পরিণতি ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় এবং চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার মধ্যে। মুসলিম মধ্যবিত্তের গঠনের ভিত্তি ছিল আরো দুর্বল, তাদের আগমনও হয়েছে বিলম্বিত, এজন্য হিন্দু মধ্যবিত্তের সংগে প্রতিযোগিতার সামনে পড়ে জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে, ফলে বৃহত্তর মুসলমানের জাতীয় আন্দোলন বিলম্বে পরিস্থিতে বেড়ে উঠেছে।

সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইংরেজের ক্ষমতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং নবাব আবদুল লতিফ ও অনুভব করেছিলেন। বিত্ত এবং শিক্ষার প্রসারে এ সময়কার বাঙালী হিন্দু যে সৃজনশীলতা পেয়েছিলেন এর অংশে বাঙালী মুসলমান তা পায়নি, একারণে শিক্ষিত মুসলমান শিক্ষিত হিন্দুকেই অনুকরণ করেছে কিন্তু অনেক পরবর্তীকালে।

শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান ১৮৮০ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত সাহিত্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যে আচরণ করেছে বাঙালী হিন্দু ১৮১৭ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যেই তা ছেড়ে এসেছিল। উভয় সম্প্রদায়ের জীবন দৃষ্টির ব্যবধানকে কিছু অধিক মাত্রায় এভাবে কেউ কেউ তুলনা করে দেখেছেন।[২]

সিপাহী বিদ্রোহোত্তর ভারতে হিন্দু প্রাধান্য থাকার কারণে জাতীয় আন্দোলন, সাহিত্য সৃষ্টি সকল ক্ষেত্রেই হিন্দু মতাদর্শ এসে স্থান গ্রহণ করেছিল। ১৮৬২ সালে পুনরায় হিন্দু উত্থানের চেষ্টা হয়। এটা দমিত হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে এটাই তিলকের রাজনীতি, শিবাজী উৎসবের মধ্যে রূপায়িত হয়েছিল।[৩] ১৮৬১ সালে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা, ১৮৬৭ সালে হিন্দু মেলা, ১৮৭৫ সালে দয়ানন্দ স্বরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজ, ১৮৮২ সালে গোহত্যা নিবারণী আন্দোলন, ১৮৯৩ সালে বালগঙ্গাধর তিলকের গোহত্যানিবারণী সভা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এটা ক্রমবর্ধমানভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। এসব আদর্শের প্রত্যক্ষ দিকে ক্রমেই শিক্ষিত হিন্দু মনে করেছে ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ, অন্য কারো এখানে অধিকার নেই। ভারতে ধর্ম হয়েছে হিন্দুর,

---

১। Social Background of Indian Nationalism, p.158.

২। Mustafa Nurul Islam-Bengali Muslim Public opinion reflected in the Bengali press, 1901-1930. Dacca, Bangla Academy, 1973, pp.39-40.

৩। Edward Thompson and G.T.Garrat-Rise and Fulfilment of British Rule in India. Allahabad, Central Book Depot, 1973, pp.462-63.

৪। মধ্যযুগের বাংলা, পৃঃ ৪০-৪১।

রাজনীতি হয়েছে হিন্দুর, সরকারী ও অন্যান্য সুবিধাভোগেরও অধিকার চেয়েছে হিন্দু । হিন্দুর সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব সৃষ্টি করেছে অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে । বিরোধ বেধেছে তখনই অন্য কেউ যখন সে অধি-কারের অংশ চেয়েছে, শুরু হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার । সাম্প্রদায়িকতা হল এমন অর্থনৈতিক সংঘাতেরই রূপান্তরিত ব্যাখ্যা মাত্র । হিন্দু সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা এসব বিরোধকে বাড়াতে সহায়তা করেছে এবং স্বাতন্ত্রিকতাবোধই নতুন শিক্ষা, সুযোগের সংকোচন ও আঞ্চলিক আন্দোলনের প্রভাবে এর মুসলমান প্রতিপক্ষ বোধ হতে দেরী হয়নি ।

দশ

কংগ্রেসে রাজনীতিতে চরমপন্থী নেতা মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলকের কাছে স্বধর্ম ও স্বদেশ ছিল প্রায় প্রতিশব্দের মত।[১] তিনি গণপতি উৎসব[২] ও শিবাজী উৎসব[৩] প্রবর্তন করেন ।

শিবাজী উৎসবের অংশ হল শরীর চর্চা, যুবকদের শিক্ষা ইত্যাদি । আফজাল খাঁর হত্যাকে যুক্তি-সংগত বলে সমর্থন করা হল, শিবাজী উৎসব জনপ্রিয়তা অর্জন করল এবং বাংলায় কেবল শিবাজী উৎসব নয়, মুসলমান আগ্রাসবাদের বিরুদ্ধে যেমন হিন্দু প্রতিভায় বিদ্রোহী হয়েছিল তাদেরও মহীয়ান করে তোলা হল।[৪] ইংরেজ সম্পর্কে ক্ষোভ ভাঙার কিন্তু আমলা বাধা মজ্জাগতভাবে সম্পর্কে নতুন ক্ষোভ সৃষ্টি হয় ।[৫]

দুর্ভাগ্যবশতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকে গোহত্যা নিবারণ প্রশ্নেই জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অংশ হয়ে দাঁড়ায় । গোহত্যাকে কেন্দ্র করে গোরক্ষা আন্দোলনের সময় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয় । এর কারণ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ধর্মবোধের সঙ্গে এটা প্রশ্নেই মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক ব্যবধান দেখা দিল ধর্ম রক্ষা এবং ধর্মাচরণের প্রশ্ন নিয়ে ।

বছরের অন্যান্য সময়ে মুসলমান কসাইয়ের কাছে হিন্দু নির্দ্বিধায় গরু বিক্রী করেছে, গোমাংসের ব্যবসাও করেছে, এখানে হিন্দু প্রতিবাদহীন । অন্যদিকে হিন্দু বাধা দিল বলেই গোহত্যা মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল । মসজিদের সামনে বাজনা ও বাজানো নিয়েও এই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।[৬] সমগ্র

১। রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক, পৃঃ ৩০৫ ।

২। Sedition committee Report, 1918, p.2.

৩। Ibid, p.2.

৪। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় - ভারতে জাতীয় আন্দোলন, কলিকাতা, প্রকাশ, দ্বি-সং, ১৯৬৫, পৃঃ১১৭।

৫। নরহরি কবিরাজ - স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা, কলিকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ দ্বি-সং, ১৯৬১, পৃঃ ১৭৩ ।

৬। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ- প্রাদেশিক কনফারেন্স সিরাজগঞ্জ অধিবেশন, সভাপতির অভিভাষণ, ১৯২৬ পৃঃ ১০, ২৫-২৬ ।
Calcutta, Mohammadi Press, ১৯২৬

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়টিই ছিল রাজনৈতিক স্বার্থ দ্বন্দ্বের প্রকাশ, এভাবেই এটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সাম্প্রদায়িক সংঘাত হিন্দু মুসলমানের মধ্যেকার দূরত্বকেই সৃষ্টি করল।

এসব পটভূমিতে মীর মোশাররফ হোসেন রচিত গোজীবন (১২৯৫) গ্রন্থ সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সাধুবাদ প্রদান করেছিল,[১] যেজন্য মুসলমান সমাজে নিন্দিত হন।[২] একই বিষয়ে লিখিত অগ্নিকুক্কুট (১ম সং, ১২৯৬, দ্বি-সং ১৩০৯) গ্রন্থে লেখক রেয়াজুদ্দিন আহমদ মাশহাদী হিন্দু কর্তৃক মুসলমান উৎপীড়নের মূলোচ্ছেদ করার জন্য ইংরেজ সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন।[৩] অথচ এই লেখকেরই অন্য একটি গ্রন্থ, আফগানীর জীবনী সম্পর্কে লিখিত সমাজ ও সংস্কারক (১২৯৬) ইংরেজ শাসনের পক্ষে আপত্তিকর মনে করে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

১৮৮৫ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে বাংলা থেকে ৩২৭৯ জন হিন্দু এবং ১৫৬ জন মুসলমান যোগ দেন। এর মধ্যে কলিকাতার অধিবেশনগুলোতেই মুসলমানদের তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে।[৪] কংগ্রেসে বর্ণহিন্দু আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল, মুসলমানদের উদাসীন্যের এটাই সম্ভবত কারণ। কংগ্রেসে যোগদানের জন্য মুসলমানদের অনেক সুবিধাও দেওয়া হয়েছিল,[৫] কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হয়নি।

সুরাট কংগ্রেসে (১৯০৭) বিভেদের পর চরমপন্থীরা হিন্দু ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে আরো গভীরভাবে মিশ্রিত করে ফেলেন। স্বদেশী, সন্ত্রাসবাদ, বয়কট ইত্যাদি আন্দোলনের পটভূমিতে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ গভীর হয়, বৈপ্লবিক তৎপরতা বাড়তে থাকে। বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীদের অনেকগুলো সংগঠন গড়ে ওঠে। তাদের লক্ষ্য ছিল ইংরেজকে বিতাড়িত করে ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা। বিপ্লবীরা পবিত্র প্রতীক কালী প্রতিমার নিকট থেকে আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা নিয়ে শপথ গ্রহণ করে থেকেছে।[৬] এসব সংগঠনে লাঠি খেলা, অস্ত্রচালনা, শরীর চর্চা ইত্যাদি বাধ্যতামূলক ছিল। মুসলমানদের এতে যোগ্য

১। তত্ত্ববোধিনী, বৈশাখ, ১৮১১ শক। দ্রষ্টব্য, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫০০।

২। (ক) আখবারে এসলামীয়া, পৌষ, ১২৯৬।

(খ) মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ২৩০।

৩। পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দিন আহমদ মাশহাদী, অগ্নিকুক্কুট, মাশহাদী রচনাবলী, ঢাকা, কেন্দ্রীয় বাংলা বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭০, পৃঃ ৩০১।

৪। Muslim community in Bengal. Appendix-C, pp. 378-98.

৫। Surendranath Banerjea-A Nation the Making, London, Humphrey Milford, Second Impression, 1925, p. 108.

৬। (ক) প্রতাপ গঙ্গোপাধ্যায়-বিপ্লবীদের কথা, কলিকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সং, ১৯৬৭, পৃঃ ১০২, ১৪৭।

(খ) সুপ্রকাশ রায়-ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ডি-এম লাইব্রেরী প্রথম প্রকাশ, ১৯৭০, পৃঃ ১১৩।

(গ) মুজফ্ফর আহমদ-আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ১৯২০-২৯, কলিকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ ১৯৭১, পৃঃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি, মুসলমানকে তারা বিশ্বাস করতে পারেনি। কারণও ছিল, তারা দেখল ইংরেজ সরকার মুসলমানকে ব্যবহার করছে।[১]

<u>এগারো</u>

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও বিবেকানন্দের আবির্ভাব হিন্দুদের মধ্যে নতুন আবেগ সঞ্চার করল। ইংরেজী শিক্ষিতেরাও এর মধ্যে নতুন অনুপ্রেরণা পেলেন।[২] ১৮৯৩ সালে শিকাগো বক্তৃতার পর বিবেকানন্দ দেশে ফিরলে শিক্ষিত হিন্দুর সক্রিয়তা প্রায় আন্দোলন আকারে দাঁড়ায়। এঁদের চিত্ত জুড়ে এর প্রভাব পড়ল এবং হিন্দু নিজেকে একটি জাতি বলে বিবেচনা করতে শুরু করল।[৩] বিবেকানন্দ হলেন অতীত ও বর্তমান ভারতের সেতু।[৪] তাঁরা ভারতের গৌরবময় অতীতের দিকে তাকাতে চেষ্টা করলেন, প্রাচীন ভারতীয় উপনিষদগুলির দিকে হিন্দুর নতুন করে কৌতূহল হল। ভারত আবিষ্কারের নতুন প্রয়াস শুরু হল দর্শন দিয়ে, ইতিহাস দিয়ে।[৫] রবীন্দ্রনাথও নানা রকমে পুণ্যধারা নিয়ে উপস্থিত হলেন ধ্যানমগ্ন ও প্রাণময় ভারতে।[৬] প্রাচীন ভারত বিজয়ের গর্বই এ প্রয়াস সাহিত্যে ও রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করল।

হিন্দুর মত মুসলমানও প্রাচীন গৌরবের সন্ধানে ভারতের সীমা ছাড়িয়ে গেল। প্যান ইসলামবাদের আন্দোলন সক্রিয় থাকতে মুসলমানরা এর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে গেল। প্যান ইসলামবাদের প্রবক্তা সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী ১৮৮০ বা ১৮৮১ সালে কলকাতায় আসেন ও কলকাতায় মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটে।[৭] সেই সকল পন্ডিতদের মাধ্যমেও প্যান ইসলামবাদের প্রচার হয়। বাঙালী মুসলমান শিক্ষিতদের মধ্যে আফগানীর প্রভাব গভীরভাবে বিস্তৃত হয় এবং অনেকেই প্যান ইসলাম পন্থী হয়ে পড়েন। মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে মুসলমান সাহিত্যিকদের বেশ যোগসূত্র সৃষ্টি হয়, আফগানীর জনপ্রিয়তা দেখেও এটা বোঝা যায়। বাঙালী মুসলমান সম্পাদিত অনেক পত্র পত্রিকাও প্যান ইসলামবাদের উদ্দেশ্যকে

১। (ক) Abul Kalam Azad-India wins Freedom, Bombay, Orient Longmans, 1959, p.4.
(খ) অগ্নিদিনের কথা, পৃ: ১৬২। ১২।
(গ) Sedition Committee Report, pp.19,96.

২। History of Political Thought, p. 240.

৩। [illegible], পৃ: ৪৪৫।

৪। Discovery of India, p.400.

৫। Ibid, pp.228-34.

৬। (ক) রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬১, পৃ: ২৮৫।
(খ) "এবার আমি আনিনি আমি নবিন নবীরূপে / আপন সুরে তোমার ফুলবনে / এনেছি দুই বীণা / দেখো সে চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কিনা।" — দ্র: মহুয়া, রবীন্দ্র রচনাবলী পঞ্চদশ খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৭০, পৃ: ৪৯।

৭। বিপিনচন্দ্র পাল উল্লেখ করেছেন, আফগানী নবাব আবদুল লতিফ সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ মুসলমান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আফগানীর প্রভাবেই মুসলমানরা জাতীয় আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে গেল। দ্রষ্টব্য Memories of My life and Times P. 9

[illegible]

অতি ইংরেজ ভক্ত ছিলেন। আফগানী সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদের বক্তব্যই অধিকতর যথার্থ।

বোধকতা করতে থাকে।[১] শেষের সময়ের দুজনায় মুসলমান কিছুই তাঁদের রোমান্টিক দৃষ্টিকে অধিকার করল এবং ভারতের সমকালীন জীবন সমস্যার সঙ্গে অনেকাংশে বিচ্ছেদ রচনা করল। এ কারণে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা সম্পর্কে কোন কোন মুসলমান কবি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন,[২] পাশাপাশি প্রকাশের সুখ মহাকাব্য বা জাতীয় আখ্যান কাব্য রচনা করেছেন, সামাজিক উপন্যাসের চেয়ে লিখেছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস। গীতিকবিতা যা লিখেছেন প্রায়ই তা প্রণয় বা জাতীয় ভাব মূলক। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি দুর্বলতা সত্ত্বেও ভাষা সমস্যা নিয়ে তাঁরা বিচলিত হয়েছেন, এর একটি চিত্র পাওয়া যাবে এভাবে,

"আমাদের শিক্ষার পথে প্রথমেই ভাষা-সমস্যা আসিয়া পড়ে। আরবী আমাদের ধর্মভাষা, পারসী আমাদের সভ্যভাষা, উর্দু আমাদের ভারতীয় অনুশীলন ভাষা, ইংরাজী আমাদের রাজভাষা, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই পাঁচ ভাষাতেই শিক্ষিত আমাদের অনেকিছুর সম্বন্ধ আছে।"[৩]।

অবশ্য সামগ্রিকভাবে মাতৃভাষার প্রতিই তাদের সমর্থন প্রকাশিত হয়েছে।[৪]

প্যান ইসলামবাদ বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যিক আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে সমস্যাও হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক নানা কারণেই বাস্তবে এবং সাহিত্যে তিক্ত হয়ে উঠে ছিল। এসবেরই প্রতিক্রিয়া থেকে জাত এ শিক্ষাবর্তী শিখা পত্রিকা ও মুসলিম সাহিত্য সমাজ। শিখা পত্রিকার প্রকাশক ঘোষণা করেন, -"বর্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার গতির পরিবর্তন সাধন"[৫] এর উদ্দেশ্য। শিখা পত্রিকা স্বল্পায়ু হয়েও ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজনীতির যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দিয়ে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিল। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই লক্ষ্য করা গেছিল "বাঙালী মুসলমানের দৃষ্টি অতীত থেকে ফিরে আসছে বর্তমানের দিকে।"[৬]

মুসলমান শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে চাকুরীপ্রার্থী মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের সঙ্গে শিক্ষিত মুসলমানের অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮৮০ সালের দিক থেকেই কলকাতা ও অন্যান্য জেলা শহরে মুসলমানরা হিন্দুদের অর্থনৈতিক চাপ অনুভব করা শুরু করেন[৭] এবং এর সঙ্গে মুসলমান মধ্যবিত্তের

১। আনিসুজ্জামান-মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র ১৮৩১-১৯৩০, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯, ভূমিকা, পৃঃ ২৬, ২৯।

২। কায়কোবাদ-অশ্রুমালা, কায়কোবাদ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৫৬, পৃঃ ২৭০।

৩। মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ- দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩২৫। বক্তৃতায় বাংলার অগ্রগণ্য [illegible] তিনি [illegible] করেছেন।

৪। (ক) আনিসুজ্জামান-স্বরূপের সন্ধানে, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৩৮০, পৃঃ ৬৯-৭০, ৮০-৮১।
(খ) সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, পৃঃ ৩১১-৪৭।

৫। শিখা প্রথম বর্ষ, চৈত্র, ১৩৩৩, উদ্ধৃত, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, পৃঃ ৪৭০।

৬। স্বরূপের সন্ধানে, পৃঃ ৭০।

৭। Muslim community in Bengal, p. 132.

Dhaka University Institutional Repository

হতে কিছুটা রাজনৈতিক সচেতনতা জাগতে শুরু করে।[১] মুসলমানের এখন অসন্তোষ যেমন ছিল সরকারের প্রতি, তেমনি অব্যবহিত প্রতিযোগিতার স্থান শিক্ষিত হিন্দুর প্রতি। বিভিন্ন অফিসে চাকুরীপ্রার্থী মুসলমান প্রত্যাখ্যাত হয়েছে হিন্দু হেডক্লার্ক, অফিসার ইত্যাদির দ্বারা এবং এ প্রত্যাখ্যান থেকে সৃষ্ট হতাশা তাদের হিন্দু বিদ্বেষী করে তুলেছে।[২] কলিকাতা সচিবালয়কে তাঁরা মনে করেছেন একটি হিন্দু জমিদারীর মত, যার সদরের গোমস্তা সবই হিন্দু এবং পেয়াদা ইত্যাদি মুসলমান।[৩] [illegible] কৃষির সংগে তাদের প্রতিযোগিতা ও স্বার্থদ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কয়েকজন শক্তিশালী মুসলমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছিল। হিন্দু সাহিত্যিকদের তুলনায় তাদের রচনা স্কুলপাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত না হবার ফলে মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ হতে দেখা যায়।[৪] মুসলমান সাহিত্যিকদের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল মুসলমান সম্পাদিত পত্র পত্রিকা, এগুলো মুসলমান সমাজ ও সাহিত্যিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে চেষ্টা করে। সাম্প্রদায়িক প্রতি-যোগিতার সংঘাত মুসলমান রচিত সাহিত্যকেও স্পর্শ করে।

বঙ্গ

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মুসলমান সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিল। কংগ্রেসের ইংরেজ বিরোধিতার মাত্রা যত বেড়েছে, ইংরেজ সরকারও তত মুসলমানদের শুভ-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে চেয়েছে। ইংরেজের এখন ভূমিকাই অনেকটা ভেদবুদ্ধির মত দেখায়। ভারতীয় বহু বিচিত্র সম্প্রদায় গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন কিংবা শাসনের সম্ভাবনা বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীকে সচেতন করে দিয়েছে এবং এ বিভেদের ওপরই ইংরেজ শাসনের সৌধ নির্মিত হয়েছে। এ বিভেদ সাহিত্যেও সম্প্রসারিত হয়েছিল, বিশেষ করে মুসলিম রচিত সাহিত্যে।

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) পরিকল্পনাকে শিক্ষিত হিন্দু সমাজ বাঙালী জাত্যভিমানের ওপর আক্রমণ এবং সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদের মাধ্যমে মুসলমান বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগাবার জন্য চরম প্রয়াস বলে মনে করলেন। অন্যদিকে কিছু সংখ্যক জাতীয়তাবাদী মুসলমান ছাড়া নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ববাংলার

১। Social background of Indian Nationalism, p.397.
২। [illegible]—অগ্নিধারা, ঢাকা, প্রকাশক—আবুল খয়ের মোহাম্মদ আলীম আহমদ, ১৩৮৬, পৃঃ২৬০-৮৭।
৩। Md. Ali Azam - Life of Maulavi Abdul Karim, Calcutta, published by the Author, 1939, pp. 109-158.
৪। Vernacular Education in Bengal, pp. 18-21.

মুসলমানরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হয়ে বঙ্গভঙ্গের পক্ষ নিলেন।[1] কলিকাতাকেন্দ্রিক বাঙালী হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে তাঁরা মনে করলেন, পূর্ব বাংলার বৃহত্তর মুসলমান জনসাধারণকে স্থায়ী-ভাবে তাঁদের কৃপানির্ভর করে রাখার প্রয়াস।[2] এটা কেবলমাত্র পূর্ববাংলার মুসলমানদের ক্ষেত্রেই ঘটেনি, বিলাতের জনসাধারণও বাঙালীদের আধিপত্য সম্পর্কে প্রসন্ন ছিলেন না।[3] পূর্ববাংলার অধিকাংশ জনসংখ্যা মুসলমান, জমিদার মহাজন হিন্দু, তাদের আনুগত্য ছিল কংগ্রেসের প্রতি। তাঁরা প্রজাসাধারণকে স্বদেশী, বয়কট ইত্যাদিতে যোগ দেবার জন্য বাধ্য করার চেষ্টা করলে স্বভাবতই সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠে।[4] জমিদার ও প্রজার সংঘর্ষ বঙ্গভঙ্গের আগে ঠিক সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়নি।[5] যে কারণে স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদীরা মেতে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, সেই একই রাজনৈতিক প্রয়োজনে মুসলমানরা আনন্দমঠের 'বহ্ন্যুৎসব' করলেন।[6] আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের অনুকরণে[7] দেশ সেবার জন্য ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করা হয়, আনন্দমঠ উপন্যাসটি স্বদেশী সন্ত্রাসবাদীদের নিকট প্রায় ধর্ম গ্রন্থের মত অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল।[8]

বঙ্গভঙ্গের পটভূমিতে ইংরেজের আশীর্বাদ পুষ্ট[9] হয়ে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এবং ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টো সংস্কারে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। দুটোতেই উপকৃত হয়েছে সংখ্যালঘু অঞ্চলের মুসলমান। এজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, সংখ্যা লঘু অঞ্চলেই লীগ বেশী শক্তিশালী ছিল।[10]

মুসলমানদের সঙ্গে ইংরেজের মধুচন্দ্রিমা বেশীদিন থাকা সম্ভব হয়নি, কংগ্রেসের রাজনীতি তাদেরও স্পর্শ করেছিল। মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে সৌহার্দ্য বাড়ার পর তাঁরা লক্ষ্য করলেন, তা: তাঁর মুসলমানদের নিকট এবং বহির্বিশ্বে ইংরেজের রূপ মুক্ত। মুসলমানদের এসব চিন্তার প্রকাশ ঘটে বলকান যুদ্ধের সময়,

---

১। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখ্য, ব্যারিষ্টার আবদুর রসুল, আবদুল হালিম, গজনবী, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মৌলবী [illegible], ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মৌলবী আবুল কাসিম, মৌলবী মুজিবুর রহমান, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান, ডঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সৈয়দ আমীর ইমাম, সৈয়দ হাসান ইমাম, মুজাম্মেল হক, মৌলবী লিয়াকত হোসেন, প্রমুখ। দ্রষ্টব্য, আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, পৃঃ ৬-৭।
২। Muslim community in Bengal, pp.228-304.
৩। Anil Seal-The Emergence of Indian Nationalism. Cambridge, At the University press, 1971, p. 347.
৪। (ক) Pirpur Report, Rare Documents. p.158.
(খ) Social Background of Indian Nationalism, p.408.
৫। Muslim community in Bengal, p. 106.
৬। শ্রী রেজাউল করিম-বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, কলিকাতা, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ ১৩৬১, পৃঃ ৪-৬।
৭। অগ্নিযুগের কথা, পৃঃ ১০-১৪।
৮। (ক) Sedition committee Report, 1918, p.101.
(খ) ভারতে জাতীয় আন্দোলন, পৃঃ ২৪০।
৯। Discovery of India, p.411.
১০। Muslim politics, p.48.

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা সাধারণভাবে ইংরেজ বিরোধী হয়ে উঠেন।[১,২] জাতীয় ধারাধারীর নেতৃত্ব যে যোগ্যতার বিকাশ ঘটে তাতে বাংলার কেন্দ্রও সফল ছিল।

১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও লীগ একত্রে লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট সম্পাদনা করে। উভয়েই স্বতন্ত্র নির্বাচনকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৩] হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত আন্দোলন যত বৃদ্ধি পেয়েছে সরকার তত দমন নীতির আশ্রয় নিয়েছে। ১৯০৬ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত বাংলায় কমপক্ষে ৫৫০ টি রাজনৈতিক মামলা হয়।[৪]

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর তুরস্কের অস্তিত্ব নিয়েই সমস্যা দেখা দিল। তুরস্কের খলিফা ভারতীয় মুসলমানদের মনে চিরদিনই শ্রদ্ধার আসন পেয়ে এসেছেন। খলিফা ছিলেন ইসলাম জগতের ঐক্য রক্ষার প্রতীক, সুতরাং ইসলাম ও মুসলমানের ধর্ম বিপন্ন হবার সুতরাং ... হল খলিফার মর্যাদাকে বজায় রাখা। খলিফা এবং খিলাফতের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ভারতীয় মুসলমানদের উদ্বেগ থেকে শুরু হল খিলাফত আন্দোলন। এ সময় ভারতীয় এবং বাঙালী মুসলমানরা প্রচণ্ড ইংরেজ বিরোধিতার পরিচয় দিয়েছে। গান্ধীজী মুসলমানদের এ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন।[৫] খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৯২১ সালেই চারদিকে অশান্তি হয়।[৬] ১৯২০ সালের ১০ই আগস্ট সিভার্স চুক্তি স্বাক্ষরের পর এক শ্রেণীর মুসলমান মনে করলেন ভারত অমুসলিম দেশ, এবং মুসলমানের বাসযোগ্য নেই। সীমান্ত প্রদেশের অনেক মুসলমান আফগানিস্তানে হিজরত করেন।[৭] ১৯১৭ সালেও রংপুর থেকে একদল মুসলমান আফগানিস্তান যাবার চেষ্টা করলে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন।[৮] ওহাবী ও ফরায়েজীদের সময়েও ভারত মুসলমানদের বাসযোগ্য কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল।[৯] খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমানের মিলন যেমন হয়েছিল,[১০] তেমনি খিলাফত আন্দোলন থেমে যাবার পর হিন্দু মুসলমানের সংঘাত বৃদ্ধি পেল এবং ১৯২০ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে প্রায় ১১১ টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়।[১১]

১। (ক) Sedition committee Report, 1918, pp. 101-102.
(খ) Report on Indian Constitutional Reforms; Reprint; Calcutta, Government of India, 1928, pp. 14-15.

২। Pattabhi Sitaramayya- The History of the India National congress (1885-1935) published by the working committee of the Congress, 1935, Appendix-II.

৩। Social background of Indian Nationalism, pp. 300-302.

৪। ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ২১৮।

৫। L.F. Rushbrook williams-India in 1920, Calcutta, Suprintendent Government printing, 1921, p. 31.

৬। L.F. Rushbrook williams-India in 1921-22 Calcutta, Superintendent Government printing India, 1922, p. 204.

৭। India in 1920, p. 51.

৮। ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ৩২০।

৯। পূর্বে, পৃষ্ঠা ৭-৮।

১০। "১৯২০-২১ সনের খিলাফৎ আন্দোলনকালে মুসলমানদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধি উদিত হইতে দেখা গিয়াছিল।" — জাতীয় পতাকা-মিছিল, ... , মাঘ, ১৩৩৩।

১১। Sir Reginal Coupland-The Indian problem 1823-1935, Oxford the University press, p. 76.

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফত আন্দোলন সম্পর্কে অনেক হিন্দুই নিঃসংশয় ছিলেন না, গান্ধী তাঁদের সমর্থন আদায় করেছিলেন।[১] মোপলা বিদ্রোহের পর তাঁদের সন্দেহ বাস্তবে পরিণত হয়। এ পরিস্থিতিতেই একটি বক্তৃতায় মওলানা মহম্মদ আলী ঘোষণা করলেন, আফগানিস্তানের আমীর যদি ইংরেজকে বিতাড়িত করে, তাহলে মুসলমানদের কর্তব্য হবে তাঁকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করা। এ বক্তৃতা স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুদের শঙ্কিত করেছিল।[২] হিন্দুরা মনে করলেন, প্যান ইসলামের ভীতি মারাত্মক প্রকট হয়ে গেছে।[৩] লালা লাজপত রায় বললেন, যেসব হিন্দুকে জোরপূর্বক মুসলমান করা হয়েছে তাদের পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা হবে হিন্দু মহাসভার অন্যতম উদ্দেশ্য।[৪] হিন্দুদের মধ্যে শুদ্ধি ও সংগঠনের প্রচেষ্টা হল মুসলমানের তানজিম।[৫] এগুলো হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষকেই বৃদ্ধি করল।

যেহেতু খিলাফত, সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কে কংগ্রেসের ভূমিকা অনেক মুসলমানকে হতাশ করেছিল, তারা মুসলিম সংগঠনের দিকে ঝুঁকে পড়েন।[৬] মওলানা মুহম্মদ আলী ঘোষণা করেন "We refuse to join Mr. Gandhi, because his movement is not a movement for the complete independence of India but for making the seventy millions of Indian Musalmans dependants of the Hindu Mahasabha."[৭] ১৯২৩ সালে কাউন্সিলে প্রবেশ নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ কাউন্সিলে প্রবেশের কর্মসূচী নিয়ে স্বরাজ দল গঠন করলেন।[৮] বাংলায় হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক উন্নয়নে স্বরাজ্যদলের অন্যতম কৃতিত্ব হল বেঙ্গল প্যাক্ট।[৯] কিন্তু কংগ্রেস এ প্যাক্ট অনুমোদন করেনি।[১০] বেঙ্গল প্যাক্ট নিয়ে শিক্ষিত হিন্দুর আচরণ বাঙালী মুসলমানদের হতাশ করেছিল, চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর মুসলমানরা কংগ্রেস থেকে ক্রমেই সরে গেলেন।[১১]

১। Op. Cit. p.73

২।(ক) India in 1921-22, pp.63-64.
(খ) ভারতে জাতীয় আন্দোলন, পৃঃ ৩৫০।

৩। প্রাদেশিক কনফারেন্স সিরাজগঞ্জ অধিবেশন, সভাপতির অভিভাষণ, পৃঃ ৪-৫।

৪। J. Coatman -India in 1925-26, pp.6-7.

৫। L.F. Rushbrook Willials -India in 1924-25, Calcutta, Government of India, 1925, p.29.

৬। Modern Islam in India pp.58-59.

৭। Times of India, 24, April, 1930, Quoted, The Indian problem, p.III

৮। Social background of Indian Nationalism, p.354.

৯।(ক) প্যাক্টের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : (ক) Life of Maulavi Abdul Karim, pp.58-59.
(খ) মাসিক মোহাম্মদী, পৌষ, ১৩৩০, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০, ইত্যাদি।

১০। বিভক্ত ভারত, পৃঃ ৩৩।

১১। A Nation in Making, pp.21-22.

Dhaka University Institutional Repository

কংগ্রেস সাইমন কমিশন বর্জন করল, প্রথম গোলটেবিল বৈঠক বর্জন করে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিল। সরকার দমননীতির আশ্রয় নিল, এবং সমস্ত দেশে অসংখ্য মানুষ কারাবরণ করলেন। মুসলমানও এ আন্দোলনে অংশ নেয়, তবে খিলাফত যুগের তুলনায় ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমানদের উৎসাহ তুলনামূলকভাবে কম ছিল।[১]

তেরো

রাজনৈতিক কোলাহল সাহিত্যকেও স্পর্শ করেছিল, এ অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটে ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি এবং সাহিত্যে তাঁর প্রভাব বৃদ্ধির পর। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মুসলমান সমস্যাকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন,

"যে দেশে প্রধানতঃ ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায় অন্য কোন বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজে প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে?" এদেশের কথা হল "যেখানে হিন্দু সেখানে মুসলমানের দ্বার সঙ্কীর্ণ, যেখানে মুসলমান সেখানে হিন্দুর বাধাবিঘ্ন।"[২]

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যকে বজায় রেখেই ঐক্য সাধনার প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। পার্থক্য যেখানে সত্য, তাকে অস্বীকার করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কারণ "নিদ্রিত মানুষের মধ্যে প্রভেদ থাকে না" এবং মুসলমান স্বতন্ত্র থেকে নিজের উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করছে তা "হিন্দুদের পক্ষে যতই অপ্রিয় হউক একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের প্রকৃত উপায়।" অন্যত্র– "পার্থক্য যেখানে সত্য, সেখানে সুবিধার খাতিরে, কাজ সারিবার প্রলোভনে তাহাকে চোখ বুজিয়া লোপ করিবার চেষ্টা করিলে সত্য তাহাতে সম্মতি দিতে চায় না।" দেশ হিতের নাম করে যাঁরা মিথ্যাকে পবিত্র এবং অন্যায়কে ন্যায় বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, সেসব দেশ হিতৈষীর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার দুঃসাধ্য সমস্যার কথা বলেছেন।[৩] মুসলমানের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টাকে তিনি স্বাগত জানিয়ে বলেন "মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে, এই ইচ্ছাটাই মুসলমানদের সত্য ইচ্ছা" এবং "হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিদ্যার স্থান দেওয়া হয় তবে সেই সঙ্গে নিজের

১। বিভক্ত ভারত, পৃঃ ৩৮
২। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর–হিন্দু মুসলমান, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৮।
৩। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, পরিচয়, উদ্ধৃত, রবীন্দ্র জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৬৮–৬৯।
৪। সদুপায়, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩১৫, উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭০–৭১।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাতন্ত্র্যকে স্থান দিলে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না।"[১] রবীন্দ্রনাথ সমস্যার আরো গভীরে যেতে চেয়েছিলেন, ১৯২৬ সালে ঢাকা ইন্টার মিডিয়েট কলেজ প্রাঙ্গনে তৃতীয় দিনে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন, দারিদ্র্য বা অভাবই হিন্দু মুসলমান বিরোধের অন্যতম কারণ। এর সমাধানের উৎস হল গ্রামে, যেখানে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি অবস্থান করছে সেখানেই সেবার মধ্য দিয়ে মিলন সম্ভব। এ উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন।

চৌদ্দ

পাশাপাশি মুসলমান সমাজ যথেষ্ট অনগ্রসর ছিল বলে তাদের সমাজচিন্তা, সাহিত্য সাধনায় তারা সেভাবেই গড়ে উঠেছিল। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে মুসলমানদের রচিত সাহিত্যকে মোটামুটিভাবে তিনটি শ্রেণীতে চিহ্নিত করা চলে, একদল সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ধর্ম এবং মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যকে উপজীব্য করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা পরিবেশ, পরিস্থিতি ও পরিবর্তন সম্পর্কে প্রায় উদাসীন, মুসলিম বিশ্ব এবং বাঙালী মুসলমানের ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কেই বিভোর ছিলেন। পরিবর্তনশীল বিশ্ব, এবং এমন কি বৃহত্তর বাঙালী সমাজ সম্পর্কেও তাঁরা নির্লিপ্ত।

অন্য একটি শ্রেণী মুসলিম বিশ্ব, মুসলিম সমাজকে গ্রহণ করেও পরিবেশিক ব্যাপারে মোটেই নির্লিপ্ত নন। এরা সমাজ সচেতন ছিলেন, হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের জটিলতাকে জাতীয়তার সৃষ্টির প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। এদের কাছে সাহিত্য ছিল সামাজিক কল্যাণ সৃষ্টির মাধ্যম, কিন্তু কিছুটা সাম্প্রদায়িক উগ্রতা থাকলেও হিন্দু সমাজকে তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন এবং মুসলমান সমাজের মধ্যে সে উজ্জ্বলতার বিকাশ ঘটাতে চেষ্টা করেছেন। মোটামুটিভাবে একই কালপরিবেশে আবির্ভূত হয়েও এ দুটো শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান ছিল বিপুল।

"১৮৭০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে প্রায় চল্লিশ জন মুসলমান লেখক পরিচিতি লাভ করেছিলেন সাহিত্য ক্ষেত্রে।"[২] সমালোচক বলেছেন, "এসব লেখকের পক্ষে আত্মপ্রকাশের সবচেয়ে জনপ্রিয় বাহন ছিল কবিতাঃ গীতিকবিতা, বর্ণনামূলক কবিতা, ছন্দোবদ্ধ রোমান্স, মহাকাব্যের আদলে কাব্য। ছড়াজাতীয় ছিল নীতি কবিতাঃ ফারসী কবিতা এবং তার আদি বঙ্গানুবাদেরা প্রেরণা জুগিয়েছিলেন বহুকাল ধরে। সবচেয়ে কম রুচি ছিল নাট্য সাহিত্যে। উপন্যাস দেখা দিয়েছিল বহুকাল পরে। আর তার আবির্ভাবের সংগে তর্কের ঝড় উঠেছিল উপন্যাসের সামাজিক প্রভাবের সুফল-কুফল নিয়ে। এই পরিবেশে তাই জোর পড়েছিল ইতিহাস, জীবনী, ধর্মতত্ত্ব ও প্রবন্ধ

১। উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৮।

২। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩রা ফাল্গুন, ১৩৯২, উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২০৬—২০০।

Dhaka University Institutional Repository

রচনার ওপরেঃ এসব সাধকের সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিলনা। সকলেই ধরে নিয়েছিলেন যে, লেখকের কর্তব্য হল সমাজের হিত সাধন। আর এইসব লেখক সমাজ বলতে বুঝেছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়কে।[১]

সমকালীন মুসলমান সমাজের বাস্তব প্রয়োজন থেকে সাহিত্য এভাবে অনুসৃত হলেও উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীটি এদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেননি। তাঁরা এ ঘটনাকে নিরূপণ করতেও চেষ্টা করেছেন এবং তাঁদেরই উত্তরাধিকারেরা বিশের দশকে মুক্ততর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। মোটা-মুটিভাবে মুসলিম সাহিত্য সমাজের লেখকদের এ পর্যায়ে শ্রেণীকরণ করা যায়। তাঁরা সাহিত্য সাধনাকে সম্প্রদায়ের দিক থেকে মুক্তি দিলেন এবং বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের সমান উত্তরাধিকার সৃষ্টি করলেন। অবশ্য এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কাজী নজরুল ইসলামের।

ইসমাইল হোসেন শিরাজী মোটামুটিভাবে এ কালপরিক্রমের মধ্যে রাজনীতিতে ও সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন, এবং যেসব মুসলমান সাহিত্যিক চতুর্থ দশকের তরুণতর মুসলমানদের জন্য উত্তরাধিকার সৃষ্টি করেছেন শিরাজী তাঁদের অন্যতম। কেবল তাই নয়, দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মধ্যে শিরাজীর অবদান শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এ সময়কার মুসলিম সাহিত্যিকদের অধিকাংশের রচনা পুনর্মুদ্রণের প্রয়াস নেই, অথবা উৎকৃষ্ট রচনা দুষ্প্রাপ্য পত্র পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই সীমাবদ্ধ থাকে সামগ্রিকভাবে এদের রচিত সাহিত্য মূল্যায়নের অসুবিধা অদ্যাবধি দূর হয়নি।

১। স্বরূপের সন্ধানে, পৃঃ ৫২-৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

সিরাজীর জীবন ও মানস-প্রকৃতি

সিরাজীর জীবনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে দেখা যায়।

ক। বাল্য, শিক্ষা ও সংসার জীবন

খ। প্রচার ও কর্ম জীবন

গ। রাজনৈতিক জীবন

ঘ। সাহিত্যিক জীবন

ক। বাল্য, শিক্ষা ও সংসার জীবন

এক

সিরাজীর জন্ম সাল এবং তারিখ নিয়ে বিতর্ক আছে। কেউ বলেন ১৮৮০ সালের ১০ই জুলাই[১], এবং কেউ বলেন ১৮৭৯ সালের ৫ই আগস্ট।[২] তাঁর পিতার নাম আবদুল করিম মিঞা[৩], মাতার নাম [illegible] নূরজাহান খানম[৪]। সিরাজীর নিজের নাম স্কুল রেকর্ডে লিখিত হয়েছে মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন[৫]।

১। এম, সেরাজুল হক-সিরাজী-চরিত, কলিকাতা, সিরাজী লাইব্রেরী, ১৯৩৫, পৃঃ ১।
২। আনোয়ার জাহান-সিরাজী: জীবন ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৮, আনোয়ার জাহান কয়েকজন মনীষীর মতামত নিয়ে আলোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, কিন্তু এগুলো মতামত মাত্র। বি, এল, হাইস্কুল রেকর্ডে তাঁর জন্মতারিখ উল্লিখিত নেই। সুতরাং অধিক সংখ্যক মনীষী কর্তৃক গৃহীত তারিখটি গ্রহণ করা যেতে পারে। সমাধি ফলকে তাঁর জন্ম ও মৃত্যু সন হল ১৫ই জুলাই, ১৮৭৯ এবং ১৭ই জুলাই, ১৯৩১।
৩। বি, এল, হাইস্কুল রেকর্ড। এম, সেরাজুল হক সিরাজী-চরিত গ্রন্থে (পৃঃ ২) বলেছেন, মৌলবী শাহ সৈয়দ আবদুল করিম। গোলাম সাকলায়েন বিস্তৃত বংশ তালিকায় তাঁর পিতার নাম দেখিয়েছেন সৈয়দ আবদুল করিম খোন্দকার (১৮৫৩-১৯২৯)। দ্রষ্টব্য, গোলাম সাকলায়েন-সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, সিরাজীর বাসভবন সিরাজগঞ্জের বানীকুঞ্জে টাঙানো একটি বংশ তালিকা রক্ষিত আছে। আমরা এটা দেখেছি, গোলাম সাকলায়েন এখান থেকেই এটা গ্রহণ করেছেন মনে হয়। গোলাম সাকলায়েন প্রবন্ধটি মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক (ঢাকা, মওলানা কিতাবিস্তান ১৯৬৭) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করার সময় এ বংশটিকে সম্ভবতঃ নির্ভরযোগ্য নয় মনে করেই বর্জন করেছেন।
৪। সিরাজী-চরিত, পৃঃ ৩।
৫। ইংরেজীতে Md. Ismail Hossain, দ্র. বি, এল, হাইস্কুল রেকর্ড।

১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রচারক পত্রিকায় প্রকাশিত রচনায় লেখক হিসেবে তাঁর নামের সঙ্গে সৈয়দ কিংবা সিরাজী, সিরাজী কোনটিই ছিল না।[১] ১৯০০ সালের জানুয়ারী সংখ্যা ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় তিনি নিজের নাম সম্ভবতঃ প্রথম লিখলেন সৈয়দ আবু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী।[২] নিজের নামের সঙ্গে 'সৈয়দ', 'সিরাজী', ও 'সিরাজী' লেখার পিছনে পরবর্তীকালে আভিজাত্যবোধ জড়িত হয়ে থাকতে পারে।[৩] সিরাজীর পিতা আবদুল করিমের পেশা ছিল ইউনানী চিকিৎসা, এ উপলক্ষেই তিনি ভাগ্য সন্ধানে সিরাজগঞ্জে এসেছিলেন।[৪] আবদুল করিম নিজেই সম্ভবতঃ খিদিরপুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, সিরাজী তাঁর কর্ম ও সাহিত্যিক জীবনে অনেকবারই মাতা ও মাতামহ বাবু খানের প্রসংগ উল্লেখ করেছেন। মাতার নামে উদ্বোধন কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গপত্রে বলেন, "ধর্ম শিক্ষা-নীতি দয়া-পুণ্য-কিরণ-সমুদ্ভাসিত চিরস্মরণীয় চির-বরণীয় যে মাতৃজীবনের সুনির্মল ভাবসমূহ এ হৃদয়কে কবিত্ব কুসুমোদ্যানে পরিণত করিয়াছে, যাঁহার অকলঙ্ক বুদ্ধিশিক্ষায় বিপুল প্রভাব ও চরিত্র আমাকে নির্ভীক, সবল এবং নীতিপরায়ণ করিয়াছে, যাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভা আমাকে প্রাণময়ী বাগ্মিতায় ভূষিত এবং জাতীয় উত্থান-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে, যাহার অমৃতময় স্নেহ ও আশীর্বাদধারা দুঃখ-দৈন্য পাপ-তাপ-সন্তপ্ত জীবন-মরুকে স্নিগ্ধ শীতল অমৃতায়মান প্রেম পুষ্পের মকরন্দ সুধায় সিঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই রমণীকুল-রত্ন, ধর্মপ্রাণা, জনহিতৈষিণী, শিক্ষানুরাগিণী পুণ্যবতী দেবী-প্রতিম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রীমতী মাতৃদেবী নূরজাহান খানম সাহেবার সুপবিত্র চরণারবিন্দে এই গ্রন্থ কুসুমদাম গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে বিনীত হৃদয়ে অঞ্জলি স্বরূপ উৎসৃষ্ট হইল।"[৫] উচ্ছ্বাস গ্রন্থটি মাতামহ বাবুখানের নামে উৎসর্গ করে বলেছেন, "আমার অন্নদাতা ও শিক্ষাদাতা শ্রী নানা সদগুণ-বিভূষিত বদান্য ও উদার চরিত্র, তেজস্বী ও পরহিতব্রতী, সুনামখ্যাত, বহুজন-মান্য, পরমপূজনীয় পুণ্যময় মাতামহদেব শ্রী শ্রীযুক্ত বাবু খান সাহেবের পুণ্যস্মৃতি চর্চা-উদ্দেশে, এই গ্রন্থ শোকাশ্রু এবং ভক্তি কুসুমাঞ্জলি তাঁহার চরণকমলে উৎসর্গীকৃত হইল।[৬]"

১। মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, পৃঃ ২৬-২৭।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২।
৩। সিরাজী আবুল মনসুর আহমদকে বলেন-"আমার উপাধি সাঁইথা আমি খাঁটি সৈয়দ কিনা তাই পরীক্ষা করতেছ বুঝি? -পরীক্ষা করতে চাও আমি ছুরা বলে কুলুন অংগার আইনা দিতেছি। তাই তুমি আমার হাতের তালুতে রাখ। যদি আমার হাতের তালুতে একটা ফোসকাও পড়ে তবে বুঝবা আমি সৈয়দের বাচ্চা নই। আমার পাকি কুষ্টা। এই কথাটা সিরাজী সাহেব আমাকে কতদিন বলিয়াছেন তার হিসাব নাই। আমাকে ছাড়া আরো অনেকের নিকট বলিয়াছেন শুনিয়াছি। দ্রষ্টব্য, আবুল মনসুর আহমদ-আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫, পৃঃ ৫৪।
৪।(ক) সিরাজী-চরিত, পৃঃ ২-৩।
(খ) বি,এম, হাই স্কুলের রেকর্ডে সিরাজীর ভর্তির সময় লেখানো হয়েছে চাকুরী হিসেবে। সম্ভবতঃ কোন সরকারী অফিস প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত থাকতে পারেন, কিন্তু আর্থিক অবস্থা তেমন সুবিধে ছিল বলে মনে হয় না।
৫। উৎসর্গ-উদ্বোধন পৃ-৭২।
৬। উৎসর্গ-উচ্ছ্বাস। পৃ-৭২।

Dhaka University Institutional Repository

আদব-কায়দা শিক্ষা গ্রন্থের নিবেদন অংশে বলেছেন, মাতামহের নিকট থেকে যা শিখেছিলেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত হতে দেখেছিলেন সেগুলোই এ গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য।[১] সিরাজীর কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় তাঁর পিতা জীবিত ছিলেন।[২] কিন্তু তিনি পিতা ও পিতৃকুল সম্পর্কে নীরব ছিলেন।

সিরাজীর মাতামহ বাবু খান ছিলেন পুলিশের সহকারী সাব ইনসপেক্টর, তিনি পাবনা সদরের অধিবাসী এবং চাকুরী উপলক্ষে সিরাজগঞ্জে এসে সেখানেই থেকে যান।[৩] সিরাজীর পিতা আবদুল করিমের সঙ্গে বাবু খানের প্রথম কন্যা মুসাম্মাৎ নূরজাহান খানমের বিয়ে হয় এবং বিয়ের পর থেকে তিনি শ্বশুর বাড়ীতেই থাকেন। সিরাজগঞ্জে বাবুখানের প্রতিষ্ঠা ছিল, কন্যা নূরজাহান খানমও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। সিরাজীর জীবনে মাতা ও মাতামহের প্রভাব পড়েছিল গভীরভাবে, উত্তরকালে সাহিত্যিক সামাজিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যেও এর প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে। সিরাজী ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনচিত্ততার আদর্শ, চারিত্রিক দৃঢ়তা পেয়েছেন এদের নিকট থেকে, আভিজাত্য সচেতনতা পেয়েছেন সম্ভবত পারিবারিক সংযোগ থেকে। ফলে বাল্য ও কৈশোরের সিরাজীমনে "মুসলিম ঐতিহ্য চেতনার একটি অনুকূল পরিবেশ[৪]" থেকে সিরাজীর মধ্যে যেমন গড়ে উঠেছিল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা, তেমনি সৃষ্টি হয়েছে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য। প্রচারক জীবনে বৈপরীত্যের অন্য কারণও ছিল, এদের প্রভাব পরবর্তীকালে অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে।

সিরাজীর পিতা আরবী, ফার্সীতে শিক্ষিত ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন[৫] কিন্তু তাঁর শিক্ষার দায়িত্ব নেন মাতা ও মাতামহ।[৬] পাঠাভ্যাস এবং আদর্শবোধ মাতার নিকট থেকে সিরাজী পেয়েছিলেন। মাতার সূত্রেই কিশোরকালে পুথির জগতের বীরত্বের ঘটা, শৌর্যবীর্য তাঁর নিকট উন্মুক্ত হয়েছিল।[৭] কৈশোরে এ পুথির সঙ্গে সংযোগ উত্তরকালে মুসলমানের অতীত গৌরবের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি[৮] করেছে ও সমকালীনতার সঙ্গে একটি দ্বন্দ্ব ও সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া মুসলমান গৌরবের প্রতি আকর্ষণ কেবলমাত্র কৈশোরের পুথির জগতের সঙ্গে সংযোগের কারণেও সম্ভব হয়নি।

১। আদব-কায়দা শিক্ষা, বর্ধিত দ্বি-সং, পৃঃ ৫।
২। সোলতান, ২২শে চৈত্র, ১৩৩০ এ পিতার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়।
৩। সাক্ষাৎকার-সৈয়দ ইউনুস উদ্দীন সিরাজী, পরিশিষ্ট। দ্রষ্টব্য
৪। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম-মুসলিম বাংলা সাহিত্য পাঠ পরিক্রমা। ঢাকা, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন ১৯৬৯, পৃঃ ১০৯।
৫। ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান-সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ঢাকা কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭০, পৃঃ ২।
৬। সিরাজী-চরিত, পৃঃ ৯-১০।
৭। মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক, পৃঃ ২০৭-৮।
৮। [illegible] আহমদ-সিরাজীঃ জীবন ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

দুই

১৮৮৫ সালে পাঁচ বছর ছয় মাস বয়সে বাবার নিকটে সাদেরউদ্দিন পণ্ডিতের পাঠশালায় তিনি ভর্তি হন । সেখানকার পাঠ শেষ করে ১৮৮৮ সালে জামদারিনী মাইনর স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলে বিদ্যার পাশাপাশি বাড়ীতে অধ্যয়ন করতেন সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য, হিন্দু ধর্মগ্রন্থ, বেদ, মনুসংহিতা ।[১] মাইনর স্কুলের পড়া শেষ করে বি,এম, হাই স্কুলে ফোর্থক্লাস-এ ভর্তি হন ১২-২-১৮৯৭ তারিখে।[২] প্রাথমিক স্কুলে অধ্যয়ন করেন তিন বছর, মাইনর স্কুলে পড়েন প্রায় নয় বছর।অর্থাৎ বারো বছর অধ্যয়ন করার পর তিনি পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং এ সময় তাঁর বয়সও হয়েছিল প্রায় সতেরো বছর ।

জীবনীকারের মতে বি,এম, হাইস্কুলে পাঠরত অবস্থায় ১৮৯৫ সালে তিনি মিয় মোহাম্মদ ইসমাইল মিঞাকে সংগে নিয়ে গৃহত্যাগ করেন, উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কে গমন । কেননা তিনি অনুভব করেন, এদেশে লেখাপড়া শিখলেও মনুষ্যত্ব লাভ সম্ভব নয় । এ ব্যাপারে তাঁর পরোক্ষ প্রেরণার উৎস ছিলেন প্যান ইসলামবাদের প্রবক্তা সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী এবং দেওবন্দের শেখুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান,

প্রায় ৩২ দিনের মধ্যেই তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেন।[১] কেউ কেউ মনে করেছেন তুরস্ক গমনে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর সম্ভবতঃ আর স্কুলে পড়েননি।[২] এটা ঠিক নয়, তাছাড়া তুরস্কগমন সম্পর্কে জীবনীকার প্রদত্ত তথ্যও নির্ভুল নয়। শিরাজীর এ গৃহত্যাগের ঘটনাটি ঘটেছিল জ্ঞানদায়িনী মাইনর স্কুলে থাকাকালে এবং বি,এল, হাই স্কুলে ভর্তি হবার প্রায় দুই বছর আগে। প্রবেশিকা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময়েই তাঁর অনলপ্রবাহ কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল।[৩] অনল প্রবাহ প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে এবং বি,এল, হাই স্কুলে তিনি সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছাতে তাঁর প্রায় এক বছর বেশী সময় লেগেছে। বি,এল, হাই স্কুলের রেকর্ডে কেবলমাত্র ভর্তির সন তারিখ ছাড়া আর কোন তথ্য নেই।

এদেশে শিক্ষা মনুষ্যত্বের প্রতিবন্ধক মনে করে তিনি দেশত্যাগের জন্য আগ্রহী হন এটাও মনে ২৫ ঠিক নয়। তুরস্কে যুদ্ধ করার নেশা ছিল শিরাজীর কিশোর মনজাত, এর সঙ্গে একটি রোমান্টিক আগ্রহ ছিল

১। শিরাজী-চরিত, পৃঃ ৩৩।

২। বি,এল, হাই স্কুল রেকর্ড।

৩। শিরাজী-চরিত, পৃঃ ১৮-২২।

৪। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, পৃঃ ৮।

৫। এম, সেরাজুল হক-মরহুম শিরাজী, অভিযান, ১৯৫৬-৫৭, পৃঃ ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান ঐতিহ্য ও বিশ্বের প্রতি। কৈশোরে মাতার মাধ্যমেই সিরাজী এটা পেয়েছিলেন, এটাই তাঁকে বয়ঃসন্ধিক্ষণের কল্পনার স্বর্গে রঞ্জিত করে নিজস্ব মনোজগতের মধ্যে সুপ্ত তুরস্কের পথে টেনে নিয়ে গেছিল। এর সঙ্গে তুরস্কের বাস্তব অস্তিত্বের সম্পর্ক নেই। কাল্পনিক বিশ্বের প্রতি রোমান্টিক কৌতূহল কিশোর বয়সেই দেখা গেছিল, তিনি মানচিত্রের সাহায্যে পৃথিবী পরিক্রমা ও স্বর্গের পথ অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেছিলেন।[১]

একাডেমিক শিক্ষার প্রতি তিনি অনাসক্ত ছিলেন কিন্তু তাঁর বিপুল পাঠাভ্যাস ছিল। সাহিত্য সমালোচনার নানা বিষয়েই তাঁর কৌতূহল ছিল, কিন্তু মুসলমান ইতিহাসের প্রতি তিনি অধিকতর আগ্রহ পরেও দেখিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করেছেন বাঙালীর ইতিহাস নেই বলে,[২] সিরাজী বেদনাবোধ করেছেন মুসলমানের সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে কিন্তু তার চর্চা নেই।[৩]

সিরাজীর পাঠাভ্যাসের বিবরণও পাওয়া যায়, এর মধ্যে রয়েছে ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য ও বিজ্ঞান।[৪] মাশহাদীর 'সমাজ ও সংস্কারক' গ্রন্থে সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীর জীবনী তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল মনে হয়, আফগানীর আদর্শেই তিনি জীবনকে গড়তে চেয়েছিলেন।

প্রধানতঃ দারিদ্র্যের কারণে একাডেমিক শিক্ষার সুযোগ তাঁর হয়নি।[৫] তা সত্ত্বেও একাডেমিক শিক্ষা তাঁর মনকে কেন আকৃষ্ট করেনি তার কারণও অনুসন্ধান করা কঠিন নয়।

জ্ঞানদায়িনীতে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর সাহিত্য রচনা ও বাগ্মিতার বিকাশ ঘটেছিল। জ্ঞানদায়িনী স্কুলের শিক্ষক রামমোহন মহাশয়ের আগ্রহ ও উৎসাহে সনিবারীয় ছাত্রদের Debating club meeting গঠিত হয় এবং এখানে বক্তৃতা দান করে সিরাজী পুরস্কৃত হন। জ্ঞানদায়িনী হতে সমিতি ও সিরাজগঞ্জ তার সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।[৬]

কিশোর বয়সে বাগ্মিতার খ্যাতি সিরাজীকে যেমন বৃহত্তর বিশ্ব ও জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দেয় তেমনি এ যোগাযোগের রোমান্টিকতা স্বাভাবিক জীবন প্রবাহেও ব্যতিক্রম ঘটায়। স্কুল জীবনেই বক্তৃতায় খ্যাতি এত বিস্তৃত হয়েছিল যে বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসায় বক্তৃতার জন্য তাঁর আমন্ত্রণ আসতে থাকে। এসব সভায় যোগদান

১। সিরাজী-চরিত, পৃঃ ১৭।

২। পূর্বে, পৃঃ ১৭।

৩। ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতা, আল-এসলাম, ভাদ্র, ১৩২৩ ও আশ্বিন, ১৩২৩।

৪। সিরাজী-চরিত, পৃঃ ১৩-১৬।

৫। (ক) অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন—ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), মাহে-নও, ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩।
(খ) শ্রী রাধারমণ সাহা—পাবনা জেলার ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, গ্রন্থকার প্রকাশিত, ১৩৩৩, পৃঃ ১২৪।

৬। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, পৃঃ ৭।

করে তিনি কিছু কিছু সন্ন্যাসীও পেতে শুরু করেন।[১] বাস্তব জীবনে বাগ্মিতার সঙ্গে এখানেই তিনি বাধা পড়েন, তুরস্ক গমনের ব্যর্থ প্রয়াসের ফলে রোমান্টিক জগৎ থেকে যে নির্মম বাস্তবে ফেরবার ধাক্কা খেয়েছিলেন, তা পুনরায় মুক্তি পেল এবার বাগ্মিতার মধ্যে। তিনি বক্তৃতায় অশ্রু ছুটিয়ে জনসমাজ ভ্রমণ করেছেন মুসলিম বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত এবং মুসলমান গৌরবের বিকাশমান অতীত থেকে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত। প্রচারক জীবনের প্রয়োজনে মুসলমান গৌরব যেখানেই যা চোখে পড়েছে তা তিনি বাঙ্ময় করেছেন যেমন বক্তৃতায় তেমনি সাহিত্যে। অতীত গৌরবের রোমান্টিক আবেগ সিরাজী বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছিলেন পরবর্তীকালে। "আরব ও তুর্কী অশ্বারোহীগণ এবং সেকালের ভারতীয় সম্রাটগণের মধ্যে বাবর, আকবর প্রভৃতি অনেকেই অশ্বপৃষ্ঠে ৩০/৪০ মাইল ভ্রমণ করিতেন, এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালী হইলেও আমার অশ্বের বর্তমানে এ কয়েকদিন ৫০/৬০ মাইল অনবরত অশ্বপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম।"[২]

গৌরব কীর্তনকে প্রাধান্য দিতে যেয়ে সাহিত্য রচনা ও বাগ্মিতা প্রায় অভিন্নভাবে তাঁর কর্মজীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। উত্তরকালে বাগ্মিতাই সিরাজীর সার্বজনিক পেশা হয়ে দাঁড়ায়[৩] ও নানা দিক দিয়েই সাহিত্য তাঁর এ বাগ্মী জীবনের প্রায় সহায়ক ভূমিকা নেয়।

১৩১০ সালে পাকশিয়া গ্রামের মুন্সী মোহাম্মদ আলা বখশ তালুকদারের কন্যা ওয়াজেদন নেসার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এ সময়েই বাপ মা মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর পুত্র কন্যার সংখ্যা ৬ জন, তিনটি পুত্র তিনটি কন্যা। সিরাজী মৃত্যুবরণ করেন ১৭ই জুলাই, ১৯৩১ সালে,[৪] স্ত্রী ওয়াজেদনেসা মৃত্যুবরণ করেন অনেক পরে, ১৯৫১ সনের ১লা এপ্রিল।[৫]

খ। প্রচার ও কর্মজীবন

এক

সিরাজীর প্রচার ও কর্মজীবন পাশাপাশি এবং এক সঙ্গেই চলেছিল। অনল প্রবাহ ও নব উদ্দীপনা প্রকাশের পর তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয় এবং তিনি স্কুলের পড়া ছেড়ে কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়েন। একাডেমিক শিক্ষার অভাব ও বাগ্মিতার নৈপুণ্য অত্যন্ত সহজভাবেই তাঁকে টেনে নিয়ে এসেছিল প্রচার জীবন ও বক্তৃতায় সার্বজনিক পেশায়। বক্তৃতা ও সাহিত্যে তাঁর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যে পর্যায়ে রোমান্টিক আবেগের দ্বারা মন্ডিত তখনই সাময়িক

১। সাক্ষাৎকার, সৈয়দ ইউনুসউদ্দীন সিরাজী, [illegible],

২। সিরিয়া পরিভ্রমণ, আল-এসলাম, পৌষ, ১৩২৫।

৩। (ক) আবুল ফজল, রেখাচিত্র, চট্টগ্রাম বইঘর, ১৯৬৫, পৃঃ ১৬৮।
(খ) জমীরউদ্দীন — সিরাজী স্মরণে, ইজাবউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত) — অনল প্রবাহের উৎসবেলে, ঢাকা, সরবার পাবলিকেশন্স, ১৩৭৩, পৃঃ ২০।

৪। সিরাজী-চরিত, পৃঃ ১৭৫।

৫। সমাধি ফলক অনুসারে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘটে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর সংগে। স্কুলে ছাত্র থাকাকালেই তরুণ কবির প্রথম কাব্যপ্রকাশের সুযোগ সম্প্রসারিত করার পথ মুক্ত নিয়ে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ একটি পদ্যকাব্যকে সচকিত করে দিলেন, কবিকে প্রথম কাব্যপ্রকাশের প্রেরণা দান করলেন। এভাবে মেহেরুল্লাহর উৎকোষের সংগে সিরাজীও প্রায় স্থায়ীভাবেই বাঁধা পড়লেন।

সিরাজীর ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের ক্ষেত্রে মুন্সী মেহেরুল্লাহর অবদান উল্লেখযোগ্য। মেহেরুল্লাহর মৃত্যুতে অন্তরের বেদনা প্রকাশ করে তিনি "শোকোচ্ছ্বাস" কবিতা রচনা করেন।[১] সিরাজগঞ্জে পাদ্রীদের সংগে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর একটি বাহাস বিতর্ক উপলক্ষে সিরাজী অনল প্রবাহ কবিতা আবৃত্তি করেন। মেহেরুল্লাহ আনন্দিত হয়ে বলেন, "শুনিতে পাইলাম তোমার আর্থিক অবস্থা সুবিধাজনক নহে। তুমি বক্তৃতা করিতে আরম্ভ কর ইহাতে তোমারও ফায়দা হইবে এবং মুসলমান জাতিরও উপকার হইবে।" এর পর থেকে তিনি মেহেরুল্লাহর শিষ্যত্ব নেন, প্রথম দিকে কিছুদিন সিরাজী মেহেরুল্লাহর সংগে প্রচারে যেতেন, পরে এককভাবেই যেতেন।[২] কিছুটা আর্থিক অসংগতির জন্য এবং কিছুটা প্রচার কার্যের খ্যাতি ও বোম্বাইয়ের সভার আকর্ষণে এর মধ্যেই তিনি সম্ভবতঃ স্কুল ছেড়েছিলেন, ১৩১৯ সালে বিয়ের পর সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। [illegible] প্রথমেই লেখায় মনোনিবেশিত হচ্ছিল, এর পর থেকে বক্তৃতাকে পুরোপুরি পেশা হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া উপায়ও ছিল না। সভা সমিতিতে বক্তৃতা করার জন্য তাঁকে বাহাদুর টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর টি, এ, ভাড়া দিতে হত।[৩] সোলতান পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে "যাহারা তাঁহাকে সভা সমিতির জন্য দাওৎ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা সিরাজী সাহেবের নামে "বালিয়াকান্দি সিরাজগঞ্জ" ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।"[৪] শেষ জীবনে স্বাস্থ্যহানির জন্য তিনি সভাসমিতিতে যোগ দিতে পারেননি, দারিদ্র্যও তাঁকে পীড়ন করা শুরু করেছিল। "যখন স্বাস্থ্য ভাল ছিল তখন দেশের বড় বড় নেতা সিরাজী সাহেবকে লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেন, নিজ নিজ দলের সমর্থনের জন্য। আজ রোগজীর্ণ অবস্থায় তিনি তাহাদের নিকট প্রয়োজনহীন। এই বিশাল কবিপ্রাণ সিরাজী সাহেবের জন্য তাই আর কোন আগ্রহ নাই।"[৫]

১। (ক) শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন—কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা, কলিকাতা, মখদুমী লাইব্রেরী, পৃঃ ৮০, ৮৬।
(খ) মেহেরুল্লাহ সম্পর্কে অন্যান্য বিবরণ, পূর্ব পৃঃ ১৫।

২। আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান বিশারদ—অনলের দিশারী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ইউসুফ উদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত)—অনলের দিশারী, ঢাকা, সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ১৯৭১, পৃঃ ২।

৩। (ক) কর্মবাগীশ—এম কামরুদ্দিন খোন্দকার ও হারুণ (সম্পাদিত)—সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী স্মরণিকা, ঢাকা, সৌখিন প্রকাশনা, ১৯৭১, পৃঃ ৫৯।
(খ) "তিনি সমাজের বন্ধু সংস্কারক উৎসাহদাতা দুঃখীর বন্ধু ব্যক্তি ছিলেন। বক্তৃতা দ্বারা তিনি স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ উপায়ও করিয়া থাকেন।"—পাবনা জেলার ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৪।

৪। সোলতান, ৯ই কার্তিক, ১৩৩১।

৫। আলীমউদ্দীন—সিরাজী স্মরণে, অনলপ্রবাহের উৎস ক্ষেত্র, পৃঃ ২০।

বাগ্মিতা একই সঙ্গে সিরাজীর প্রতিভার অন্যতম স্ফুরণ ক্ষেত্র এবং দুঃখ ও ব্যর্থতারও অন্যতম কারণ। কর্মজীবনের সূচনালগ্নেই তাঁর বাগ্মিতার খ্যাতি যে কোন মানুষের জন্য আকাঙ্ক্ষিত গৌরবের বিষয়। মেহেরুল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল, সিরাজীর বক্তৃতা মুসলমান সমাজের জাগরণের সহায়ক হয়েছিল তাঁর জীবিকার সংস্থানও করে দিয়েছিল। কিন্তু সিরাজীর দুর্ভাগ্য তিনি নিজেই তাঁর চারদিকে এক ধরণের সহজ খ্যাতির দেয়াল তুলে দিয়েছিলেন।

১৯০৩ সালে সিরাজীর প্রচার জীবনের খ্যাতির দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে ইসলাম প্রচারক পত্রিকায়। চট্টগ্রামে তাঁকে উর্দুতে প্রদত্ত একটি মানপত্র উল্লেখ করা হয়, "মওলানা সিরাজী সাহেব আরব তক মেরা দিয়া। খোদা হওয়ালে কসবতে ওঠা দিয়া।" আগরতলা বার লাইব্রেরীতে বক্তৃতায় সভাপতি হিসাবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলশ্রীযুক্ত উমাকান্ত রায় বাহাদুর মন্তব্য করেন, "আমি এরূপ বক্তৃতা মুসলমান দূরে থাক, হিন্দুর মুখেও শুনি নাই।"[১]

সে যুগে মাইকের প্রচলন হয়নি, কেবলমাত্র কণ্ঠস্বরের ঔজ্জ্বল্যেই দর্শক শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে রাখার প্রয়োজন হত, এ ব্যাপারে সিরাজীর কণ্ঠস্বর উত্তীর্ণ।[২] মাইক ছাড়াই তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা করতেন বাগ্মিতা দিয়ে শ্রোতাকে মুগ্ধ করে রাখা সিরাজী শক্তি হিসাবে নিয়েছেন, এর একটি চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন আবুল ফজল তাঁর রেখাচিত্র গ্রন্থে।

"ওয়াজে সিরাজী সাহেবের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম, রাত কাবার করে যে দাঁড়িয়েছিলাম বক্তৃতা শেষ হওয়ার আগে দাঁড়া সোজা হবার সুযোগই ছিলনা, এমন অদ্ভুত ব্যথা হয়েছে।"[৩]

জীবিকা অর্জনের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে অনবরত চর্চার মাধ্যমে বাগ্মিতাকে সিরাজী আরো বিকশিত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী প্রায় সকলেই সিরাজীর এই গুণটির কথা বর্ণনা করে গেছেন। বক্তৃতা দেবার সময় তিনি পাগড়ি পরতেন[৪] এবং পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ব্যক্তিত্বের প্রকাশ জ্ঞাপক পোশাকও পরিধান করতেন।[৫] সিরাজীর উদ্যোগে সেখানে হাই স্কুল মাদ্রাসা বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপিত হত। তাঁর

১। ইসলাম প্রচারক, ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩।

২। (ক) আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃঃ ৮৩-৮৪।
(খ) ফজলুল হক সেলবর্ষী-সিরাজী সান্নিধ্যে। দরবার, আষাঢ়, ১৩৬৬।

৩। রেখাচিত্র, পৃঃ ৬৮।

৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭।

৫। আবদুল কাদির-সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, [illegible] রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭১, পৃঃ ৬৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

রোগে শয্যাশায়ী হবার সংবাদ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।[১]

আরো পরে ছোলতান পত্রিকা "শিরাজী সাহেব পীড়িত" শিরোনামে শিরাজী সহ তাঁর পরিজনদের পীড়ার সংবাদ দিয়ে দারিদ্র্যের নির্মম চিত্র তুলে ধরেছে, "শিরাজী সাহেবকে একমাত্র প্রচারকার্যের উপর নির্ভর করিয়া বিশাল পরিবার পোষণ ও মেহমান মোসাফের এবং ছাত্র, অনেক সময় একেকজনের সেবার ভার আঞ্জাম দিতে হয়, কিন্তু বিগত ২/৩ মাস হইতে তিনি নানা প্রতিকূল বাধা বিঘ্ন নিবন্ধন প্রচারে বাহির হইতে পারেন নাই। একে কারকর্ম্মে পূর্ব হইতে জর্জরিত, তদুপরি সপরিবারে পীড়িত। নিজের ও বাড়ীর লোকের চিকিৎসা ও অন্নাহার পর্য্যন্ত চলা দুষ্কর হইয়াছে। তাহার পরিবারবর্গের স্বাস্থ্য কামনা করিয়া খোদাতায়ালার নিকট সর্বত্র সমবেত প্রার্থনা করিবেন এবং সকলেই বিপন্ন কবি ও কবি-পরিবারের বিপদ মোচন জন্য কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করিয়া তাহার নামে সিরাজগঞ্জে পাঠাইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন।"[২]

<u>দুই</u>

জীবিকা অর্জনের অন্য কোন মাধ্যম না থাকায় প্রচারক জীবন শিরাজীর জন্য অবিমিশ্র শান্তির হয়নি। অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্কেও তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। রংপুর খেলাফত কমিটির কর্তৃপক্ষ শিরাজীর চাঁদা আদায় সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করেন। ব্যাপারটি ক্রমেই তিক্ত হয়ে উঠতে থাকলে শিরাজী মোহাম্মদী পত্রিকায় যে চিঠি দেন তা থেকে তাঁর প্রচার জীবন সম্পর্কেও একটি ধারণা করে নেয়া যায়। দীর্ঘ পত্রের এক স্থানে তিনি লেখেন "মোটামুটি সমস্ত সভা হইতে ৭৭৩ ৷৷/০ আদায় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৪ বারের যাতায়াত খরচ, পীড়ার চিকিৎসা (পীড়ার কথা যথাসময়ে মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল) বিজ্ঞাপন খরচ, মোকামের মসজিদে চারজন লোকের দেড়মাস কাল অবস্থান, তাদের নাস্তা ও খাওয়া খরচ, সভার আয়োজন করিবার জন্য নানা স্থানে লোক প্রেরণ ও তাহাদের রেল ও স্টীমারের ভাড়া, মোকামের স্কুল পূজায় বন্ধ হইয়া যাওয়ায় একটা চাকরানী রাখিয়া রান্না করিয়া খাইতে হয় তাহার খরচ ইত্যাদিতে প্রায় পাঁচশত টাকা খরচ হইয়া যায় অতএব বাকীটা ফান্ডের টাকা হইতে খরচ করিতে বাধ্য হই।" প্রসঙ্গতঃ মোহাম্মদী সম্পাদকীয় মন্তব্য করে, "শিরাজী সাহেব নিম্নোক্ত পত্রের মধ্যে যে ৬০০ শত টাকা খেলাফৎ কমিটিতে জমা দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার রশিদ আমরা দেখিয়াছি।"[৩]

১। ভিক্টোরিয়া প্রেস, সিরাজগঞ্জ, ৫ই চৈত্র, ১৩২৭ সন।

২। ছোলতান, ২১শে ভাদ্র, ১৩৩০।

৩। মোহাম্মদী (?) কার্তিক সই, ৫৫০ -ক।

Dhaka University Institutional Repository

অন্য একটি সংবাদে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর পত্রের উল্লেখ করে বলা হয় "প্রতি কার্যকারী সমূহ নাকি সিরাজী সাহেবের অধিকাংশ সভাতেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, অনেক সভাতে সিরাজী সাহেবের ব্যক্তিগত প্ররোচনাই আদায় হয় নাই। সিরাজী সাহেব তাহার পত্রেও এই ভাবের কথা বলিয়াছেন। আমরা এ সকল কথা বিশ্বাস করিতেছি। আমরা সিরাজী সাহেবকে আর্দোয়ার চাঁদা আত্মসাৎকারক বলিয়া কখনোই মনে করি নাই, এবং এখনও করিতেছিনা।" দীর্ঘ বিতর্কের পর মোহাম্মদী মনে করেছে "এই ব্যাপারটির মূলে উভয় পক্ষের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ কিঞ্চিৎ কার্য করিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে।" শেষে সিরাজীকে "ক্ষুব্ধ বা ক্ষুণ্ণ" না হতে এবং রংপুরের সেক্রেটারী সমিতির কর্মকর্তাদেরকে দুঃখ পরিহার করতে আহবান জানানো হয়েছে।[১]

প্রচারক জীবনে সিরাজীর দীর্ঘকালের সহকর্মী ছিলেন ইসলামাবাদী। নূর পত্রিকায় সিরাজী আঞ্জুমানে ওলামা সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "আঞ্জুমানের কাজ কর্ম দেখিয়া ক্রমশঃ নিরাশ হইতে হইয়াছে।[২]" ইসলামাবাদী এর উত্তরে আল-এসলাম পত্রিকায় লেখেন, "যোগ্য ব্যক্তিগণের চিরকালই আদর সমাদর থাকিবে, সুতরাং আঞ্জুমানের দুর্ভাগ্য বিদ্বেষের দ্বেষে অন্যান্য প্রচারক, বক্তা ও মৌলবী মৌলানাগণের অন্ন মারা যাইবে, এরূপ মনে করার কোনই কারণ নাই। সিরাজী সাহেবের সহিত আমাদের এই সেরেফ মনুষ্যের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও প্রসংগক্রমে কথাটা এখানে উল্লেখ করা হইল।[৩]" বলা বাহুল্য, মন্তব্যটি সিরাজীকে উদ্দেশ্য করে নয়, এরকম মনে করার কোন কারণ নেই।

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার পর ভারতীয় হিন্দু সমাজে তার প্রভাব সিরাজীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। নূর পত্রিকায় "আত্মত্যাগ ও জাতীয় উন্নতি" প্রবন্ধে সিরাজী এমন একদল যুবককে জাতির সেবার জন্য আহবান করেন যাঁরা ধর্ম বলে "অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল ও জীবন্ত হইবেন। কামিনী কাঞ্চনের লালসা তাঁহাদের হৃদয়কে লুব্ধ ও মুগ্ধ করিতে পারিবে না। এইরূপ একদল যুবককে যদি পাইলে তাঁহাদিগকে লইয়া একটি আশ্রম খুলিতে রাজী আছি।[৪]" নূর পত্রিকাতেই 'আহ্বা' শিরোনামে এর পার্শ্ব উৎসের একাংশে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সিরাজীকেই উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "আসুন তিনি সাম্প্রদায়িকতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া অর্থের নাম কনক ভূষণ ত্যাগ করিয়া সৈনিক বসনে উজ্জ্বল অগ্নি মূর্তির ন্যায় আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকুন ---আমাদের আহবানকারী স্বামী সিরাজি কেমন লোক কিনা, আমরা দেখিতে চাই।[৫]"

১। মোহাম্মদী, ২৮শে পৌষ, ১৩২৯।
২। নূর, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৬।
৩। আল-এসলাম, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।
৪। আত্মত্যাগ ও জাতীয় উন্নতি, নূর, মাঘ, ১৩২৬।
৫। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী-দাড়া, নূর, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর লেখায় সিরাজী কিছুটা প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয়। এর পর সিরাজী মন্তব্য করেছেন "দেখা যাইত এরূপ উৎসাহ ও আগ্রহপূর্ণ আড্ডা যুবজনের নিকট হইতে পাওয়া যায়। একদম যুবক হইলে তবে ত আড্ডা। একজন কি দুইজন অশীতিপর বৃদ্ধ তেজস্বী হইলেও তদ্দ্বারা জাতীয় দিগ্বিজয় সম্ভবপর নহে, এক ইটে কখনও মসজিদ হয় না।

আর একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক, যুবকগণকে তেজস্বী হইতে হইবে তাই বলিয়া উদ্ধত নয়।"[১]

সিরাজী আদর্শ আশ্রম গড়ার কথা ভেবে ছিলেন এবং বিবেকানন্দের মতই আদর্শবান যুবকশ্রেণীকে চেয়েছিলেন। বোঝা যায়, সিরাজীর লক্ষ্য ঠিক ধর্ম নয়, বরং ধর্ম প্রচারের রোমান্টিকতা, মানুষকে আকৃষ্ট করে নতুন সমাজ গড়ে তোলা। সিরাজগঞ্জে 'আঞ্জুমানে খাদেমুল ইসলাম' বা 'ইসলাম সেবক সমিতি' নামে তিনি যে সংগঠন গড়ে তোলেন তার মধ্য দিয়েও এ আদর্শের রূপায়ণ ঘটেছে। আঞ্জুমানে খাদেমুল ইসলামের উদ্দেশ্য তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন-

"দুঃস্থ, বিপন্ন, আর্ত ও পীড়িত নরনারীর সেবা করাই হইতেছে মানুষের শ্রেষ্ঠতম ধর্ম। ইসলাম জগতের এই সেবাব্রত প্রচারের জন্যই প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যে এই বিরাট দেশে এ পর্যন্ত মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সেবক সমিতি গঠিত হয় নাই। এজন্য আমরা হিন্দু ভ্রাতাদিগের প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের অনুরূপ এই খাদেমুল ইসলাম সমিতি স্থাপন করিলাম।" এ সমিতির যে নয়টি উদ্দেশ্য বলা হয়েছে তার একটিতেও ইসলাম ধর্ম প্রচারের কথা নেই, যা আছে তার মধ্যে প্রধান হল জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, ও গ্রন্থাগার স্থাপন, বৃত্তিপ্রদান ইত্যাদি। এ ছাড়া রয়েছে দুঃস্থ ও পীড়িতদের সেবা, এতিম বালক বালিকার জন্য আশ্রম, দুঃস্থ ও পীড়িতের চিকিৎসা, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন ও অগ্নিদাহে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যদান[২] ইত্যাদি।

সিরাজীর কাছে মুসলমানের প্রধান সমস্যা ধর্ম বিশ্বাসের নয়, বরং আত্মবিশ্বাসের। এ কারণে তিনি আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছেন, ধর্মের চেয়ে মানবিক গুণাবলীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এমন কি ইসলামের নামে সেবা সমিতি গঠন করলেও মানবতার সেবাকেই মুখ্য করে তুলেছেন।

সিরাজী প্রচলিত অর্থে ধর্মপ্রচারক ছিলেন না, কিন্তু প্রচারক জীবনে ধর্মীয় বিতর্ক থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে যেতে পারেননি। সমগ্র প্রচারক জীবনই ছিল তাঁর প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকতার দ্বন্দ্ব, যুক্তির সঙ্গে প্রয়োজনের, এবং এ দ্বন্দ্ব ছিল তাঁর নিজের ভেতরেই। অবশ্যই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হয়েছেন কিন্তু প্রচারক জীবনের অনুরাগে অনেক ক্ষেত্রেই তা ঢেকে গেছে।

১। নূর, ৩য় ভাগ, দশম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।
২। ভিক্টোরিয়া প্রেস, সিরাজগঞ্জ, ৮ই বৈশাখ, ১৩২৮ সন। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী-সেক্রেটারী প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজীর সমকালীন প্রচারকদের দৃষ্টিতে দেখা যায়, (ক) ধর্মীয় নীতিমালার ব্যাখ্যা দান ও প্রতিপক্ষকে যুক্তি মতে আপন আসনে সম্মত করা, (খ) মুসলমানের গৌরব কীর্তন, অতীত সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও নতুন সমাজগঠন। সিরাজীর প্রচারক জীবন দ্বিতীয় পর্যায়ের, সমকালীন ধর্মপ্রচারকদের তুলনায় এখানে সিরাজীর প্রচারক জীবনে প্রগতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেই তিনি তাঁর পথ প্রদর্শক মুন্সী মেহেরুল্লাহকে অতিক্রম করে এসেছিলেন, এমন কি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর তুলনায়ও সম্ভবত কিছুটা অগ্রসর ছিলেন।

ইসলাম প্রচারক সিরাজীর যে ২৫টি বক্তৃতার বিবরণ একত্রে পাওয়া গেছে সেখানে খৃষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে বিতর্কের সংবাদ কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সিরাজী মুসলমান সমাজের কল্যাণকে অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে নিয়েছেন, কুসংস্কার ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা দূর করে সমাজকে আদর্শভিত্তিক করে গড়তে চেয়েছেন, কিন্তু হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত জীবনকে উপেক্ষা করেননি। তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কামনা করেছেন কিন্তু সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মধ্যে, বিশেষ করে একশ্রেণীর হিন্দু কর্তৃক মুসলিম বিদ্বেষের প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে সবক্ষেত্রে সংযম রাখতে পারেননি। কৃষক শ্রেণীকে জমিদার মহাজনের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান কৃষককে পৃথক করে দেখেননি। নির্যাতিত হিন্দুর বিরুদ্ধে তিনি কিছু বলেননি, এমনকি সম্প্রদায়গতভাবে সাধারণ হিন্দুর বিরুদ্ধে তিনি খুব কমই বলেছেন।

তিন

দেশের জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ও মহাজনী শোষণ বন্ধ করার জন্য নানা স্থানে প্রজা আন্দোলনে তিনি অংশ গ্রহণ করেন।[২] মানিকগঞ্জে মহাজনদের হাত থেকে দরিদ্র কৃষকদের রক্ষার জন্য মহাজন বিরোধী সংগঠন গড়ে তোলেন, এখানে এ আন্দোলন প্রায় চার পাঁচ বছর চলেছিল।[৩] মেদিনীপুর ওয়াটসন কোম্পানীর প্রজা নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন, এজন্য বঙ্গের সফর করে বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা করেন এবং প্রজার দুঃখ মোচনের জন্য দাবি বক্তৃতার এক স্থানে বলেন, "আমরা যদি সামান্য জমিদারের অবিচার নিবারণেই অসমর্থ হই তাহা (হইলে)[৪] স্বরাজ লাভের কল্পনা কি আমাদের পক্ষে বাতুলতা নয় কি? আমরা আরও প্রার্থনা করি যে বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের কাউন্সিলের দেশীয় মেম্বরগণ এ বিষয়ে কাউন্সিলে তুমুল

১। পারিশিষ্ট, চৌত্রিশ-সাঁইত্রিশ।

২। বজলুর রহমান চৌধুরী-সিরাজী সাহেবের সঙ্গে আট বৎসর, দরবার ৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৫।

৩। (ক) [illegible] –সিরাজী সকাশে, জনমতবাদের উৎস কেন্দ্র, পৃঃ ১৮–১৯।
(খ) এ,কে, ফজলুল হক বলেছেন, "দেশের চাষী মজুর ও খাতকদিগকে দুর্দশা মোচনের জন্য মরহুম ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেবের কণ্ঠেই নতুন আহবান আমরা শুনিয়াছিলাম। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।

৪। প্রথম বন্ধনীতে "হইলে" আমাদের সংযোজন।

ব্যবসায় করিতে যেন বিরত না হন, পক্ষান্তরে যাহাতে উপযুক্ত জন্য একটা কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করেন, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। সমিতি হইতে আমাদিগকেও যেন বঞ্চিত রাখা হয় ইহা আমার বিনীত প্রার্থনা।[১] সিরাজীর এ সমস্ত প্রস্তাবের সব অনুদিত, পরে হিতবাদী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় "এখানে ১০ জন প্রজার দুঃখ ও টিকাদি সহ বিমুদ্রিত প্রস্তাবের লাখপতেন হস্তগত হইয়াছে। পরে ৫৭ দফা কলিকাতায় বিবৃত হইয়াছে।[২]

চাকার চৌকাটে প্রায় অধিবেশনে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের সমাবেশে সিরাজী সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতায় তিনি হিন্দু মুসলমানের একতা, মুসলমানের অনুন্নত অবস্থা, হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির অভাবের আবশ্যকতা সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় কথা বলেন।[৩]

সিরাজী হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য নেতা ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাট চাষ ও ব্যবসাকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী হিন্দুর মধ্যে সিরাজীর অসহযোগিতা হয় এবং এটা সিরাজগঞ্জের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে দূরপ্রসারী রাজনৈতিক রূপ নেয়। কৃষক ও পাটের ব্যাপারী প্রায় সবাই মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও পাট ব্যবসার মুনাফা লোটে মাড়োয়ারী, মাড়োয়ারী, ইংরেজ ও হিন্দু কোম্পানী। সিরাজী মুসলিমদের মুসলমানের আর্থিক উন্নতি সাধন সিবা, রাজনৈতিক অধিকার লাভ ইত্যাদি কিছুই সম্ভব নয়। এজন্য সিরাজী জাতীয় ঐক্যবাদিয়া ট্রেডিং কোম্পানী খোলার প্রস্তাব করেন এবং একটি সভায় সিরাজী নিজেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে মুসলমানদের সহযোগে এরকম একটি কোম্পানী গড়েই তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করবেন।[৪] পাট চাষের অর্থ প্রকৃতপক্ষে কৃষক পায়নি, এ কারণে তাদের দুর্দশারও শেষ হয়নি। দৈনিক বসুমতী সম্পাদকীয় মন্তব্য করেন,

"মহাকবি সৈয়দ সিরাজী সাহেব আজ কোথায়? তাঁহার পূর্ববর্তী যে আশঙ্কা ছিল তাহা আজ ফলিতে চলিয়াছে। দুর্ভাগা কৃষকের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তিনি ভবিষ্যত প্রান্তরে অনাগত বিপদরাশি লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাই অত্যুৎসাহের সাথে কৃষকদের বাঁচাইবার জন্য আন্দোলন তুলিয়াছিলেন কিন্তু সহানুভূতির অভাবে অগ্রসর হইতে পারেন নাই।"[৫] দৈনিক বসুমতী এর পরেও কৃষকদের দুরবস্থার সংবাদ প্রকাশ করেন।[৬]

১। হিতবাদী, ১০ই শ্রাবণ, ১৩২৮।
২। চাবুক, ৪ঠা/২৮শে আষাঢ়, ১৩২৮।
৩। বসুমতী, ১৭ই পৌষ, ১৩৩০।
৪। মোহাম্মদী, ২৫শে মাঘ, ১৩৩০।
৫। দৈনিক বসুমতী, ১লা চৈত্র, ১৩৩০।
৬। চাবুক, ১২ই চৈত্র, ১৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

পাট চাষ, ব্যবসা ও মুসলমান কৃষকের দুরবস্থা মোচনের সংগে সিরাজী জড়িত হয়ে যান। সিরাজগঞ্জ পাট চাষ ও ব্যবসার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল এবং কলিকাতার সংগে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হবার ফলে[১] কৃষককে রক্ষা করার আন্দোলনের সংগে রাজনীতি যুক্ত হয়ে গেল। অধিকাংশ কৃষক ছিল মুসলমান এবং মহাজন ব্যবসায়ী হিন্দু, ফলে কৃষকদের মহাজন শোষণের হাত থেকে মুক্ত করার প্রয়াস ক্রমেই স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির রূপ পেল, সিরাজী নিজেও সিরাজগঞ্জের শিক্ষিত কিংবা ব্যবসায়ী হিন্দু সমাজ কর্তৃক নিন্দিত হলেন। সিরাজীর ইসলামিয়া ট্রেডিং কোম্পানী গঠনকে দেখা হল হিন্দুদের সমুচিত শিক্ষা দেবার প্রয়াস হিসাবে। এজন্য বসুমতী পত্রিকায় সিরাজীর বিরুদ্ধে লেখা হলে সিরাজীকে সমর্থন দিল ছোলতান। ছোলতান এর একটি যুক্তি সর্বত চিত্র তুলে ধরেছে, মুসলমানের উন্নতি হলে দেশ হিতৈষী হিন্দুর নিকট তা অপ্রীতিকর হতে পারে না। "মাড়োয়ারীরা যেভাবে বাঙ্গালার রক্তশোষণ করিয়া উদরপূর্তি করিতেছে তাহাতে অল্পকালের মধ্যে ব্যবসায় ক্ষেত্র হইতে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব ঘুচিয়া যাইবে। বাঙ্গালীকে হাত গুটাইয়া বসিতে হইবে। কই বাঙ্গালী হিন্দুরা ত পাটের ব্যবসায় একচেটিয়া করিতে পারেন নাই, বরং কিছুই করিতে পারে নাই। তাহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ জর্জরিত হইয়া যৌথ কারবারের পত্তন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন এরূপ ধারণা বড়ই গর্হিত। জাতি বিদ্বেষ-বীজ বপনের সময় এই নয়।"[২]

সিরাজগঞ্জে পাট চাষ ও ব্যবসাকে কেন্দ্র করে এ মনোমালিন্য ঘটেছিল সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সের অব্যবহিত পূর্বে, সুতরাং এটা সহজেই রাজনৈতিক রূপ পেয়েছিল। কিন্তু একারণে সিরাজীকে স্বাতন্ত্র্যবাদী বলা চলে না, সিরাজী সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্য হিসাবে হিন্দু মুসলমানের মিলন কামনা করেছিলেন।[৩] তাঁর মতে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য না হলে উভয়েরই ধ্বংস অনিবার্য। ১৩৩০ সনের একটি জনসভায় তিনি বলেন, "ভারতমাতার সর্বাঙ্গীন পূর্ণতার জন্য দয়াময় বিধাতা পুরুষ হিন্দু মুসলমান এই দুইটী ভাবপ্রবণ ও কর্মপ্রাণ জাতিকে ভারতক্ষেত্রে সমবেত করিয়াছেন। এই দুই জাতির মহামিলন হইতে এক অভিনব বিরাট জাতির উদ্ভব হইবে। তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা ও বীর্য্য-গৌরব এবং যশঃপ্রতিভায় জগৎ ধন্য হইবে।"[৪]

স্বরাজ লাভের জন্য শিক্ষার প্রসার ও হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ওপর জোর দিয়ে কয়েকটি

১। Satistical Account of Bengal, Vol.IX, pp.342-52.

২। ছোলতান, ৩রা ফাল্গুন, ১৩৩০।

৩। The Servant 13th September, 1923 • উদ্ধৃত, সিরাজী-চর্চা, পৃঃ১৪৬-৪৭।

৪। নায়ক, ১৩৩০, ফাল্গুন, ২২শ সংখ্যা, উদ্ধৃত প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১।

সভায় তিনি বক্তৃতা দেন।[১] বঙ্গীয় মুসলিম তরুণদল এর থেকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি ডেপুটেশন দল পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে যায়। সিরাজী এবং কাজী নজরুল ইসলাম এ ডেপুটেশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন।[২] আনন্দবাজার পত্রিকা সিরাজীর এ সাহসের প্রশংসা করেছে।[৩] সুতরাং মনে করা যায়, সিরাজীর প্রতি স্থানীয় হিন্দু সমাজের বিদ্বেষের কারণ অরাজনৈতিক নয় এবং এজন্য সিরাজী স্বাতন্ত্র্যপন্থী ছিলেন কিনা তা প্রমাণিত হয় না।

প্রচারক জীবনের প্রয়োজনে মুসলমান সমাজের কল্যাণচিন্তার সঙ্গে অনেক বেশী যুক্ত ছিলেন বলে তিনি মুসলমান সমাজের দুর্দশা মোচনের জন্যই অধিক শক্তি ব্যয় করেন।

কিশোরগঞ্জের জনসভায় মুসলমানদেরকে আত্মনির্ভরতা ও আত্মসম্মান সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন।[৪] বক্তৃতায়, মুসলমানদের ধর্মীয় গৌরবের কথাই তিনি বেশী করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সমকালীন হিন্দুর মত ধর্মবোধকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এজন্য হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের পাশাপাশি বিশ্ব মুসলমানের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সংযোগ ছিল। বিভিন্ন স্কুলের বিবাদ উপলক্ষে কিশোরগঞ্জের মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এক সময় তিনি যে [illegible] চেষ্টা করেন[৫] পরবর্তীকালে তারা বৃহত্তর আকারে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় তা রূপান্তরিত হয়েছিল।[৬] বয়ঃসন্ধিকালে যেটা রোমান্টিক চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল, পূর্ণ যৌবনে তুরস্ক ভ্রমণের বাস্তব অভিজ্ঞতা সিরাজীকে এ ব্যাপারে অগ্রসর করে দিয়েছিল। এজন্য ইসলাম অর্থে তিনি বিশ্ব ইসলামকে বুঝতেন, বিশ্বের যে কোন অঞ্চলের ইসলামের সঙ্গে তিনি কল্যাণবোধে যুক্ত হয়েছিলেন। মুসলমানের নিজস্ব সমস্যাকে তিনি পৃথকভাবে দেখেছিলেন একই সঙ্গে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার সমস্যাকে একত্রিত রূপে দেখেছিলেন, এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন নির্দ্বন্দ্ব। একারণে প্যান ইসলামী চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তার কোন বিরোধ হয়নি।

তাঁর সাময়িক প্রভাবের পরিচয় মেলে বক্তৃতার জন্য মুদ্রিত প্রচারপত্রে।[৭] প্রচার বা পাবলিসিটিই প্রচার জীবনের অন্যতম অবলম্বন এটা তাঁকে সস্তা জনপ্রিয়তা ও সহজ প্রতিযোগিতার মধ্যে টেনে এনেছিল, সিরাজীর সাহিত্য চর্চাও একারণে বিঘ্নিত হয়েছে।

১। Forward. 5th February & 8th March, 1925.
২। নায়ক ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৩৩।
৩। আনন্দবাজার, ২রা মার্চ, ১৯২৫।
৪। দৈনিক ছোলতান, ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩৩।
৫। এম, নূরউদ্দীন চৌধুরী-তারুণ্যের প্রতীক সিরাজী-সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী স্মরণিকা, পৃ ১০৭।
৬। তুরস্ক ভ্রমণ, ১ম সং, পৃঃ ৮৭-৮৯।
৭। (ক) "আসুন হিন্দু, আসুন মুসলমান আসুন দেশবাসী আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব দেশমান্য [illegible] গাজী সিরাজী সাহেবের চরণ দর্শন করিয়া মনপ্রাণ পবিত্র করিয়া লউন। আজ সেই যুগপুরুষ আমাদের এই [illegible] বাজারে পদার্পণ করিতেছেন, তাহার পরিচয় আজ দেশবাসীকে নূতন করিয়া দিতে হইবেনা। তিনি সমগ্র জগতের প্রতিভা [illegible], দেশের ও ধর্মের অকৃত্রিম সেবক, দেশমান্য শ্রদ্ধেয় নেতা যিনি দেশের জন্য, ধর্মের জন্য দীর্ঘ দুই বৎসর কারাবাসে ছিলেন, যিনি ধর্মের জন্য পাগলের মত টর্কী-ইটালিয়ান যুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিয়া গিয়াছিলেন-সেখানে তুর্কবাসীদের দ্বারা যথাযথ গাজী উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন-তিনি সেই গাজী সিরাজী সাহেবকে দেখিবার জন্য দলে দলে লোক পাগলের মত ছুটিয়া আসুন"----------ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য, সিরাজগঞ্জ [illegible] প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি।
(খ) হিতৈষী প্রেস, ফরিদপুর ১৮-৩-৩৩ [illegible] সেক্রেটারী, আঞ্জুমানে ইসলামিয়া ফরিদপুর-এর মুদ্রিত প্রচারিত।

শুদ্ধি আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে মুসলমানদের তাবলিগ আন্দোলনে[১] তিনি যেমন যোগ দেন,[২] তেমনি গোঁড়া মুসলমানদের আহবানে সবেবরাতের দিন হরতাল ডাকতে সম্মত না হওয়ায় "তাহারা মত প্রকাশ করেন যে সিরাজী সাহেব নাস্তিক হইয়া গিয়াছে।"[৩] ইসলামাবাদীর মতো সিরাজী একদা হানিফী ও মোহাম্মদী দলীয়দের ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, আবার কাঠমোল্লাদের হাত থেকে মুসলমান সমাজকে রক্ষার জন্য তিনি বলেন, "অশিক্ষিত কাঠমোল্লার দল মহাভক্তির পঙ্গপালের দলের ন্যায় ফকীর পল্লীতে পল্লীতে গৃহে গৃহে যাইয়া যে সমস্ত অসার এবং অমূলক গোঁজামিলী কেচ্ছা কাহিনীপূর্ণ ওয়াজ নসিহত করিয়া থাকেন, তাহার প্রকৃত অর্থ এই—অর্থাৎ ব্যবসায় বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া এবং যদি থাক তাহা হইলে পরিবারবর্গকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া আল্লার নামে শুধু তওবাহ করিয়া ফকির হইয়া জঙ্গলে যাও অথবা লোকদ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ কর। সংসারের সমস্ত কাজকর্ম ত্যাগ করিয়া আল্লার জেকের ফেকের এবং অজিফার মেহনতে জান্নাতে যাও। নামাজ এবং রোজা কর, আর বাবা। খয়রাত খুব কর। তোমার জরুগরু বিক্রয় করিয়া হইলেও আমাদের খুশী পূর্ণ কর।"[৪] ইসলামে সুদ প্রদান এবং গ্রহণ দুটোই নিষিদ্ধ হলেও মুসলমান বা হিন্দু মহাজনকে কেবলমাত্র সুদ প্রদান করেনি প্রচলিত হচ্ছে, কিন্তু গ্রহণ করতে পারবে না এ নিয়েও সিরাজী বিদ্রূপ প্রকাশ করেছেন।[৫]

সিরাজীর লক্ষ্য ছিল একই সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা এবং সমকালীন জ্ঞানপ্রবাহের সঙ্গে মুসলমান সমাজের সংযোগ ঘটানো। এটা করতে গিয়ে কখনো যেমন বিদ্রোহ করেছেন আবার অবস্থাকে মেনেও নিয়েছেন। সাহিত্যে এটা প্রতিফলিত হয়েছে, কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক যে, সাহিত্যে প্রকাশিত সিরাজীর বক্তব্য ঠিক শেষ কথা নয়, তাঁর সমগ্র বক্তব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশমাত্র। সিরাজী হিন্দু মুসলমানের মিলন কামনা করেছিলেন কিন্তু বৃহত্তর মুসলমান সমাজের স্বার্থ বিপন্ন করে নয়। আবার মুসলমান সমাজকেও আত্মবিধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

১। পূর্বে, পৃ. ২৮।

২। দৈনিক ছোলতান, ১২ই আষাঢ়, ১৩৩৩।

৩। সিরাজগঞ্জে ম্যাজেস্ট্রি, দৈনিক প্রজাদর্শী, ভাদ্র ৬১ শ সংখ্যা।

৪। ইসলাম মিশনারী, কার্তিক বই ৫৫০-ক। ইসলামাবাদীও এ ধরনের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। দ্রষ্টব্য, ইসলাম প্রচারক, অক্টোবর, ১৯০০।

৫। মোহাম্মদী ২৮শে বৈশাখ, ১৩২৯।

Dhaka University Institutional Repository

চার

শিরাজী ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী দুজনেই প্রচারক হিসেবে পারস্পরিক সহকর্মী। বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতির সহকারী সম্পাদকরূপে ইসলামাবাদীর নাম শিরাজী প্রস্তাব করেন।[১] শিরাজী নিজেও ইসলামাবাদীর সংগঠন আঞ্জুমানে ওলামার সদস্য ছিলেন। তা সত্ত্বেও আঞ্জুমানে ওলামা এবং ইসলামাবাদীর প্রস্তাবিত আরবী বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে প্রকাশ্য আদর্শগত বিরোধ সৃষ্টি হয়।[২] এ বিতর্কের মধ্য দিয়ে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গীও স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। শিরাজী বলেছেন, "বর্তমান জগতে মুসলমানদিগের এই অধঃপতনের যুগে আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কারণ বর্তমান অবস্থায় আরবী ভাষায় কোরাণ, হাদিস, ফেকাহ এবং মুসলমান জাতির ইতিহাস ব্যতীত অধ্যয়নের উপযুক্ত কোন বিষয় (Sibject) নাই। সুতরাং ইসলামাবাদী সাহেব আরবী ভাষায় যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কল্পনা করিতেছেন, তাহা আকাশ-কুসুম ব্যতীত আর কিছুই নহে। আরব জাতি যদি কখনও মাথা তুলিতে পারে এবং বিদ্যা চর্চায় জগতে শীর্ষস্থান লাভ করিতে পারে, তাহা হইলেই ভবিষ্যতে আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ভাবীকালে সম্ভব হইতে পারে। আধুনিক যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে গেলে ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান এই তিন ভাষার অন্ততঃপক্ষে একটীকে জড়াইয়া ধরা ব্যতীত উপায় নাই। কারণ বর্তমান জগতের কোন বিদ্যাই আরবীতে নাই।"

ইসলামাবাদী এর উত্তরে বলেছেন, ধর্মজীবনের সঙ্গে পার্থিব জীবনের উন্নতি বিধানের জন্যই আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা। শিরাজীর প্রতি ইসলামাবাদী কটাক্ষ করে বলেছেন, যেখানে শতকরা পাঁচজন শিক্ষিত লোকও ধর্মনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না, "এমতাবস্থায় বিজ্ঞানপুষ্ট শিরাজী সাহেব ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা কি উপকারের আশা করেন তাহা আমরা জানিতে চাই।" শিরাজী আঞ্জুমানে ওলামার ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করেছেন, ইসলামাবাদী এর জবাবে যেসব যুক্তি প্রদান করেছেন, এর মধ্যে ব্যক্তিগত উষ্মাও প্রকাশিত হয়েছে। শিরাজী বিদেশে মিশন পাঠাবার কথা বলেছেন, ইসলামাবাদী বলেছেন বিদেশে প্রেরণের জন্য উপযুক্ত প্রচারকের অভাব রয়েছে। শিরাজী বলেছেন, মিশনের জন্য টাকার অভাব হবে না, ইসলামাবাদী শিরাজীকেই প্রশ্ন করেছেন, যথেষ্ট প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি সমাজ হিতকর কাজের জন্য কত টাকা এ পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পেরেছেন? আঞ্জুমানের প্রচারক নিযুক্ত হয়ে অন্যান্য প্রচারক বক্তার সমাদর কমে যাবে মনে করে

১। ইসলাম-প্রচারক, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১।

২। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নূর, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৬ এবং আল-এসলাম জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা "আঞ্জুমানকে পাহাড় পর্যন্ত মনে করিয়া সামাবাদ বা সমুদ্রপথে নির্বাসনের পক্ষপাতী। কিন্তু তাহাদের এই ধারণা ভিত্তিহীন।" এ মতের পরেও ইসলামাবাদী প্রস্তাবিত আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে সিরাজী সহ অন্যান্য মনীষীর সমর্থনের আশা ছাড়েননি।[১]

ইসলামাবাদী মনে করতেন "ইউরোপের বর্তমান শিক্ষা-সভ্যতা, বৈজ্ঞানিক উন্নতি, দার্শনিক চিন্তা মানবজাতিকে ক্রমে নাস্তিকতা ও জড়বিজ্ঞানের দিকে লইয়া যাইতেছে।"[২] –"সিরাজী ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানকেই বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জাতীয় উন্নতির অন্যতম উপায় হিসাবে বহু ক্ষেত্রেই মনে করেছেন। আঞ্জুমানে ওলামার উদ্দেশ্য ও সমাজ সংস্কার কর্মসূচিতে[৩] মুসলমানদের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনকে সচল করে তোলার প্রয়াস থাকলেও অন্যতম গুরুত্ব পড়েছে বিধর্মীদের আক্রমণ থেকে ইসলাম ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা এবং ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনীয়তার ওপর। এজন্য তাঁরা প্রচারকার্যকে সফল করে তুলতে সার্বক্ষণিক প্রচারক সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। সিরাজী আঞ্জুমানে ওলামার সদস্য থাকলেও এর সংগে একমত হতে পারেন নি।[৪] আঞ্জুমানে ওলামায় পরিচালিত আল-এসলাম পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।"---একদিকে সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণ ও অংশেকর দোষ সংস্কার পূর্বক ধর্মভাব বর্ধন ও জাতীয় জীবন গঠন, অন্যদিকে বিভ্রান্ত ও বিধর্মী দিগের মধ্যে এসলামের মহিমা প্রচারপূর্বক ও তাহাদিগকে এসলামের গণ্ডীর মধ্যে আনয়নের চেষ্টা।"[৫] সিরাজী সম্পাদিত নূর পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য জাতীয় আদর্শমণ্ডিত সাহিত্য সৃষ্টি, ধর্মের প্রসংগ এসেছে অপেক্ষাকৃত সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনে।[৬] আল এসলামের তুলনায় নূর পত্রিকায় ধর্মের প্রসংগ অপ্রধান। নূর পত্রিকায় ধর্মীয় উদার দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত সংস্কারপন্থীদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছে।[৭] আল-এসলাম পত্রিকার সংগে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকলেও সিরাজীর প্রচুর সংখ্যক উৎকৃষ্ট রচনা আল এসলাম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তা সত্ত্বেও নিজস্ব মতের প্রকাশক্ষেত্র অনুসন্ধান করার জন্য সম্ভবতঃ তিনি নূর পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইসলামাবাদী ও সিরাজী একত্রে সবর্ণদীয় ছোলতান পত্রিকাও পরিচালনা করেন।

১। ছোলতান, ৩০শে কার্তিক, ১৩৩০।

২। এছলামাবাদী-ঈমানের তেজ, আল-এসলাম, চৈত্র, ১৩২৬।

৩। দ্রষ্টব্য-আল-এসলাম, আষাঢ়, ১৩২৬, আশ্বিন, ১৩২৬, অগ্রহায়ণ, ১৩২৬।

৪। নূর, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৬।

৫। এছলামাবাদী -সমাজ সংস্কার, আল -এসলাম, মাঘ, ১৩২৫।

৬। নিবেদন, নূর, মাঘ, ১৩২৬। সকল সংখ্যার সম্পাদকীয় ও আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৭। (ক) ইসলাম দর্শন, বৈশাখ-১৩২৭। বিস্তৃত বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য।

(খ) বঙ্গনূর, অগ্রহায়ণ, ১৩২৬। বিস্তৃত বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামাবাদী প্রতিষ্ঠিত শাহজাহান কোম্পানী[১] শিরাজীর গ্রন্থও প্রকাশ করে।[২]

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সংগে শিরাজীর সম্পর্ক লক্ষণীয়। ১৯২২ সালে আকরম খাঁর কারাদন্ড, মোহাম্মদী পত্রিকার আট হাজার টাকা জামানত আটক করা হলে শিরাজী বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়ে মোহাম্মদী পুনঃপ্রচার এবং আকরম খাঁকে কারামুক্ত করার চেষ্টা করেন।[৩] কিন্তু মোহাম্মদী পত্রিকা মুসলিম উদ্দেশ্য রক্ষা করে চলতে পারেনি এটা শিরাজীর বিকট ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। সাপ্তাহিক সওগাত পত্রিকায় একটি পত্রে শিরাজী লেখেন, "মিলাদ মহফিলে যে গান গাওয়া লইয়া কবি নজরুল ইসলামকে অতি জঘন্যভাবে গালাগালি দিয়া (সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে) ইসলামি ভ্রাতার (আদবের) মাথায় পাদুকাঘাত করা হইয়াছে আবার মাসিক মোহাম্মদীতে জোরে সোরে সেই গান বাজনা জায়েজ বলিয়া ফতোয়া দেওয়া হইয়াছে। এ সমস্তই চমৎকার কান্ড। আমার মনে হয়, সম্পাদক মৌলানা আকরম খাঁ সাহেবের তওবা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য।--- হয় তিনি ভদ্রলোকের মত মোহাম্মদী পরিচালিত করেন, না হয় বন্ধ করিয়া দিন।--- পয়সার জন্যই যদি এরূপ করিতে হয়, তবে চুরি ডাকাতি বা জাল জুয়াচুরি করিলে ইহা অপেক্ষা বেশী রোজগার হইতে পারে।"[৪]

শিরাজী নিজে গজনয় অনুরাগী ছিলেন এবং আকরম খাঁর দ্বিমুখী নীতি অনুমোদন করতে পারেননি। সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কনফারেন্স ও বঙ্গীয় মোসলেম মহাসভার ব্যাপারে দুজনের মধ্যেকার ব্যবধান উভয়ের বক্তৃতার মধ্যে স্পষ্ট, কিন্তু পরবর্তীকালে আকরম খাঁ যখন কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছেন সেক্ষেত্রে তাঁর অতীত ভূমিকার সংগে কোন সংযোগ ছিলনা। কংগ্রেসের পক্ষ নেবার এবং বিরোধিতা করার উভয় ক্ষেত্রেই আকরম খাঁ বর্গীয় সমর্থন খুঁজেছেন[৫]। শিরাজীর মধ্যে এত বড় অসংগতি দেখা যায় না।

ইসলামাবাদী ও আকরম খাঁর সংগে শিরাজীর একটি মৌলিক পার্থক্যও ছিল। দুজনের সংগে বাস্তব সংযোগের ফলে শিরাজী মুসলিম হিন্দুর যে সংঘকে যুক্তিসংগতভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, ইসলামাবাদীও আকরম খাঁ তাকে সাম্প্রদায়িক করেছেন। অনেকটা একারণে ইসলামাবাদী ও আকরম খাঁ যত ঘনিষ্ঠভাবে আঞ্জুমানে ওলামার সংস্কার কিংবা প্রচারকর্মের সংগে যুক্ত থাকতে পেরেছেন[৭] শিরাজী তা পারেননি। জীবিকার জন্য প্রচারক হলেও শিরাজী এর সংগে যুক্ত নন, তিনি যা কিছু করেছেন তা সবই সামাজিক প্রয়োজন এবং নাম্র শক্তি কিংবা

১। সমকুর রহমান চৌধুরী-শিরাজীর সংগে লাট সাহেব, মঙ্গলবার, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৫।
২। উদ্দীপ্ত রত্ন, প্রথম খণ্ড, ১৯১৩।
৩। শিরাজী-চরিত, পৃঃ ১৫৩।
৪। সাপ্তাহিক সওগাত, ৩০শে কার্তিক, ১৩৩৫।
৫। (ক) প্রাদেশিক কনফারেন্স, সিরাজগঞ্জ অধিবেশন, সভাপতির অভিভাষণ।
(খ) ইসলাম দর্শন, শ্রাবণ, এবং ভাদ্র, ১৩৩১।
৬। বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, পৃঃ ১১-১২।
৭। মওলানা আকরম খাঁ আঞ্জুমানে ওলামার সেক্রেটারী এবং ইসলামাবাদী জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন। দ্রষ্টব্য, আল-এসলাম, মাঘ, ১৩২৫।

Dhaka University Institutional Repository

আত্মবিস্মৃতের উৎস থেকে। ঐতিহাসিক ইসলামকে গ্রহণ করার ফলে তিনি আদর্শবাদী ও রোমান্টিক হয়েছেন; সমাজ সেবা ও রাজনীতির মধ্যে নিঃশেষিত না হয়ে সাহিত্যেও তিনি ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সিরাজীর সাহিত্য রচনা তাঁর কর্মজীবনের অংশ হলেও সেখানে তা সিরাজীর প্রচেষ্টা উদ্দেশ্য ও কর্মজীবনকে অতিক্রম করে গেছে সেখানে তিনি স্রষ্টা। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর সহকর্মীবৃন্দের চেয়ে অগ্রগণ্য, সাহিত্যেও সিরাজীর তুলনীয় স্থান এখানে চিহ্নিত করা যায়।

ইসলামাবাদী মনে করতেন, বিশুদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলে সামাজিক সমস্যার সমাধান হবে, সিরাজীও ধর্মবোধে বিশুদ্ধতা কামনা করেছেন, কিন্তু মনে করেছেন সামাজিক প্রগতি, জাতীয় চৈতন্যবোধকে না জাগাতে পারলে ধর্ম কেবলমাত্র গতানুগতিক আচরণ বা বিশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে, জাতীয় অগ্রগতির পক্ষে এটা হবে আত্মঘাতী। ইসলামাবাদী যখন দেশের মানুষের ধর্মবিশ্বাস সংস্কারের কাজ করেছেন সিরাজী সেই মুহূর্তে সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ জাতিগঠনের কথা বলেছেন, এশিয়াটিক ট্রেডিং কোম্পানী গঠন, জমিদার মহাজনের হাত থেকে কৃষক নির্যাতন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছেন। সিরাজীর যুক্তিভঙ্গীর সামাজিক আবেদন ইসলামাবাদীর তুলনায় ভিন্ন, কোন কোন ক্ষেত্রে গভীরও। ইসলামাবাদী সুস্থির চিত্ত কিন্তু সিরাজী তা নন, সিরাজী অনেক সংগঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন কিন্তু শেষ করতে পারেননি। সিরাজীর তুলনায় ইসলামাবাদী তাঁর সমকালে কম বিতর্কিত। ইসলামাবাদী প্রধানতঃ ধর্মপ্রচার ও সমাজ সেবার প্রয়োজনে সংগঠন করেছেন, সিরাজী রাজনীতি, সমাজ সেবা ও জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য ধর্মকে গ্রহণ করেছেন। ইসলামাবাদী ধর্মভিত্তিক শিক্ষায়তন আরবী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার চেষ্টা করেছেন, সিরাজী ধর্মসম্পর্কহীন আধুনিক শিক্ষার কথা বলেছেন। সিরাজী মুসলিম মানসের জাগরণ মুহূর্তের পরিবর্তনশীলতার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি ইসলামাবাদীর তুলনায় অধিকতর সক্রিয় ছিলেন কংগ্রেস রাজনীতিতে। কেউ কেউ ইসলামাবাদীকে সুধীক, পরিকল্পনাবিদ ও সংগঠক, সিরাজীকে ঐতিহাসিক এবং অতএব তাঁকে পুনরুজ্জীবনবাদী বলতে চেয়েছেন।[১]

জীবিকা যুক্ত হয়েছিল বলে প্রচারকর্মকে তিনি ছাড়তে পারেননি, এ কারণে তাঁর চিত্তের স্বাধীনতা কিছুটা বাধা পেয়েছিল এবং তিনিও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন। তা সত্ত্বেও সমকালের তুলনায় সিরাজীর প্রচারকর্মে স্বাতন্ত্র্য ছিল, কর্মচিন্তার অব্যবহিত লক্ষ্য সুধর্মীদের প্রতি ছিল, কিন্তু তিনি এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েননি। সিরাজীর প্রচারক ও কর্মজীবনের বিশিষ্টতা এখানেই।

১। মুজীবর রহমান খাঁ—অনগ্রসরদের কবি, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ—আশ্বিন, ১৩৭১।

Dhaka University Institutional Repository

গ। রাজনৈতিক জীবন

এক

সিরাজীর প্রচারক এবং কর্মজীবনের মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছিল রাজনৈতিক জীবন। এসবের একটি থেকে অন্যটিকে পৃথক করে নেয়া কঠিন।

সিরাজীর রাজনৈতিক জীবনে প্রধানত দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল, প্রথমে অনলপ্রবাহ রচনার জন্য ১৯১০ সালে দুই বছরের জন্য কারাবরণ, এবং ১৯১২ সনের ১৫ই মে কারামুক্তির পর বলকান যুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য করার জন্য ডাঃ আনসারীর নেতৃত্বে মেডিকেল মিশনে অংশগ্রহণ। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনও অক্ষুন্ন রেখেছেন। ১৯১০ সালে কারাবরণ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মহেন্দ্রক্ষণ বলা যায়। এর আগে পর্যন্ত প্রচারক জীবনের মধ্য দিয়েই পরবর্তীকালের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিলেন।

১৯১০ সালে তাঁর কারাবরণ আংশিকভাবে সাহিত্যকর্মের জন্য এবং আংশিকভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য। এর আগেই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে[১] এবং স্বদেশী আন্দোলনে[২] তাঁকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশী আন্দোলনে স্বল্পসংখ্যক মুসলমান যারা অংশ নেন সিরাজী ছিলেন তাদের অন্যতম। আন্দোলনের ব্যাপক সরকার দমননীতি প্রয়োগ করেন, অসংখ্য ব্যক্তিকে কারাবরণ করতে হয়।[৩] অনলপ্রবাহ রচনা অর্থাৎ ইংরেজের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ উস্কানোর অভিযোগে সিরাজী কারাবরণ করেন[৪], প্রায় একই সময়ে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কারাবরণ করেন সন্ত্রাসবাদী নেতা শ্রী অরবিন্দ ঘোষ। দুজনেই পরবর্তীকালে কারাজীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে কারাকাহিনী রচনা করেন।[৫] লক্ষণীয় যোগাযোগ হল একই পুলিশ ইনস্পেক্টর -শ্রী বিনোদবাবু দুজনকেই গ্রেপ্তারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং প্রায় একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা দুজনেই বর্ণনা করেছেন। সাধনা পত্রিকায় সিরাজীর কারাকাহিনী প্রকাশিত হয়, সুপ্রভাত পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষের কারাকাহিনী প্রকাশিত হবার প্রায় বারো বছর পরে, সুতরাং মনে করা যায় অরবিন্দ ঘোষের কারাকাহিনী পড়ে সিরাজী তাঁর নিজের কারাজীবনের অভিজ্ঞতা রচনা করার জন্য অনুপ্রাণিত বোধ করতেও পারেন।

১। পূর্বে, পৃ: ২৬।
২। মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃঃ ২২৫।
৩। পূর্বে, পৃ: ২৭।
৪। কেউ কেউ মনে করেন সাহিত্য রচনার জন্য সিরাজীই প্রথম কারাবরণ করেন। দ্রষ্টব্য, অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু তালিব-বাংলা সাহিত্যে সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), মাসিক মোহাম্মদী, আষাঢ়, ১৩৬৯।
৫।(ক) শ্রী অরবিন্দ ঘোষ-কারাকাহিনী। সুপ্রভাত পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হয়, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
খ) সিরাজীর কারাকাহিনী 'সাধনা' বৈশাখ, ১৩২৮ থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। আমরা মাঘ, ১৩২৮ পর্যন্ত পেয়েছি। এর পরে কারাকাহিনী আর প্রকাশিত হতে দেখা যাচ্ছেনা।

Dhaka University Institutional Repository

কারাজীবনের নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতার মধ্যেই অরবিন্দ ঘোষ সন্ন্যাস ব্রতের দিকে ঝুঁকে পড়েন, সিরাজী রাজনীতির সঙ্গে ধর্মবোধকে মিশ্রিত করে একে জাতীয় মুক্তি ও কল্যাণের পথ বলে গ্রহণ করেন। কারামুক্তির পর অরবিন্দ ঘোষ ক্রমেই সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আশ্রম বা সন্ন্যাস জীবন শুরু করেন। অরবিন্দ ঘোষের ধর্মবোধ তাঁকে আধ্যাত্মিক মুক্তির দিকে নিয়ে গেছে, সিরাজীর ধর্মবোধ আরো দৃঢ়ভাবে পার্থিব উন্নতি, জাতীয় মুক্তি ও রাজনীতির সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করে দিয়েছে। কারাজীবন দুজনকে দুটো পৃথক পথ প্রদর্শন করেছে।

অনলপ্রবাহ সম্পর্কিত মামলাকে কেন্দ্র করে সিরাজীর যে সমস্ত গ্রন্থ ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে ও মোহাম্মদী এজেন্সীতে বিক্রীর জন্য ছিল পুলিশ সেগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়।[১] সিরাজগঞ্জে কবির বাসগৃহ বাণীকুঞ্জেও সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ সহ হাজির হয়ে অনল প্রবাহের সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থের কপিও নিয়ে যান।[২] কেউ কেউ সিরাজীর গ্রেফতারের আদেশ রদ করার জন্য নবাব সলিমুল্লার মাধ্যমে ছোট লাট হেয়ার সাহেবের নিকট চেষ্টা চালাতে উদ্যোগ নেন, কিন্তু সফল হননি।[৩] এর পর তিনি ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে আত্মগোপন করে থাকেন। হিতাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে চীন দেশে বা আফগানিস্তানে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দেন, কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হননি[৪]। তাঁকে গ্রেফতারের জন্য সরকার পাঁচশো টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে, চন্দননগরেও সিরাজীকে ধরার জন্য ডিটেকটিভ পুলিশের আগমন ঘটে[৫], আত্মগোপন করে থাকা আর সম্ভব নয় বলে তিনি সুইনহোর আদালতে আত্মসমর্পণ করেন।[৬] সিরাজীর এ মামলার ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহায্য করেন, উকিল বিনোদবিহারী গুপ্ত ও ব্যারিস্টার বি,সি,চ্যাটার্জি বিনা পারিশ্রমিকে সিরাজীর মামলা গ্রহণ করেন। সুইনহোর বিচারে সিরাজীর দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়, অর্থাভাবে হাইকোর্টে আপীল করা সম্ভব হয়নি।[৭] ১৯১২ সালের ১৪ ই মে তিনি কারাদণ্ড থেকে মুক্তি পান।

স্বদেশী আন্দোলন থেকে কারাদণ্ড রাজনীতির সঙ্গে সিরাজীর যোগাযোগকে প্রত্যক্ষ করে তুলল। এটা আরো পরিণত রূপ পেল বঙ্গভঙ্গ যুগের অংশগ্রহণের মধ্যে। কেউ কেউ মনে করেন, ১৯০৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি একজন ডেলিগেট হিসাবে যোগদান করেন।[৮]

১। কারাকাহিনী, সাধনা, বৈশাখ, ১৩২৮।
২। শেখ আবদুল গফুর জালালী-সিরাজীর কারাবরণের কাহিনী, আলোর দিশারী, পৃ: ৬৬-৬৭।
৩। কারাকাহিনী, সাধনা, বৈশাখ, ১৩২৮।
৪। প্রাগুক্ত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮।
৫। প্রাগুক্ত, আষাঢ়, ১৩২৮।
৬। প্রাগুক্ত, আশ্বিন, ১৩২৮।
৭। শেখ আবদুল গফুর জালালী-সিরাজীর কারাবরণের কাহিনী, আলোর দিশারী, পৃ: ৬৮-৭১।
৮। Muslim community in Bengal, p.346.

কিন্তু পরিশিষ্টে ১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের যেসব বাঙালী মুসলমান ডেলিগেটের নাম দেয়া হয়েছে সেখানে সিরাজীর নাম নেই। দ্রষ্টব্য, Ibid, Appendix-e.

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যেই ১৩১৩ সনের ৩০শে আশ্বিন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিরাজগঞ্জ আগমন উপলক্ষে সভা-সমিতির আয়োজন হয়। এ সময় পদ প্রতিপক্ষের বিরোধিতার মধ্যে পড়ে তিনি প্রহৃত ও রক্তাক্ত কলেবর হন। এরপর তিনি প্রহারে শীর্ষক কবিতাটি রচনা করেন।[১] তাঁর প্রহারের সংবাদ বিভিন্ন ও সংবাদপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হলে অনেকে ক্ষুব্ধ হন।[২] উক্ত প্রহারের রাজনৈতিক পটভূমি অবশ্যই ছিল কিন্তু মূল কারণটি ছিল অন্যত্র গভীর[৩] এবং এর মাধ্যমে সমসাময়িক পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজের তুলনায় সিরাজীর প্রগতিশীল মুক্তিচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

সিরাজগঞ্জের স্থানীয় মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক মতামত সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত ছিল। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর অংশটি ছিল সিরাজীর বিরুদ্ধে, এর সঙ্গে স্থানীয় ঈর্ষা ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল বলে মনে হয়। সিরাজগঞ্জে সিরাজীর বিরুদ্ধাচারণকারী মুসলমানরা দুভাবে সংগঠিত ছিলেন, (ক) সিরাজীর মাতা, পিতা কেউ স্থানীয় অর্থাৎ বংশানুক্রমিকভাবে সিরাজগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন না, এ জন্য সিরাজীর সামাজিক রাজনৈতিক খ্যাতিতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠাবান অনেক মুসলমান নেতৃবৃন্দের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে তাঁর প্রতি বিরূপ ছিলেন, সিরাজীর সুনামকে তাঁরা ভালোভাবে নিতে পারেননি, (খ) সিরাজীর ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে উদারদৃষ্টিভঙ্গি মুসলমান সমাজের গোঁড়া অংশ সহ্য করতে পারেনি। মুসলমান সমাজের তরুণ অংশের ওপর সিরাজীর প্রভাব ছিল এবং এই তরুণদের সঙ্গে তাঁর সংযোগকে অনিবার্য করে তুলে। বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যের কারণে অন্যান্য প্রচারকও সিরাজীর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। এদেশেরই পরিণতি ঘটেছে তাঁকে প্রহারের মধ্যে, সিরাজীর 'প্রহারে' কবিতায় তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "যুক্তি তর্ক ন্যায় জ্ঞানে পরাজিত হবে মূর্খগণ/অমনি ফুলিয়া উঠে তাহার ক্রোধ হুতাশন।" এবং "স্বর্ণ যথা অগ্নিতাপে হয় ওঠে পূর্ণ দীপ্তিময়" সেরকম তারও জীবন ধন্য হবে যেদিন তাদের হাতে তার প্রাণসংহার ঘটবে।[৪] এদেশের পরও তিনি সামাজিক ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়াননি, নারী জাতির অবরোধ ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছেন, জনসভায় নিজের মেয়েদের দিয়ে গান গাইয়েছেন, বক্তৃতা করিয়েছেন।[৫] এসব ব্যাপারে গোঁড়া মুসলমান সমাজের প্রতিবাদকে উপেক্ষা করেছেন।

১। (ক) সিরাজী-চরিত, পৃঃ ১৫৩-৫৫।
(খ) নবউদ্দীপনা, ৩-সং, পৃঃ ৩২-৪০।
(গ) Bengalee, 21 October, 1906---The official record predictably dismissed the incident as "insignificant." Fortnightly Report from Eastern Bengal and Assam, No.228M, 5 November 1906-Home public progs. December 1906 p.148. Quoted-Sumit Sarkar-The Swadeshi Movement in Bengal (1903-1908) peopl's publishing House, 1977, p.432.
২। ইবরাহিম খাঁ-বাতায়ন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৭, পৃঃ ৪১।
৩। [illegible] দূত সিরাজী, আলোর দিশারী, পৃঃ ২২৩-২৪। -প্রবন্ধটিতে কিছু তথ্যগত ভুল আছে। প্রহৃত হবার সময় কেবলমাত্র তাঁর এক কন্যার জন্ম হয়েছে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মকাল ১৩১৬, দ্রষ্টব্য সিরাজী-চরিত, পৃঃ ১৮৯। তবে সিরাজীর ধর্মীয় ও সামাজিক উদার দৃষ্টিভঙ্গী গোঁড়া মুসলমান সমাজে অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল।
৪। (ক) সিরাজী-চরিত, পৃঃ ১৫৪।
(খ) নব উদ্দীপনা, পৃঃ ৩২-৪০।
৫। [illegible] সিরাজী-পরিচিতি. [illegible]-বর্তিকা।

Dhaka University Institutional Repository

বয়কটের পক্ষে আন্দোলন করতে যেয়ে নবাব সলিমুল্লাহ, নওয়াব আলী চৌধুরী বুঝিয়ায় হিন্দুদের দ্বারা গৃহীত হওয়ায়[১] আন্দোলনটি দাঁড়িয়েছিল অনেকটা মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর আন্দোলনের মত। এ কারণে বয়কটের বিরোধিতা করার জন্য তাঁকে প্রচার করা বিদ্বেষপ্রচারকারী মুসলমানদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। শিরাজীর প্রতিপক্ষের অন্যতম সিরাজগঞ্জের নিকটে হোসেনপুরের মুন্সী মেহেরুল্লাহ মনে করতেন, হিন্দুর অর্থে লালিত হয়েই শিরাজী বয়কটের পক্ষ সমর্থন, ও মুসলমানদের বিরোধিতা করেছেন।[২] প্রায় এরই কারণে ১৯০৬ সনের ৩রা অক্টোবর সিরাজগঞ্জের আঞ্জুমানে ইসলামিয়া শিরাজীর সংগে সম্পর্ক অস্বীকার করে একটি প্রস্তাব নেয়, এতে সমর্থক ছিলেন মেহেরুল্লাহ।[৩] তবে শিরাজীকে 'Paid Agent' হিসাবে মেনে নিতে কেউ কেউ অবশ্য সম্মত হননি।[৪] সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সের আহ্বান পর্যন্ত সিরাজগঞ্জের হিন্দুরা তাঁকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন[৫] এটা হয়ত অসত্য নয়, কিন্তু সেকারণে শিরাজী মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এটাও ঠিক নয়, গোঁড়া মুসলমানের মত গোঁড়া হিন্দুকেও তিনি আক্রমণ করতে ছাড়েননি। তাছাড়া মুন্সী মেহেরুল্লাহর এমন বক্তব্যও যথার্থ নয়, কেননা তিনি চিরকালই শিরাজীর —"বাগ্মিতা ও কবিত্ব প্রভাবের বিদ্বেষায় জ্বলিয়া পুড়িয়া শত্রুতা সাধন করিয়াছেন এবং তখনও — বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন এবং যথাসময়ে সাক্ষ্যও দিয়াছিলেন। ইনি স্বদেশী আন্দোলনের সময় গবর্ণমেন্ট পক্ষ প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন। সিরাজগঞ্জের অন্যতম স্বদেশ সেবক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধেও ইনি গবর্ণমেন্ট পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।[৬] —এই মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে বক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ব্যক্তির প্রতিযোগিতায় উভয়ের ঈর্ষার অন্যতম কারণ হতে পারে। সিরাজগঞ্জে এমন স্থানীয় ঈর্ষা ও বিরোধ বরাবরই ছিল।[৭] সুরেন্দ্র মোহিতের সিপাহে যাবার সময়ও এ বিরোধ প্রকাশিত হয়েছিল, এক পক্ষ যেমন তাঁকে সমর্থন করে, অন্য পক্ষ তেমনি বিরোধিতাও করে।

দুই

বয়কট আন্দোলনের পটভূমিতেই শিরাজীর রাজনৈতিক খ্যাতি বিস্তৃত হতে শুরু করে। অধিকাংশ মুসলমান বয়কটের পক্ষে ছিলেন, শিরাজী এর বিরোধিতা করেন বলেই তাঁর শত্রুপক্ষের হাতও শক্ত হয়। আর এসব কারণে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে মুসলমান সমাজে নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়ানোর জন্য সাহিত্যিক ও

১। সাপ্তাহিক পত্রে প্রাপ্ত ও জমাদ, পৃঃ ১৯৯-২৬০।
২। Public Letters from India, 1906, quoted, Muslim Community in Bengal, p.312.
Ibid, p.312.
৪। The Swadeshi Movement in Bengal, p.436.
৫। সাক্ষাৎকার, সৈয়দ ইউনুস উসমান শিরাজী পরিশিষ্ট, উল্লাপাড়া-সিরাজ।
৬। কারাকাহিনী–সাধনা, কার্তিক, ১৩২৮।
৭। (ক) শিরাজী-চরিত, পৃঃ ১০২-৩, ১২৫।
(খ) বাতায়ন, পৃঃ ৫০-৫১।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার পাশাপাশি সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষতি বাঙালার দিকেও মনোযোগী হতে হয়েছিল। এর আগামী সংখ্যা থেকেই ইনি লেখা নামের মধ্যে সৈয়দ ব্যবহার করতে, এছাড়া প্রথমে সিরাজী এবং পরে 'সিরাজী' ব্যবহার করেছেন। মিহির ও সুধাকর পত্রিকায় এ নিয়ে বিদ্রূপমূলক রচনা প্রকাশিত হয়। সিরাজী ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ছিলেন। মিহির ও সুধাকর পত্রিকার সঙ্গে ইসলাম প্রচারক পত্রিকার সম্পর্ক ভালো ছিল না বলে। সিরাজীকে নিয়েও মিহির ও সুধাকর বিদ্রূপাত্মক প্রকাশ করেছে। এসবের পরিণতি হল সিরাজীর নামের সমালোচনা।[১] বাঙ্গালার গোকিমপুর নিবাসী জনৈক শ্রী মোহাম্মদ এম-এন মাইন মিহির ও সুধাকর পত্রিকায় সিরাজীর নাম নিয়ে আলোচনা করেন। এটা সম্ভবতঃ লেখকের ছদ্ম-পরিচয়, তিনি লেখেন, "অধুনা আমাদের সিরাজগঞ্জ ও বিদ্যাবুদ্ধি ও কবিত্বে অনিন্দ্যসুন্দর হইয়া উঠিয়াছে সত্য, সিরাজগঞ্জের এক আধটি কবি লেখনী হইতে "অনলপ্রবাহ" প্রমুখ কবিতাপুঞ্জ বিনির্গত হইয়াছে সত্য কিন্তু তাই বলিয়া সেই কবি নিজে সিরাজগঞ্জের নামে পরিচিত হইলেন বা তাঁহার নামের দ্বারা সিরাজগঞ্জকে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ করিতে গিয়া সিরাজগঞ্জকে সিরাজ লিখিতে পারেন না। নিজে সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণ করিয়া সিরাজগঞ্জী পরিবর্তে সিরাজী লিখিতে পারেন না।" লেখক আক্ষেপ করেছেন, তাঁর পূর্ব পুরুষরা কেউ সিরাজ নগর থেকে এসেছেন কিনা, এসে থাকলেও তিনি সিরাজগঞ্জেই জন্মগ্রহণ করেন এবং "আমরা এই কবি-কুলপ্রদীপ মহাত্মাকে তাহার বাল্যকালাবধি সিরাজগঞ্জে দেখিতেছি কখনও বা ত্রিপুরার নবাব ফয়জুন্নেসা সাহেবার আটচালাতেও দেখিয়াছি", সুতরাং লেখকের মতে সিরাজীর নিজের পক্ষে সিরাজ নগর থেকে আসা অসম্ভব। বস্তুত, সমালোচক বাঙ্গালার ঠিকানা দিয়েছেন, কিন্তু সিরাজীর জমানায় খবর সমূহ যেভাবে পরিবেশন করেছেন তাতে অনুমান করে নেয়া যায়, [এটির] সিরাজীর অপরিচিত কেউ নন। সাইকেল, লেফাফা এবং অন্যান্য অনুকরণের সম্পর্কে আলোচনা করে লেখক দেখিয়েছেন, বাঙ্গালী কবির সিরাজী নাম গ্রহণ "যোগাবহ"। সুতরাং ইনি এটা অসার অবাস্তব দিয়েছেন। কেননা তিনি যখন নিজে একজন মস্ত কবি, "তখন তাঁহাকে অর্থোপার্জনের জন্য "সিরাজী" আখ্যা ধারণ করিতে হইবে না। সূর্য্যের প্রধান গুণ ২ সূর্য্য।" সিরাজীর নামের সঙ্গে আবুল মোহাম্মদ যোগ করাতেও লেখক আপত্তি করেছেন। কারণ "আবুল মোহাম্মদ অর্থাৎ মোহাম্মদের পিতা" পুত্রের প্রকাশের জন্য এটা অনেকে করে থাকেন।—"কিন্তু আমরা যতদূর জানি তিনি আবুল মোহাম্মদের [illegible]।—এমতাবস্থায় "আবুল মোহাম্মদ" আখ্যা গ্রহণ করিতে যাওয়াই বোধ হয় তিনি আবুল মোহাম্মদের

১। মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৪১০।

২। কিঞ্চিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, মিহির ও সুধাকর, ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩১১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতি বর্ণ না বুঝিয়া "আবুল মোহাম্মদ" একটা আড়ম্বর প্রণোদক উপাধি বলিয়া আনন্দ সহকারে উহা গ্রহণ করিয়াছেন।" সমর প্রবাহ প্রকাশের সময় যেখানেই মোহাম্মদ ছিল, এবং "কালক্রমে উহার পশ্চাতে আবুল শব্দটি সংযোজিত হইয়া আমাদিগকে "কৃতকৃত্য" করিয়া দুষিয়াছে। অতএব আবুল মোহাম্মদ নামটি সর্বাগ্রে বর্জনীয়।" লেখক বলেছেন, "শিরাজী" ও আবুল মোহাম্মদ" নিয়ে সংবাদপত্রে বহুবার আলোচনা হয়েছে, কিন্তু শিরাজী তা নিয়ে কখনো পরিবর্তন করেননি, "তিনি আপনাকে সিংহপুরুষ ভাবিতেছেন এবং তর্কবাগীশগণকে মূসাম বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন এবং নিজে যে একজন বাচাল তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন।" মিহির ও সুধাকর পত্রিকা এ আক্রমনের হাত থেকে শিরাজীকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসে ইসলাম প্রচারক পত্রিকা। মিহির ও সুধাকর পত্রিকার অনুবাদে "অযথা বাক্যব্যয় বর্ষণ" বলে অভিহিত করে একনে হামিদ লেখেন, "একবার তাহার নাম ধরিয়া খুবই 'হৈচৈ' পাড়া হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি এসমাইল হোসেন সিরাজী নিজের নামটি নষ্ট করায়, নিজের নামে সৈয়দ আখ্যা সংযোজিত করায় এবং সিরাজী নাম ধারণ করায় তাহাদের কি ক্ষতি হইয়াছে বা হইতেছে?"[১]

আদব-কায়দা শিক্ষা গ্রন্থে নাম-প্রকরণ আলোচনা প্রসঙ্গে শিরাজী বলেছেন,

"নামের শেষে জন্মভূমির যোজনা ইসলামের প্রথা, যাহা প্রচলিত আছে, তাহা আবশ্যক। ইহাতে জন্মস্থানের গৌরব ঘোষণা করা হয়। ইহা মাতৃভূমি প্রীতিরও উত্তম দৃষ্টান্ত।--কিন্তু পাবনা জেলার অন্তর্গত কেহ সিরাজগঞ্জে বা শাহজাদপুরে জন্মিলে সে পাবনাভী বলিয়া অভিহিত না হইয়া সে সিরাজগঞ্জী বা শাহজাদপুরী বলিয়াই অভিহিত হইবে। যেহেতু পাবনা অপেক্ষা সে সিরাজগঞ্জ বা শাহজাদপুর বেশী প্রসিদ্ধ।"[২]

নাম প্রকরণ সম্পর্কে এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী তিনি "সিরাজগঞ্জী" বলে অভিহিত হতে পারতেন, কেননা এটার পরপরই বলেছেন,--"আজকাল কেহ কেহ বাঙ্গালায় লিখিয়া খোন্দকার, মোল্লা, শেখ ইত্যাদি নামে পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা মূঢ়তা, মূর্খতা ও অজ্ঞতার লক্ষণ এবং জাতিধর্মের প্রতি গুরুতর বিদ্রূপাত্মক।"[৩]

এ বক্তব্যের আলোকে শিরাজী, শিরাজী নাম গ্রহণ করার কারণ প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন। মনে হয় যে, আদব-কায়দা শিক্ষা গ্রন্থটি রচিত হয় জনমনে আত্মপোলব্ধি করে থাকবার, এর আগে থেকেই তিনি নিজের নামের সঙ্গে সৈয়দ ও শিরাজী ব্যবহার করছিলেন, এ পরিপ্রেক্ষিতে আদব কায়দার সঙ্গে শিরাজীর উক্তির ব্যাপারে এক প্রকার অসংগতি সৃষ্টি হয়। তা সত্ত্বেও এটি সঙ্গে সৈয়দ ও শিরাজী ব্যবহার এবং

১। এয়াকুব হামিদ-পত্রাকাতরতা, ইসলাম-প্রচারক, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩১০।

২। আদব-কায়দা শিক্ষা, পৃঃ ১৮-১৯।

৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

পারিপার্শ্বিকতা বিচারে সম্ভবতঃ সিরাজী এটা দেখা যায়, পারিবারিক আভিজাত্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই তিনি সাবির পারস্যের সিরাজ নগরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন এবং নিজের পূর্ব নামের তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর, ১৯৩৪ সনে প্রকাশিত সিরাজী-চরিত গ্রন্থেও এটা দেখানো হয়েছে,[২] বানারসীর রচিত বংশতালিকাতেও এটা দেখা যাচ্ছে[৩]। সম্ভবতঃ আলাদা রাজনৈতিক সামাজিক ঈর্ষা থেকেই সিরাজীর পরিবারকে নিন্দিত করে তোলার প্রয়াস হয়েছিল, এরূপ প্রমাণ ইঙ্গিত পাওয়া যায় পুলিশ রেকর্ডে[৪]। এসব বিতর্কের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে সিরাজীর গুরুত্বের স্বীকৃতি রয়েছে।

তিন

মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সিরাজীর আত্মিক যোগ স্থাপিত হয়েছিল কিশোর বয়সে, এ ব্যাপারে তাঁর আদর্শ ছিলেন সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী ও দেওবন্দের শেখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান।[৫] মুসলিম বিশ্ব, বিশেষতঃ খেলাফতের কেন্দ্রস্থল তুরস্ক সম্পর্কে সিরাজীর রোমান্টিক আবেগ যুক্ত হয়ে গেছিল। এ পর্যন্ত রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি তুরস্ক ও ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্রস্থলগুলিতে মুগ্ধচারী থেকেছেন। বলকান যুদ্ধই সিরাজীর সামনে বিপুল সুযোগ এনে দিল তুরস্কের সংগে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের।

বলকান যুদ্ধের আগে থেকেই ভারতীয় মুসলমানদের ইংরেজ সম্পর্কে মোহভঙ্গ শুরু হয়েছিল এবং এ যুদ্ধে ইংরেজের ভূমিকা ভারতীয় মুসলমানদের কল্পনার জগত থেকে নির্মম বাস্তবে নিয়ে আসলো। ডাঃ আনসারীর নেতৃত্বে মেডিকেল মিশন গঠিত হয়, বাংলা থেকে চারজন যাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, এদের মধ্যে লটারীর ফলে সিরাজী একাই সুযোগ পান।[৬] তিনি তুরস্ক থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৫ই জুলাই, ১৯১৩।

তুরস্ক প্রবাসকালের বিবরণ সিরাজী তুরস্ক ভ্রমণ গ্রন্থে এবং কিছু ব্যক্তিগত পত্রে দিয়েছেন। ১৯১২ সালের ১৯ই ডিসেম্বর দিল্লী থেকে লেখেন, "আহারাদি ও পানের কষ্ট বিশেষ হইতেছে।"[৮] তুরস্কে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় বিভাগের ইনস্পেক্টর, প্রচুর পরিশ্রম করে আহতদের সেবা শুশ্রূষা করতে হত। তা সত্ত্বেও সতত

১। বর্তমানে ইহার বড় ... প্রায় ৪৭ বৎসর পূর্বে দাদাগণ ও প্রভৃতি সিরাজী মহোদয়ের বাল্যকালে বাস্তবপ্রিয়তা ও আত্মপ্রশংসা যে সকল সাধারণ দোষ পরিলক্ষিত অদ্যাবধি মনকারে ও [illegible] ক্রমে বিদূরিত হইলে, ইনি সর্বজনপ্রিয় নেতৃরূপে দর্শন হইবেন আশা করা যায়। (পাবনা জেলার ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ১২৩)। [illegible]

২। সিরাজী-চরিত, পৃঃ ২-৩।

৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮২।

৪। পুলিশ রেকর্ডে সিরাজীর পরিচয় দেয়া হয়: "The grandson of a constable of Police who married a prostitute". Fortnightly Report from Eastern Bengal and Assam, No. 14? T, 7 December, 1906, para 4. Quoted in The Swadeshi Movement in Bengal, p. 432.

৫। সিরাজী-চরিত, পৃঃ১৯-২০।

৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬-২৭।

৭। বাংলার পত্র সিরিজঃ অনুসন্ধান বিশারদ—আলোর দিশারী সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আলোর দিশারী, পৃঃ ৩।

৮। সিরাজী পত্রগুচ্ছ ॥ ১ম খণ্ড, ২৯শে আষাঢ়, ১৩৬৬।

উৎসবের মধ্যে তিনি সাগ্নিত্য পালন করেন।[১] তুরস্কে সোলতান ও পাশাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ২০শে জানুয়ারী, ১৯১৩ জাতীয় দলের এক সভায় ইংরেজীতে ভাষণ দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। লণ্ডনের Daily News পত্রিকাতেও এ বক্তৃতার বিবরণ প্রকাশিত হয়।[২] তুরস্ক সফর কালে আঙ্কারাতে প্রদত্ত বক্তৃতায় সিরাজী বলেন "মুসলমান সংখ্যায়, শক্তি ও বিজ্ঞান চর্চায় দিক দিয়া দুর্বল হইলেও ঈমানের দিক দিয়া দুর্বল নহে। আমরা সুদূর বাংলাদেশ হইতে ছুটিয়া আসিয়াছি। আমরা ভ্রাতৃবৃন্দদিগকে কখনই বন্ধপাশত্যাগ করিব না। প্রয়োজন হইলে তোমার মুসলিম বিশ্ব একত্রিত হইয়া আমাদের দুশমনদের মোকাবেলা করিব। বিশ্বময় ধনিক বিশ্বের ষাইট কোটি মুসলমানের এক জান, এক প্রাণ। আন্তর্জাতিক আইনে বিভেদ সৃষ্টি করিলেও আমরা এক সূত্রে গাঁথা। সুতরাং শত্রুকে ভয় করিবার কিছুই নাই। আমরা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে সংহত। তাই তুরস্কের বিপদ নিজেদের বিপদ মনে করিয়া সুদূর ভারতবর্ষ হইতে আমরা ছুটিয়া আসিয়াছি। ইউরোপবাসী শত্রুরা সতর্ক হও। সাবধান হও। মুসলিম আজও মরে নাই। জাতির জন্য কওমের জন্য রক্ত দিতে আমরা আজও কুণ্ঠিত নহি।" বক্তৃতার অংশবিশেষও সরকারী নির্যাতনের আশঙ্কায় জীবনীকার তাঁর সিরাজী-চরিত গ্রন্থে সেসময় মুদ্রিত করতে সাহস পাননি।[৩] সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীও এভাবে জাগরণের অগ্নিমন্ত্র প্রচার করেন।[৪] তুরস্কে তাঁর কাজের জন্য তিনি পুরস্কৃত হন।[৫]

দেশে ফেরার পর সিরাজী প্রায়ই সভাসমিতিতে তুরস্ক প্রত্যাগত পোশাক[৬] পরে যেতেন। সি, আর, দাসের সভাপতিত্বে বগুড়ায় অনুষ্ঠিত উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে যোগদানের জন্য সিরাজী এ পোষাক পরিধান করে উপস্থিত হন। সিরাজীকে শত্রুদেশের পোশাক পরিহিত দেখে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে হুকুম দেন, হয় সিরাজীকে এ পোশাক বর্জন করে এ সভায় থাকতে হবে, অন্যথায় সভা ছেড়ে যেতে হবে। সিরাজীর মনোবল ছিল [illegible] অপরিমিত, তিনি পোশাক খোলেননি কিন্তু সভা ছেড়ে চলে যান। বিভিন্ন পত্রিকায় ম্যাজিস্ট্রেটের এ বেআইনী আদেশকে নিন্দা করা হয়। স্টেটসম্যান মন্তব্য করেন,

The first thing to ask in this matter is What is a Turkomans dress? We are not aware of any official prohibition of the dress

---

১। সিরাজী পত্রগুচ্ছ॥৩॥ প্রাগুক্ত।
২। সিরাজী পত্রগুচ্ছ॥২॥ প্রাগুক্ত।
৩। এম সেরাজুল হক-সিরাজী সাহিত্যে প্যান ইসলামী ভাবধারা, অভিযান, ১ম বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৬৩-৬৪, পৃঃ ৪৪-৪৫।
৪। দ্রষ্টব্য "সমাজ ও সংস্কারক" সাপ্তাহিক রচনাবলী।
৫। পাবনা জেলার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (১৩৩৪) পৃঃ১২০, ঐ, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৪।
৬। সিরাজী-চরিত, পৃঃ ৩০ পরিশিষ্ট, একান্ন।

Dhaka University Institutional Repository

in question. Why then should Mr. French allowed himself to run amock ? Bogra is not even a non-regulation district where certain autocratic latitude is permitted to the local tin-gods.---But it is necessary to protest against this kind of eccentricity on the part of officials in the Mofussil."১

তুরস্ক প্রবাস সিরাজীর জীবনে একটি বিশেষ দিক পরিবর্তনকারী ঘটনা। তুরস্ক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বক্তা হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে যায়। সিরাজীর লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের জাতীয় চেতনাকে উপযোগী করে তোলা, সাহিত্যকে সে উদ্দেশ্যে তিনি ব্যবহার করেছেন। এদিক দিয়ে তুরস্কের সংগে বাস্তব সংযোগ নানা অর্থেই কল্যাণকর হয়েছিল।

তুরস্কে যেয়ে তিনি দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার মূল্য সম্পর্কে নতুনরূপ উপলব্ধি করেন। কৈশোরে একবার তুরস্কে যাবার ব্যর্থ প্রয়াসও করেছিলেন। তুরস্কে যেয়ে তাঁর স্বপ্ন যেমন সফল হয়, তেমনি তিনি বিবিধ বাস্তবের মুখোমুখী হয়ে পড়েন। তুরস্কে যাবার অর্থেই তাঁর বহু ঋণ ও ক্লেশের জন্ম হয়েছিল। দেশে পারিবারিক অর্থ সংকটের জন্য তিনি একবার ফিরে চলে আসবার প্রত্যাশীও হন।৩

সিরাজীর জন্মলগ্নে বাংলার পরাধীনতার প্রায় একশো তেইশ বছর পার হয়েছে, তুরস্ক তখনো স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রামরত। তুরস্কে যাবার অব্যবহিত পূর্বে অনলপ্রবাহ গ্রন্থের জন্য কারাবরণ প্রসংগতঃ স্মরণ করা যেতে পারে। সম্ভবতঃ একারণে তুরস্কে অবস্থান করেই তাঁর জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দৃঢ়তর হয়, বাঙালী মুসলমানদের নির্লিপ্ততাকে আঘাত করার জন্য তিনি নতুনভাবে সংকল্প নেন, এবং একই সংগে জাতীয় স্বাধীনতা ও মুসলমানের দুর্দশার কথা বলতে পেরেছেন। মধুসূদনের যেমন ধর্মান্তরিত মাইকেল সুদূর প্রবাসে বসে যেভাবে দেশকে আবিষ্কার করেছিলেন, সিরাজীও সে সুযোগ পান তুরস্কে গমনের পর।৪

-১। Bombay Chronicle, August 29, 1917.

২। সিরাজী-চরিত, পৃঃ ১০৪।

৩। সিরাজীর পত্র গুচ্ছ ॥৩॥, দরবার, ২৮শে আষাঢ়, ১৩৬৬।

৪। "হিন্দু দেশের মাটি হ'তে তোমার বাণিজ্য চাষ।/নহলে মনে যা ভাবো।পরাণেতে ভালবাসি। তোমার স্মরণে যাবো। চোখে বহে অশ্রুধার।/কাশ্মিনী বঙ্গভূমি মা আমার মা। আমার।" দ্র, সিরাজী-চরিত, পৃঃ ১০৮-০৯।

৫। [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

চার

তুরস্ক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাজনীতি ক্ষেত্রে আরেকবার বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন, ১৯২১ সালে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময়।[১] তিনি সিরাজগঞ্জ কংগ্রেস কমিটির ও খিলাফত কমিটির সভাপতি ছিলেন। খিলাফতের বিপদকে সিরাজী অত্যন্ত গুরুত্বের সংগে গ্রহণ করেন এবং প্রাদেশিক খিলাফত কনফারেন্সে -

" The most momentous resolution of the session was moved by Syed Ismail Hossain Shiraje of Shirajganj to the effect that a volunter army of 10 thousand Mujahidins be raised from Bangal and sent to Asia Minor to help the Angora Government. The resolution was passed amid scenes of frenzied enthusiasm and a subcommittee was formed to give practical effect to the resolutiond and to faise suitable sum of money to equip and maintain the army at its own cost at Angora ."[২] এই একই বৈঠকে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি গৃহীত বিলাতী দ্রব্য বর্জনের সিদ্ধান্তও অনুমোদিত হয়। ভলান্টিয়ার প্রেরণের ব্যাপারে কমরেড পত্রিকায় মওলানা শওকত আলীর প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেন[৩] এবং আসামের গোয়ালপাড়ায় কয়েকটি সভায় তাঁর ভলান্টিয়ার প্রেরণ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৪] ১৯২১ সনের ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে সেপ্টেম্বর সিরাজগঞ্জে তিনটি জন-সভায় সভাপতির বক্তৃতায় তিনি "বিদেশী দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন, স্বরাজলাভের সোজা পথ, খেলাফতের পুনরুদ্ধার, আঙ্গোরায় সাহায্য প্রেরণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভায় পিকেটিং চালাইবার জন্য এক বিশেষ স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হয়। "সভার সাফল্য সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ সংবাদে বসুমতী মন্তব্য করেছে, "আশা করা যায়, এখানে অবিলম্বেই বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় এমন কি আমদানী পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইবে।"[৫] এর পরপরই নোয়াখালীর চাঁদপুর ও ভাতরায় সভায় কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বক্তৃতায় " He clearly made the public understand that without these we could not attain sqaraj and could not get rid of the oppression of the government.[৬]"

সিরাজীর বক্তৃতার ফলেই পাবনার বরদানগর থেকে 'দারুণ অভাবের সময়ও' আঙ্গোরা কাজের জন্য কিছু টাকা আদায় হয়,[৭] এবং জলপাইগুড়ি জেলার বোদা বন্দর সন্নিহিত এলাকায় মহিলাদের একটি

১। খিলাফত প্রসঙ্গের জন্য, পূর্বে, পৃঃ [illegible]-২৮।
২। The Servant, August, 13, 1921.
৩। তুরস্ক ভ্রমণ, পূর্বাভাষ, পৃঃ ৩।
৪। Amrit Bazar Patrika, 26th August, 1921.
৫। বসুমতী, ২রা অক্টোবর, ১৯২১।
৬। The Servant, 5th October, 1921.
৭। দৈনিক মোহাম্মদী, ২০শে বৈশাখ, ১৩২৮।

Dhaka University Institutional Repository

সভায় তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আঙ্গোরা ফান্ডের জন্য কিছু টাকা দান করেন।[১] সিরাজগঞ্জ কংগ্রেস ও খিলাফত সভাপতি হিসাবে সিরাজী একটি প্রচারপত্রে বলেন, "এই ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদে যেখানে তোমার সর্বস্ব দেওয়া ফরজ সেখানে মাত্র এক মুষ্টির রোজগার আঙ্গোরা ফান্ডে দিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। ইহাও যদি তুমি না দাও তাহা হইলে বেঈমান ও কাফের হইয়া যাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।---আশা করি, কোরবানির চামড়ার অর্দ্ধেক টাকা, আকাতের সমস্ত টাকা এবং অনুন্ত:পক্ষে প্রত্যেক এক মুষ্টিতে ও গরীবেরা একদিনের রোজগার আঙ্গোরা ফান্ডে দান করিবেন।"[২]

সিরাজী আঙ্গোরার জন্য সাহায্য ফান্ডকে আন্দোলন আকারে গ্রহণ করেন। কেবল তাই নয়, খিলাফত সমস্যার সঙ্গে নিজেকে এমনভাবে জড়িত করেন যে এক পর্যায়ে এমন চিন্তাও করেছেন--- "কাবুলের মহামান্য আমীর বাহাদুর জেহাদ ঘোষণা করিলে তাহার পতাকাতলে সমবেত হইতে হইবে।" তাঁর এ ধরনের মানসিকতার আভাস আগেও পাওয়া গেছে।[৩] মওলানা মহম্মদ আলীর চিন্তায়ও এটা ছিল।[৪] কিন্তু আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে সিরাজীর সম্পর্ক নষ্ট হয়। কেন্দ্রীয় খেলাফত কমিটির নিষ্ক্রিয়তা বর্জনের ব্যাপারে মওলানা শওকত আলীর কাছে চিঠি দিয়ে সিরাজী নিরাশ হন।[৫] সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে কলিকাতা গড়ের মাঠে মুসলমানদের সভায়, "হিতৈষী" পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সভার বড় অক্ষরে এ ধরনের শিরোনাম ছাপা হয়। 'মহাগোল, বিশৃঙ্খলা ও মুসলমানের দুর্ভাগ্য নিদর্শন' হিসাবে বলা হয়, সিরাজী বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন শুরু করলে 'ছায়া বিভ্রাট' নিয়ে বিতর্ক দেখা দিল। সিরাজীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন মওলানা মহম্মদ আলী, আকরম খাঁ প্রমুখ এবং "সিরাজী সাহেবও অতোধিক বাগ্মিতায় বলিলেন, "হিন্দুস্থানীদের ধৃষ্টতা সহ্য করা হইবে না। এই বাঙ্গালী মুসলমানের সভায় তাহাদের কথা বলিবার কোন অধিকার নাই।" আর কি, তুমুল বেগে মহাকোলাহল আরম্ভ হইল। আলেম ও মুহাজেদ পরস্পরের উপর মধুমাখা বাক্যবৃষ্টি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। গভর্ণমেন্টের খোশামদ, হিন্দুর গোলাম, পাজের দল প্রভৃতি মধুমাখা বাক্যের স্রোত বহিয়া গেল। সভাপতি বহু কষ্টে সভায় শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন।"[৬] বাঙালীর, বিশেষভাবে মুসলমানের দুর্দশা তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছিল বলে তাদের দুর্দিনে তিনি সবার উপরে স্থান দেন। এ কারণে নির্দ্বিধায় কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কিংবা

১। মোসলেম জগৎ, ১লা কার্তিক, ১৩২৯।
২। খোদার ডাক-ইসলামের হাদেম, সৈ. দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী-কংগ্রেস ও খেলাফত সভাপতি, সিরাজগঞ্জ, ৮ই শ্রাবণ, সন ১৩২৯।
৩। মোহাম্মদী, কার্তিক বই ৫৫৩-ক।
৪। আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃঃ ৫৫।
৫। পূর্বে, পৃঃ ২৮।
৬। মোসলেম জগৎ-১৭ই ও ২৪শে ভাদ্র, ১৩৩২।
৭। হিতৈষী, কার্তিক বই, ৫৫৩-ক।

Dhaka University Institutional Repository

সেটুকুকে মেনে নেননি। খিলাফত কমিটির সঙ্গে যেমন বিরোধ করেছেন, সি. আর দাশের বেঙ্গল প্যাক্টের[১] ব্যর্থতা ও সে ব্যাপারে মনোমালিন্যকেও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাই বলে সিরাজগঞ্জের প্রাদেশিক সম্মেলনে বিরোধিতা এবং যোগদানের অক্ষমতার অজুহাতে সিরাজী দাশের মৃত্যুতে শোকাহত নন। এ সময় শিক্ষিত হিন্দু কর্তৃক সিরাজীর বিরোধিতা এবং অনেকটা সেকারণেই এক শ্রেণীর মুসলমান কর্তৃক সিরাজীকে সমর্থনের ফলে এটা দুর্ভাগ্যের আকৃতি পেয়েছিল। সিরাজী তাঁর স্বধর্মীদের দুঃখ মোচন করে অগ্রসর হিন্দুর সমান করতে চেয়েছিলেন।

পাঁচ

সিরাজী তাঁর জীবদ্দশায় কংগ্রেসের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে কোন না কোন উপায়ে যুক্ত ছিলেন, কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু সিরাজী স্বাধীনচিত্ত ছিলেন বলে রাজনীতির ক্ষেত্রে ভিন্নমত থাকলে তা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন।

বেঙ্গল প্যাক্টকে কেন্দ্র করে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান যেমন সাময়িক পরস্পর কাছাকাছি আসে তেমনি এক শ্রেণীর হিন্দুর স্বার্থান্বেষী বিরুদ্ধাচারণের ফলে এর ব্যর্থতা বিশেষভাবে মুসলমানদের হতাশ করে তোলে। সিরাজীর রাজনৈতিক জীবন এর মধ্য দিয়ে কিভাবে আন্দোলিত হয়েছিল তারও পরিচয় পাওয়া যায় সমকালীন বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মধ্যে। সিরাজী মধ্যপন্থী ছিলেন, মধ্যপন্থী রাজনীতিকরা কাউন্সিলে প্রবেশের জন্য উৎসাহ দেননি, আবার বাধা দেওয়া সমর্থন করেননি। "এতৎসম্বন্ধে আমরা তোমাদিগকে এইটুকু বলিতে কুণ্ঠিত নহেন যে, যথাসম্ভব স্বদেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহী খোশামোদজীবি প্রার্থীগণের পরিবর্তে স্বাধীনচেতা দেশের মুক্তিকামী ও প্রজার পক্ষপাতী লোকদিগকেই ভোট দেওয়া কর্তব্য। কারণ কংগ্রেস ও খেলাফত শত চেষ্টা করিলেও যখন কাউন্সিল বর্জন সম্ভবপর হইবে না, যে কোন শ্রেণীর কতকগুলি লোক যাইয়া কাউন্সিল জুড়িয়া বসিবেই, তখন তাহাতে মন্দের পরিবর্তে ভাল লোক যান তজ্জন্য পরামর্শ দেওয়া প্রত্যেক দেশহিতৈষীর কর্তব্য।"[২] মধ্যপন্থীদের মধ্যে সিরাজী ছাড়াও মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রমুখ ছিলেন। কাউন্সিলে গমন সম্পর্কে সিরাজীর নিজেরও কিছু দুর্বলতা ছিল, কাউন্সিলে যেয়ে সমাজের জন্য কিছু কল্যাণমূলক কাজ করা সম্ভব বলে সিরাজী মনে করতেন। সেকারণে যাঁরা কাউন্সিলে যেতেন তাঁদের সম্পর্কে সিরাজীর প্রত্যাশা ছিল অনেক, আবার তাঁদের ব্যর্থতায় তাঁর মনে দাগ কেটেছিল অনেক বেশী। পাটচাষীদের দুর্দশা মোচনের জন্য কাউন্সিল

১। পূর্ব, পৃঃ ২৮১

২। মোসলেম, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যদের ভূমিকা রাখে, কিন্তু তিনি দেখেছেন, "যে ব্যক্তি জীবনে কখনো কোন জাতির কথা ভাবে নাই এমন লোকও কাউন্সিলে যায়। নিজের স্বার্থই যাহার জীবনের চরম ও পরম কার্য্য, টাকার জোরে তাহারাই দেশের নেতা সাজে। তাহার ফলে দেশ ও জাতি দিন দিন অতলেই ডুবিতেছে।"[১] এর পর ১৯২৯ সালে তাঁকে কাউন্সিলে সদস্য পদের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তিনি নির্বাচনে পরাজিত হন[২], এবং তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।[৩] নির্বাচনের পর তাঁর বিরুদ্ধে চার পাঁচটি মিথ্যা মামলা হয়। সিরাজী ক্ষুব্ধ লেখেন, "অধিক যাহাতে সিরাজগঞ্জে বাস করিতে না পারি তাহার চেষ্টা চলিতেছে।"[৪] এখানেও সিরাজগঞ্জের স্থানীয় দলা প্রতিফলিত হয়েছে মনে হয়।

সিরাজীর রাজনৈতিক জীবনে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে একটি বড় সংকট দেখা দেয় ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সকে কেন্দ্র করে। এর আগেই পাট চাষ নিয়ে সিরাজগঞ্জের হিন্দু মহাজন ব্যবসায়ী শ্রেণীর সঙ্গে সিরাজীর সম্পর্কে ফাটল দেখা দিয়েছিল। দরিদ্র কৃষকদের রক্ষার জন্য তাঁর প্রয়াস ক্রমেই রূপ নিয়েছিল হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম হিসেবে। আসলে মহাজনের শোষণের হাত থেকে দরিদ্র মুসলমান কৃষকশ্রেণীকে রক্ষার প্রয়াসও একই কারণে বাধ্যতামূলকভাবে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিপ্রণোদিত বলে মনে হতে পারে।[৫] কিন্তু দরিদ্র মুসলমানদের ওপর নির্যাতন থেকে তিনি বিচলিত না হয়ে পারেননি।

স্বরাজ্য প্যাক্টের ব্যাপারে একশ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুর বিরোধিতা সিরাজীকে আহত করেছিল। তিনি সম্ভবতঃ সি,আর,দাসের নিকট থেকে সাহসী ভূমিকা আশা করেছিলেন। একারণে তিনি একই সঙ্গে সি,আর,দাস ও শিক্ষিত হিন্দুর প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁর এসব বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটে প্রথমে পাট চাষকে কেন্দ্র করে, এটা চূড়ান্ত রূপ পায় সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সের সঙ্গে মতানৈক্যে। একই সময় সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মোসলেম মহাসভার আয়োজন হয় এবং এখানে সিরাজী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১৩৩০ সালের ২৬শে ফাল্গুন সিরাজগঞ্জের এক জনসভায় সভাপতি হিসেবে তিনি সি,আর,দাসের সমালোচনা করেন। সিরাজগঞ্জের হিন্দুরা প্যাক্ট সমর্থন না করায় এবং তারা মুসলমানদের উপেক্ষা করার ফলে দুঃখ প্রকাশ করে এ মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির আসন্ন বার্ষিক

১। প্যাক্টের বিশেষ কথা—দৈনিক ছোলতান, [illegible], ১৩৩০।
২। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, পৃঃ ১০-১১।
৩। [illegible]—এর পাণ্ডুলিপি থেকে। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী স্মরণিকা, পৃঃ ৫৭।
৪। সিরাজী-চরিত, পৃঃ ১২৩-২৪।
৫। পূর্বে, পৃঃ ৪৪-৪৬।
৬। [illegible] বাঙালী মোসলমান, মোহাম্মদী, ১০ই পৌষ, ১৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশনে সিরাজীকে অগ্রাহ্য করতে পারলে মুসলমানরা প্রাদেশিক কনফারেন্সে যোগদান করবেন না। মুসলমানদের বিজাতির নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতে ও বিজাতির বাড়ীতে দাস কাজ করতে নিষেধ করা হয় এবং নিজেদেরকেই স্বর্ণকার, কর্মকার, কুম্ভকার, বারুই গোয়ালা, মোদক, সূত্রধর প্রভৃতি ব্যবসা অবলম্বন করার জন্য বলা হয়।[1]

বসুমতী পত্রিকায় সিরাজগঞ্জে হিন্দু মুসলমান মনোমালিন্যের কারণ হিসাবে বলা হয় (ক) স্থানীয় কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটির সভাপতি সিরাজীকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি না করায় (খ) বেঙ্গল প্যাক্ট হিন্দুরা সমর্থন না করায় ও (গ) কনফারেন্সের মেম্বর ফি দরিদ্র মুসলমানদের জন্য পাঁচ টাকা না করায় সিরাজগঞ্জের মুসলমানরা হিন্দুদের জব্দ করার জন্য সমস্ত পাট একচেটিয়া করে এলাহিয়া পাট কোম্পানী গঠনের চেষ্টা করছে।[2]

সি, আর, দাসের প্রতি সিরাজীর বিরূপ থাকার সম্ভবতঃ অন্য কারণও ছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের 'জাতীয় অধিকার বিষয়ক কয়েকটি প্রস্তাব' স্বরাজদলভুক্ত সদস্যরা বিরোধিতা করলে পাবনা ও সিরাজগঞ্জের বিশিষ্ট মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন।[3] এ ছাড়া সিরাজীর মতে, তাঁর পরামর্শে সি, আর, দাস কাবুলে কংগ্রেসের শাখা খুলতে সম্মত ছিলেন কিন্তু লালা লাজপত রায়ের বিরোধিতার ফলে তা সম্ভব হয়নি। লালা লাজপত রায় অভিযোগ করেছিলেন, কংগ্রেস কাবুলের আমীরের দ্বারা ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করেছে।[4] লালা লাজপত রায়ের বিরোধিতার কারণও ছিল, খেলাফত নেতা মওলানা মহম্মদ আলী এবং সিরাজী প্রমুখ আফগানিস্থানের আমীরকে অভ্যর্থনা জানাতে চেয়েছিলেন। এজন্য হিন্দু সমাজ খুশী হতে পারেনি।[5] এ পরিস্থিতিতে শিক্ষিত হিন্দু কর্তৃক সি, আর, দাশের প্রচন্ড বিরোধিতা এবং সি, আর দাসের ব্যর্থতা সিরাজীর মনে দাগ কেটেছিল। প্রচারক জীবনের প্রয়োজনে নির্যাতিত মুসলমানদের সংশ্রব এবং স্বার্থ রক্ষা করা ছাড়া সিরাজীর অন্য উপায়ও ছিল না, সিরাজীর বিরুদ্ধাচারণকারী মুসলমানরা এ অবস্থায় বিরোধ ভুলে যেয়ে সিরাজীকে সমর্থন দান শুরু করলেন এবং সিরাজীকে কেন্দ্র করেই সিরাজগঞ্জে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেকার বিভেদ স্পষ্টই পূর্ণতা পেল। কিন্তু সিরাজীর প্রতি গোঁড়া মুসলমানদের সমর্থন লাভ সত্ত্বেও তিনি তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে সরে

১। ছোলতান, ১৬ই চৈত্র, ১৩৩৩।
২। ছোলতান, ৩রা ফাল্গুন, ১৩৩৩।
৩। ইসলাম দর্শন, শ্রাবণ, ১৩৩১।
৪। আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃঃ ৫৫-৫৬।
৫। পূর্বে, পৃঃ ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

দাঁড়াননি। সোলতান মন্তব্য করেছে, সিরাজীর যোগ্যতা আছে কিন্তু তিনি কোন পদের জন্য লালায়িত নন। রাজনীতিতে তিনি হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি রক্ষার চেষ্টা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়ে আসছেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে যে কোন সম্প্রদায়ের ত্রুটি সংশোধন করে দেবার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের জন্য দশ টাকার পরিবর্তে পাঁচ টাকা চাঁদা হিন্দু মুসলমান সকলের জন্যই, এতে সকল সম্প্রদায়েরই অধিক সংখ্যক সদস্য যোগদানের সুযোগ পাবেন। এছলামিয়া পাট কোম্পানী গঠিত হলে ও ব্যবসা বাণিজ্যে মুসলমানের অগ্রগতি হলে হিন্দুর সেজন্য খেদের কিছু থাকতে পারেনা। কেননা মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা হিন্দু মুসলমান সকলকেই নির্বিশেষে শোষণ করছে এবং "বাঙালী হিন্দুরা পাটের ব্যবসায় একচেটিয়া করিতে পারেন নাই, বরং কিছুই করিতে পারেন নাই। তাহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রণোদিত হইয়া যৌথ কারবারের পত্তন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন—এরূপ ধারণা ভুলই পরিচয়। আমরা বলি—দেশের নেতৃবর্গ এরূপ অপ্রীতিকর বিষয়ের সমালোচনায় বিষ আনয়ন করিবেন। জাতি-বিদ্বেষ বীজ বপনের সময় এই নয়।"[১]

দুই

প্রথমত: সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা পাট চাষ ও কারবার সম্বন্ধে শিক্ষিত হিন্দু কর্তৃক বেঙ্গল প্যাক্টের বিরোধিতা ক্রমেই রাজনৈতিক রূপ নিল এবং সিরাজগঞ্জের হিন্দু মুসলমানের সমস্যা বিভক্ত হয়ে গেল। সম্ভবতঃ, যেমন প্যাক্টের বিরোধিতাকারী সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সের বিরোধিতা করেছেন তেমনি আক্রমণী মুসলমানরা প্রথম থেকেই এর বিরোধী ছিলেন। এ পরিস্থিতিতে ভারসাম্য রক্ষা করে চলার দায়িত্ব ছিল সিরাজীর হাতে। সেজন্য কনফারেন্সের উদ্যোক্তাদের প্রথম কাজ ছিল কনফারেন্সের বিরোধিতা না করার ব্যাপারে সিরাজীকে সম্মত করানো। অনেক বড় বড় নেতা সিরাজগঞ্জে এসে সিরাজীর সঙ্গে দেখা করেন, অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান, সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সিরাজী নিরপেক্ষ হয়ে যাওয়াতে সম্মেলন বিরোধী চক্রান্ত সফল হয়নি।[২]

সিরাজী প্রাদেশিক সম্মেলনের বিরোধিতা করেননি, কিন্তু যোগও দেননি। প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। এখানে স্থানীয় মুসলমান বেশী যোগ দেননি, তাঁরা সমবেত হন একই সময়ে সিরাজগঞ্জের অন্য একটি স্থানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মোসলেম মহাসভার অধিবেশনে।

১। সোলতান, ৩রা ফাল্গুন, ১৩৩[illegible]

২। (ক) আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃঃ ৫৬-৫৭।

(খ) কেউ কেউ বলেছেন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন [illegible] জে. চৌধুরী। দ্রষ্টব্য, সিরাজী-চরিত, পৃঃ ১৬১।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে প্রায় কুড়ি পঁচিশ হাজার মুসলমান যোগ দেন এবং প্রায় পাঁচ হাজার মুসলমান যুবক ভলান্টিয়ার রূপে কাজ করেন। কাউন্সিল সদস্য খান বাহাদুর মৌলবী মোশাররফ হোসেন সম্মেলনে সভাপতি রূপে নির্বাচিত হন। এ সভায় "মুসলমানদের জাতীয় স্বার্থ ও দাবী-দাওয়ার সমর্থনসূচক ১৫ টী প্রস্তাব পাশ"[১] হয়। স্মরণীয়, এর পরও সিরাজী তাঁর রাজনৈতিক আদর্শে অবিচল থেকেছেন এবং সিরাজগঞ্জ থেকে ৩১শে জানুয়ারী ১৯২৫ সংবাদ দেওয়া হয়েছে – "The first resolution (by)[২] Khan Bahadur Choinuddin to oppose the obstractive tactics of the swarajya party in the council was opposed by the redoutable Moulana Shiraje, backed by Moulavis Ashraf Ali and Khan Abul Monsur Illahi Buksh ---the resolution was negetived by an overwhelming majority."[৩]

সামাজিক রাজনৈতিক যে কোন সমস্যাকে সিরাজী বস্তুর প্রয়োজনের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন, এবং সেভাবেই গ্রহণ কিংবা প্রতিবাদ করেছেন। এটাকে অনেকে সিরাজী চরিত্রের বৈপরীত্য মনে করেছেন, এবং Forward পত্রিকাও তাঁকে Redoubtable Moulana বলেছে। ইসলাম দর্শন পত্রিকা এর আগে সিরাজীর ধর্মবোধ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিল[৪], কিন্তু মোসলেম মহাসভার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের বাহিরে যখন প্রকাশ পাওয়ায় সিরাজীর প্রশংসাসূচক সংবাদ পরিবেশন করেছে, মহাসভায় প্রদত্ত তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতাও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছে।[৫] Forward পত্রিকার মন্তব্য দেখে মনে হয়, সিরাজী মোসলেম মহাসভার মধ্যে বিলীন হয়ে যাননি, এবং মহাসভায় যোগদান করেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। এর পরে ১৯২৫ সালের ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনেতে সিরাজী তাঁর পূর্বের রাজনৈতিক বক্তব্য আরো স্পষ্ট রূপে উত্থাপন করেন, তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারীদের ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটে।[৬] একই সময়ে এ,কে,ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফরিদপুর মোসলেম কনফারেন্সে স্বরাজী মুসলমান প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যোগ দেন, কিন্তু তাঁকে আর কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে না। এ কনফারেন্সে গান্ধী ও সি,আর দাস আসেন, গান্ধী বক্তৃতাও করেন।[৭]

১। ইসলাম-দর্শন, শ্রাবণ, ১৩৩১।
২। প্রথম বন্ধনীতে 'by' আমাদের সংযোজন।
৩। Forward, 1925, ফেব্রুয়ারী, ৫৫০-খ।
৪। পূর্বে, পৃঃ ৮০, এবং বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য।
৫। ইসলাম দর্শন, শ্রাবণ এবং ভাদ্র, ১৩৩১।
৬। সিরাজী-চরিত, পৃঃ ১৬২।
৭। ইসলাম দর্শন, বৈশাখ, ১৩৩২।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৭ সনের ২৫শে অক্টোবর সিরাজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মোসলেম তরুণ সংঘের সভায় সুভাষচন্দ্র প্রমুখের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তবংশীয় তরুণদের বিনা বিচারে ও অযৌক্তিক নির্যাতনমূলক কারণে আটক রাখার নিন্দা করা হয় এবং এর বিরুদ্ধে সকলকে প্রতিবাদ জানাবার জন্য আহবান জানানো হয়।[১]

১৯২৮ সনের ১৫ ও ১৬ই আগস্ট কলিকাতার আলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গীয় কর্মী সম্মেলনে সিরাজী তাঁর সভাপতির অভিভাষণ দেন, এ সভায় রাজবন্দীদের মুক্তি, স্যার আমীর আলীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ, প্রভাবতী দাশগুপ্তার গ্রেপ্তারে কলিকাতা পুলিশের কাজের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে তিনটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[২] পরের দিন দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির বক্তৃতায় ও সিরাজী বলেন, প্রজাস্বত্ব আইনে প্রজার স্বার্থ উপযুক্তভাবে রক্ষিত না হলে প্রজা কিছুতেই তা মানবে না এবং বাংলায় বারদৌলীর ঘটনার পুনরাভিনয় আরম্ভ হবে। সভায় গৃহীত অন্যতম প্রস্তাবে কংগ্রেসকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত পথ নির্দেশের জন্য, স্বরাজী সদস্যদের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাস্বত্ব আইনে প্রজার স্বার্থ রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে আহবান জানানো হয়।[৩] ১৯৩১ সনে আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব করার সময় তিন মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।[৪] এসময় আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে তাঁর সংগে আর যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে মৌলবী শামসুদ্দীন, আবু হোসেন সরকার, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মৌলবী মুজিবর রহমান, সুভাষচন্দ্র বসু, সিরাজী-চরিত গ্রন্থের লেখক এম, সেরাজুল হক অন্যতম।[৫]

মৃত্যু

কারাবাস থেকে মুক্তির পর তিনি আর বেশী দিন বেঁচে থাকেননি। তাঁর মৃত্যুর পর পত্রিকায় পরিবেশিত সংবাদ ও বিভিন্ন মনীষীর প্রেরিত শোকবাণীর মধ্য দিয়ে সিরাজীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন লক্ষ্য করা যায়। পি, সি, রায় একটি শোকসভায় বলেন - "He was a genuine Bengalee who made no distiction between Hindus and Mohammadans. Now-a-days most of the young educted Mohammadans were of nationalist outlook. Among the pioneers whose examples were responsible for mentality of young Mohammadans was the late Moulana Shirajee Shabib."[৬]

১। Forward, 2nd November, 1927.
২। দৈনিক বসুমতী, ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৩৫।
৩। দৈনিক বসুমতী, ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৩৫।
৪। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, পৃঃ ১১।
৫। এম, সেরাজুল হক-আমার বন্দী জীবন, অভিযান, ৭ম বার্ষিক সংখ্যা, ১৯৬০-৬১, পৃঃ৪০-৪৪।
৬। সিরাজী-চরিত, পৃঃ ১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

সুভাষচন্দ্র বসু যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, বসন্ত মজুমদার, গিয়াসউদ্দীন, শামসুদ্দীন, কামিনী দত্ত, জ্ঞানাঞ্জন, প্রবাসীর পত্রিকার সম্পাদক মওলানা আকরম খাঁ খান, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মুকুন্দ দাস, মৌলবী ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, আনন্দবাজার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, মোহাম্মদী সম্পাদক মওলানা নজির আহমদ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ভূপতি মজুমদার, কাজী আহমদ আলী এনামাবাদী, মোয়াজ্জীন কবির, নরেন্দ্রকুমার গুহরায়, গোলাম মাদ্দুদা মোলানী, কবি কাসেম আলী মিয়া প্রমুখ মনীষী ছাড়াও মোহাম্মদী, হানাফী, নায়ক, আনন্দবাজার পত্রিকা, সুলতান, বঙ্গবাণী, Amrita Bazar, Liberty, Advance – প্রভৃতি পত্রিকা তাঁর গুণ কীর্তন করেন।[১৪] সাধারণভাবে যেসব কথা কমবেশী সবাই উচ্চারণ করেছেন তা হল মুসলমান সমাজে সে সময় এরকম নেতা খুব আর কেউ ছিলেন না। প্রতিভা ও যোগ্যতার অভাব ছিল না বলে রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি মুসলমান সমাজের উপযুক্ত সম্মান পাননি। মনেপ্রাণে তিনি ভারতের স্বাধীনতা ও হিন্দু মুসলমানের মিলনকামী, সক্রিয়, সচেতন ও নির্ভীক রাজনীতিক, নির্যাতনকে ভয় পাননি, আদর্শ থেকে সরে যাননি, নিজের সমাজের কুসংস্কার ও সীমাবদ্ধতাকে আঘাত করেছেন।

Amrita Bazar Patrika বলেছে, "He was a pious Musalman but his loyalty to his religious faith did not stand in the way of his being , on the foremost workers in the nationalist cause. His death at present moment, where the country requires more than ever the services of every moslem nationalist is a great loss to her."

Liberty পত্রিকা বলেছে, "A nationalist to the marrow of his bone he was equally proud of Islamic civilization and culture. He realized that what is known to-day as Indian culture was the synthesis of more than one culture. He identified himself with the congress and all national movements for political freedom and uplift of the people."

Advance পত্রিকা বলেছে, "Serajganj is mourning and Bengal will deeply regret his demise at a time when efforts are being

১৪ বিস্তৃত বিবরণের জন্য, সিরাজী-চরিত, পৃঃ ১৮০–১৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

made to excite ill feelings between communities by wild speeches and persistent press propaganda."

সিরাজীর রাজনৈতিক জীবনের মূল সুর হল স্বাধীনতা, অর্থাৎ সকল প্রকার অধীনতা থেকে মুক্তি। এ অধীনতা যেমন রাজনৈতিকভাবে বিদেশী শক্তি ইংরেজের নিকট থেকে, তেমনি অর্থনৈতিকভাবে স্বদেশীয় জমিদার মহাজনদের নিকট থেকে। এ ব্যাপারে সকল সম্প্রদায়ের জমিদার মহাজনকেই তিনি প্রায় সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন। সংগঠন, যৌথ কোম্পানী ইত্যাদির উপর তিনি জোর দিয়েছেন, ব্যক্তিগত মালিকানায় সম্পদ পুঞ্জীভূত করার চেয়ে এজমালী ব্যাঙ্ক, জাতীয় ধনভাণ্ডার, বায়তুল মাল ফান্ড, ইত্যাদির দিকেই তাঁর উৎসাহ ছিল বেশী।[১] মুসলমান সমাজের কল্যাণের প্রতি তাঁর অত্যধিক আগ্রহ ছিল, কিন্তু তিনি সাম্প্রদায়িক হিন্দু কি মুসলমান কাউকেই সহ্য করতে পারেননি।

রাজনীতি ও প্রচারকর্মের সংগে যুক্ত থেকে সিরাজী সাধারণ মানুষের কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। প্রচারক জীবনে বনজঙ্গলে, নদীর বুকে, সাধারণ মানুষের আতিথ্য নিয়ে অবস্থান করে দেশের অবস্থা অনুভব করেছেন। সাধারণ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে যেমন দেখেছেন আত্মনির্যাতনমূলক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, তেমনি জমিদার মহাজনের অর্থনৈতিক শোষণের হয়ে বাকহীন। বক্তৃতায়, রাজনীতিতে, এমন কি সাহিত্য রচনায়ও তিনি তাঁদের মুখে ভাষা তুলে দেবার চেষ্টা করেন। সিরাজীর বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ ঘটেছিল এদেরই মধ্যে। সমস্যাসমূহ যেমন পরস্পরবিরোধী এবং এক রকমের নয়, সিরাজীর প্রতিক্রিয়াও তেমনি এক রকমের হয়নি এবং অনেকটা এ কারণে তাঁর জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে কোথাও কোথাও সামান্য অসংগতি এসেছে। সিরাজী রোমান্টিক আদর্শবাদী ছিলেন বলে অসংগতিকেও স্বাভাবিকভাবে নিজের মধ্যে স্থান করে দিয়েছেন। সাহিত্য ও মানুষের রাজনীতি বাহ্যিকভাবে এক হয়নি, কিন্তু তাঁর অন্তরের মধ্যে এসে মিলেছিল। সিরাজীর মধ্যে সেই মূল বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে অবস্থান করে সমকালীন অনেক জাত্যভিমানী মুসলমানের মত একদিকে হিন্দু নেতৃত্ব, অন্যদিকে বাঙালী ও অবাঙালী মুর্শিদদের মধ্যে আন্দোলিত হয়েছিলেন।[২] সিরাজী আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের সংগে বিবাদ করেছেন, সি. আর. দাসের বিরোধিতা করেছেন এবং বারবারই ফিরে এসেছেন বাঙালী মুসলমানের কাছে, অশিক্ষিত সাধারণ হিন্দু মুসলমানের কাছে। সিরাজীকে মুসলমান সমাজের বঙ্কিমচন্দ্র করে তুলতে গিয়ে[৩] তাঁর পূর্বসূরীরাই তাঁকে শিক্ষিত হিন্দুর

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১।

২। পূর্ব, পৃঃ ১৮।

৩। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসর মোহাম্মদ সানাউল্লাহ বলেন, "আপনি মুসলমান সমাজের বঙ্কিমচন্দ্র হইয়া উঠুন।" ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

নিকট থেকে দূরে নিয়ে গেছেন, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর জন্য অনগ্রসর মুসলমান সমাজেও আসন পাননি। ফলে শিরাজীকে প্রকৃত অর্থে দূরে থাকতে হয় উভয়ের নিকট থেকেই।

শিরাজীর সাহিত্যের একটি বড় অংশ মুসলমানদের হীনমন্যতা মোচনের প্রয়াস, তাঁদের শিক্ষা অর্থনীতি ও রাজনীতিতে প্রতিবেশী হিন্দুর সমকক্ষ করে তোলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এখানেই তিনি মুসলমান সমাজের বিশ্বাসবোধ জাগানোর জন্য শিক্ষিত হিন্দুর সংগে কোন কোন অংশে কুৎসাকীর্তনে না নেমে পারেন নি। তবু তাঁর লক্ষ্য সম্ভবতঃ ছিল সমন্বয়ের দিকেই, কিন্তু শিরাজীর দুর্ভাগ্য, সমকালীন রাজনীতি, মুসলমান সমাজ ও মুসলমান রচিত সাহিত্যের অনগ্রসরতার জন্য তাঁর সমন্বয় প্রয়াস সফল হয়নি। প্রচুর বাধা অতিক্রম করেও তিনি রাজনৈতিক জীবন অপরিবর্তিত রেখেছিলেন, কিন্তু এই সময়ে সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য-বোধকে স্থান করে দেবেন তা ঠিক বোধগম্য নয়, সাধারণত সম্ভবও নয়। এজন্য শিরাজীর রাজনীতি ও জাতীয় চিন্তার আলোকেই তাঁর সাহিত্যকে দেখা প্রয়োজন, হিন্দুর সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষের প্রতিবাদ করতে, মুসলমানকে মহিমান্বিত করতে যেয়ে হিন্দু চরিত্র ও বিষয়ে কালিমা দিতে হয়েছে। সমকালীন অধিকাংশ শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মুসলমানের কাম্য ছিল তাই। শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব রাজনীতি ও সমাজে বিস্তৃত হবার পর এ ধরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রই প্রশস্ত হয়ে উঠেছিল, প্রচারক জীবনে সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য এ পথে যাওয়া ছাড়া শিরাজীর অন্য উপায়ও ছিল না।

খ। সাহিত্যিক জীবন

এক

শিরাজীর সাহিত্যিক জীবনের বিকাশ হয়েছে দুভাবে—(ক) সাহিত্য রচনা এবং (খ) সাহিত্য ও সাহিত্যিক সংগঠন।

শিরাজীর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা ও বিকাশ প্রাপ্তি ঘটেছিল প্রচারক জীবনের অংশ হিসাবে এবং সেজন্য মুসলিম গৌরবের প্রকাশই এর প্রায় সবটুকু স্থান অধিকার করে আছে। প্রচারক, ও কর্মী জীবনের আবেগ সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। অতএব, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রকাশ সাহিত্যে সর্বত্র প্রচ্ছন্ন নয়, তাঁর দোদুল্যমান চিত্তকে তাঁর অনুসারীরা পরবর্তীকালে বড় করে তুলেছেন। সেকারণে তাঁর মানসিকতা দ্বিধাবিভক্ত বলে মনে হয়, বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে রাজনীতিতে যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন, সাহিত্যে আবেগ দিয়ে তা রাখতে পারেননি। আর আবেগের আতিশয্যে এ সাহিত্য মুগ্ধ করেছিল তাঁদেরই, যাঁরা আবেগ দিয়ে হিন্দু মুসলমানের সংঘাতকেই বড় করে দেখেছেন, শিরাজীকে সেভাবেই ব্যাখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। সমাজের নিকট এটা গৃহীত হয়েছিল বলে আরো পরবর্তীকালে মুসলমান সমাজের প্রগতিশীল অংশ তাঁকে উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্যকে এ কারণেই কেউ "হৃদয়গ্রাহী"[১] বললেও পরের দিককার রচনাকে সেভাবে মেনে নিতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রথম জীবনের রচনার সংগে পরেকার পার্থক্য বেশী নেই, পরে তা কোথাও এক ধরণের বাহ্যবরণ পেয়েছিল মাত্র।

শিরাজীর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হয় প্রায় কৈশোরে, স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পাঠরত থাকাকালে। কৃষ্ণকুমার মজুমদারের সদ্ভাবের শোভা কবিতার অনুসরণে তিনি লেখেন -

"মরি মরি! কি সুন্দর এ পৃথিবী চারু
গড়িয়াছে নিরজনে কোন বিধি কারু!
পাহাড় পর্বত নদী মরি কিবা শোভা!
যে দেখেছে সে বুঝেছে কত মনলোভা!"

এ কবিতাটি তিনি ষোল লাইন রচনা করেন, এবং স্কুলের হেডপন্ডিত মন্তব্য করেন, "এই ছেলে কালে বিখ্যাত কবি হইবেন।"[২] এ কবিতাটিই সম্ভবত শিরাজীর কবিতা সৃষ্টির প্রথম আনন্দের প্রকাশ এর পর থেকে অন্তরের প্রেরণাসমূহ সংকোচ/ন ব্যবধান অতিক্রম করে তিনি প্রকাশের ভাষা দিয়েছেন।

জ্ঞানদায়িনীতে ভর্তি হবার সময়ে (১৮৮৮) তিনি 'সুধাকর' পত্রিকা পড়তে শুরু করেন। নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি মিহির, সুধাকর, ছোলতান, ইসলাম-প্রচারক প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন।[৩] কেউ কেউ মনে করেছেন, ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় অনলপ্রবাহ গ্রন্থের সমালোচনা দেখে এটা অসম্ভব বলে মনে হয় না।[৪] একক্তভাবে ইসলাম প্রচারক ও আর এসলাম পত্রিকাতেই শিরাজীর প্রচুর সংখ্যক রচনা প্রকাশিত হয়, এ দুটো পত্রিকা শিরাজীর সাহিত্যিক জীবন গঠনে অনেকখানি সহায়তা করে। শিরাজী একই সংগে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখেছেন, এসবের মধ্যে রয়েছে ইসলাম প্রচারক, প্রবাসী, মধ্যভারত, প্রচারক, সুপ্রভাত, কোহিনুর, বাসনা, ইসলাম প্রভা, মাসিক ছোলতান, সাপ্তাহিক ছোলতান, দৈনিক ছোলতান, সওগাত, সাধনাক্ষ, ভারত মিহির, সন্ধ্যা, মানসী ও মর্মবানী, সম্মিলনী, সোনার বাংলা, দৈনিক তরক্কী, নায়ক নবশক্তি আত্মশক্তি, বান্ধব, ভারত মহিমা, নবযুগ, নবনুর, পথিক, জাগরণ(ঢাকা), মোসলেম জগৎ, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, দেশের কথা[৫] ইত্যাদি। আমরা অবশ্য সকল পত্রিকা এবং এসবের সকল সংখ্যা পাইনি, যতদূর সম্ভব অনুসন্ধান করে সকল পত্রিকাতেও শিরাজীর রচনা পাইনি।

১। শাশ্বত বঙ্গ, পৃঃ ২৬৮।
২। শিরাজী-চরিত, পৃঃ ১১-১২।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫।
৪। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, পৃঃ ৩৫-৩৬।
৫। (ক) মুসলিম সাহিত্যে ও সাহিত্যিক, পৃঃ ২৬৬।
(খ) শিরাজী-চরিত, পৃঃ ৮২।
(গ) শাহ আকবর আলী-সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজী তাঁর নামের বানান বিভিন্ন রূপে লিখেছেন[১] এদের মধ্যে অধিকতর প্রচলিত হল ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং সিরাজী দুটোই।

কৈশোরে কবিতার মত গদ্য রচনার নিদর্শনও পাওয়া গেছে। জ্ঞানদায়িনী ছাত্র সমিতির দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সভায় সিরাজী শাহজাদপুরে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। তাঁর সে সময়কার গদ্য রচনাও অলংকারবহুলতায় উজ্জ্বল ছিল। সিরাজী লেখেন, "বর্ষায় সিরাজগঞ্জের পাশবাহিনী নদী যখন উচ্ছ্বসিত হইয়া তরঙ্গে বহিয়া যাইতেছিল—চাঁদ যখন নীল আকাশের পটে বসিয়া জ্যোৎস্না ছড়াইয়া নদীর বুকে স্বর্ণবৃষ্টি করিতেছিল—নদীর তীরের বটগাছের পাতাগুলি চাঁদের কিরণে চিক চিক করিয়া দুলিতেছিল—এবং মৃদু বায়ুর তাড়নে এই পাতাগুলি যখন আনন্দে করতালি দিতেছিল—যখন নানা দেশীয় নৌকাগুলি দুই পাড়ে আবদ্ধ হইয়া তরঙ্গের তালে তালে দুলিতেছিল—দুই পাড়ের কোলাহল যখন থামিয়া গিয়াছিল—রাত্রির আহারান্তে আমরা ঠিক সেই সময় নৌকায় আরোহন করিলাম।"[২]

বস্তুতঃ, সিরাজী যে ভাষায় বক্তৃতায় কথা বলেছিলেন, সেই একই ভাষায় অলংকৃত গদ্য লেখাও শুরু করেন প্রথম থেকে। যে সময় ভাষায় বাহুল্য কিংবা মেদ বর্জন করে তাকে শাণিত, সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে, সিরাজী তখনও ভাষাকে বাঁধতে চেয়েছেন ওজন দিয়ে, অনাবশ্যক ধ্বনির প্রভাবে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর ভাষার নতুন কাব্যরূপকে সিরাজী ধরতে পারেননি, সম্ভবতঃ চাননি প্রচারক জীবনে বাগ্মিতার প্রয়োজনে।

দুই

সিরাজী পত্রিকায় বিভিন্নভাবে লিখেছেন কিন্তু সামান্যই গ্রন্থাকারে লিখেছেন, পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা সংকলন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। তাঁর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম রচনা অনল প্রবাহ (১৩০৬), কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম রচনা কোনটি তা বলা কঠিন। ইসলাম-প্রচারক ১৩০৬ এর মাঘ সংখ্যায় "বঙ্গ ও বিহার বিজয়" রচনার নীচে ক্রমশঃ ছিল, রচনাটি তিনি আদৌ শেষ করেছিলেন কিনা সে ব্যাপারে কেউ কেউ নিশ্চিত হননি।[৩] নূর পত্রিকায় এ রচনাটিই পুনঃ প্রকাশিত হয়, কিন্তু সেখানে আর ক্রমশঃ নেই।[৪] সুতরাং

১। মহম্মদ এসমাইল হোসেন, মুনশী মহম্মদ এসমাইল হোসেন, মুনশী এসমাইল হোসেন, মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী, মুনশী মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী, আবু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী, এ,এম,এসমাইল হোসেন সিরাজী, আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী, সৈয়দ আবু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী, সৈয়দ এসমাইল হোসেন সিরাজী, এম, এসমাইল হোসেন সিরাজী, এস, এ, এম, এসমাইল হোসেন সিরাজী, সৈয়দ মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, সিরাজী, সৈয়দ সিরাজী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কবি সোলতান মওলানা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, সৈয়দ মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী, গাজী সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, গাজী সৈয়দ আফেন্দী শাহ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কবি সোলতান, ইত্যাদি। এ পরিবর্তন থেকেও বহুমত তাঁর মনোবিকাশের পরিচয় মেলে।
২। সিরাজী-চরিত, পৃঃ ১৫।
৩। আবদুল কাদির-সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, সি-র, পৃঃ ৩১৭।
৪। নূর, বৈশাখ, ১৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজী 'বঙ্গ ও বিহার বিজয়' শেষ করেননি তেমন মনে করার কোন কারণ নেই। প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয় ছোলতান মাহফুজ প্রবন্ধটি। পর পত্রিকায় এর আগে আর কোন রচনা প্রকাশের সুনিশ্চিত তথ্য আমরা পাইনি।

সিরাজীর সর্বমোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক আছে। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখের মতামত আলোচনা করে মনোয়ার হোসেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সিরাজীর সর্বমোট গ্রন্থের সংখ্যা ৩১টি, এর মধ্যে প্রকাশিত ১৯টি এবং বাকীগুলো অপ্রকাশিত।[২]

এ সিদ্ধান্ত সঠিক নয়, সিরাজীর প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে তিনি 'স্বজাতিপ্রেম' অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। 'স্বজাতিপ্রেম' একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ মাত্র, ছোলতান পত্রিকায় এটা প্রকাশিত হয়,[৩] এবং ছোলতান থেকেই পুস্তিকা আকারে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সনের জানুয়ারী মাসে। প্রকাশিকা বেগম রবিয়া খানম, আবহাসরা লাইব্রেরী, ১৮ মুসলমান পাড়া লেন, কলিকাতা। শেষে ১ পৃষ্ঠায় একটি কবিতা সহ সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা -১১।

অন্যদিকে নিখিলবঙ্গীয় তরুণ সম্মেলন (১ম অধিবেশন) সভাপতির অভিভাষণ: ১৫ই আগস্ট, ১৯২৮, আলবার্ট হল কলিকাতা পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭। প্রকাশক, বিধান মুখার্জী, কলিকাতা, ১৯২৮। সিরাজীর অন্য একটি বক্তৃতা ইসলামের ডাক সিরাজী সাহেবের বাণী নামে সিরাজগঞ্জ, পাবনা থেকে ইজাবউদ্দীন আহমদ প্রকাশ করেন ১৯০৮ সালে, এটার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫। স্বজাতিপ্রেমকে গ্রন্থাকারে ধরলে এ দুটো বক্তৃতাও গ্রন্থাকারে বিবেচ্য হতে পারে।

সিরাজীর অন্য একটি গ্রন্থ "ইসলামের জেহাদ বা মুক্তির বাণী"[৪] ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৭২ সনের ১লা ফাল্গুন। সংগ্রাহক ও প্রকাশক মোহাম্মদ মোস্তাফিজুদ্দীন হামিদী, হামিদিয়া লাইব্রেরী, খুলনা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪১। প্রকাশক উল্লেখ করেছেন, সিরাজীর কবিতা ও প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকা থেকে গৃহীত এবং "এই পুস্তকের ছাপা খরচ বাদে অবশিষ্ট অর্থ হামিদপুর চিনিকাটা আলিয়া মাদ্রাসার সাহায্যকল্পে ব্যয়িত হইবে।" প্রবন্ধ ও কবিতা সহ গ্রন্থে প্রকাশিত সর্বমোট রচনার সংখ্যা বাইশটি, চারটি বাদ দিয়ে সবগুলিই ছোলতান থেকে গৃহীত। প্রকাশক মন্তব্য করেছেন, "পাবনা জেলার সেরাজগঞ্জ মহকুমার এলাকাধীন সমাজ হিতৈষী জনাব মৌলভী মোহাম্মদ এমদাদুল হক তালুকদার সাহেবের নিকট ছোলতান পত্রগুলি আছে।—কবির অন্যান্য কবিতা ও প্রবন্ধগুলি এই পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণে প্রকাশিত হতে পারে।" এ গ্রন্থটি সহ

১। প্রচারক, মাঘ-ফাল্গুন, ১৩০৬।
২। মনোয়ার হোসেন-সিরাজী: জীবন ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৮।
৩। ছোলতান, ১৬ই কার্তিক, ১৩৩০।
৪। নির্ভুলভাবে মুদ্রিত নয় বলে আমরা আলোচনায় সমধিক ছোলতান পত্রিকা থেকে তথ্য প্রমাণ উল্লেখ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজীর সর্বমোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮টি নয়, ২২ টি । সিরাজীর অন্যান্য গ্রন্থের বিবরণ নিম্নরূপঃ

(১) অনল প্রবাহ প্র,সং,যশোর,মুহম্মদ মেহেরুল্লা,১৩০৬,দ্বি-সং,কলিকাতা,শ্রীগুরুনাথ পালিত, ১৩১৫ ,বাজেয়াপ্ত ১৩১৭ থেকে ১৩৫৮ পর্যন্ত,তৃ-সং,সিরাজগঞ্জ,পাবনা,সৈয়দ আসাদ-উদ্দৌলা সিরাজী,১৩৬০ ।

(২) উচ্ছ্বাস প্র,সং কলিকাতা,শ্রী গুরুনাথ পালিত,১৩১৪।

(৩) নব উদ্দীপনা-প্র-সং ,কলিকাতা ,শ্রী গুরুনাথ পালিত,১৩১৪ ,

মহানগরী কর্ডোভা,প্র,সং,কলিকাতা, মকবুল আহমদ,১৯০৭,দ্বি-সং,কলিকাতা,শাহজাহান কোম্পানী,১৩২০,স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা বা মহানগরী কর্ডোভা নামে প্রকাশিত। তৃ,সং,গ্রন্থকার ,১৩২০ ।স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা নামে প্রকাশিত ।

(৪) স্ত্রী শিক্ষা- প্র-সং,কলিকাতা,গুরুনাথ পালিত,১৩১৪ । দ্বি-সং,কলিকাতা,নূরউদ্দীন আহমদ ১৩১৯, বর্ধিত সং ,ত্রিপুরা,চিনাইর নিবাসী মুন্সী বজলর রহমান চৌধুরী,১৩২৩।

(৬) উদ্বোধন- প্র-সং,কলিকাতা,গুরুনাথ পালিত,১৯০৮।

(৭) তুর্কী নারী জীবন- প্র-সং,রঙ্গপুর,কাকিনাবাড়ী নিবাসী শ্রী মুন্সী মোহাম্মদ শাফায়েতুল্লা চৌধুরী,১৩২০। দ্বি-সং,ত্রিপুরা ,চিনাইর নিবাসী মুন্সী বজলুর রহমান চৌধুরী,১৩২৫ ।

(৮) তুরস্ক ভ্রমণ- প্র-সং,কলিকাতা, শাহজাহান কোম্পানী,১৯১৩।

(৯) স্পেন বিজয় কাব্য- প্র-সং,কলিকাতা,গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত,১৯১৪ ,দ্বি-সং,কলিকাতা,মখদুমী লাইব্রেরী,১৯২০ ।

(১০) আদব কায়দা শিক্ষা-প্র-সং,সিরাজগঞ্জ,পাবনা,গ্রন্থকার ,১৯১৪ ,দ্বি-সং,কলিকাতা,মখদুমী লাইব্রেরী,১৩২৬।

XXXX বর্ধিত দ্বি-সং,গ্রন্থকার,১৩২৭ ।

(১১) রায়নন্দিনী-প্র-সং,(প্রথম সং ধীরা বা রায়নন্দিনী নামে প্রকাশিত) ,কলিকাতা,কাদের রহমান খিজির ,১৩২২ । দ্বি-সং,কলিকাতা,করিম বক্স ব্রাদার্স,১৩৩৫।

(১২) তারাবাঈ- প্র-সং (?)

দ্বি-সং(?) কলিকাতা,করিম বক্স ব্রাদার্স।

১। উপন্যাস চারটি-আবদুল কাদির সম্পাদিত -সিরাজী-রচনাবলী নামে ঢাকা,কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(১৩) সঙ্গীত সঞ্জীবনী– প্র-সং, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, গ্রন্থকার, ১৯১৬।

(১৪) প্রেমাঞ্জলি– প্র-সং, কলিকাতা, শেখ আবদুর রহমান জামালী, ১৩২০।

(১৫) সুচিন্তা– প্র-সং, কলিকাতা, মুন্সী মৈজউদ্দীন আহমদ, ১৯১৬।

(১৬) ফিরোজা বেগম – প্র-সং, কলিকাতা, মুহম্মদ সুলেমান খান, ১৯১৮।
দ্বি-সং, কলিকাতা, করিম বক্স ব্রাদার্স পাবলিশিং ডিপার্টমেন্ট, ১৩৩৪।

(১৭) নূরউদ্দীন– প্র-সং, কলিকাতা, মুহম্মদ সুলেমান খান, ১৩২৬।
দ্বি-সং, করিম বক্স ব্রাদার্স (পাবলিশিং ডিপার্টমেন্ট), ১৩৩৫।

(১৮) মহাশিক্ষা কাব্য– প্র-খণ্ড –প্র-সং, ঢাকা, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৯।
দ্বি-খণ্ড –প্র-সং, ঢাকা কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭১।

সিরাজীর অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। ডক্টর গোলাম সাকলায়েন ও ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান অপ্রকাশিত গ্রন্থের একটি তালিকা[১] দিয়েছেন, এগুলো [illegible] হল, কাব্য ও কবিতা –
(১) মহাশিক্ষা কাব্য, (২) সুধাঞ্জলি, (৩) গৌরব কাহিনী, (৪) কুসুমাঞ্জলি, (৫) আবে হায়াৎ, (৬) কাব্য কুসুমোদ্যান ও (৭) পুষ্পাঞ্জলি; প্রবন্ধ ও গদ্য রচনা — (১) সুচিন্তা –২য় খণ্ড, (২) কারাকাহিনী, (৩) মুক্তির বাণী, (৪) বিবিধ প্রবন্ধ, (৫) তুরস্ক ভ্রমণ–২য় খণ্ড, (৬) তুরস্কের ডায়েরী ও (৭) নব্যতুর্কী। আমরা সিরাজগঞ্জে কবির বাসগৃহ বাণীকুঞ্জে সিরাজী একাডেমী লাইব্রেরীর[২] যাবতীয় গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, অপ্রকাশিত রচনা এবং অন্যান্য কাগজপত্র একাধিকবার যথাসাধ্য পরীক্ষা করে দেখেছি, আমাদের প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপ।

মহাশিক্ষা কাব্য ১ম ও ২য় খণ্ড ১৯৬৯ এবং ১৯৭১ সালে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। সুধাঞ্জলি গ্রন্থটি আমরা দেখেছি, এতে সর্বমোট ২১৯টি কবিতা বা গান আছে। সুধাঞ্জলি থেকে চারটি কবিতা নূর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৩] পাণ্ডুলিপির প্রথম ও দ্বিতীয় কবিতা পত্রিকায় ; ও চতুর্থ কবিতা হিসাবে মুদ্রিত, রচনাকাল ২১শে ফাল্গুন, ১৩২৩। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম ও দ্বিতীয় কবিতার রচনাকাল, ১৭ই ও ১৪ই মাঘ, ১৩২৪ সাল, ময়মনসিংহের কেন্দুয়া ও কুতুবপুরে অবস্থানকালে লিখিত। মনে হয়, তিনি সুধাঞ্জলি গ্রন্থের কবিতা কেবল পত্রিকায় প্রকাশ করা শুরু করেন, কিন্তু পরে আর সুযোগ হয়নি। সুধাঞ্জলি কাব্যের প্রতিটি কবিতার শেষে গীতাঞ্জলি গ্রন্থের মত রচনাকাল ও রচনাস্থান উল্লিখিত আছে।

১। (ক) সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, পৃঃ ২০–৩২।
(খ) মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক, পৃঃ ২৬৭।

২। প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৯৪, মিরমোহর, পরিশিষ্ট, আলোকচিত্র।

৩। নূর, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজীর স্ত্রী শিক্ষা গ্রন্থের শেষ প্রচ্ছদে যন্ত্রস্থ বলে "গৌরব কাহিনী" গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়।[১] সিরাজী তখনো জীবিত ছিলেন, সম্ভবতঃ মুসলমানদের গৌরব কাহিনীমূলক কবিতা সমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশের বাসনা কবির ছিল, পরে তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। আমরা এ গ্রন্থের পান্ডুলিপি দেখিনি।

'পুষ্পাঞ্জলি' ও 'আবে হায়াৎ' নামে কোন কাব্য গ্রন্থ আমরা দেখিনি। সোলতান পত্রিকায় 'আবে হায়াত' শিরোনামে আরো অনেকের মত সিরাজীর বেশ কিছু সংখ্যক কবিতা প্রকাশিত হয়। এটা থেকে 'আবে হায়াৎ' নামে কবির অপ্রকাশিত গ্রন্থ আছে এ ধারণা হতে পারে। বস্তুতঃ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর কারাবাসকালে তাঁর পরিবারের সাহায্যার্থে 'আবে-হায়াত'[২] নামে একটি সংকলিত প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, এ গ্রন্থে সিরাজীর "আধ্যাত্মের উৎকর্ষ" প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছিল মাত্র।

সিরাজী তাঁর "বাংলা সাহিত্যে মোসলমান পশ্চাৎপদ কেন?" প্রবন্ধে "কুসুম-ইস্লাম" নামে একটি কাব্যের প্রেস কপি প্রস্তুত করেছেন এবং ছাপার অভাবে তা কীটদষ্ট হচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] এটা ছাপা হয়নি। পুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থের (১৩২৩) নাম পৃষ্ঠায় সিরাজীকে অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'বাসন্তী' এবং 'মন্দাকিনী' গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে বলা হয়েছে, কিন্তু এ দুটো গ্রন্থও প্রকাশিত হয়নি। সিরাজীর মৃত্যুর পর সঞ্জিবনী পত্রিকায়[৪] অপ্রকাশিত আরো কিছু গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হয়েছে, কাব্যকুসুমোদ্যান (গীতিকাব্য) প্রত্যাদেশ (জাতীয় কবিতা) স্বাধীন চিন্তা, মুক্তিরবানী, প্রভাত চিন্তা, নাসিকা কাব্য (বৈষ্ণব ও মুসলিম ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা), মুক্তিচিন্তা, ধর্মবিজ্ঞান, কোরান ও হাদিসের উপদেশাবলী, ইসলামের শিক্ষা, গৌরব কাহিনী, প্রজ্ঞাজাগরণ (ছাত্রী মুসলমানের প্রতি), বৈষ্ণব পদাবলী, মুবারক (মহৎ জাতীয় সংস্কার মূলক গ্রন্থ), নব্য তুর্কীর ইতিহাস ইত্যাদি। এ তালিকা প্রকাশের ভিত্তি কি তা উল্লিখিত হয়নি, আমরা এসব গ্রন্থের পান্ডুলিপি দেখিনি।

পুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থের পান্ডুলিপি এবং আরও কিছু অপ্রকাশিত কবিতা আমরা পেয়েছি।

মুক্তিচিন্তা ১ম খন্ডেই সম্ভবতঃ ২য় খন্ডের উল্লেখ রয়েছে। মুক্তিচিন্তা ১ম খন্ডটি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত চিন্তামূলক আটটি প্রবন্ধের সমষ্টি। এভাবেই আরো কিছু প্রবন্ধ সংকলন করে ২য় খন্ড প্রকাশের ইচ্ছা তাঁর থাকতে পারে, কিন্তু তা আর প্রকাশিত হয়নি।

১। স্ত্রী শিক্ষা, বর্ধিত সং।

২। সোলতান সম্পাদকের মোকদ্দমার ব্যয় বহন, তাঁহার ঋণ পরিশোধ ও পারিবারিক সাহায্যকল্পে দৈনিক সোলতান পত্রে বিজ্ঞাপিত সেই জাতীয় জীবন সঞ্চারক উপদেশ গ্রন্থ আবেহায়াত। প্রথম সংস্করণ। ৪৪/১ মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। কাতি ৫ বর্ষ, ৫৫০-ক।

৪। সঞ্জিবনী, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৩১।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজীর কারাজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত হয় কারাকাহিনী, চট্টগ্রামের সাধনা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। অরবিন্দ ঘোষের কারাকাহিনীর মত সিরাজীরও এটা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার ইচ্ছা থাকতে পারে, কিন্তু সিরাজী কারাকাহিনী রচনা সম্ভবতঃ শেষ করেননি, সাধনা পত্রিকায় কয়েকটি সংখ্যার পর আর ছাপা হয়নি। সুতরাং একে ঠিক অপ্রকাশিত গ্রন্থ বলা যায় না। আমরা সিরাজীর "জেরবল রোজনামচা" পেয়েছি, এটা বোধ হয় কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

'মুক্তির বাণী' নামে সিরাজীর কোন অপ্রকাশিত গ্রন্থ আমরা পাইনি। কোনও পত্রিকায় 'মুক্তির বাণী' শিরোনাম থেকে এ ধারণা আসতে পারে, একই কারণে সিরাজীর অন্য একটি রচনা সংকলনের নাম "ইসলামে জেহাদ বা মুক্তির বাণী" দেয়া হয়ে থাকতে পারে।[১] এ ছাড়া সিরাজীর বিবিধ প্রবন্ধের সম্ভাব্য সংকলন থেকে "বিবিধ প্রবন্ধ" নাম আসতে পারে।

তুরস্ক ভ্রমণ প্রথম খন্ডের শেষে দ্বিতীয় খন্ডের ব্যাপারে বিজ্ঞাপন ছিল, কিন্তু এটা প্রকাশিত হয়নি, এ গ্রন্থের পান্ডুলিপি আমরা দেখিনি।

বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সিরাজীর প্রচুর কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, এসবের সংখ্যা নিরূপন করা কঠিন। সিরাজী-চরিত গ্রন্থে কিছু কবিতা ও প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা আছে। কিন্তু প্রকাশের স্থান বা কাল উল্লেখ করা হয়নি।[২] পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি, "এরকম প্রায় দুই তিন শত প্রবন্ধ" আছে বলে গোলাম সাকলায়েন উল্লেখ করেছেন।[৩] কিন্তু কিভাবে ও কোন সূত্রে এ সংখ্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা বলেননি। তাঁর এ সিদ্ধান্ত আনুমানিক বলে মনে হয়, তিনি তালিকা দিয়েছেন মাত্র ৫০টির, এবং তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেছেন, প্রকাশের স্থান বা কাল উল্লেখ করেননি। সিরাজী-চরিত গ্রন্থে প্রকাশিত তালিকার সঙ্গে তুলনা করলে মনে হবে, গোলাম সাকলায়েন এ তালিকা প্রস্তুত করতে সিরাজী-চরিত গ্রন্থের সাহায্য নিতে পারেন। সিরাজীর সমকালীন বিভিন্ন পত্র পত্রিকা অনুসন্ধান করে আমরা এসব তালিকায় উল্লিখিত এবং তালিকা বহির্ভূত বেশ কিছু রচনার সন্ধান পেয়েছি।

তিন

ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় সমালোচনা প্রসঙ্গে সিরাজীর "অনন্দিকা" কবিতা সম্পর্কে মিহির ও সুধাকর এর পত্রিকায় মন্তব্য প্রকাশিত হয়, "হজরতের মর্ত্তে আগমনসূচক" অনন্দিকা কবিতাটি বঙ্গ ভাষায় এক অপূর্ব সৃষ্টি। কবিতাটিতে কল্পনার উচ্ছ্বাস বর্ণনার চমৎকারিত্ব এবং ছন্দের ঝঙ্কার অতীব আকর্ষণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।"[৪]

১। পূর্বে, পৃঃ ৭৫।
২। সিরাজী-চরিত, পৃঃ ৮২-৮৩
৩। মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক, পৃঃ ২৬৪-৬৬।
৪। মিহির ও সুধাকর, ২৫শে আশ্বিন, ১৩০৮।

Dhaka University Institutional Repository

এর প্রায় দু'বছর পরে ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় প্রকাশিত শিরাজীর বঙ্গবাণি কবিতার সমালোচনায় মিহির ও সুধাকর পত্রিকা নির্ভিক সুরুচিপূর্ণ রক্ষা করতে পারেনি। "প্রেমিক জাত্যাভিমানী সেবক," বঙ্গ পড়িতে যাহার তিনি যদি ক্ষমতার অভাব বশতঃ বাংলা পড়িতে আরম্ভ করেন, তবে তাহা কে পছন্দ করিয়া থাকে --বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের ২/১ টি অর্ধশিক্ষিত, চপলমতি বালক উল্লিখিত রূপ শিব পদে বাংলা পড়িতে, কালা মাথার দৃষ্টি করিতে, বটতলার উপর টেক্কা দিয়া অদ্ভুত পদাবলী লিখিয়া নাম জাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।--ইহাতে যে সমাজের কি ক্ষতি হইতেছে তাহা চিন্তাশীল লোকেরাই বুঝিতে পারেন। বস্তুতঃ বর্তমানে আমাদের বাঙ্গালী অবস্থা তাহাতে কদাচারা আমরা চাইনা। সুধী হিতাকাঙ্খী আমাদের সমাজে নাই, বরং দুর্ভাগ্য তাহার, তথাপি মুসলমানের আবির্ভাব হওয়াটা ভয়ঙ্কর নহে। কেননা তাহাতে আমাদের মধ্যে ক্রমশঃ বটতলার সার্বজনীনপূর্ণ কুসাহিত্যের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি লেখক ও আমাদের "ইসলাম প্রচারকে" মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যা 'বঙ্গবাণি' নামে একটি পদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। সেটি যে কিরূপ অদ্ভুত পদ্য, তাহা যাহারাই না দেখিয়াছেন, পাঠ করিয়া না দেখিলে সে মজা ব্যাপার বুঝাইবার যো নাই।--অযথা শব্দ প্রয়োগ, পুনরুক্তি দোষ, বাজে কথার অবতারণা বহু আছে, তদ্ব্যতীত জাতীয় জীবন জাতীয় বিশ্বাস, জাতীয় ধর্মীয় আদর্শ, তাল জ্ঞান প্রভৃতির এরূপ ছড়াছড়ি হইয়াছে যে, পড়িতে শ্রদ্ধা জন্মে না। এরূপ কর্কশ বঙ্গবাণি বা ঢক্কা কানে পশিলেই কান জুড়ায়।--পরিশেষে "আলীগড় অবনী ঝাণ্ডা ভাই ডাকিছে" বলিয়া শিরাজী সাহেব সেবকবর সকলকে পরিত্রাণ পরিয়া আসিতে বলিয়াছেন।

আমরাও বলি, খবরদার, খবরদার উদ্বুদ্ধ হইয়া কেহ যেন না যাবে। আসিলে বীরত্বে বুলিত, পেশোয়ারের সরিত দেশের পোশাকে পড়িয়া অসমর্থ হইতে হইবে। যাক্, আর কিছু বলিতে শ্রদ্ধা হয় না, ইতর বাকে যাহা লোকেরাই মাথায় আর্তা করিয়া পর্বতে ঘোড়া দিতে কষ্টকর হয়, ইহা কি কম দুঃখের কথা?[১]

শিরাজীর রচনা মূল্যায়নের ব্যাপারে প্রায় দুবছরের ব্যবধানে মিহির ও সুধাকর পত্রিকার এ মতামতের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন সবটুকু শিরাজীর নিজের কারণে কিংবা তাঁর রচনার বিরুদ্ধে নর জন্য ঘটেনি। প্রসঙ্গত ইসলাম প্রচারক পত্রিকার সঙ্গে মিহির ও সুধাকর পত্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা আছে। ইসলাম প্রচারক পত্রিকার

১। জাতীয়বাণী--অর্থনৈতিক সংবাদ, মিহির ও সুধাকর, ১১ই ভাদ্র, ১৩১০।
২। পূর্বে, পৃঃ ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম শক্তিশালী কবি ও লেখক ছিলেন শিরাজী, এ কারণেও সম্ভবতঃ তিনি আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। মিহির ও সুধাকর পত্রিকায় শিরাজীর পুনর্কীর্তন ও নিন্দা জ্ঞাপন উভয় ক্ষেত্রেই তরুণ কবির প্রতিভা ও প্রভাবের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। শিরাজী মিহির ও সুধাকর পত্রিকার এসব বৈরী ভূমিকার প্রত্যুত্তর দেন কবিতা রচনা করে।[১] ইসলাম প্রচারক পত্রিকাও শিরাজীকে সমর্থনসূচক নিবন্ধ প্রকাশ করে, "এসমাইল হোসেন মিয়া এ যাবৎ যে সকল প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সমাজের হিতকর কি অহিতজনক, একথা প্রতিবাদকারী মহোদয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি। "ইসলাম-প্রচারক" বা অন্যান্য পত্রিকায় এযাবৎকাল তাঁহার যে সকল কবিতা ও প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে আমাদের মতে তাহার প্রত্যেকটি সমাজের পক্ষে উপকারজনক। তাঁহার লেখা ও বক্তৃতা, সকলই সমাজের হিতজনক। কোথায় আমরা এই তরুণ বয়স্ক উদ্যমশীল যুবককে উৎসাহ দিব, না তৎপরিবর্তে অতি ঘৃণিতভাবে গালি বর্ষণ করিয়া তাঁহার উৎসাহের পথ রুদ্ধ করিয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছি।--প্রতিবাদকারীদিগের প্রতিবাদ পাঠে তাঁহার প্রতি স্তরে স্তরে ও অন্তরে অন্তরে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের স্রোত অনুভূত হইতেছে।"

দেশে মুসলমানদের সাহিত্য সাধনার করুণ অবস্থা তুলে ধরে মন্তব্য করা হয়েছে, "এরূপ ক্ষেত্রে বঙ্গ শিক্ষিত বালক বা যুবক ব্যতীত আমরা আর কাহাকে পাইব?"[২]

ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় শিরাজীর প্রচুর রচনা প্রকাশিত হয়, কিন্তু মিহির ও সুধাকর পত্রিকার সঙ্গে সংযোগ সম্ভবত তাঁর ছিল না। শিরাজী অবশ্য ইসলাম প্রচারক পত্রিকার মধ্যেও কখনো সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েননি।

নবনূর পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়, "মুসলমানেরা ধর্মের নামে কখনই যুদ্ধ করে নাই।" এবং "জেহাদ অর্থ,-"প্রাণপন চেষ্টা করা। ইহার দ্বিতীয় অর্থ নাই।" এ প্রসঙ্গে জেহাদ শব্দের প্রয়োগও এ আলোকে করা হয়।[৩]

শিরাজী এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, "আমরা নবনূর সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি এই প্রবন্ধটি দেখিয়া শুনিয়া নির্বাচন করিয়াছিলেন? --ইহার লেখক কে? তিনি না অপর কেহ? আমরা ভরসা করি তিনি মুসলমান সমাজের নিকট ইহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ প্রদান করিবেন। জেহাদ যে কোরাণ ও হাদিসের নির্দ্ধারিত বিষয় তাহা কি তিনি অবগত নহেন? যদি অবগত না থাকেন তবে এরূপ জ্ঞান লইয়া মাসিক পত্রিকায় ধর্ম সম্বন্ধীয় গুরুতর বিষয়ে আলোচনা কতদূর সমীচীন?"[৪]

১। শিরাজী-চরিত, পৃঃ ৩৮-৪০।
২। এবনে হামিদ-পরশ্রীকাতরতা, ইসলাম প্রচারক, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩১০।
৩। ধর্মযুদ্ধ, গাজী ও জেহাদ, নবনূর, অগ্রহায়ণ, ১৩১০।
৪। নবনূর ও জেহাদ, ইসলাম প্রচারক, অগ্রহায়ন-পৌষ, ১৩১০।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ করে তুলতে চেয়েছিলেন, যদিও বস্তুতঃ এক্ষেত্রেই নবনূরে প্রকাশিত লেখকদের এ ব্যাপারে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হননি।

শ্রী অজিত কুমার চক্রবর্তী প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেন, "তাজমহল যাহা জগতের বিস্ময়- সেই 'সকলের দুর রাশিকে' কে সৌন্দর্য্য মুগ্ধলোক হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিল, কে? হিন্দু শিল্পী। মুসলমান তো কেবল ভারতবর্ষেই আসে নাই- আরবে, পারস্যে, তুর্কিস্থানে কোথায় মুসলমানের শিল্প ভারতবর্ষের মত এমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে?"[১]

মুসলমান প্রসঙ্গে থাকতে শিরাজী এর একটি উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "বাঙ্গালী লেখকদিগের এই অতিরিক্ত ও অন্যায় স্বজাতি গৌরব লোলুপতা এবং আর্য্যামীর "বড়াই" এর জন্য মুসলমান লেখকদিগের মধ্য সঞ্চালিত লেখনী মুখ হইতে "জমের অন্দরে মহাভারত" "হিন্দু ধর্মরহস্য" "দেবলীলা", "বিষবাগজেনা" প্রভৃতি পুস্তক হিন্দু ধর্ম ও জাতির বীভৎস কলঙ্কাবলী বিশ্বকে প্রচারার্থে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার জন্য দুঃখিত ও মর্মাহত। কিন্তু ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হইবেই।"[২]

মুসলমান গ্রন্থকারদের দ্বারা হিন্দুর কুৎসাকীর্তন মূলক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশকে শিরাজী ঠিক আগ্রহের সঙ্গে অনুমোদন করেছেন বলে মনে হয় না, তবে এর প্রকৃতিটি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। এখানে শিরাজীর ভূমিকা সমালোচনাপেক্ষা আত্মরক্ষামূলক।

প্রবাসী পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়, "মুসলমানদের শাস্ত্রে এমন কোন বাধ্যতামূলক বিধি আছে কিনা জানিনা যে, তাহাদের নাম আরবী হওয়াই চাই। সম্ভবতঃ মুসলমানেরা বলিতে পারিবেন।"[৩] শিরাজী এর প্রতিবাদ করে বলেছেন "মুসলমানের নাম আরবী ভাষায় হওয়া, শাস্ত্রীয় আদেশ। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় নাম হইলে কেবল নাম শুনিয়া মুসলমান কিনা, ঠিক করা কঠিন হইত। এই জন্য মুসলমানের নমাজের বচনগুলিও মূল আরবীতে হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, উহা মহাকোরআনের সুক্ত। কিন্তু প্রার্থনা যে কোন ভাষায় হইতে পারে। মুসলমান ধর্ম এবং সভ্যতা সকল বিষয়েই কেন্দ্রাতিকর্ষক। সকল বিষয়েই একটা বিরাট ঐক্যের কেন্দ্রে টানিয়া লয়।"[৪]

প্রবাসীর এ নিবন্ধে দেশহিতের জন্য ঐক্য এবং ঐক্যের জন্য মুসলমানদের দেশজ নাম রাখার প্রস্তাব করা হয়। শিরাজী এর প্রত্যুত্তরে বলেন, "জাতীয়তা সৃষ্টি করিবার জন্য যদি এক ভাষায় নামকরণ হওয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে হিন্দুদিগের নাম আরবী ভাষায় হওয়া উচিত। ইহাতে বিরাট মুসলমান জাতির

১। শ্রী অজিত কুমার চক্রবর্তী-ভারতবর্ষীয় শিল্পকলা ও তাহার আদর্শ, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩১৯।
২। কাটিং বই ৫৫০-৩।
৩। বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩১৯।
৪। মুসলমান সম্বন্ধে দুই একটা কথা, প্রবাসী, কার্তিক, ১৩১৯।

যদিও অন্ততঃ মতের দিক দিয়াও হিন্দুরা এক হইতে পারেন। এ বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রেও কোন বাধা নাই।"

শিরাজীর এ রচনার নীচে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, "মুসলমানেরা আরবীকে পবিত্র ভাষা জ্ঞান করেন। কিন্তু অন্যেরা তাহা করেন না, এবং আরবী ভারতবর্ষের ভাষাও নহে। সুতরাং সমুদয় ভারতবাসীর আরবী নাম কখনও হইবে না। দুশত জন হিন্দুর এরূপ নাম যে এখনও আছে, তাহা মুসলমান প্রভাবের শেষ চিহ্ন, পরে তাহাও থাকিবে না। হিন্দুর অধিকাংশ নাম সব প্রদেশেই সংস্কৃতমূলক। সংস্কৃত এই দেশের ভাষা বলিয়া এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। যদি কোন দেশের শক্তি দেখিয়া নাম রাখিতে হয়, তাহা হইলে সকলেরই ইউরোপীয় ও খ্রীষ্টীয় নাম রাখা উচিত। কারণ উহারাই এখন জগতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী।"

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, শিরাজী আদব-আয়মা শিক্ষা থেকে মুসলমানের নাম প্রকরণ দিয়ে বিস্তৃত আলোচনা না করলেও, তাঁর নিজের নাম নিয়েও এক সময় বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। শিরাজী নিজের আভিজাত্যবোধের মত বাংলায় মুসলমান সমাজেরও প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন, এবং বিতর্কের মধ্যে তার আত্মমর্যাদাবোধ, কোন কোন ক্ষেত্রে অসাধারণ আত্মশক্তিতার পরিচয়ও প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রী প্রকাশচন্দ্র সরকার ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের ব্যাপারে বখতিয়ার খিলজীকে দোষারোপ করেন।[১] শিরাজী এর প্রতিবাদ করে বলেন, "সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া মোসলেম ইতিহাসের চর্চা করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহা হইতেই ইহা সর্বথা মিথ্যাই ঘোষণা করিতেছি। মুসলমানেরা কোনও জাতির জ্ঞান বিদ্যাকে অগ্রাহ্য বা হিংসা করা দূরে থাকুক, বরং তাহারাই গ্রীস, রোম ও ভারতের জ্ঞান ভাণ্ডার রক্ষা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই মুসলমানের নিকট "কাফের" বলিয়া অভিহিত ছিল। এ অবস্থায় হিন্দু "কাফের" বৌদ্ধ "কাফের" অপেক্ষা কোনসূত্রে এত প্রীতিভাজন হইয়াছিল যে, মুসলমানেরা বাছিয়া বাছিয়া কেবল বৌদ্ধ কীর্তিই বিনাশ করিলেন, আর হিন্দু কি কীর্তি স্পর্শও করিলেন না।

যাহা হউক, আশা করি আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণ অতঃপর "যবন মিথ্যা প্রচারে একটুকু সাবধান ও সতর্ক হইবেন। ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যানুসন্ধানে সর্বপ্রকারের জাতিগত ও দেশগত সংস্কার পরিবর্জনীয়।"[২]

আলোচনার ঐ শিরোনামে শিরাজীর এ রচনার নীচে শ্রী প্রকাশচন্দ্র সরকারের একটি প্রতিবাদও প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ চন্দ্র সরকার বলেছেন, "শিরাজী সাহেবের ইতিহাসটা ততদূর তারপুন পড়া আছে

১। শ্রী প্রকাশ চন্দ্র সরকার, বৌদ্ধ শিক্ষা পদ্ধতি, ভারতী, আষাঢ়, ১৩২৬।
২। আলোচনা, ভারতী, ভাদ্র, ১৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

কিনা জানি না, যদি পারিত, তাহা হইলে আমাকে তিনি এরূপ নির্দয়ভাবে আক্রমণ করিতেন না।"
এর পর লেখক নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়, চৈতন্যের বৈষ্ণবলীলা ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন। শেষে ভারতের প্রসঙ্গে 'সাইয়ারুল মুতাক্ষরীন', 'হেনরি ইলিয়টের ভারতের ইতিহাস ২য় ভাগ ৩০৫ পৃষ্ঠা, 'তবাকাৎ-ই-নাসিরী', 'শূন্য পুরাণ' গ্রন্থের উল্লেখ করে বলেছেন, "শিরাজী সাহেব যদি এই সব বই পাঠ করেন, তবে তাহার ভ্রম অপনোদিত হইবে এবং সেই সঙ্গে তিনি জানিতে পারিবেন যে, লোককে বুঝিয়া সব কথা বলা উচিত।"

শিরাজী এবং প্রবোধচন্দ্র সরকার উভয়ের পত্র সম্পর্কে পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, "এই দুইটী পত্রেই আক্রমণের ভঙ্গীটা তেমন 'সাহিত্যিকোচিত' হয় নাই। পাণ্ডিত্য অথবা ব্যক্তিগত কটুকাটব্যের স্থান নাই। কোন ঘটনার সত্যাসত্য প্রমাণ করিতে হইলে মূল গ্রন্থাদি হইতেই তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় দুইখানি পত্রেই স্থানে স্থানে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছিল যে আমাদের দাবীর দুইখানি পত্রেই কিছু কিছু বাদ দিতে হইয়াছে।"

আল এসলাম পত্রিকা, ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতা প্রবন্ধটির শেষাংশ প্রকাশিত[১] হবার পর এর প্রতিবাদ করে শ্রী পদ্মনাথ দেবশর্মা লেখেন, "সুলেখক শিরাজী সাহেবের বিগত আষাঢ়-সংখ্যা পত্রিকার প্রথম প্রবন্ধে হিন্দুদিগের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের তাহাতে বিশেষ আপত্তি না -- বিবেকের কণ্ঠমটি বাহির হইয়া যাওয়াই ভাল। প্রবন্ধে অনেক ভুল আছে এবং তাহার মতের বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলিবার আছে---কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তাহার স্থল নহে। তিনি উক্ত প্রবন্ধে হিন্দুদের অপেক্ষাও মোসলমানদের উপরে অভিযোগ কম করেন নাই।"[২]

শিরাজী তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন, হিন্দুর রচিত বিভিন্ন জেলার ইতিহাস গ্রন্থে মুসলমানের কথা অনুপস্থিত। উত্তরে শ্রী পদ্মনাথ দেবশর্মা বলেন, শিরাজীর মন্তব্য শ্রীহট্ট জেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সম্পাদকীয় পাদটীকায় আবদুল মাজিদ চৌধুরীকে এ ব্যাপারে কিছু লিখবার জন্য আহ্বান জানানো হয়।[৩]

আবদুল মাজিদ চৌধুরী হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের রচনায় বিদ্বেষ প্রতিহত করার জন্য "শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, মৌলানা মোঃ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী, মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মৌলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লা, মৌলবী ইছমাইল হোসেন শিরাজী ও মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেবান সমবায়ে বঙ্গদেশে একটী শক্তিশালী কমিটি গঠন করা উচিত" বলে মনে করেছেন।

১। আল এসলাম, কার্তিক, ১৩২৩।

২। শ্রী পদ্মনাথ দেবশর্মা–কিঞ্চিৎ নিবেদন– মোসলমান সাহিত্যিক দলের সমীপে, আল এসলাম, আষাঢ়, ১৩২৪।

৩। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্যিকদের অনুরোধ জানাবেন, যেন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে "অকপট ও স্থায়ী সম্মিলন" অসম্ভব হবে না।[১]

কেবলমাত্র হিন্দুর সঙ্গেই নয়, মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গেও শিরাজী বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং নিজে পত্রিকা প্রকাশের পরও এগুলো অব্যাহত রয়েছে। এভাবে সমকালীন সমাজের রাজনৈতিক সাহিত্যিক ইত্যাদি চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি সংযোগ স্থাপন করেন।

চার

শিরাজী ১৩২৬ সালের মাঘ মাসে নূর পত্রিকা প্রকাশ করেন। ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয় একত্রে, এবং বৈশাখ, ১৩২৭ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ছোলতান পত্রিকায়, ম্যানেজার শিরাজী-লাইব্রেরী, বাণীকুঞ্জ, সিরাজগঞ্জ -এর নামে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, "[illegible]" মাসিক পত্র বেশী নাই, ফুরাইয়া আসিয়াছে, একত্রে ৫ সংখ্যা সডাক মূল্য ১৲ ৭৫ আনা।[২] আমরাও বাণীকুঞ্জে শিরাজী ফ্যামিলী লাইব্রেরীতে নূর পত্রিকার পাঁচটি সংখ্যা একত্রে বাঁধাই অবস্থায় পেয়েছি। ১৩২৬ সালের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা পৃথক করে নিলেই এ পাঁচটি সংখ্যা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেছেন, "কয়েকজন দুর্বৃত্তের বিশ্বাসঘাতকতায় অচিরেই নূরের আলো নিভিয়া যায়।"[৩] তবে বন্ধ হয়ে যাবার অন্যতম কারণ ছিল অর্থনৈতিক। নূর পত্রিকার সহ সম্পাদক ছিলেন শেখ আবদুল গফুর জালালী, এবং প্রকাশক ছিলেন মফিজুর রহমান চৌধুরী, ৩৩ এ, বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা থেকে এটা প্রকাশিত হত। নূরের নিয়মাবলী হিসাবে উল্লেখ করা হয় "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, প্রাচীন কীর্তিকাহিনী, মহাপুরুষ-জীবনী, মুসলমানদিগের শিল্প, শিক্ষা, বাণিজ্য, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ, এক সংখ্যায় সমাপ্ত হইতে পারে (৮/১০ পৃষ্ঠার বেশী নহে) এরূপ ক্ষুদ্র গল্প, নাটিকা ও প্রহসন এবং উৎকৃষ্ট কবিতাবলী সাদরে গৃহীত হইবে। নিরপেক্ষ সমালোচনা ও হিতগর্ভ ব্যঙ্গ কবিতাও প্রকাশিত হইবে। সমাজ, ধর্ম ও দেশের হিতকল্পে কেহ কোনও প্রস্তাব করিলে, স্বাধীনভাবে তাহার আলোচনা করিবার সুবিধা দেওয়া হইবে।"[৪]

নূর পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, পত্রিকার প্রকাশে [illegible] তা অনুভব করা যায়। নূর-এর সমালোচনায় আল এসলাম পত্রিকার সম্পাদক মন্তব্য করেন, "নূরের সম্পাদক [illegible] মোসলেম সমাজের [illegible] কবি বাগ্মী শিরাজী সাহেব। তাঁহার বক্তৃতাদির [illegible] পুস্তিকা হইয়াছে দেখিয়া তাহার

১। আবদুল মালিক চৌধুরী-আলোচনায় সমালোচনা, আল এসলাম, পৌষ, ১৩২৬।
২। [illegible] ছোলতান, ১১ই মাঘ, ১৩৩০।
৩। শিরাজী-চরিত, পৃঃ ৮১-৮২।
৪। নূর, মাঘ, ১৩২৬।

বন্ধুগণ পরম প্রীত হইয়াছেন।"[১] কিন্তু নূর পত্রিকার ভাব, ভাষা, "মুসলমান জাতির জাতীয় জীবনের একটা ভাবময়ী চিন্তা, সমাজের দুঃখ দৈন্য দূরীভূত করিবার একটা অদম্য পিপাসা" সম্পর্কে প্রশংসা উচ্চারণ করলেও এই বিষয়ে শিরাজীর "সাম্প্রদায়িকতা ও ইচ্ছাকৃত বিদ্রোহ" বিষয়ে ইসলাম-দর্শন পত্রিকা নিন্দাজ্ঞাপন করে বলেছে, "কবি ইসমাইল হোসেন সাহেবের ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় পত্রিকাটির প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষের ভাব তাঁহার সম্পাদিত কাগজখানির সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইহা নিন্দনীয় ও আপত্তিকর।"[২] অন্যায়, মোসলেম ভারতের মতও এ পত্রিকাটিই শিরাজীকে সর্বান্তকরণে সমর্থন দিয়েছিল। শিরাজীর চরিত্রে এ বিদ্রোহ ভাবের কথা তখনো ইসলাম দর্শন পত্রিকার জানা ছিল, কিন্তু তখন সমর্থন দেবার কারণ সম্ভবতঃ শিরাজীর মধ্যের স্বপ্নে আপাতঃ দৃষ্টিতে গোঁড়া মুসলমানদের বাহ্যিক মিল দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু শিরাজী যে সময়েও মানসিক বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট হতে দেননি।

শিরাজী "সাহিত্য ও জাতীয় জীবন" প্রবন্ধে সিরাজগঞ্জে কিভাবে মুসলমান সাহিত্যিক সৃষ্টির প্রয়াস করেছিলেন তার উল্লেখ করেন[৩] এবং শেখ হবিবর রহমান অন্যত্র "সর্বান্তকরণে তাহার সমর্থন" করে বলেন, "সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ দিয়া তিনি সিরাজগঞ্জে যে সফলতা লাভ করিয়াছেন, সেরূপ সফলতা বঙ্গে সর্বত্রই যে একান্ত সম্ভবপর ইহা "যশোহর-খুলনা সম্মিলনীয় সাহিত্য সমিতির সংস্রবে থাকিয়া ধ্রুব সত্য বলিয়া উল্লেখ করিতে সাহসী হইতেছি।"[৪]

শিরাজী শেখ হবিবর রহমান সম্পাদিত "বঙ্গনূর" পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় সমালোচনা করেন নূর পত্রিকায় এবং শেখ হবিবর রহমান এর জবাব দেন বঙ্গনূর পত্রিকায়।[৫] শিরাজী বঙ্গনূর পত্রিকার নিরপেক্ষ সমালোচনা করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বঙ্গনূরের সমালোচনার মধ্যে বিদ্বেষভাব প্রকাশিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নূর সম্পাদককে ব্যক্তিগতভাবেও আক্রমণ করা হয়েছে। বঙ্গনূর প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে; নূর পত্রিকা ১৩২৬ সালের মাঘ মাসে অর্থাৎ বঙ্গনূর প্রকাশের দুমাস পর প্রকাশিত হয়

শিরাজী মনে করেন, "সমালোচনা সম্পাদকের নিজেরই করা উচিত। পুস্তক যে বিধাতার সন্নি-ধানে আত্মনিবেদন জানাইবে তাহাও তাহার নিজেরই কাজ। তাহাতে ত সুরুচিশিল্পী খাটে না।"— বঙ্গনূর প্রকাশের যে যৌক্তিকতা দেখান হয়েছে শিরাজী তা মেনে নিতে পারেননি, কারণ তিনি মনে করেছেন এর সাথে ইঙ্গিত হয়, "বর্তমানে যে কয়খানি মাসিক ও সাময়িক পত্র আমাদের সমাজে তাহার দ্বারা আমাদের

১। আল-এসলাম, মাঘ, ১৩২৬।
২। ইসলাম-দর্শন, বৈশাখ, ১৩২৭।
৩। সাহিত্য ও জাতীয় জীবন, আল-এসলাম, ভাদ্র, ১৩২৮।
৪। শেখ হবিবর রহমান—সাহিত্যের সাহিত্যিক সংবাদ, আল এসলাম, শ্রাবণ, ১৩২৩।
৫। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: (ক) নূর, মাঘ, ১৩২৬। (খ) বঙ্গনূর, বৈশাখ, ১৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় জীবনের ও সাহিত্যের কোন উপকার হইতেছে না।—কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি এই ইঙ্গিত নির্বিবাদে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত হইবেন না।"—শিরাজীর দৃষ্টিভঙ্গী যথেষ্ট প্রসারিত ছিল, কিন্তু বঙ্গনূর এটাকে সহজভাবে নিতে পারেনি, এবং প্রথমেই তিক্তভাবে আক্রমণ করে বসেছে, "বঙ্গনূর" প্রকাশের পর উহার হুবহু ব্যর্থ নকল করিয়া লইয়া শীঘ্র সম্পাদিত পত্রের "নূর" নামকরণ করা এমদাদুল হোসেন সাহেবের কতদূর সমীচীন হইয়াছে তাহার আলোচনা আজ আবশ্যক করিব না।"

বঙ্গনূরের তৃতীয় প্রবন্ধ "তৌহিদ বা অদ্বৈতবাদ" সম্পর্কে শিরাজী বলেছেন, এ দুটো "এক কথা হওয়া দূরে থাকুক, উহাদের পরস্পর বিরোধিতা এত অধিক যে, উহাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন কখনো সম্ভব বলিয়া আমাদের মনে হয় না। অথচ প্রবন্ধের শীর্ষদেশেই তৌহিদ ও অদ্বৈতবাদ এক এবং অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।" বঙ্গনূরের উদ্দেশ্য উদার ও অসাম্প্রদায়িক বলে ঘোষণা করা হলেও সম্পাদকের "অস্ট্রিকার বাঙালী মোসলেম কীর্তি" শীর্ষক প্রবন্ধ আলোচনা করে শিরাজী দেখিয়েছেন, পত্রিকার ঘোষিত অসাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সম্পাদক তাঁর নিজের লেখায় বজায় রাখতে পারেননি।

বঙ্গনূর শিরাজীর এ মন্তব্যে বিদ্রূপ প্রবৃত্ত হয়ে উঠেছে, এবং প্রায় ব্যক্তিগতভাবেই শিরাজীকে আক্রমণ করেছে। পবিত্র এবং অপবিত্র উভয় অর্থেই নূর ব্যবহৃত হয়, শিরাজীর নূর পত্রিকা দ্বিতীয় অর্থের দ্যোতক বলে মনে করেছে। কারণ "নূরের প্রথম পৃষ্ঠাতেই একটা অশ্বারোহী প্রতিমূর্তি বিরাজমান। এসময়ের এরূপ একটা হারাম ও নিষিদ্ধ কার্যের দ্বারা যে শীঘ্র মজাটের শোভা বর্ধন করিতে পারে, তাহার সুরূপ সম্বন্ধে সাধারণতঃই লোকের মনে সন্দেহ হয়।"[১] নূর পত্রিকায় ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে, কিন্তু "ইসলামী নূরের আবরণ থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে উহা যে শয়তানী এবং কোফরী নূরের দ্বারাই অনুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, সুতরাং এই অবৈধরসিক অস্পৃশ্য "নূর" দর্শন ও স্পর্শ করা সম্বন্ধে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদিগকে সতর্ক করিবার জন্যই আমরা বঙ্গনূরের এতখানি কলেবরের অপব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম।"

ইসলাম দর্শন পত্রিকাও নূর পত্রিকায় ধর্মবোধের শৈথিল্য সম্পর্কে মন্তব্য করে, কিন্তু বঙ্গনূর ইসলাম দর্শনের সমালোচনায় এ পত্রিকাটির প্রতি পাঠকের সহানুভূতি কামনা করেছে।[২]

বঙ্গনূরে প্রকাশিত "কল্পবৃক্ষ" গল্পে ব্যবহৃত "প্রিয়তমা" শব্দটি সম্পর্কে শিরাজী প্রশ্ন তুলেছেন, "ইহা কি ছাপার ভুল? না "প্রিয়তমা"র নূতন সংস্করণ?" বঙ্গনূর এ কথার উত্তর দিয়েছে, "এ কথাও যাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তিনিও আবার সম্পাদক? তিনিও আবার সমালোচনা করিতে অভিলাষী ইহাই আশ্চর্য।"

এর পরেও শেখ হবিবর রহমানের রচনা নূর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।[৩] এসব বিতর্কের মধ্য দিয়ে সমকালীন মুসলমান সাহিত্যিক সমাজে শিরাজীর অবস্থান সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা করে নেয়া যায়।

১। নূর পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠার জন্য, পরিশিষ্ট, তালিকা।

২। বঙ্গনূর, চৈত্র, ১৩২৭।

৩। (ক) শেখ হবিবর রহমান—সঙ্গীত ও তাহার প্রভাব, নূর, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৬।
(খ) তৌহিদ গীতি (কবিতা)—নূর, বৈশাখ ১৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

শিরাজীর ধর্মীয়, সামাজিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী এদের তুলনায় যথেষ্ট প্রসারিত ছিল, বাঙালী মুসলমান সম্পাদিত অন্যান্য পত্র পত্রিকার তুলনায় "নূর" পত্রিকা সমকালীন পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল[১], এবং শিরাজীর পত্র পত্রিকা সম্পাদনা করার যোগ্যতাও এতে প্রমাণিত হয়েছিল।[২] কাজী নজরুল ইসলামের মেহের নেগার (মাঘ,১৩২৬) মুক্তি (ফাল্গুন-চৈত্র,১৩২৬), রিক্তের বেদন (বৈশাখ,১৩২৭) কবিতার উক্তি (জ্যৈষ্ঠ,১৩২৭) সহ গোলাম মোস্তফা, কায়কোবাদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, ফজলুল হক সেলবর্ষী, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, নিরুপমা দেবী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকের এক কিংবা একাধিক রচনা নূর পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

নূর পত্রিকায় শিরাজী সাহিত্যিক সামাজিক নানাবিধ বিষয়ে বিতর্কের সূত্রপাত করেন। তিনি ধর্ম প্রচারকদের সংকীর্ণতা, অজ্ঞতা, মিথ্যাচার, আঞ্জুমানে ওলামার ভূমিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতি, মোসলেম পাবলিশিং হাউস, সবর হিন্দুদের আধিক্য[৩] বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকীর্ণতা, আঞ্জুমানে ওলামা, আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা ভাষার অনাদর,[৪] উপন্যাসের আধিক্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় মোসলেম শিক্ষা সমিতি, খোতবা পাঠ[৫], ইত্যাদি সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করেন। এগুলোর মধ্যে আঞ্জুমানে ওলামা, আরবী বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি সম্পর্কে পত্রিকান্তরে তাঁর বাদানুবাদ হয়।[৬] মোসলেম পাবলিশিং হাউস সম্পর্কে নূর পত্রিকাতেই[৭] উত্তরে শিরাজীর মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলা হয়, "শিরাজী সাহেবের মন্তব্য পাঠ করিয়া বুঝিলাম তিনি কোম্পানী সম্বন্ধে কোন খবর নিয়েই দেখেন নাই।" ইত্যাদি।

এতে মনে হয়, নূর পত্রিকা স্বল্পায়ু হলেও সাহিত্য ক্ষেত্রে, এমন কি সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রেও মোটামুটিভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

পাঁচ

১৩৩০ সালে নবপর্যায় সাপ্তাহিক ছোলতান পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ভারতী পত্রিকায় বীরবল মন্তব্য করেন, "কলিকাতার রাস্তাঘাটে হিন্দু মুসলমানের ফাটাফাটির ফলে অনেক নূতন সংবাদপত্র জন্মলাভ করেছে।

১। "মোসলেম ভারতের প্রতিষ্ঠা দর্শনে উৎসাহিত হইয়াই হউক, আর আন্তরিক আগ্রহ বশতঃই হউক এ সময়ে আর যেসব মাসিক পত্র প্রকাশিত হয় সে সবের মধ্যে কাহারও বা সাহিত্য সেবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, যোগ্যতা ছিলনা। কাহারও বা যোগ্যতা ছিল অর্থ ছিলনা। কাহারও বা ইহার একটিও ছিলনা, ছিল শুধু নাম প্রচারের উৎকট পিপাসা। এই শ্রেণীর মাসিকের ভিতর সবচাইতে উৎকৃষ্ট ছিল "নূর" আর সবচাইতে অধ্যবসায়ী হইতেছে সহচর।"-প্রবন্ধ-এম, আনসারী-বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩৩০।

২। মুস্তাফা মহবাম শা—অমর উদ্দেশের কবি—বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭১।

৩। নূর, মাঘ, ১৩২৬।

৪। প্রাগুক্ত, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৬।

৫। প্রাগুক্ত, বৈশাখ-১৩২৭।

৬। পূর্বে, পৃঃ ৪২, ৪৭-৫০।

৭। নূর, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

---আর একখানির নাম "ছোলতান"। বুঝতে পারি যে ও হচ্ছে "সুলতানের" দুষ্ট সংস্করণ। দুষ্ট কি হিসেবে ? সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে না ফার্সী ব্যাকরণ অনুসারে। সংস্কৃতের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। ফার্সী উচ্চারণ অনুসারেও বোধ হয় "সুল" "ছোল" হয় না। ---আমার ভয় যে, "ছ" সংবাদপত্রে প্রশ্রয় পেয়ে শেষটা "সাহিত্যের" ঘাড়ে না চড়ে বসে। বর্ণ বিভ্রাটের প্রথম সাহিত্যিক ফল এই বর্ণ বিভ্রাট।"[১]

মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সংগে সিরাজী যুগ্মভাবে ছোলতান পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন।[২] কেউ কেউ মনে করেছেন সিরাজী "হাবলুল মতীন" পত্রিকার সহ সম্পাদক ছিলেন।[৩] "হাবলুল মতিন" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী। ১৯১২ (?) সালে এটা প্রকাশিত হয়।[৪] আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন, সিরাজী ছোলতান পত্রিকার অংশীদারও ছিলেন। প্রধানতঃ সম্পাদনা করতেন ইসলামাবাদী এবং সিরাজী কলিকাতায় এসে আতিথ্য গ্রহণ করতেন।[৫] কিন্তু এ ধারণা বোধ হয় ঠিক নয়, সিরাজী এম, সেরাজুল হককে লেখেন "একবারে "সোলতানের" জন্য সমাজের সহিত বহু টাকা আদায় করিয়া ইসলামাবাদীকে দিয়াছিলাম।"[৬] বিভিন্ন সময় ছোলতানের সংগে সম্পর্ক থেকে মনে হয়, সিরাজী ছোলতান পত্রিকার অংশীদার ছিলেন না, এমন কি সম্পাদনাও করতেন না। সামাজিক ও সাহিত্যিক খ্যাতির জন্য ছোলতান কর্তৃপক্ষ সিরাজীর নাম পরিচালক হিসেবে ব্যবহার করেছেন মাত্র। অধিকাংশ সময় কলিকাতার বাইরে থেকে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালনা সিরাজীর পক্ষে সম্ভবও ছিল না।

কিন্তু "ছোলতানের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা" সিরাজী সিরাজগঞ্জে এ পত্রিকার গ্রাহক বাড়াবার চেষ্টা করেন। তাঁর চেষ্টাতেই সিরাজগঞ্জ এলাকা থেকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ৪০০ গ্রাহক হবার সম্ভাবনা দেখা যায়।[৭] হিন্দু সমাজের ওপর সিরাজীর প্রভাব কাজে লাগিয়ে সিরাজগঞ্জে হিন্দু গ্রাহক সংগ্রহের চেষ্টা বিফল হয়নি। ছোলতান মন্তব্য করেছে, ছোলতানের বক্তব্য ছিল, এজন্য "হিন্দু মোসলমানের সম্প্রীতি আবশ্যক, আর এই একতার প্রধান অন্তরায় হইতেছে ভারতের মিথ্যা ও কল্পিত ইতিহাস। সুতরাং সত্য ইতিহাস প্রকাশ করিয়া তাহাদের মনের মলিনতা দূর করা আবশ্যক।"[৮] ছোলতান পত্রিকা ইতিহাস সম্পর্কিত ও জাতীয় চিন্তামূলক রচনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে, এ ধরনের রচনার অন্যতম লেখকও ছিলেন সিরাজী।

১। হিন্দু মুসলমান। দাঁড়ার সাহিত্যিক কারাকান, ভারতী, আশ্বিন, ১৩৩০।
২। পরিশিষ্ট টীকাটিপ্পনী।
৩। (ক) মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক, পৃঃ ২৫০।
   (খ) সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, পৃঃ১৬।
৪। মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, পৃঃ ১০৪।
৫। (ক) আবুল মনসুর আহমদ—আত্মকথা, ঢাকা খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৭৮, পৃঃ ৩৩৪।
   (খ) আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃঃ ৫২।
৬। সিরাজী-চিত্রাবলী, পৃঃ ৫৬।
৭। ছোলতান, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।
৮। ছোলতান, ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

শিরাজী ছোলতান পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও নিজস্ব মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অবলম্বন করেছেন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে বাঙালী মুসলমানের স্বার্থ বিপন্ন হবার আশঙ্কা দেখা দিলে শিরাজী বাঙালী স্বধর্মীদের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে মোহাম্মদী, এমন কি ছোলতান পত্রিকার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়। শিরাজী ছোলতান পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে মোহাম্মদী ছোলতান পত্রিকার নিকট শিরাজীর ভূমিকার জন্য কৈফিয়ৎ চায়। উত্তরে ছোলতান মন্তব্য করেছে, "আমরা কেন, বাঙলার সকলেই জানেন, জনাব মৌলবী শিরাজী সাহেব চিরকালই অতি স্বাধীনচেতা ব্যক্তি—অন্যের স্বাধীনতায় তিনি কোনকালেই হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি একদিনের জন্যও "ছোলতান" সম্পাদককে মত পরিবর্তন করিয়া দেশদ্রোহী সাজিবার পরামর্শ দেন নাই।" এ পরিপ্রেক্ষিতে শিরাজীর বক্তব্য, জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবের জন্য ব্যক্তিবিশেষ দায়ী হতে পারেনা, ছোলতান শিরাজীর এ বক্তব্যকে যথেষ্ট বলে মনে করেছে।[১] তুর্কী মুসলমান মন্ত্রীকে মন্ত্রীত্ব পদে বহাল রাখার সুবিধা কিংবা অসুবিধা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে শিরাজীও এতে অংশ নেন। শিরাজী মন্ত্রীদের পক্ষ নেন এটাও 'মোহাম্মদী' পছন্দ করেনি। মোহাম্মদীর পূর্বেকার কৈফিয়তের জের টেনে দীর্ঘ মন্তব্যের এক অংশে ছোলতান বলেছে, "ছোলতানের সহিত যাহারা সহানুভূতি রাখেন ছোলতানে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেন, গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন বা অন্য প্রকারে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেন, তাঁহারা রাজনৈতিক ও অন্যান্য সকল বিষয়েই যে ছোলতানের সহিত একমত হইতে পারিবেন সেরূপ আশা করা অস্বাভাবিক। রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বভাবতই ভিন্নমতের লোক থাকেন।--ছোলতানের সঙ্গে হিতৈষীবর্গের সকল সময় সকল বিষয় একমত হওয়া প্রয়োজন নহে এবং তাহা সম্ভবপরও নহে।—অতএব একদিকে যেমন উল্লিখিত বিষয়ের শিরাজী সাহেবের ব্যক্তিগত নীতিকে 'ছোলতানের' নীতি মনে করা অনুচিত, পক্ষান্তরে শিরাজী সাহেবের স্বাধীন মতের জন্য আমরা তাঁহার নিন্দা করিতেও প্রস্তুত নহি।"[২]

শিরাজীর সঙ্গে ছোলতানের সম্পর্ক এখানে স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তাঁর গল্প-কবিতা, প্রবন্ধ যেমন ছোলতানে প্রকাশিত হয়, তেমনি শিরাজীর সঙ্গে সম্পর্কের জন্য ছোলতান পত্রিকাও সম্ভবত কিছুটা জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

ছয়

সাহিত্য রচনার পাশাপাশি সাহিত্য সংগঠনের গুরুত্ব আরোপ করে শিরাজী জানান এক সময় সিরাজগঞ্জে কতকগুলি মুসলমান তরুণ নিয়ে তিনি এর সূত্রপাত করেন। ক্রমে মোহাম্মদী, ছোলতান ও আল এসলাম পত্রিকার পৃষ্ঠায় সিরাজগঞ্জের বেশ কিছু নতুন সাহিত্যিকের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়।[৩] সিরাজগঞ্জে

১। ছোলতান ১৫ই চৈত্র, ১৩৩০।
২। প্রাগুক্ত, ২২শে চৈত্র, ১৩৩০।
৩। সাহিত্য ও জাতীয় জীবন, আল-এসলাম, আষাঢ়, ১৩২৩।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর বাসভবনে নিয়মিতভাবে প্রায় প্রতি শুক্রবারেই সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হত। এ আসরে যারা যোগ দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন এম, কে আবদুল হক, আবুল মনসুর এলাহী বখশ, গোলাম [illegible] সোহানী, শেখ আবদুর গফুর জালালী, [illegible], চন্দ্র[illegible] প্রমুখ ব্যক্তি, এবং এদের মধ্যে অনেকেই টাংগাইল, শাহজাদপুর প্রভৃতি দূরবর্তী এলাকা থেকেও এসেছেন।[১] এদের কারো কারো রচনা সিরাজীর "নূর" পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে।

গোলাম সাকলায়েন মনে করেছেন, ইংরেজী সাহিত্যে ডক্টর জনসনের মত নিয়মিত সাহিত্য আলোচনা চক্রের মাধ্যমে সিরাজীও নব্য দিক সাহিত্যিক সৃষ্টি।[২] সিরাজগঞ্জের [illegible] মুসলমানদের একটি জনসভায় সিরাজীর সভাপতিত্বে গৃহীত অন্যতম একটি প্রস্তাবে বলা হয় "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত আনন্দমঠ এবং রাজসিংহ এই দুই গ্রন্থখানি মোসলমান বিদ্বেষ ও রাজদ্রোহিতার উৎস বলিয়া ঐ পুস্তক দুইখানি বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত।"[৩]

সিরাজী তাঁর কাব্যে রাজভক্তি কখনও দেখিয়েছেন, কিন্তু সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রাজদ্রোহিতার উৎস বলার কারণ হল এ দুটো উপন্যাসের বহুলপ্রচার মুসলমানদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ সৃষ্টি করেছে এবং রাজশক্তির সহায়তা ছাড়া এর প্রচার বন্ধ করার অন্য কোন উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও মুসলমানদের হীনমন্যতা দূর করার জন্য সিরাজী প্রেমাঞ্জলি[৪] দিয়েছেন, এবং প্রায় একই কারণে নোবেল পুরস্কার পাবার পর রবীন্দ্রনাথ যখন চারদিকে প্রচুর প্রতিষ্ঠা ও অভিনন্দন পেয়েছেন সে সময় সিরাজী কায়কোবাদকে অভিনন্দন জানাবার জন্য এগিয়ে এসেছেন। সৈয়দ এমদাদ আলীর মহাশ্মশান কাব্যের বিরূপ সমালোচনার[৫] উত্তরে কায়কোবাদকে সমর্থন করে সিরাজী মহাশ্মশান কাব্যের সমালোচনা প্রকাশ করেন। তিনি কায়কোবাদকে জরীর টুপি ও সোনার দোয়াত কলম দেবার উদ্যোগ নেন এবং এজন্য নিজে পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দেবার প্রস্তাব করেন।[৬] সিরাজী "নূর" পত্রিকায় 'হক থোক্কু' ছদ্মনামে 'ঢেকি অবতার' কবিতা দিয়ে সমালোচক সৈয়দ এমদাদ আলীকে ব্যঙ্গ করেছেন,[৭] সৈয়দ এমদাদ আলীও সিরাজীকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি।[৮] কায়কোবাদকে সম্বর্ধনা দেবার উদ্যোগে সিরাজী অবশ্য প্রশংসাও পেয়েছেন।[৯]

১। অধ্যাপক এম, এ, সাঈদ—কর্মবীর সেরাজুল হক, পাবনা, [illegible] প্রকাশনা, ১৯৬৬, পৃঃ ২১-২২।
২। গোলাম সাকলায়েন—[illegible] সিরাজগঞ্জ, [illegible] উ. মহকুমা, পৃঃ ৩৪-৩৭।
৩। মোহাম্মদী, ১৫ই চৈত্র, ১৩৩৩।
৪। ক) আবুল কালাম শামসুদ্দীন—অতীত দিনের স্মৃতি, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮, পৃঃ ১০৪-৫।
৪ খ) আবদুল কাদির—ভূমিকা, মহাশ্মশান কাব্য ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৮৮।
৫। সৈয়দ এমদাদ আলী—মহাশ্মশান কাব্যে ঐতিহাসিক ও জাতীয় ভাব, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩২৬।
৬। মোহাম্মদী [illegible] শ্রাবণ, ১৩২৫।
৭। নূর, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৬।
৮। সৈয়দ এমদাদ আলী—মহাশ্মশান কাব্যে ঐতিহাসিক ও জাতীয় ভাব, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩২৬।
৯। সিরাজী—[illegible], পৃঃ ৯৪-৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

কায়কোবাদের মত নজরুলের উদীয়মান কবিপ্রতিভাকেও সিরাজী আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছেন। নজরুলের কবিতা পড়ে খুশী হয়ে সিরাজী তাঁকে দশটি টাকা পাঠান[১] এবং লেখেন, "আমার থাকিলে দশ হাজার টাকা পাঠাইতাম।" পরে ফরিদপুর প্রাদেশিক কনফারেন্সে সিরাজীর সঙ্গে নজরুলের সাক্ষাৎ হয়। বঙ্গীয় মোসলেম তরুণ সঙ্ঘের সঙ্গেও উভয়ে যুক্ত ছিলেন।[২] ১৯৩২ সালে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে নজরুল সিরাজীকে এভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন, "সিরাজী সাহেব ছিলেন আমার পিতৃতুল্য। তাঁহার সমস্ত জীবনই ছিল অনলপ্রবাহ। আমার রচনায় সেই বহ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রকাশ। ফরিদপুরে সিরাজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারকে নজরুল মনে করেছেন "যেন বহুকাল পরে পিতা তাঁহার হারানো পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়াছেন" এবং এখন সিরাজগঞ্জে এসে "এ যেন হজ্জ করিতে আসিয়া কাবা শরীফ না দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া। -- তাঁহারই প্রেরণায় সমস্ত আমরা -- তরুণেরা এই যৌবনের আরাফাত ময়দানে আসিয়া মিলিত হইয়াছি।[৩]

১৯২৬ সালে সিরাজী এম, সেরাজুল হককে লেখেন, "তোমার আত্ম শক্তিতে পড়িয়া খুব খুশী হইলাম আরো লিখ।"[৪] এই এম, সেরাজুল হক ১৯৩৫ সালে সিরাজীর জীবনী 'সিরাজী-চরিত' প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীকালে 'অভিযান' পত্রিকায় সিরাজী সম্পর্কে আরো কিছু প্রবন্ধ লেখেন। সিরাজী 'রক্তিমপুষ্পিতা, মালেকা, কনোজকুমারী, মুৎফর রহমানের 'প্রকাশ' কাব্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থের মুখোবন্ধের পর ভূমিকা লিখে দেন[৫] এবং মুহম্মদ এনামুল হককে 'বঙ্গে সূফী সাহিত্য' গ্রন্থ প্রণয়নে সহায়তা করেন। মোহাম্মদ ইয়াছিন তাঁর 'সুর্গোদ্যান' উপন্যাস সিরাজীর নামে উৎসর্গ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।[৬]

মুসলমান সাহিত্যিক সৃষ্টির জন্য সিরাজী যে সাহিত্য কর্মীর দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছিলেন তা অনেকাংশেই ফলপ্রসূ হয়েছিল। সিরাজী জীবদ্দশাতেই বাংলা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে মুসলমান সাহিত্যিকদের ক্রমবর্ধমান আবির্ভাব দেখে গেছেন।

১। সিরাজী মোসলেম জগৎ 'পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষে টাকা পত্রে উপহার দেন। দ্রষ্টব্য, সিরাজী-চরিত, পৃঃ ৯৬।
২। পূর্বে, পৃঃ ৪৭।
৩। অনলপ্রবাহের উৎস কেন্দ্রে, পৃঃ ৭-৮।
৪। কর্মবীর এম, সেরাজুল হক, পৃঃ ২৩।
৫। ক) সিরাজী-চরিত, পৃঃ ৯১।
খ) ১৩২২ সালে প্রকাশিত মুৎফর রহমানের 'প্রকাশ' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে, লেখেন, "আমার আশীর্বাদ ও প্রীতি সহ এই উদীয়মান কবিকে সাহিত্যকুঞ্জে অভিনন্দন করিতেছি।
গ) শফিউদ্দীন আহমদের কনোজকুমারী গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, "বিজাতীয় আক্রমণ হইতে মোসলেম-গৌরব ও চরিত্র রক্ষা করিবার জন্য এই শ্রেণীর শক্তিশালী লেখক যত আবির্ভূত এবং এই শ্রেণীর উপন্যাস যত রচিত হয়, ততই মঙ্গল। অবশেষে আমরা এই নবীন উদীয়মান শক্তিশালী লেখকের জয় ও মঙ্গল কামনা করিয়া তাঁহাকে মোসলেম সাহিত্য কুঞ্জে সাদরে আহবান করিতেছি।"
৬। ক) বঙ্গে সূফী-প্রভাব, নিবেদন, পৃঃ ৴
খ) "যাহার ঐকান্তিক উত্তেজনা বলেই সম্পূর্ণ অযোগ্যতা সত্ত্বেও সাহিত্যের পুণ্য ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে সাহসী হইয়াছিলাম সেই পরম হিতৈষী বন্ধুবর বাগ্মীপ্রবর মুসলমানদের জাতীয় কবি জনাব ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেবের করকমলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত হইল।" দ্রষ্টব্য, উৎসর্গ, মোহাম্মদ ইয়াছিন প্রণীত-সুর্গোদ্যান, কলিকাতা, মখদুমী লাইব্রেরী, প্রকাশকাল (?)

Dhaka University Institutional Repository

সাত

শিরাজীর জীবনকাল তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়ঃ প্রথমে ১৮৮০ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত। এ পর্বে শিরাজী নিজেকে গঠনমূলক কাজে নিবেদিত রেখেছেন। এ সময়ে তাঁর শিক্ষা, বাগ্মিতার বিকাশ, সাহিত্য সৃষ্টি ও বৃহত্তর জীবনের সংগে সংযোগের সূচনা, প্রচার ও বাগ্মিতাকে পেশারূপে গ্রহণ, ধর্মদেশ ও জীবন সম্পর্কে রোমান্টিক ভাবনার রূপকিতার ইত্যাদি রয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি বৃহত্তর দায়িত্ব এবং কর্মক্ষেত্রের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন, সংক্ষেপে একে বলা যায় প্রস্তুতিপর্ব।

দ্বিতীয় পর্যায় ১৯০০ সাল থেকে ১৯১২ সালের কারামুক্তি পর্যন্ত। এ সময়ে শিরাজী সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজচিন্তায় দ্বিধাহীন, নিঃশঙ্ক, তাঁর অন্তরে এবং বাইরে দুটি দিগন্ত সর্বত্র সম্প্রসারিত। বাস্তব জীবনে প্রবেশ করার ফলে নিজের মধ্যেই বাস্তব ও রোমান্টিকতার সংযোগ ঘটিয়েছেন এবং সেটাই সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজচিন্তায় নবশক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছে। কোন বাধাকেই তিনি বাধা বলে মানতে চাননি। রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন ও কারাবরণ করেছেন, একে বলা যায় সূচনা পর্ব।

তৃতীয় পর্যায়ে রোমান্টিকতার সংগে বাস্তবের সংযোগ আরো দৃঢ় এবং ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তুরস্ক সম্পর্কে অতিশয় কল্পনা বিহার বাস্তবে পরিণত হবার ফলে নিজেকে, নিজের চারপাশের সমস্যাকে, মানুষকে, সমাজকে, রাজনীতিকে সরেজমিনে নিকট থেকে দেখবার, এর সংগে সহাবস্থান করে চলবার প্রয়োজন হয়েছে। এক সময় শিরাজী প্রতিকূলতাকে অস্বীকার করে সামনে চলতে চেয়েছেন, পরিবেশের প্রতিকূলতা, দারিদ্র্য ও অন্যান্য বাস্তব প্রয়োজনে নিজের অন্তরের মধ্য থেকেই প্রতিরোধের সন্ধান করেছেন। সেজন্য দ্বিতীয় পর্বের অগ্নি কণ্ঠস্বর এ পর্যায়েও জোয়ার হয়ে আবার স্তিমিত হয়ে গেছে। সেই সংগে দুঃখবোধ, প্রচার এবং বাগ্মিতাজাত প্রতিক্রিয়া বারবার তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে প্রস্তুতি ও সূচনাপর্বের মিশ্রিত অবস্থায়।

শিরাজীর যুগটিই এমন ছিল যা তাঁর স্রষ্টার নিকট থেকে সব্যসাচী হবার দাবী করেছিল। শিরাজী এজন্য নিজের সত্তাকেই নানা ভাগ করে নিয়ে বিভিন্নভাবে তা মেটাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রচারকের জীবন এমনভাবে তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যে তাঁর অনুরক্ত স্রষ্টা প্রবল থাকতে পারেনি। রাজনীতিতে যা পেয়েছেন সাহিত্যে বাস্তবতঃ তা পায়নি এটা স্বাভাবিক নয়। জীবনের বিচিত্র কর্মে যে সময় তিনি দিয়েছেন সাহিত্যের জন্য তা দেননি, সাহিত্যকে কর্ম ও প্রচারক জীবনের একাংশ করে তুলতে গিয়েই এ বিপত্তির সৃষ্টি করেছেন।

শিরাজীর "সমগ্র জীবন তাঁর কোনো একটি বিশিষ্ট এলাকার কীর্তির চেয়ে মহৎ ছিল"[১] মনে করা যেতে পারে।

১। মুনীর চৌধুরী—ইসমাইল হোসেন শিরাজী, কয়েকটি জীবন, পৃঃ ১২০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
সংযোজন সংখ্যা A197884

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালী উপন্যাসিকদিগের ধর্ম এবং ব্রতই হইয়াছে—মুসলমান চরিত্রকে হেয় এবং নীচ করিয়া অঙ্কিত করা।"[১] সিরাজী উপন্যাসকে ইতিহাসের অপ্রধান বিষয় মনে করেছেন, "মুসলমান জাতির ইতিহাস এত বিরাট, এত বিচিত্র এবং ঘটনাবহুল যে, তাহাদিগের পক্ষে উপন্যাসের তেমন কোনও আবশ্যকতা নাই।" কিন্তু এ সময়ে প্রকাশিত প্রচুর উপন্যাসের স্রোতে মুসলমান পাঠকেরা আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ছিল এবং এ অবস্থা থেকে তাঁদের উদ্ধারের জন্য "জাতীয় গৌরবপূর্ণ আদর্শস্থানীয় উপন্যাস রচনা করা একান্ত কর্তব্য" মনে করলেন। এ কর্তব্যের আহ্বানেই তিনি "সেই ভীষণ গ্রীষ্মের মধ্যে মশার ক্রোড়ে মশারির মধ্যে উপবেশন করিয়া "রায়নন্দিনী" রচনা করিতে প্রবৃত্ত" হন। "চন্দননগরে সঙ্গীহীন নির্জন প্রবাসে ভাগীরথীর বালুচর, "খরস্রোতা গম্ভীর গাঙ্গবারি—সম্পৃক্ত সমীর" ও "প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁকে সাহিত্য চর্চায় প্রেরণা দিয়েছিল।

রায়নন্দিনী বাহ্যতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের অংশে কিছু সাদৃশ্য অনুসরণ করে অনেকে রায়নন্দিনী উপন্যাসকে দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের জবাব বলে মনে করেছেন, সিরাজীর স্বীকৃতিও এ সংশয়কে দৃঢ় করেছে।[২] অন্যত্র আনন্দমঠ ও রাজসিংহ উপন্যাস দুটি প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানালেও[৩] দুর্গেশনন্দিনীর ব্যাপারে তিনি নীরব। প্রকৃতপক্ষে দুর্গেশনন্দিনী গ্রন্থের অসাধারণ জনপ্রিয়তাকে অবলম্বন করে তিনি উপন্যাসে অন্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন।

১। আত্মকাহিনী, সাধনা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮।

২। "বগুড়ার পাবলিক লাইব্রেরীর সেক্রেটারী মুন্সী সেলামতউল্লা সাহেবের উৎসাহ এবং খরচ বহনের প্রবল প্রতিশ্রুতিতে আমি বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী উপন্যাস রায়নন্দিনী রচনা করি। রচনা শেষে মুন্সী সেলামতউল্লা সাহেবকে যখন বিজ্ঞাপিত করিলাম তখন তিনি নীরব হইলেন। অতঃপর নিজে যাইয়া দেখা করিলাম কিন্তু হায়! তিনি আর প্রতিশ্রুতি পালনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন না। অতঃপর দীর্ঘকাল পরে বহু চেষ্টা ও যত্নে বন্ধুবর আমীর হোসেন খান সাহেবের সাহায্যে ডি-সরকার কোং থেকে অতি সামান্য অংশ ও প্রতিশ্রুতিতে ছাপিতে দেই। এই কোং বহু কষ্টেই প্রায় ২॥ বৎসরে এই পুস্তক বাহির করিতে সমর্থ হয়। এক্ষণে আমার মহাশিক্ষা কাব্য এবং তারাবাঈ উপন্যাস ছাপিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও সাহায্যকারী কিংবা প্রকাশক পাওয়া যাইতেছে না। আমার নিজের পক্ষে বিরাট সংসার চালাইয়া এই সমস্ত পুস্তক ছাপা করা একেবারেই অসম্ভব।"—বাংলা সাহিত্যে মোসলমান পশ্চাৎপদ কেন? কার্তিক বই, ৫৫০—ক।

৩। ছোলতান, ১৫ই চৈত্র, ১৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজীর শাসন ছিল শিবাজী উৎসব ও প্রতাপাদিত্য উৎসব ইত্যাদি কেন্দ্র করে সমকালীন ঘটনা প্রবাহের মন্ত্রণা।[১] বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া রবীন্দ্রনাথের বউ ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩) থেকে অনুপ্রাণিত হয়েও তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেন, যদিও তাঁর মতে তিনি মুসলমানদের জন্য বিকল্প আদর্শ অনুসন্ধান করছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সেক্ষেত্রে তিনি সফল হননি। বীরত্বের অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য এক সময় শিবাজী বর্গি বিজেতা মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীকেও দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন।[২]

স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালীর প্রত্যাবর্তনে বাঙালী বীরের ও বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য সন্ধান ও সৃষ্টি অপরিহার্য হয়েছিল, বারভূঁইয়াদের মধ্যে কেবল প্রতাপাদিত্যই বাঙালী ছিলেন, তাই তাঁকে শিবাজীর পাশাপাশি বড় করে তুলতে হয়েছিল। বাংলায় বীরপূজার অভিব্যক্তিরূপ প্রতাপাদিত্য উৎসব শুরু হয় ১৩১০ সনের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে, সরলাদেবী এর অন্যতম উদ্যোক্তা। এ উৎসব থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং হরচন্দ্র ঘোষ 'প্রতাপাদিত্য' নাটক লিখেন। এ বছরের শ্রাবণ মাসে উদয়াদিত্য উৎসবও প্রতিপালিত হয়।[৩] প্রতাপাদিত্য নাটকের বিপুল জনপ্রিয়তা[৪] থেকে মনে হয় বাংলায় বীর হিসাবে প্রতাপাদিত্য মর্যাদা পেয়েছেন। প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে বাঙালীর পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় 'প্রতাপাদিত্য' উৎসবের আগে ও পরে লিখিত উপন্যাস সমূহের মধ্যে,[৫] রবীন্দ্রনাথ বউ ঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসের ভূমিকায় এর একটি চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন।[৬] রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ছিল

১। ক) পূর্বে, পৃঃ ২১।

খ) "ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা—ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা—প্রতিবাদ এবং প্রতিবাদ সত্ত্বে ভারতের হিন্দু জাতির জাতীয় জীবন গঠন এবং সহা শক্তিলাভের জন্য তাহাদের আপ্রাণ চেষ্টা—স্বদেশী আন্দোলন—জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠন—শিবাজী এবং প্রতাপাদিত্য উৎসব—এই সমস্ত কার্য্য এবং অনুষ্ঠানের মূলে কি গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও সংকল্প এবং রাজনৈতিক চাতুর্য বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা কি তোমরা একবারের জন্যও চিন্তা করিবে না? তোমরা কি এই প্রবল বিরাট তুমুল জন কোলাহলের মধ্যে এমনই বধির হইয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত রহিবে?"—কার্তি ২ বষ, ৫৫৩-৪।

গ) —"হিন্দু সমাজ এই সময় নিশ্চেষ্ট এবং সুপ্ত সত্য [illegible] পাইয়া জাতীয় জীবন ও শক্তি গঠন করিবার জন্য শিবাজী ও প্রতাপাদিত্য ইত্যাদি উৎসব সৃষ্টি করিয়া তদুপলক্ষে সর্বান্তঃকরণে অনুপ্রাণিত হইয়া ভাবী উত্থানের পথ পরিষ্কার করিতেছে। আর হতভাগ্য আমরা আলস্যে অবহেলায় দিনযাপন করিতেছি।"—মুসলমান সমাজের শিক্ষা সমস্যা, কার্তি ২ বর্ষ, ৫৫০-৫।

২। বীরপূজা, অমরভারত, ১ম বর্ষ, পৃঃ ৪৭-৫৫।

৩। শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল—জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬১, পৃঃ ৫।

৪। ক) N.K.Bhattasali-Bengal Chief's struggle, Calcutta, 1928, pp.27-28.

খ) "কিন্তু দুঃখের বিষয়, [illegible] মহারাজা প্রতাপাদিত্যের [illegible] নাই। ইহাতে মুসলমানদের যে অংশ চিত্রিত বা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা না, একটা উচ্চ আদর্শের ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় নাই"—কাজী ইমদাদুল হক—[illegible] ক্ষীরোদের প্রতাপাদিত্য, নবনূর, আষাঢ়, ১৩১২।

৫। প্রতাপাদিত্য উৎসবের আগে ও পরে লিখিত উপন্যাস সমূহের মধ্যে রয়েছে, (ক) প্রতাপচন্দ্র ঘোষ—বঙ্গাধিপ পরাজয়, ১৮৬৯ (খ) হরিশ্চন্দ্র মিত্র—প্রতাপ সংহার ১৮৭১ (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বউ ঠাকুরাণীর হাট ১৮৮৩ (ঘ) রোহিনী কুমার গুপ্ত—বঙ্গবনিতা, দ্বি-সং ১৮৮৯ (ঙ) হারানচন্দ্র [illegible]—বঙ্গের শেষ বীর প্রতাপাদিত্য—১৯১৭, (চ) [illegible]—প্রতাপাদিত্য [illegible] (?) ইত্যাদি।

৬। "স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে একসময় বাংলাদেশের আদর্শ বীর চরিত্র রূপে খাড়া করবার চেষ্টা হয়েছিল। এখনও তার নিবৃত্তি হয়নি। যখন সে সময় তার সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি [illegible] তিনি অন্যায়কারী, অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তার ছিল কিন্তু শক্তি ছিল না। সে সময়কার ইতিহাস লেখক এর উপরে পরবর্তীকালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। [illegible] এ বই অল্প বয়সে লিখেছিলুম, তখনো তার পূজা প্রচলিত হয়নি।"—ভূমিকা, বউ ঠাকুরাণীর হাট, রবীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৩, পৃঃ ৩৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গাধিপ পরাজয়-এর সঙ্গে তারাচন্দ্রের অনুবাদের ভাব। এবং রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) গ্রন্থে প্রতাপাদিত্য চরিত্রের অন্ধকারময় দিকটিই তুলে ধরা হয়েছে।[১] প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য সাহিত্যিক গ্রহণ করতে পারেননি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বোধিত নির্লিপ্ততা সম্পূর্ণ বজায় ছিল কিনা সে সম্পর্কে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন।[২] ভারতচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে ধারণা ভেঙে গেছে হারাণচন্দ্র রক্ষিতের "বঙ্গের শেষ বীর প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি গ্রন্থে। এখানে এসে প্রতাপাদিত্য জাতীয় বীরের আসন পেয়েছেন। ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "প্রতাপ-আদিত্য" নাটকে হিজলীর ঈশা খাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে, ঈশা খাঁর সঙ্গে একত্রে দেশোদ্ধারের সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছে।[৩] তখনকার রাজনৈতিক প্রয়োজনে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলনের প্রয়াসও হয়েছে, যদিও এ রাজনৈতিক মিলন শহরে এক শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, গ্রামাঞ্চলে তার বিশেষ কোন প্রভাব পড়েনি।[৪]

সাহিত্যে প্রতাপাদিত্যের এত মূল্যায়ন সত্ত্বেও সবাই চিন্তারই প্রতিফলন মাত্র। শিবাজীর মত নিয়ে বাংলার নিজস্ব গৌরব প্রকাশের বাসনা সম্পর্কে সন্দেহ একেবারে ছিল না তা নয়।[৫] প্রতাপাদিত্যের ক্ষেত্রে সে সুবিধা ছিল না, কিন্তু সাহিত্যিকদের নিকট থেকে তিনি বিপুল সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন প্রতাপাদিত্য চরিত্রের বীরত্ব ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সাহিত্য রাজনীতি ও সমাজে প্রচারের ব্যাপারে ঐতিহাসিকেরা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।[৬]

প্রতাপাদিত্য কখনো মোগল সৈন্যকে পরাজিত করেননি, বরং তাঁর পুত্র উদয়াদিত্য যুদ্ধের শুরুতেই পলায়ন করেন।[৭] এমন কি কোন কোন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, প্রতাপাদিত্যকে দিয়ে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করানো, মধ্যযুগের লেখকদের নিকট ছিল দিবাস্বপ্নের মত।[৮] অন্যদিকে ঈশা খাঁর ক্ষেত্রে এর বিপরীত চিত্রটি চোখে পড়ে, ইতিহাসে প্রতাপাদিত্য যেমন কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতক[৯] হিসাবে উল্লিখিত,

---

১। "প্রতাপাদিত্যের ভাগ্য পর পর প্রসন্ন হইল এবং মন্ত্রী বুঝিল সেই মত।" রামরাম বসু-প্রতাপাদিত্য চরিত্র, কলিকাতা, রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ১০৪০, পৃঃ ৫০।

২। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ-ঐন্দ্রজালে প্রতাপাদিত্য, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১০৭০।

৩। ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-প্রতাপ-আদিত্য, ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, কলিকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃঃ ৪৯-৫০।

৪। মজিবর রহমান-[illegible], কলিকাতা, মখদুমী লাইব্রেরী, ১৩২৬, পৃঃ ১৫।

৫। প্রফুল্লচন্দ্র প্রসাদ পালগুপ্ত-ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, বুকল্যান্ড, পৃঃ ৬৫।

৬। ক) Jadunath Sarkar(ed) History of Bengal, Vol.II, Dacca, Dacca University, 1948, pp.225-264

খ) Bengal Chief's struggle, p.29.

গ) শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স, য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, পরিবর্ধিত দ্বি, সং, ১০৮০, পৃঃ ২০৭-৮।

৭। History of Bengal, Vol.II, p.225-26.

৮। Bengal Chief's struggle, p.33.

৯। M.I. Borah(ed)- Baharistan-i-Gaibe, Vol.I, Assam, Government of Assam, 1936 pp.14, 27, 123 etc.

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি মুসাহিবকে 'জমিদারদের প্রধান ঈশা খাঁর পুত্র'[১] বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক বিবরণেও ঈশা খাঁকে ভৌমিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[২]

প্রতাপাদিত্যের বিপরীতে ঈশা খাঁকে বীর চরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা সিরাজীর উদ্দেশ্য ছিল, রায়নন্দিনী গ্রন্থে একে তিনি উপন্যাসের মোড়কে পরিবেশন করেছেন। অন্য একটি দিক হল, হিন্দু সাহিত্যিকদের হাতে ইতিহাসের হিন্দু নামাংকিত চরিত্রের বন্দনা ঘটেছিল, এসবের বিপরীত একটি দৃশ্য সৃষ্টি করারও আকাঙ্ক্ষা সমকালীন মুসলমান সমাজের একাংশের ছিল। প্রতাপাদিত্য চরিত্রকে কলঙ্কিত করতে সিরাজীর কোন অসুবিধা হয়নি, সমর্থন হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' গ্রন্থের কথা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।[৩] এছাড়া স্বর্ণময়ী চরিত্র সৃষ্টিতেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে।

দুই

বাংলায় মসনদ ভূঁইয়াদের ইতিহাস অনেকাংশে রহস্যাবৃত। প্রচলিত কাহিনীতে চিত্রিত ঈশা খাঁর সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক ক্ষীণ। সিরাজী উপন্যাসের প্রয়োজনে এসব কাহিনী থেকে গ্রহণ কিংবা বর্জন করেছেন।

কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ী শ্রীপুর থেকে মাতুলালয় সাদুল্লাপুর যাবার পথে শ্রীপুর ও বিক্রমপুরের মধ্যবর্তী কোন স্থানে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করছিলেন, সাদুল্লাপুর সেখান থেকে তখনো প্রায় দুক্রোশ।[৪] কিন্তু সাদুল্লাপুর একটি ঐতিহাসিক স্থান,[৫] স্বর্ণময়ীর মাতুলালয় উপলক্ষ্যে সাদুল্লাপুর নামক নিয়েই সিরাজীর মনোরাজ্যে সৃষ্ট, এর কোন ভৌগোলিক অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। সিরাজী স্বর্ণময়ীকে কেদার রায়ের কন্যা[৬] বলেছেন, এবং চাঁদ রায় ও কেদার রায়কে দুই ভাই বলেছেন।[৭] প্রচলিত উপাখ্যানে স্বর্ণময়ীকে কেদার রায়ের কন্যা[৮], চাঁদ রায়ের বিধবা[৯], বা কেদার রায়ের বিধবা দুহিতা বলা হয়েছে।[১০] চাঁদ রায় এবং কেদার রায়ের

১। Op.Cit. XXXXXXX p.628.
২।(ক) Bengal Chief's struggle,, pp.33-34.
(খ) কেদারনাথ মজুমদার-ময়মনসিংহের বিবরণ, কলিকাতা, দাসগুপ্ত এন্ড কোং, ১৯০৪, পৃঃ১৭।
৩। রায়নন্দিনী, সি-র(সিরাজী রচনাবলী, আবদুর রহমান সম্পাদিত), পৃঃ৫২।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ৮-১১।
৫।(ক) রজনী কান্ত চক্রবর্তী-গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, published by M.Abid Ali Khan, Malda, 1909, পরিশিষ্ট, পৃঃ ১৯-২০।
(খ) শ্রীঅক্ষয় কুমার মৈত্রেয়-রজনাবলী, প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১৪।
৬। রায়নন্দিনী, সি-র, পৃঃ১১।
৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৭।
৮। গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ২৭১।
৯। এম, আবদুল কাদের-ঈশা খাঁ-সোনারগাঁ, মাহে নও, আশ্বিন, ১৩৭৫।
১০। যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত-বিক্রমপুরের ইতিহাস, কলিকাতা, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স, ১৩১৬, পৃঃ ৮৯-৯০।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ক নিয়েও মতভেদ আছে। চাঁদ রায় ও কেদার রায়কে অনেকে যেমন দুই ভ্রাতা বলেছেন[১], তেমনি পিতা এবং পুত্রও বলেছেন। কেদার রায় পিতা, চাঁদ রায় পুত্র[২]। কেউ কেউ কেদার রায়কে চাঁদ রায়ের পুত্রও বলেছেন।[৩] উপন্যাসে যশোহরের অধীশ্বর প্রতাপাদিত্য স্বর্ণময়ীকে বিয়ের জন্য কেদার রায়ের নিকট বারবার প্রস্তাব দেন, কিন্তু কেদার রায় বহু অপহ্নীর ভয়ে প্রতাপাদিত্যের নিকট কন্যা সমর্পণ করতে সম্মত হননি। এজন্য প্রতাপাদিত্য কূটবুদ্ধির মাধ্যমে স্বর্ণময়ীকে অধিকার করার চেষ্টা করেন।[৪] এটা ইতিহাস সমর্থিত নয়।

ঈসা খাঁ স্বর্ণময়ীকে বলেছেন, "কেবলা মসনদের মৃত্যুর পর হতে বিষয়কর্ম নিয়ে এমনি ব্যস্ত রয়েছি যে, এদিকে ভ্রাতৃবৎ মত দম কোনখানেও আমার খবর নাই।"[৫] প্রচলিত কাহিনীর মতে এক দিন নেই, শৈশবে পিতার মৃত্যুর পর জনৈক তুরানী সওদাগর ঈসা খাঁ ও তাঁর ভাইকে ক্রয় করে নিয়ে যান। ঈসা তাঁর পিতৃব্য কুতুব-উদ-দীন তার নবের পালন কার্যে সহায়তা করায় তাজ খান তাঁর ভাই-পোদের ক্রয় থেকে ফিরিয়ে আনার অনুমতি দেন।[৬] ঈসা খাঁর শৈশব জীবনের প্রচলিত কাহিনী পরবর্তীকালে চরিত্র ডাঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেমের 'ঈসা খাঁ ও স্বর্ণময়ী'[৭] গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল।

স্বর্ণময়ীর মতে সাক্ষাৎকালের সময় জানা গেছে ঈসা খাঁর বয়স তার পঁচিশ শুরু হয়েছে এবং তখনো বিয়ে হয়নি।[৮]

স্বর্ণময়ী হরণের সম্ভাব্য সময়কাল ১৫৯০ সালের গোড়ার দিকে। কেউ কেউ মনে করেন হরণ-কাহিনী পরবর্তীকালের সৃষ্টি।[৯] মোগল আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে কেদার রায় ঈসা খাঁর আশ্রয় নেন।[১০] বিপদে সাহায্য লাভের জন্য কেদার রায় (১৫২৬-১৬০০) স্বেচ্ছাকৃতভাবে এবং নিজ প্রয়োজনেই স্বর্ণময়ীকে ঈসা খাঁর নিকট অর্পণ করেন।[১১] এটা মেনে নিলে ঈসা খাঁর বয়স ২৫ বছর হতে পারে না। উপন্যাসে যেমনভাবানু-

---

১। বিক্রমপুরের ইতিহাস, পৃঃ৮৮-৮৯।
২। (ক) History of Bengal, Vol.II, pp.225-26.
(খ) এম, আবদুল কাদের-বাংলার বার ভূঁইয়ার ইতিহাসের পুনর্গঠন, বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, শ্রাবণ-ফাল্গুন-১৩৮৪।
৩। গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৭১।
৪। রায়নন্দিনী, পি-র, পৃঃ ১৪-১৫।
৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।
৬। আবদুল করিম-ঈসা খান মসনদ-ই-আলা, বংশকাটি জীবন, পৃঃ ২০-২১।
৭। ডাঃ আবুল কাসেম -ঈসা খা স্বর্ণময়ী, কলিকাতা, মধুমতী লাইব্রেরী, ১৯৬০।
৮। রায়নন্দিনী, পি-র, পৃঃ ২০-২৫।
৯। এম, আবদুল কাদের-ঈসা খাঁ-সোনামতী, মাহে-নও ফাল্গুন, ১৩৭৫।
১০। (ক) History of Bengal, Vol.II, p.211.
(খ) এম, আবদুল কাদের -বিক্রমপুরের ঈসা খান, মাহেনও, কার্তিক, ১৩৬৯।
(গ) বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২৮-২৯।
১১। এম, আবদুল কাদের-ঈসা খাঁ-সোনামতী, মাহেনও, ফাল্গুন, ১৩৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

অভিরাম স্বামী কর্তৃক স্বর্ণময়ী অপহরণের মনোমালিন্যবশতঃ কেদার রায় ঈসা খাঁ জোটের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হয় এবং প্রতাপাদিত্য পরাজয় বরণ করেন।[১] প্রচলিত কাহিনীতে চাঁদ রায়ের সঙ্গে ঈসা খাঁর মিত্রতা নষ্ট হয় স্বর্ণময়ী অপহরণের পর এবং চাঁদ রায়ের মৃত্যুর পর কেদার রায় বিক্রমপুরের অধীশ্বর হন।[২] যুদ্ধান্তে কেদার রায় প্রাণ ত্যাগ করেন।[৩] শিল্পী ঈসা খাঁ ও কেদার রায়ের এ বৈরিতাকে প্রতাপাদিত্যের ওপর দিয়েছেন মনে হয়। উপন্যাসে কেদার রায়ের পুত্র বিনোদ,[৪] কিন্তু কেদার রায়ের বংশ তালিকায় বিনোদ নামে কেউ নেই।[৫] উপন্যাসে ফাতেমা ঈসা খাঁর বোন[৬] কেউ কেউ বলেছেন, ফাতেমা ঈসা খাঁর প্রথম স্ত্রী, তাঁর জীবদ্দশায় কিংবা মৃত্যুর পরে স্বর্ণময়ীর সঙ্গে ঈসা খাঁর বিয়ে হয়।[৭] ঈসা খাঁর মাতার নামও কেউ কেউ ফাতেমা বলেছেন[৮], উপন্যাসে মাতার নাম বাবুশা বানম।[৯] শিল্পী উপন্যাসের শেষে ধর্মান্তরিত শাহজাদেমা নামে স্বর্ণময়ীর বিয়ে দেখিয়েছেন,[১০] অনেকে মনে করেন স্বর্ণময়ীর ধর্মান্তরিত নাম নিয়ামত জান,[১১] সালি মেহেরজান।[১২] উপন্যাসে স্বর্ণময়ীর বিয়ের পরও কেদার রায় ও চাঁদ রায়কে জীবিত থাকতে এবং ঈসা খাঁর সঙ্গে শ্রীপুরের সাম্প্রদায়িক বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখা যাচ্ছে।[১৩] প্রতাপাদিত্যের বিদুষী কন্যা অরুণাবতীর সঙ্গে যার ভাব ঈসার প্রণয় সে পাত্র যখন ছিলেন ঈসা খাঁ তখনো অবিবাহিত যুবক। তাছাড়া প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য অংশ নিয়েছেন,[১৪] প্রায় একই সময়ে ঈসা খাঁর পুত্র মুসা খাঁর সঙ্গে মোগলদের সংঘর্ষ হয়েছে।[১৫] উপন্যাসে ঈসা খাঁর বয়সের কথা বিবেচনা করলে ইতিহাসের কালগত অসংগতি অনিবার্য।

উপন্যাসে বিভিন্ন সূত্রে ঈসা খাঁর সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হচ্ছে[১৬], কিন্তু ইতিহাসে দ্বিতীয় ঈসা খাঁর সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হয় এবং সে যুদ্ধে ঈসা খাঁ পরাজয় ও মৃত্যু বরণ করেছেন।[১৭]

১। রায়নন্দিনী, পি-র, পৃঃ ১০২।
২। (ক) যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র-যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১ম খণ্ড, ১৩২৯, পৃঃ৩০৬।
(খ) গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৭৩।
(গ) F.B. Bradly Birt-Dacca The Romance of an Eastern Capital, London C.Bell and sons Ltd.2nd Ed.1914, pp.63-64.
৩। বিক্রমপুরের ইতিহাস, পৃঃ ১০-১১।
৪। রায়নন্দিনী, পি-র, পৃঃ ২৬।
৫। শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-কেদার রায়, ঢাকা, পাবলিক লাইব্রেরি, ১৩২১, পৃঃ১১।
৬। রায়নন্দিনী, পি-র, পৃঃ ৪২।
৭। এম, আবদুর রহমান-ঈসা খাঁ-সোনারগাঁও, ঢাকা-৭৫, আদিম, ১৩৭৫।
৮। গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৪।
৯। রায়নন্দিনী, পি-র, পৃঃ১৪৪।
১০। প্রাগুক্ত, পৃঃ১৪৯।
১১। শ্রী শরৎচন্দ্র ঘোষ-প্রতাপাদিত্যের সঙ্গী পাঠিকা, দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৬, ভূমিকা, পৃঃ৫৭-৫৮
১২। কেদার রায়, পৃঃ ৩০।
১৩। রায়নন্দিনী, পি-র, পৃঃ ১৬৭।
১৪। Baharistan-i-Ghaibi Vol.II, pp.127-37.
১৫। Ibid, Vol.I, pp.4, 28-57, 82-98 etc.
১৬। রায়নন্দিনী, পি-র, পৃঃ১০২।
১৭। (ক) যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ১৬, ৩২, ৩৩, ২৭৬-৮০।
(খ) সত্যচরণ শাস্ত্রী-প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত, কলিকাতা, গ্রন্থকার প্রকাশিত, পৃঃ৮৭-৯৫।
(গ) প্রতাপাদিত্য চরিত্র, পৃঃ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

খিলজী রাজ্যের উত্তরাধিকারী জনৈক ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলা উপাধি গ্রহণ করেন।[১] ঈসা খাঁ নামে মস-ইবের অন্য একজন জমিদার সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।[২] খিজিরপুরের ঈসা খাঁর সঙ্গে এর পার্থক্য রয়েছে।[৩] ইতিহাসে একাধিক ঈসা খাঁর অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে, সিরাজী ঈসা খাঁর সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের সংঘর্ষের ব্যাপারে খিজরী ও খিজিরপুরের ঈসা খাঁর পার্থক্যকে বিস্মৃত করে ফেলেছেন।

উপন্যাসে প্রতাপাদিত্যের ঢালী সৈন্যের অন্যতম কালিদাস ঢালী[৪] ঐতিহাসিক সত্য। কালিদাস ঢালীর পরবর্তী বংশধরেরা এখনো যশোরে আছে।[৫] মাহতাব খাঁ[৬] নামে কোন সেনাপতির নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না, তবে প্রতাপাদিত্যের সৈন্যের মধ্যে মুসলমানও ছিল।[৭] উপন্যাসে প্রতাপাদিত্যের অন্যতম স্ত্রী দুর্গাবতীর কন্যা অরুণাবতী মাহতাব খাঁর প্রণয় মুগ্ধ[৮] কিন্তু প্রতাপাদিত্যের পুত্র কন্যার মধ্যে অরুণাবতী নামে কেউ নেই।[৯] বউ ঠাকুরাণীর হাটে প্রতাপাদিত্য তনয়ার নাম বিভাবতী, সম্ভবতঃ এর সাদৃশ্যেই অরুণাবতী চরিত্রের সৃষ্টি এবং মাহতাব খাঁ অরুণাবতীর কাহিনী কাল্পনিক।

তালিকোটের যুদ্ধে[১০] ঈসা খাঁর অংশগ্রহণের ব্যাপারটি সম্পূর্ণই কাল্পনিক, বাস্তবের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। তালিকোটের যুদ্ধে মুসলিম বিজয় গৌরবের সঙ্গে ঈসা খাঁর বীরত্ব প্রকাশকে যুক্ত করে দেবার জন্য এ কাহিনী অংশের সৃষ্টি হয়েছে। তালিকোটের যুদ্ধে হিন্দু রাজশক্তির সূর্যাস্ত, পরে আবার সূর্যোদয় ঘটে মারাঠা শিবাজীর মাধ্যমে।[১১] মাঝখানে প্রায় পুরো সময় ভারতের ইতিহাস প্রধানতঃ মুসলমানদের কীর্তিতে সমুজ্জ্বল। তালিকোটের যুদ্ধে মুসলমান পক্ষের ঐক্য জোট সামনে রেখেই সিরাজী বাংলার মুসলমানদের এর সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা করতে পারেন। সমকালীন অগ্রসর হিন্দুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা থেকে তিনি প্রথম

১। এম,আবদুল কাদের-খিজরপুরের ঈসা খাঁ, মাহে-নও, আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩৬৯।
২। শ্রী কালি প্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ(সম্পাদিত)-রাজমালা, তৃতীয় লহর, আগরতলা, রাজমালা কার্যালয়, ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দ, পৃঃ ১৫-১৬।
৩। এম,আবদুল কাদের-বাংলার বার ভূঞার ইতিহাসের পুনর্গঠন, বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৪।
৪। রায়নন্দিনী, পি-র, পৃঃ৫৩।
৫।(ক) যশোহর-খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিশিষ্ট পৃঃ ৪০৯-১৪।
(খ) গৌড়ের ইতিহাস, পৃঃ ২৮৯।
৬। রায়নন্দিনী, পি-র, পৃঃ ৫৬।
৭। যশোহর-খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২৫।
৮। রায়নন্দিনী, পি-র, পৃঃ ৬৯।
৯। যশোহর-খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০১।
১০(ক) Wolseley Haig(ed)The Cambridge History of India,Vol.III,Delhi, S.Chand & Co.1958,pp.447-50.
(খ) Vincent A.Smith-The Oxford History of India, Oxford,At the Clarendon press,Third ed.(reprint)1961,pp.298-99.
(গ) Mountstuart Elphinstone-The History of India,London,John Murray, 1905,pp.466-67.
১১। "After the fatal day of Talicota(1565)no Hindu even in the shattered southern land, had had raised his head above the flood of Muslim conquest as a sovereign with a fully independent state under him"—Jadunath Sarkar-House of Shivaji,Calcutta,M.C.Sarkar & sons Ltd. ,Third Edn.1955,p.103.

উপন্যাসে হিন্দুর পতনকালে মুসলমানের ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দ্বিতীয় উপন্যাস তারাবাঈতে হিন্দু উত্থান কালের সংঘর্ষে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করেছেন। শিবাজীর উত্তরপুরুষদের পরাজিত ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন ফিরোজা বেগম উপন্যাসে। পানিপথের যুদ্ধ অবতারণার জন্য একটি কারণও সম্ভবতঃ রয়েছে। বাংলায় পাঠান শক্তিগুলোর পতনের অন্যতম কারণ হল মোগল শাসনের বিরোধিতা, প্রতাপাদিত্য উৎসবের সৃষ্টি এখান থেকে। কিন্তু ঈশা খাঁর সঙ্গে মোগল রাজশক্তির সংঘাতকে উপন্যাসে ব্যবহার করা সম্ভব ছিলনা, এ কারণে বাংলার বাইরে মুসলমান শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ ও বিজয় গৌরবকে তিনি এভাবে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন।

রায়নন্দিনী উপন্যাসে ইতিহাস প্রসংগ দুর্বল, অধিকাংশ ঘটনা এবং বেশ কিছু চরিত্র অনৈতিহাসিক, উপন্যাসের প্রয়োজনে লেখকের মনোরাজ্যে এ সবের সৃষ্টি। সুতরাং রায়নন্দিনী গ্রন্থটি উপন্যাস হিসাবে বিবেচ্য, ইতিহাসের বাহ্যিক কাঠামো আছে বলে ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপেও গ্রহণ করা যেতে পারে।

তিন

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে জগৎসিংহ-তিলোত্তমার প্রেমে বিশুদ্ধ দ্বন্দ্ব মুক্তির জন্য আয়েশা এবং ওসমানের অবতারণা। রাজসিংহে বিশুদ্ধ দ্বন্দ্ব নেই, কিন্তু মুসলমান ছুটো প্রণয়চিত্র বিদ্যমান, এখানে দেখা যাঁ -দুর্গবাসীর মিলনের অনুরাগ মুক্তির চেষ্টা করেছে প্রচার্যাদিতে ও মেহেরবানু-অভিরাম স্বামীর কামনিকা, ইন্দিরপুরের জমিদার প্রাননাথ চৌধুরীর মধ্যে দুর্গস্থার বিবাহের [illegible] সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু অন্যের কোন অনুরাগ নেই, এমন কি যে ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে উপন্যাসের মুসলমান পাত্র পাত্রীরা মানসিক উচ্চমন্যতায় ভুগেছে, সেখানেও হিন্দু রমনীকে অসম্মান করে দূরে রাখা হয়নি। উপন্যাসের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য চরিত্রের বিকাশ এবং সে প্রয়োজনে কাহিনীর একটি অনিবার্য গতিময় রূপ দাঁড় করানো, এখানে দ্বৈত কাহিনী উপস্থাপনার হলে যে সম্ভাবনা দুর্বল হয়েছে। এ ছাড়াও র মূলে উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে প্রায় সম্পর্কহীন শাহ মহিউদ্দীন কাহিনীর অবতারণা। সে কারণে মনে হতে পারে, কাহিনীর স্বাভাবিক বিকাশ নয়, পরিণামটুকুই ছিন্ন হয়। উপন্যাসের শেষে নায়িকার ধর্মান্তর গ্রহণ এবং মিলন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়, উপন্যাসের কাহিনী হিসাবে এখানে এর দুর্বলতা।

রায়নন্দিনী প্রত্যক্ষে যারা দুর্গেশনন্দিনীর জবাব হিসাবে পেতে চেয়েছেন, কাহিনীর বহিরঙ্গে মুসলমান নারীর প্রতি হিন্দু রমনীর প্রণয়ানুরাগ এবং ধর্মান্তর গ্রহণ দেখেই তুষ্ট থেকেছেন। দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে ওসমানকে প্রত্যাখ্যান করে জগৎসিংহের নিকট আয়েষার অযাচিত প্রণয়দান তাঁদের নিকট অপমানিকর মনে হয়েছিল। তাঁরা এটাকে উপন্যাসের ঘটনা হিসাবে দেখেননি, ইতিহাসের অসংগতিই তাদের নিকট বড় হয়ে দেখা দেয়।[১]

১। এম, এম, আকবর উদ্দীন বি, এ, —বর্তমান বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের স্থান, মাস-এসলাম, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫।

Dhaka University Institutional Repository

রায়নন্দিনী উপন্যাসে প্রেমোপাখ্যান রয়েছে দুটি, প্রথমে ঈসা খাঁ-স্বর্ণময়ী এবং পরে মাহতাব খাঁ-অরুণাবতী, প্রধান কাহিনীটির উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্যই অপ্রধান অংশটুকুর অবতারণা। কিন্তু রায়নন্দিনী উপন্যাসে দ্বিতীয় কাহিনীটি ঠিক অপ্রধান থাকেনি, অনেক ক্ষেত্রে মাহতাব খাঁ-অরুণাবতীর কাহিনী স্ফীত হয়ে ঈসা খাঁ-স্বর্ণময়ীর স্থান সঙ্কুচিত করে দিয়েছে। বঙ্কিম-রমেশচন্দ্রের নিপুণ শিল্পকর্ম তিনি করতে পারেননি এটা প্রধান কারণ সন্দেহ নেই।

"৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের" পথে একাকী গমন করার সময় পথে বিশাল প্রান্তরের মধ্যে সূর্যাস্ত হল। আকাশে মেঘ জমল, তার পর বিদ্যুদ্দীপ্তি প্রদর্শিত পথে চলতে চলতে শৈলেশ্বরের শিব মন্দিরে যখন আসলেন[1] বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার একটি পথও সে আলোকে পরিচিত হয়ে উঠল। জ্যোৎস্না ও দুর্যোগময় রাত্রিতে ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার দৃশ্য রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত(১৮৭৮) এ আছে।[2] দুর্যোগময় নিশীথ রাত্রির মনোহারিণী দৃশ্য বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী অনেক উপন্যাসের মধ্যেই পুনরাবৃত্ত হয়েছে, রায়নন্দিনী উপন্যাসের সূচনায় একই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুরীয় বিনিময় উপন্যাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অঙ্গুরীয় বিনিময় উপন্যাসে শিবাজী কর্তৃক দস্যুদের মাধ্যমে রোশেনারা অপহৃতা হয়েছেন।[3] এখানে দস্যুদের অপহৃতা স্বর্ণময়ী মন্দিরে আশ্রয় নেবার পর ঈসা খাঁ কর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছেন।[4] দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে শৈলেশ্বরের শিবমন্দিরে জগৎসিংহের সঙ্গে তিলোত্তমার প্রথম সাক্ষাৎ ও প্রণয়ের সঞ্চার হয়েছে।[5] এ সব ঘটনার মধ্যে কিছু বাহ্যিক সাদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু অন্য কোন ক্ষেত্রে তুলনা সঙ্গত নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা উপন্যাসে দস্যুর হাতে লুণ্ঠন[6] প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণ করা যেতে পারে, তবে অঙ্গুরীয় বিনিময় ও দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের ঘটনার স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে।

<u>চার</u>

রায়নন্দিনী উপন্যাসের দ্বিতীয় উপাখ্যান রচনায় ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বউ ঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসের প্রভাব পড়েছে। "বউ ঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন প্রতাপাদিত্যের দুর্দমনীয়তা এবং

১। দুর্গেশনন্দিনী, খ-১, প্র, পৃঃ৫৩।
২। মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, রমেশ রচনা সম্ভার, পৃঃ ৪০৮-০৯।
৩। "এই রূপে শিবিকা নির্দিষ্ট ইতিবাসমর হঠাৎ তদুত্তকেরা কতিপয় অস্ত্রধারী পুরুষ কর্তৃক একেবারে চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হইল এবং চকিতের মধ্যে কতিপয় বলবান পুরুষ ভারবাহিদের স্কন্ধদেশ হইতে শিবিকা আছিন্ন করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।" অঙ্গুরীয় বিনিময়, ভূদেব রচনা সম্ভার, পৃঃ ২৮৫।
৪। রায়নন্দিনী, পি-৮, পৃঃ ১৩-১৭।
৫। দুর্গেশনন্দিনী, খণ্ড-, ৫, পৃঃ ৫৩।
৬। ইন্দিরা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৩-৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

এই দুঃশাসনের জন্য পুত্র, কন্যার জীবনে ব্যর্থ পরিণতি।[১] বউ ঠাকুরানীর হাটের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিভাবতী, রাজনন্দিনী উপন্যাসে প্রতাপাদিত্যের অন্যতম কন্যা অনুপাবতীকে শিরাজী গ্রহণ করেছেন, দুজনের মধ্যে নামের সাদৃশ্য সৃষ্টি শিরাজীর নিজস্ব পরিকল্পনা থেকে। বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসে [illegible] জামাতা রামচন্দ্রের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের বিরোধ, রাজনন্দিনীতে কন্যার প্রেমিক মাহতাব খাঁর সঙ্গে, দুটোর পটভূমিকা সম্পূর্ণ পৃথক। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস প্রতাপাদিত্য উৎসবের সঙ্গে সম্পর্কহীন, কিন্তু শিরাজীর ক্ষেত্রে তা সম্পর্কযুক্ত। শিরাজী মোঘলদের মুসলমান রাজনীতি মনে করেছেন বলে প্রতাপাদিত্য উৎসবের সামনে আত্মগ্লানি বোধ করেছেন। ফলে প্রতাপাদিত্যকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে গ্রহণ করেছেন শিরাজীর পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। প্রতাপাদিত্য যখন ধ্যাননেত্রে দুর্গমন্ত্রার শরীর অবলোকন করেছেন, তখন তাঁরই সুন্দরী কন্যা অনুপাবতী মাহতাব খাঁর হাত ধরে পিতৃরাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে গেছেন। বউ ঠাকুরানীর হাট উপন্যাসে প্রতাপাদিত্য রামচন্দ্রকে হত্যার আদেশ দিয়েছেন, রাজনন্দিনীতেও তিনি মাহতাব খাঁকে হত্যার আদেশ দিয়েছেন। রামচন্দ্র জামাতা, মাহতাব খাঁ সেনাবাহিনী থেকে কর্মত্যাগী ভবিষ্যৎ জামাতা। দুজনেই পলায়ন করেছেন নদী পথে তাঁদের অনুসরণকারীরাও নদীপথে গেছেন।

বউ ঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের মুক্তিয়ার খাঁ রাজনন্দিনীতে মাহতাব খাঁতে পরিণত হতে পারেন। শিরাজী মুক্তিয়ার খাঁর অপবাদ মোচন করে দেবার জন্যই মাহতাব খাঁর মধ্য দিয়ে তাঁকে নতুন ভাবে নির্মাণ করেছেন এবং রাজকন্যার সঙ্গে প্রেমের উপাখ্যানও সৃষ্টি করেছেন। দুজনের মধ্যে নামের সাদৃশ্যও রয়েছে। বসন্ত রায়কে হত্যার ব্যাপারে উদয়াদিত্যের প্রশ্নের জবাবে মুক্তিয়ার খাঁ বলেছে, "প্রভুর আদেশ পালন করিতে পাপ নাই।" উদয়াদিত্য উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "মিথ্যা কথা। যে ধর্মশাস্ত্র তাহা বলে সে ধর্মশাস্ত্র মিথ্যা। নিশ্চয়ই জানিয়ো মুক্তিয়ার, পাপ আদেশ পালন করিলে পাপ।"[২] বসন্ত রায় রামচন্দ্রকে রক্ষার চেষ্টা কালে প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যকে যবনের সুহৃদ বলে ভর্ৎসনা করেছেন।[৩] এ কারণে মুক্তিয়ার খাঁকে দিয়ে বসন্ত-রায়ের হত্যা। শিরাজীকে আহত করতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম উপন্যাসে চন্দ্রচূড় যে কাজ পারেনি মুসলমানকে দিয়ে তা করিয়ে পরে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়া হয়।[৪] এমন মুসলমানকে শিরাজী বিবেকবান করে তুলেছেন, মাহতাব খাঁর মধ্য দিয়ে এদের দোষস্খালন করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মাহতাব খাঁ কর্মত্যাগ করেছেন তবু প্রতাপাদিত্যের ন্যায় অন্যায় সকল ইচ্ছার বাহন হয়ে ওঠেননি। মুক্তিয়ার খাঁ ছিলেন প্রভুর

১। অর্পণা প্রসাদ সেনগুপ্ত, বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস, কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১ম সং, ১৩৬৭, পৃঃ ৯২।

২। বউ ঠাকুরানীর হাট, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫০৭-০৮।

৩। "যবন চরণের মৃত্তিকা তুমি কপালে ফোঁটা করিয়া পরিয়া লও। তোমার ওই যবনের পদধূলিময় অস্পৃশ্য মাথাটা ধূলিতে লুটাইবার সাধ ছিল, বিধাতার বিড়ম্বনায় তাহাতে বাধা পড়িল। এই তোমাকে মুখে বলিলাম।" পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫২০।

৪। "সীতারাম চন্দ্রচূড়কে আজ্ঞা করিলেন গোলমাল লোক লইয়া আইল-মুসলমান।" সীতারাম, পূ.প্র, পৃ: ১৪৮

ইচ্ছার নিকট সমর্পিত, প্রতিবাদহীন। মাহতাব খাঁ নীতির বক্তৃতা করেছেন, কিন্তু খুজিয়ার খাঁ সৈনিকের কর্তব্য যথাযথ করেছেন। মাহতাব খাঁ এবং খুজিয়ার খাঁ ভিন্ন যুগের ভিন্ন দুটি দলের সমকালীন পটভূমিতে তাঁরা যেন পরস্পরের পরিপূরক, খুজিয়ার খাঁর বিদ্রোহী মুসলমান সৈনিকের ভাবমূর্তি সৃষ্টির জন্যই মাহতাব খাঁর অবতারণা। মাহতাব খাঁর প্রতি প্রতাপাদিত্যের আদেশ ও তা প্রত্যাখ্যান এবং খুজিয়ার খাঁর প্রতি আদেশ ও তা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন একই কথা বা সত্যের ধ্বনি কিংবা প্রতিধ্বনি মাত্র। রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন মিরাজী তা সংশোধন করে দিয়েছেন, এবং রবীন্দ্রনাথ যা বলেননি তা বলার জন্যই মিরাজী কলম ধরেছেন। বোঝা যায়, প্রতাপাদিত্য পূজার প্রতিক্রিয়া থেকে প্রতাপাদিত্য চরিত্র এবং এমন কি মাহতাব খাঁ অরুণাবতী কাহিনীর পরিকল্পনা। এ রকমও মনে হয়, প্রতাপাদিত্য প্রসংগ এসেছেই যতটুকু প্রতাপাদিত্যকে প্রতিহত করার জন্য। মিরাজীর এ উপন্যাস যখন রচিত হয়েছে তখন একদিকে প্রতাপাদিত্য উৎসব এবং অন্যদিকে ঐতিহাসিকদের কর্তৃক প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান প্রয়াস, মিরাজী এ সুযোগটিই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তবু মনে হয় উপন্যাসের প্রভাব এবং উপন্যাস ও নাটকের মাধ্যমে হিন্দু সাহিত্যিকদের ইতিহাস দূষণের প্রচেষ্টা মিরাজীকে উপন্যাস রচনায় অনুপ্রাণিত করতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ তার সহায়ক হয়েছে, তিনি প্রতাপাদিত্য চরিত্রের আংশিক ভাবমূর্তি গ্রহণ করেছেন, প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি খুজিয়ার খাঁর বিকল্প খাঁ সৃষ্টি করেছেন এবং কাহিনী কাঠামো নির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী নয়, বরং রবীন্দ্রনাথের বউ ঠাকুরাণীর হাটকেই অনুসরণ করেছেন।

বউ ঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসে কাহিনী প্রকৃত অর্থে দুটো, যুব রামচন্দ্র-বিভাবতীর উপাখ্যানের উজ্জ্বলতা দানের জন্য উদয়াদিত্য-সুরমার কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ দুয়ের মধ্যে যেভাবে চমৎকার সমন্বয় সাধন করে নিতে পেরেছেন, মিরাজীর পক্ষে ঈশা খাঁ-স্বর্ণময়ী এবং মাহতাব খাঁ অরুণাবতীর কাহিনীর মধ্যে তেমন সমন্বয় সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। মিরাজীর মধ্যে ছিল ঈশা খাঁ-স্বর্ণময়ী, কিন্তু বারবারই মাহতাব খাঁ-অরুণাবতী প্রাধান্য লাভ করে মূল কাহিনীকে সংকুচিত করে দিয়েছে। এর কারণ হয়তো লেখকের দৃষ্টি, উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে তিনি ঈশা খাঁ স্বর্ণময়ীকেই নিঃসন্দেহে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু প্রতাপাদিত্য উৎসবের বিকল্প এবং প্রতাপাদিত্যের চরিত্র প্রতিরোধ স্পৃহা প্রবল হয়ে উঠে মিরাজীর লক্ষ্যকে অস্পষ্ট করে দিয়েছে। লেখকের দৃষ্টিতে মাহতাব খাঁ-অরুণাবতীর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো প্রতাপাদিত্য, যদিও উপন্যাসে প্রতাপাদিত্যের প্রত্যক্ষ ভূমিকা তুলনামূলকভাবে বেশী নয়। সে জন্য বার বার প্রতাপাদিত্যের অগৌরব দেখানো হয়েছে এবং প্রতাপাদিত্যকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখে তাঁর পরিণতির জন্য অরুণাবতীর মরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে, প্রতাপাদিত্য যে বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়েও আসেননি।

১। রায়নন্দিনী, দ্বি-স, পৃঃ ১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

এর আগে স্বর্ণময়ী অপহরণের জন্য অভিযুক্ত এবং ঈশা খাঁর নিকট যুদ্ধে পরাজিত প্রতাপাদিত্যকে হত্যা করা হয়নি সম্ভবতঃ প্রতাপাদিত্যের পরাজয়কেই চূড়ান্ত করে তোলার জন্য। যুদ্ধে যেমন তিনি পরাজিত হয়েছেন, তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণ এবং পরাজিত সেনাপতির সংগে তাঁর বিবাহ প্রতাপাদিত্যের অন্তরে ও বাইরে পরাজয়কেই নিশ্চিত রূপ দিয়েছে। সে কারণে মনে হয়, প্রতাপাদিত্যের চরম অনুশোচনা মুহূর্ত পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার জন্যই যাবতীয় বাঁশদ্রোণাবতীর কাহিনী অনাবশ্যক দীর্ঘ করতে হয়েছে। কোথাও এ কাহিনী এত প্রাধান্য পেয়েছে যে মূল কাহিনীর ভারসাম্য ও প্রায় ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে।

প্রতাপাদিত্য উৎসবের ক্রিয়া হিসাবে তিনি ঈশা খাঁকে নিতে পারেননি। ইতিহাসে ঈশা খাঁর মূল প্রতিষ্ঠা মোগল বিরোধিতার জন্য। তিনি ছিলেন মোগল বিরোধী শাসক শক্তিগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু প্রতাপাদিত্য উৎসবকেই সিরাজী স্বীকার করেননি, সুতরাং ঈশা খাঁকে সেই জাতীয় বীরের মর্যাদা প্রদান কি সম্ভব? মুসলমানের ঐক্যবোধের প্রচারক সিরাজীর জন্য এটা ছিল অত্যন্ত দুঃসময়, তিনি ইতিহাসকে ছেড়ে যেতে পারেননি। ফলে প্রতাপাদিত্য উৎসবের সামনে বিপুলশক্তি বিক্রম নিয়েও ঈশা খাঁ ম্লানপ্রভ।

পাঁচ

ঈশা খাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্য দুটো, প্রথমে প্রেম এবং পরে আদর্শবোধ—বীর, সাধক, ধর্মপ্রাণ, মুসলমান ইত্যাদি হিসাবে আদর্শ চরিত্র। লেখকের দৃষ্টি সত্য ছিল দ্বিতীয়টির প্রতি, কার্যত জীবনে প্রেমের আবির্ভাবই ঈশা খাঁর চরিত্রকে পূর্ণতা দান করেছে, এবং তাঁর স্বাভাবিক বিকাশকে সহায়তা করেছে। প্রেমের এই স্পর্শ ছিল বলে ঈশা খাঁ তাঁর ইতিহাসের অবস্থান ছেড়ে লেখকের সমকালীন দশজন রক্তমাংসের মানুষে পরিণত হয়েছেন। সিরাজী ঈশা খাঁ চরিত্র অঙ্কনের প্রয়োজনে কোন কোন দিক দিয়ে অবশ্যই তাঁকে প্রায় আদর্শ মনে করেছেন। কিন্তু ঈশা খাঁ চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে উঠেছে, প্রেমে, এখানেই সংঘাত সৃষ্টি হবার পর তার বিকাশও পরিপূর্ণ হয়েছে।

ঈশা খাঁর প্রেমানুভূতির বাহ্যিক প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখক সংযম রক্ষা করেছেন। স্বর্ণময়ীর সংগে ঈশা খাঁ অকস্মাৎ পরিচিত, স্বর্ণময়ীর বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপলক্ষ, আগে "কৃষ্ণদাধি"তে নির্যাতিত হবার সময় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ঈশা খাঁই তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন।[১] মন্দিরে সাক্ষাৎকারের সময় স্বর্ণময়ীর অনাবৃত চামড়ার অভ্যন্তরের কথা জেনে, তাঁর সৌন্দর্য ও অভ্যুদয়ম যৌবন ঈশা খাঁকেও আত্মহারা করে তুলেছিল। আদর্শ ও সৌন্দর্যের সম্মিলন, মন্দিরে দুর্যোগময় পরিস্থলে মুহূর্তগুলোর মধ্যে ঈশা খাঁ স্বর্ণময়ীকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে নিয়েছেন, ঈশা খাঁর নতুন আবিষ্কারের আনন্দ প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে প্রতিফলিত।[২]

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৮।
২। [illegible]
৩। [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে উঠেছে। স্বর্ণময়ীর মনোভাব স্পষ্ট ব্যক্ত হলেও ঈশা খাঁর অনুভূতি গোপন থাকেনি। লেখক স্বর্ণময়ীকে সৃষ্টি করেছেন অনুরাগ প্রকাশ করার জন্য, কিন্তু পুরুষ চরিত্র হিসেবে ঈশা খাঁর মানস কিংবা প্রথম অনুরাগ সঞ্চারের প্রকাশটি অস্পষ্ট রইল।

এর পর স্বর্ণময়ীর পত্রের জবাবদানের সময় ঈশা খাঁর প্রণয় পীড়িত মন আর অন্তরালবর্তী থাকেনি। ঈশা খাঁ আন্তরিকভাবে বললেও কিন্তু রমনী স্বর্ণময়ীর নিকট নিজের 'অযোগ্যতা' সম্পর্কে উক্তি করেছেন। এটা কেবলমাত্র বিনয়ভাবের প্রকাশ নয়, প্রেমাস্পদের কারণে ঈশা খাঁর অন্তরে স্বর্ণময়ীর ব্যাপারে আর কোন ব্যবধান নেই। ইঙ্গিত আমরা পাওয়া যায়, তাদের মিলনের অন্তরায় হল বাহ্যিক এবং ব্যায়াম চর্চা ও লক্ষ্য সন্ধানের দ্বারা সে অসুবিধা দূর হতে পারে। ব্যায়াম চর্চার কথা লেখকের নিজেরই, স্বর্ণময়ীকে ঈশা খাঁর উপযুক্ত করে তোলার এটা একমাত্র পথ। মনে হয় হিন্দু রমণীর সঙ্গে বিয়েতে ঈশা খাঁর মত লেখকেরও কোন আপত্তি নেই, কেবলমাত্র প্রয়োজন হল ভবিষ্যৎ বংশধরদের দুর্বলতা পরিহার করতে শেখানো। স্বর্ণময়ী হিন্দু না হয়ে মুসলমান হলেও লেখক তাকে দিয়ে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেই ঈশা খাঁর জন্য উপযোগী করে তুলতেন।

মহররমের সময় স্বর্ণময়ীর সঙ্গে ঈশা খাঁর সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা একটি উপলক্ষ সৃষ্টি মাত্র, লেখক নিজে মহররমের মাহাত্ম্য বর্ণনার সুযোগ নিতে চেয়েছেন।[2] মহরম উৎসব উপলক্ষেই স্বর্ণময়ী অপহৃতা হন এবং এ অপহরণকে কেন্দ্র করে ঈশা খাঁ ও কেদার রায় গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। যুদ্ধে ঈশা খাঁর নিকট প্রতাপাদিত্য পরাজয় বরণ করেন।

ঈশা খাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় যখন শ্রীপুরের জমিদার শ্রীনাথ চৌধুরীর সঙ্গে স্বর্ণময়ীর বিয়ে স্থির হয়, এবং কেদার রায়ের গুরু অমোঘানন্দ ঠাকুরের কারণে কেদার রায় স্বর্ণময়ীকে ঈশা খাঁর সঙ্গে বিয়ে দিতে অসম্মত হলেন। ঈশা খাঁর মাতা [illegible] খানমও সম্মত ছিলেন না।[3]

ঈশা খাঁর এ সময়কার মানসিক দ্বন্দ্বকে লেখক চমৎকার রূপ দিয়েছেন। তাঁর "আলোকময় আনন্দ কোলাহলপূর্ণ পৃথিবী যেন শ্মশানে পরিণত হইল।"[4] আশা নিরাশার প্রবল দ্বন্দ্বে ঈশা খাঁর হৃদয় তখন ক্ষত বিক্ষত, স্বর্ণময়ীর প্রেমপূর্ণ ব্যবহার, মধুভাষার সুধাকে তিনি অনুভব করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, যে স্বর্ণময়ীর

১। "যুবক এই বলিয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে গেলেন। দেখিলেন মেঘ-বিমুক্ত আকাশ নির্মল নীলিমা ফুটাইয়া তারকা-হারে মণ্ডিত হইয়া হাস্য করিতেছে। পূর্বদিকে দশমীর চন্দ্র শুভ্র একখণ্ড শুভ্র জলদের ভিতর হইতে বৃষ্টিস্নাত পৃথিবী সুন্দরীর বদনে চাহিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে। নব বধূ অতি প্রথমে গোপনে স্বামীকে দেখিতে যায়। চিরবিরহ পরে সহসা দর্শন পাইলে যেমন লজ্জায় ও সুখ-চাপা আনন্দে ঈষৎ আরক্ত ও কুসুম হইয়া উঠে, সদ্য স্নাতা ধরণী সুন্দরীও তেমনি চন্দ্র দর্শনে আনন্দে স্ফীতবক্ষা ও হাস্যমুখী হইয়া উঠিয়াছে।"—প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ১০২-১০।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে তাঁর হৃদয়ের সকল আনন্দ ও দুঃখ বেদনা জড়িত, সে স্বর্ণময়ী প্রতি মুহূর্তে অন্যের হাতে পড়ে যাচ্ছে।[১]
স্বর্ণময়ীকে কেন্দ্র করে ঈসা খাঁর সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে যে বিপুল যন্ত্রণা নিরন্তর দগ্ধ করছিল, তিনি সেসব নিরা-
করণের উপায় অনুসন্ধান করছিলেন। একই রমণীর দুজন প্রেমপ্রার্থী থাকতে পারে না। স্বর্ণময়ীকে নিয়ে ঈসা
খাঁর মধ্যে শ্রীমন্ত চৌধুরীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় সত্য, কিন্তু ঈসা খাঁ পারেননি কেদার রায়ের বাধা এবং
মাতার নিষেধ অগ্রাহ্য করে বাহুবলের সাহায্যে স্বর্ণময়ীকে ছিনিয়ে আনতে। লেখকের জন্য বাস্তব অসুবিধাও
ছিল, কেননা প্রচলিত কাহিনী হল ঈসা খাঁ স্বর্ণময়ীকে হরণ করে নিয়ে আসেন। কিন্তু লেখক সচেতনভাবে
ঈসা খাঁকে এ হরণের অপবাদ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছেন বলে স্বর্ণময়ী লাভে ব্যর্থ ঈসা খাঁ আত্মহননের
পথটিই বেছে নিয়েছেন। চান্দিকোটের যুদ্ধে যোগদান প্রকৃত অর্থে মৃত্যু ডেকে আনার জন্য আত্মহননের পথ,
তিনি চেয়েছিলেন হৃদয়ের যন্ত্রণা চিরতরে জুড়াবার জন্য একটি যুদ্ধক্ষেত্র। চান্দিকোটের যুদ্ধের ঐতিহাসিকতা
বিস্মৃত হয়ে কেবলমাত্র একটি যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করা গেলে উপন্যাসের উপলব্ধির পক্ষে তা অনিবার্য
হয়ে আসে, ঈসা খাঁর অন্তরের এবং বাইরের মধ্যে যে বিপুল সংঘাত তার প্রতীক হয়ে উঠেছে চান্দিকোটের
যুদ্ধ। যুদ্ধে ঈসা খাঁ আহত হন, স্বর্ণময়ী তাঁকে সেবা করার সুযোগ পান, দুজনের মধ্যে মিলনের একটি
এটা প্রথম সূত্র। বিচ্ছেদ মুহূর্তে কিংবা সংঘাতের মধ্যে ঈসা খাঁর হৃদয়ের যে মহত্ত্ব ও ঔদার্যের পরিচয় পাওয়া
গেছে মিলনের মধ্যে তা অনুপস্থিত। চান্দিকোটের যুদ্ধে ঈসা খাঁর বাহু ও মুসলিম ঐক্যবোধের পরিচয় রয়েছে
ঠিকই, কিন্তু প্রেমে ব্যর্থ না হলে তিনি আত্মদানের জন্য এত উৎসাহের সঙ্গে অগ্রসর হতেন কিনা সন্দেহ।
তা সত্ত্বেও ঈসা খাঁ একজন প্রেমিক, যার জীবনের আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি হল প্রেমিকার সঙ্গে মিলনে, উপন্যাসের
শেষে এ মিলন হয়েছে এবং মনে হয় এত বড় একজন আদর্শ বীরের জীবনে চূড়ান্ত প্রাপ্তি ঘটে, মিলনের পর
আর কিছুই যেন প্রাপ্য নেই।

শিল্পী কিন্তু রমণীকে মুসলমান নায়কের অনুরাগিনী করে তোলবার চেষ্টা করেছেন সচেতনভাবে কিন্তু কার্যত
ঈসা খাঁর অনুরাগই গভীর হয়েছে। সুতরাং তোতায় দাম্পত্য গঠন করে ঈসা খাঁ তাঁর স্ত্রী শিরাজীকে সম্পূর্ণ
গ্রহণ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। তা সত্ত্বেও লেখকের অভিপ্রায় অনুযায়ী ঈসা খাঁ সর্বক্ষেত্রে বিজয় গৌরব লাভ
করেছেন। ধর্মান্তরিত স্বর্ণময়ীর সঙ্গে ঈসা খাঁর বিয়ে হল, তিনি দেশে ফিরে এসে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন।
ঈসা খাঁর জীবনের এ অংশটি বৈশিষ্ট্যহীন। তাঁর বিরহ মিলনের মধ্যে চরিত্র বিকাশের সবটুকু সম্ভাবনা
লেখক কার্যকর করতে পারেননি, তা সত্ত্বেও সমগ্র উপন্যাসে ঈসা খাঁই সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র, তাঁর কারণেই
উপন্যাসের উজ্জ্বলতা। ঈসা খাঁর দ্বৈতসত্তা রয়েছে উপন্যাসে, একদিকে তিনি প্রেমিক, রস মাধুর্যের অধিকারী,
উচ্চ অনুভূতি সম্পন্ন, অন্যদিকে মুসলমান সমাজের জন্য আদর্শ সেনাপতি, আদর্শ বীর পুরুষ, শাসক, যুব

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০-১১।

এমন কি আদর্শ প্রেমিকও বটে। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে ঈসা খাঁর আত্মপ্রকাশ যত সুন্দর, আদর্শ প্রকাশের ক্ষেত্রে তেমন সহজ নয়। তিনি ব্রহ্মবংশের, মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করেছেন, মুসলমান সমাজের জন্য কল্যাণ চিন্তা করেছেন, প্রেমে সংযম রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন, প্রেমের কারণে মুসলমান হিসাবে সামাজিক দায়িত্ব ভুলে যাননি। তা সত্ত্বেও ঈসা খাঁর মত আদর্শ মুসলমানও হিন্দু রমণীর সঙ্গে অসামাজিক প্রেমে লিপ্ত হয়েছেন, তাঁকে দিয়ে লেখক মুসলমানদের শৌর্য্য দাম্ভিক্য প্রমাণ করাতে চেয়েছেন অনেকটা জোর করেই। মুসলমানের সামাজিক কল্যাণ যার লক্ষ্য, তাঁর পক্ষে প্রেম এবং বিবাহের প্রশ্নে যে সাম্প্রদায়িক কি বিস্মৃত হওয়া সম্ভব? ঈসা খাঁর জন্য সোজাসুজি হত কোন আদর্শ মুসলমান রমণীর পাণিগ্রহণ, নতুবা ধর্মান্তরিত মুসলমান দিয়ে তা চলে না। অন্যদিকে হিন্দুর হাতে মুসলমান চরিত্রের অবমাননার সামাজিক ক্ষুব্ধ দৃষ্টি থেকে নিয়ে ঈসা খাঁর জন্য হিন্দু রমণীকে প্রেমিকা হিসাবে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিল না, ইতিহাস কিংবা প্রচলিত কাহিনীতেও সে রকম ছিল। এ কারণে আদর্শ মুসলমান চরিত্র ঈসা খাঁর জন্য এমন একজন রমণী চরিত্র লেখক নির্বাচন করেছেন, ধার্মিক আচরণ এবং আদর্শবোধ দেখে মনে হয় যদিও তিনি মুসলমান কন্যাই ছিলেন, সামাজিক স্বীকৃতিটুকু অপেক্ষা করছিল মাত্র। ঈসা খাঁর প্রেম এবং আদর্শবোধের মিলন সম্পর্কে লেখকের নিজেরও সংশয় ছিল মনে হয়, কেবলমাত্র প্রেম হলে তা অলৌকিকের মত থাকলে অবশ্যই তাঁকে সমকালীন মুসলমান সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় আদর্শও বহন করতে হয়েছে।

খ

স্বর্ণময়ী যে লেখকের আদর্শ প্রচারের অনন্তর মাধ্যম হয়েছেন ফলে স্বর্ণময়ীর চরিত্রের বিকাশের সম্ভাবনাকে লেখক সেভাবে ব্যবহার করতে পারেননি। সিরাজী এ উপন্যাসে এমন একজন রমণীকে আদর্শ করে তুলতে চেয়েছেন যিনি হিন্দু, এবং মুসলমান পুরুষের প্রেমে নিমগ্ন হয়ে ধর্মান্তরিত এবং মুসলমান রমণীর আচরণযোগ্য গুণাবলী সম্পন্ন। স্বর্ণময়ীর প্রেম এবং ধর্মবোধের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। স্বর্ণময়ীকে ধর্মান্তরিত করার ফলে সমকালের মুসলমানদের মত লেখক নিজেও গৌরব বোধ করেছেন। অথচ সিরাজী স্বর্ণময়ীকে যেরূপ গুণাবলীর আধার করে তুলেছেন তা ঈসা খাঁর মাতা জমিলা খানম এবং ভগ্নী ...মার মধ্যে অনুপস্থিত। অথচ মাতা জমিলা খানম এবং কোন ...মার কথা, আত্মিক ধর্মাচরণের কথা প্রায় সব ক্ষেত্রে মনে হয়। মাতা জমিলা খানম পরবর্তীকালে স্বর্ণময়ী কর্তৃক আদৃত ঈসা খাঁর সেবা করতে দেখে বিস্মিত হননি

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮।

বরং সেবার কাৎসবর্গ স্নেহে তাঁকে পুত্রবধূরূপে পাবার জন্যই আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।[১] এক্ষেত্রে দুর্গমগ্নার নিকট থেকে প্রার্থিত বাঞ্ছনের পরামর্শ নেবার প্রয়োজনও হয়নি।

ঈশা খাঁর পিতার নাম কালিদাস গজদানী, তিনি ধর্মান্তরিত মুসলমান[২] সুতরাং অসম্ভব নয়, লেখক এটাকে বিকৃত করে নেবার জন্য কিংবা অনুধাবন করার প্রবণতা সৃষ্টির জন্যই তাঁদের দিয়ে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি আত্যন্তিক প্রীতি প্রদর্শন করেছেন। তাছাড়া বিষয় হল, মুসলমানের সুরা, সম্পর্কে উক্তি করার সময় হতভাগ্য যে গালি দিয়েছেন সেখানে সুরাপানের পরিচয় অনুপস্থিত।

দুর্গমগ্না চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে লেখক হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের শক্তি পরীক্ষার একটি ক্ষেত্রও প্রস্তুত করে তুলেছেন। সেকারণ দুর্গমগ্না চরিত্রে মুসলিম বিদ্বেষ বারবার প্রকাশ পেয়েছে, এবং যে কোন উপলক্ষ্য পাওয়া গেলে লেখক নিজেই যেন অবিচলিত হয়ে মতামত প্রকাশ করেছেন।

ঈশা খাঁ দুর্গমগ্নার পূর্ব পরিচিত, কিন্তু মন্দিরে সাক্ষাৎ কালের সম্ভাবনা নতুন। এ সাক্ষাৎ কালের মধ্য দিয়ে দুর্গমগ্নার হৃদয়ে যে ভাবান্তর ঘটেছে লেখক তাকে প্রেম বলেছেন। কিন্তু আসলে তা প্রাণ এবং সম্মান রক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতা।[৪] সন্দেহ নেই দুর্গমগ্নার এ কৃতজ্ঞতাবোধই ধীরে ধীরে প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এ প্রেম পুষ্পিত হয়ে যখন ঈশা খাঁকে প্রাণদান সেবা করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে, এবং পাছে যদি ধর্মান্তরিত হয়ে ঈশা খাঁর সঙ্গে তিনি বিবাহ করতে আবদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু দুর্গমগ্নার প্রেমে কোন বৈচিত্র্য নেই, তিনি নির্লিপ্ত এবং নিষ্ক্রিয়, ঈশা খাঁর জন্য হৃদয় সমর্পণ করার পর তাঁর যেন আর কিছুই করণীয় ছিল না। ইলিমপুরের জমিদার চাঁদরায় চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে স্থির হবার পর তিনি বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু সেকথা চিঠির মাধ্যমে ঈশা খাঁকে জানিয়েই কর্তব্য সমাধান করেছিলেন। তাঁকে উদ্ধার করে নেবার জন্য তার কোন প্রচেষ্টা নেই, এই ধারণাই তাকে নিশ্চিন্ত করেছে যে রূপকথার রাজপুত্র ঈশা খাঁ এসে তাঁকে পরিত্রাণ করে নিয়ে যাবেন। তবে মন্দিরে সাক্ষাৎকালের পর থেকে ঈশা খাঁর নিকট ২ পত্র প্রেরণ দুর্বুদ্ধি দর্শন দেখা যায়, দুর্গমগ্না নিজের থেকেই ঈশা খাঁ সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়েছেন। ঈশা খাঁর প্রতি দুর্গমগ্নার আকর্ষণ অকৃত্রিম, এবং মন্দিরে সাক্ষাৎকালের মধ্যে তাঁর প্রেমের পৃথিবীর ওপর রচনার সূত্রপাত নিহিত হয়েছে।[৫]

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮।
২। History of Bengal, Vol.II, pp.177-78.
৩। মাসুমকিশা, দি-র, পৃঃ৪৪, ৪৬।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬।
৫। "যাহারা গগন পথের উপারম্ভ আকাশ বিদ্যুৎ বর্ণা এবং দুই পার্শ্বের শ্যামল তরুরাজি যেন আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিতেছে। চারিদিকে যেন মহোৎসবের চহল উঠিয়াছে। দুর্গমগ্নী সেদিন সত্য সত্যই অপার স্নিগ্ধতা—পুলকরাশ এবং রসমাধুর্যে।—হৃদয় উচ্ছ্বসিত নদীর ন্যায় দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দুই বিন্দু অশ্রু অজ্ঞাতসারে তাঁহার গণ্ডস্থলে পতিত হইল।"—প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খাঁর মত বিদ্রোহী সুর্ণময়ী নিজের ব্যক্তিত্বকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে নিলেন এবং সমগ্র পৃথিবীকে নতুন দৃষ্টিতে দেখলেন। প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতি বিবাহ কিংবা মিলন, সেকারণে দিল্লীর অনুমতি পত্র করার জন্য সুর্ণময়ী পত্র প্রেরণ করলেন, প্রথ এমন সাথীর কুল নিয়েছেন।[১] তিনি ঈসা খাঁর নিকট স্বয়ং সমর্পন করলেন। কিন্তু প্রেম ও কর্তব্যের মধ্যে দোদুল্যমান চিত্ত এবং স্বপক্ষের অনুসরণ থাকলে সুর্ণময়ীর প্রণয় চিত যেমন উজ্জ্বল হতে পারত এখানে তা নেই। ঈসা খাঁর তাঁর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেননি, বাদশার মহরম উৎসবে দেখা হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনিও সুর্ণময়ীর চিঠির উত্তর দিয়েছেন।[২] এর পর থেকেই সুর্ণময়ী প্রায় নিয়ন্ত্রণ হারা হয়েছে। মহরম উৎসব উপলক্ষে দামুদাপুর ঘাট থেকে হেমদাকান্ত ও অভিরামস্বামী কৌশলে সুর্ণময়ীকে হরণ করে ঈসাখাঁপুরের দিকে যাত্রা দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসে শৈবলিনী পুষ্করিণীর ঘাট থেকে শৈবলিনী জনৈক ফস্টরের দৃষ্টিতে পড়েছিলেন এবং অপহৃতা হয়েছিলেন।[৩] সুর্ণময়ীর অপহরণ ব্যাপারে চন্দ্রশেখর উপন্যাসের প্রভাব পড়তে পারে, এমন কি হেমদাকান্ত চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী উপন্যাসের ব্যোমকেশের আদলে গঠিত।[৪] সুর্ণময়ী সম্পর্কে হেমদাকান্ত ও অভিরামস্বামীর মনে অসদিচ্ছা ছিল, সুর্ণময়ী কৌশলে দুজনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে যাত্রা ভাগ করে নিলেন এবং অরণ্যবাসী মাহতাব খাঁ তাঁকে উদ্ধার করলেন।[৫] কেদার রায়ের পুত্রবধূ অপমানজনক ধর্মান্তরিত অভিযুক্ত হত হয়ে পালিত ঈসা খাঁর সহায়তায় সুর্ণময়ীকে উপস্থিত করে দিলেন। এর পরেকার ঘটনা কাহিনীর, গতানুগতিক, আয়েষা কর্তৃক জগৎ-সিংহের সেবার মত, সুর্ণময়ী ঈসা খাঁকে সেবা করে সুস্থ করে তুলেছেন। এমন কি উপন্যাসের সমাপ্তিকালের সীমা অতিক্রম করে সুর্ণময়ী ঈসা খাঁর রোগমুক্তির প্রাক্কালে নিজের বাম বাহুর উপস্থিতদের সামনে আত্মচ্ছেদন নিজেই করে দিয়েছেন।[৬] ...নাটি দুটি দ্বারা প্রভাবিত, সুর্ণময়ীর অনুরাগের গভীরতা এবং প্রণয়ীর জন্য আত্মোৎসর্গের আকাঙ্ক্ষা দেখে শিরাজীর মত ঈসা খাঁ সমকালীন মুসলমান সমাজে খুশী হয়েছিল। শেষে সুর্ণময়ী ধর্মান্তরিত হয়ে শাহজাদা নাম গ্রহণ করেছেন এবং ঈসা খাঁর সঙ্গে বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে।[৭] সুর্ণময়ীর প্রেমে কোন বিশিষ্টতা নেই, হেমদাকান্ত ও অভিরামস্বামী কর্তৃক অপহৃতা না হলে তিনি ঈশানাথ চৌধুরীর সঙ্গে কিছু প্রতিরোধ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ, অথবা নিজেকে বাধ্য হতে হলে ঈসা খাঁর মত আত্মনিগ্রহ বা আত্মহননের পথ বেছে নিতে পারতেন কিনা বলা কঠিন। সুর্ণময়ী নিজের অন্তরায় দগ্ধ হননি, তাঁর প্রেমের আগুন তাঁকে অন্তরতে দাহন করেনি। হেমদাকান্ত ও অভিরামস্বামীর সঙ্গে সুর্ণময়ী যে আচরণ করেছেন তা কেবলমাত্র আত্মরক্ষা ও সতীত্ব রক্ষার প্রয়োজনে। মুসলমান সমাজের গৌরবময় স্থানে লেখক তাকে অধিষ্ঠিত

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫-৩৬।
২। পূর্বে, পৃঃ ১০৭।
৩। চন্দ্রশেখর, বঙ্ক, ৩, পৃঃ ৪০৫-৪৪।
৪। মৃণালিনী ... প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০১-০২।
৫। ...নামিনা, দি-স, পৃঃ ৯৬-১০০।
৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮-০৯।
৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১।

প্রতিষ্ঠিত করবেন স্থির করেছেন কিন্তু যমুনা নিজেও তাঁকে অশুচি হতে দেননি, তাঁর অমর্যাদা সহ্য করেননি। তাঁকে বহু নানা রকম পরীক্ষায় ফেলেছেন, এবং সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়েছেন। একবার প্রতাপাদিত্যের দস্যুদলের হাতে, পরে কেদার রায়—অভিরামস্বামীর হাতে এবং শেষে আহত ঈসা খাঁর জন্য যুদ্ধে নিজ বাহুর বল দেখিয়েছেন সবই ছিল স্বর্ণময়ীর জন্য কঠিন পরীক্ষা। এসব বাহ্যিক, কিন্তু ঈসা খাঁর মত বিজ্ঞ হৃদয়ের কাছে কঠিন পরীক্ষায় তাঁকে আসতে হয়নি। স্বর্ণময়ী শক্তি দিয়ে ভাগ্যকে জয় করে নিতে পারেননি, যে পুরুষকার ঈসা খাঁর মধ্যেও নেই, কিন্তু ভাগ্য ও জীবনকে এক সূত্রে গ্রথিত করে ঈসা খাঁ যেভাবে জীবনের সংগেই যার কথাকথি করেছেন স্বর্ণময়ীর পক্ষে তা সম্ভব ছিলনা। অথচ প্রেমানুরাগ প্রকাশের জন্য লেখকের মূল লক্ষ্য ছিল স্বর্ণময়ী, ঠিক ঈসা খাঁ নন। সেজন্য এমন মনে হতে পারে যে, লেখকের নিজেরও উদ্দেশ্যের পরাজয় ঘটেছে। ঈসা খাঁ আসলে বীরের পরিবর্তে হয়েছেন আদর্শ প্রেমিক, এবং এমন প্রেমিক যিনি ভাগ্য জয়ের পরিবর্তে পুরুষকার প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে আত্মনিগ্রহে নিপুণ। লেখক ঈসা খাঁর আত্মনিগ্রহ ও স্বর্ণময়ীর সেবাকার্য, যা সে-ক্ষেত্রেন এক করে দেখাতে চেয়েছেন, কিন্তু তা এক নয়। ঈসা খাঁর আত্মনিগ্রহ যেমন উপন্যাসের জন্য অনিবার্য ছিল, তুলনামূলকভাবে স্বর্ণময়ীর সেবা ও ত্যাগ বাইরে থেকে আরোপিত, স্বর্ণময়ী সেটা পারিপার্শ্বিক হিসাবে পালন

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন, হৃদয়ের সংঘাত কিংবা আন্দোলন সেখানে স্পষ্ট নয়।

সাত

পূর্ণযাত্রা এক হলে যেমন হিন্দু ধর্ম ও মুসলমান ধর্মের একটি তুলনার সুযোগ দিয়েছেন, তুলনাটি সমকালীন মুসলমানদের চিত্তে উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল, তাদের নিকট থেকে শিবরাম একারণে প্রশংসা পেয়েছিলেন। এগুলো বাহ্যিক, উপন্যাসের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কবিহীন। মন্দিরে দস্যুর হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পূর্ণযাত্রী দিক-বিদিকের দিকে চেয়ে দৌড়িয়ে ত্যাগ করেছেন।[১] শিবরামিতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অনুসন্ধান এবং সেখানে হিন্দুর পরাজয়ে যেমন দেখিয়েছেন মন্দিরের দেবতা শক্তিহীন ও দুর্বল বলে অনির্ভরযোগ্য। হিন্দুর মন্দিরকে এভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা শিবরামের অন্যান্য উপন্যাসেও আছে। যেমন নৌ পরাজিত দস্যুদলের মধ্যে দুরাচারণ নিয়ে সমালোচনা করেছেন।[২] মন্দিরে বসে হিন্দু ধর্মের অসারতা, মন্দিরের অসারতা ও ইসলাম ধর্মের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ শিবরামের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বলে দিন মন্দিরের ঘটনার অবতারণা করা হতে পারে। এটা আংশিক সত্য হলেও পূর্ণযাত্রী প্রভৃতির মধ্যে রাজবিদ্রোহীর সম্পর্ক জড়ানো বলে মনে এবং রাজবিদ্রোহী উপন্যাসে মন্দিরের অবস্থান বিজয় ভূমিতে দাঁড়িয়ে যায়। তা সত্ত্বেও দুটো উপন্যাসের দুটো ঘটনাই সম্পর্কহীন নয় এবং এ সংযোগ দিয়েছেই বাহির।

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ মহিউদ্দীন কাশ্মিরীর আবির্ভাবের সঙ্গে উপন্যাসের সংযোগ নিতান্তই ক্ষীণ। বোঝা যায়, কুলপুরু যশোদানন্দনের সঙ্গে তুলনায় শাহ মহিউদ্দীন কাশ্মিরীর ক্ষমতা প্রতিপন্ন করা শিরাজীর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এটা করতে যেয়ে লেখককে অলৌকিকত্বের, যাদুর এমন এক পথ অবলম্বন করতে হয়েছে যার সঙ্গে তাঁর প্রচারক জীবনের বিশ্বাসের মিল সামান্যই। ধর্মপ্রচারও কাশ্মিরীর লক্ষ্য ছিল। কাশ্মিরীর আবির্ভাব কৌশলটি তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সাধু সন্ন্যাসীর ভূমিকা থেকে নিয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসে তাঁরা যেমন ঘটনার সঙ্গে অনিবার্যভাবে মিশ্রিত হয়ে গেছেন এখানে তেমন হয়নি, না হবার কারণও বোধ হয় এই যে, তিনি এটাকে প্রচারের কাজে লাগাতে এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য বেধারগড়ের কুলপুরু যশোদানন্দন কাশ্মিরীর নিকট পরাজিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং মনের পরিবর্তিত মুহূর্তে অনুতাপের মন্ত্রণা ব্যক্ত করেছেন।[১] এরপর যশোদানন্দন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে জহিরুল হক নাম গ্রহণ করেছেন। তিনি দুর্গমতীর বিয়েতে এক সময় বাধার সৃষ্টি করেন এবং ধর্মান্তরিত হয়ে যাবার দুর্গবতীকেই কৌশলে আবদ্ধ ঈশা খাঁকে দেবার জন্য নিয়ে যান, তাদের মিলনে সহায়তা করেন, সমগ্র উপন্যাসে এত বড় একটি উপাখ্যানের ভূমিকা মাত্র এইটুকু।

বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) উপন্যাসে নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রার মত[৩] শাহ মহিউদ্দীন কাশ্মিরী শ্রীপুরের ঘাটে প্রভুত্ব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন।[৪] বজরাটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) উপন্যাসের বজরা বলেও ভ্রম হয়।[৫] ঐতিহাসিক ঘটনা হল, ঈশা খাঁর সময়কালে অনেক ধর্ম প্রচারক এদেশে আসেন[৬] কাশ্মিরী এদের একজন হতেও পারেন। তবে এদের আদলে উপন্যাসে আবির্ভাব লেখকের কল্পনাপ্রসূত। শাহ মহিউদ্দীন কাশ্মিরীর ভূমিকা কেবল কেরামতি এবং বাকোটা প্রচারকর্মের মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কেরামতিটুকু পরদেশের আত্মশক্তিরূপে লেখক দেখাতে চেয়েছেন, তা সত্ত্বেও অলীক পার্থিব কিংবা অপার্থিব ক্ষমতা প্রদর্শনের রোমান্টিকতা শিরাজীকে মুগ্ধ করেছিল। শিরাজীর নিজের প্রচারক জীবনও[৭] এর মধ্য দিয়ে প্রতিভাত। প্রচারক শিরাজী সমাজের নিকট থেকে কি সম্মান ও প্রতিপত্তি আশা করেছিলেন তার পরিচয় এখানে রয়েছে। কাশ্মিরীর সঙ্গে শিরাজীর জীবনযাত্রার মিল নেই, তবু আকাশে তিনি যেসব স্বপ্ন রচনা করেছিলেন তা পুষ্পিত হয়ে উঠেছে উপন্যাস বহির্ভূত এসব উপকাহিনীর মধ্য দিয়ে। সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে লেখক নিজেই আবির্ভূত হয়েছেন কোথাও সাধু সন্ন্যাসীর বেশে, রাজ কবি[৮] ইত্যাদি হিসাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ১১০-১২২,১২৮-১৩১।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ১২৯।
৩। বিষবৃক্ষ, ব-র, ৩, পৃঃ২৬১।
৪। রায়নন্দিনী, সি-র, পৃঃ১১৫।
৫। দেবী চৌধুরাণী, ব-র, ৩, পৃঃ৮২০।
৬। গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৭১।
৭। পূর্বে, পৃঃ ৬৭-৬৮।
৮। রায়নন্দিনী, সি-র, পৃঃ ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের বহির্ভূত। তাই প্রতিপত্তিশালী জমিদারী ও জমিদার হয় শিল্পজীর সমকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু ঈশা খাঁ, এমন কি দুর্গমতীও সমকালের বেড়া অতিক্রম করে আর বার প্রাণশক্তি পেয়েছেন। উপন্যাসে ঈশা খাঁ এমন একজন পুরুষ যিনি কোন একটি সমাজের বা ক্ষুদ্র দলের পরিচয়ে চিহ্নিত নন।

খাঁ

মাহতাব খাঁ প্রতাপাদিত্যের অন্যায় অপকর্মের সহায়ক হননি এবং এমন কি জীবন সংশয় জেনেও প্রতাপাদিত্যকে সামনেই প্রতিবাদ করেছেন, পায়ের জুতো খুলে প্রতাপাদিত্যের মুখে আঘাত করেছেন।[১] সমকালের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে মাহতাব খাঁর এ ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। মাহতাব খাঁর মাধ্যমে লেখক এ পাদুকা প্রতাপাদিত্যের পূজা মণ্ডপে ফেলতে চেয়েছেন।[২]

মাহতাব খাঁ প্রতাপাদিত্যের দরবার থেকে পলায়ন করেছেন এবং প্রতাপাদিত্যের অন্যতম রাণী দুর্গাবতীর প্রাসাদে উপনীত হয়েছেন। মাহতাব খাঁর সংগে দুর্গাবতীর কন্যা অরুণাবতীর প্রণয়ভূমিকার পটভূমিকা অতি সামান্য, তা সত্ত্বেও পলায়নরত মাহতাব খাঁকে খাদ্য পরিবেশনরত অরুণাবতী সহসায় প্রেমাবেশে এ মাহতাব খাঁর চুম্বনের ফলে মূর্ছিত হয়েছেন।[২] মাহতাব খাঁর প্রস্থানের সময় অরুণাবতী অনন্যোপায়েই সখীতে কাঁদিয়ে পড়েছেন, মাহতাব খাঁ বাধ্য হয়েছেন অরুণাবতীকে সংগে করে নিয়ে যেতে। রাণী দুর্গাবতী তাকে আশীর্বাদ করেছেন—"মা, তুই কলঙ্কিনী নস্। তুই-ই প্রকৃত সতী।"[৩] রাণী দুর্গাবতীর কথা লেখকের নিজেরও কথা, অরুণাবতীকে তিনি প্রতাপাদিত্য থেকে পৃথক করে নিয়েছিলেন। এর পর দুজনের অরণ্যবাস,[৪] শিবাজী প্রায় তপোবনের আদর্শে তাঁদের অরণ্য জীবনের পরিকল্পনা করেছেন। মাহতাব খাঁ-অরুণাবতীর অরণ্যবাস স্পষ্টই বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাস দ্বারা প্রভাবিত।[৫] কপালকুণ্ডলায় নবকুমার একা এসেছিলেন জ্বালানী কাঠের সন্ধানে। মাহতাব খাঁ অরুণাবতী অরণ্যে এসেছেন আকস্মিকভাবে নীড়ের সন্ধানে। নবকুমার অরণ্য দুহিতা কপালীকে নিয়ে লোকালয়ে আসেন, মাহতাব খাঁ অরুণাবতীর অরণ্যবাস শেষ হয় ঈশা খাঁর নিকট প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পর।

১। "প্রতাপাদিত্য এবার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, পা হইতে পাদুকা খুলিয়া মাহতাব খাঁর দিকে সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। মাহতাব খাঁ পুনঃ-পুনঃই পাদুকা তুলিয়া লইয়া "অধমের কেচহিত পাদুকা" বলিয়া প্রতাপাদিত্যের মুখে বিষম জোরে কয়েক ঘা বসাইয়া দিয়া দ্রুত হইতে দ্রুত অদৃশ্য হইয়া গেলেন।" প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯।

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।

৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮।

৪। কপাল-কুণ্ডলা প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১-৮৫।

৫। কপালকুণ্ডলা, ব-র, ২, পৃঃ ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

অরণ্যবাসের মধ্যে কপালকুণ্ডলার মতো নায়িকা মিল ছাড়াও অন্যের শিরাজী-বিরচিত একটি কাব্যময় চিরহরিৎ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে সেখানে মাহতাব খাঁ ও অরুণাবতীর মনোদিত যৌবনকে স্থাপন করেছেন। যৌবনের বর্ণময় সৃষ্টিতে মাহতাব খাঁ এবং অরুণাবতী দুজনেই বন্যভূমি ও তাঁদের দুজনের জগৎকে বর্ণাঢ্য করে তুলেছেন। শিরাজী দুজন বন্য উঁদের কাছে ইরানী কবির দুজ প্রেমের গজল পরিবেশন[1] করেছেন এবং মাহতাব খাঁকে মহাপুরুষ চিহ্নিত করে তোলবার জন্য অরুণাবতীকে কুহন দান করলেন।[2] যে মাহতাব খাঁ অসাধারণ নৈতিকজ্ঞানসম্পন্ন বীরপুরুষ, প্রতাপাদিত্যের অনৈতিক কর্মের প্রতিবাদ করে যিনি চাকুরী ত্যাগ করে এসেছেন, তিনিই আবার প্রাক বিবাহ হিন্দু রমণীর "অধরসুধা" দুবার পান করেছেন। অরণ্যবাসের সূচনায় কবিত্বময় ভাবধারার একটি পর্যায়ে লেখক কেবলমাত্র অরুণাবতীর বর্ণনার প্রয়োজনের সংযোগ দিয়েছেন। কিন্তু নায়কোচিত কিছু সম্পন্ন হয়েছে উপন্যাসের শেষে।[3] অরণ্যবাসী মাহতাব খাঁ একবার যেভাবে স্বর্ণময়ীকে উদ্ধার করে ঈশা খাঁর সঙ্গে তাঁর মিলনে সহায়তা করেছিলেন[4] ঈশা খাঁও সেভাবে অরুণাবতীকে সহমরণের চিতা থেকে উদ্ধার করে মাহতাব খাঁর সঙ্গে মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেন।[5] প্রতাপাদিত্যকে জুতো দিয়ে আঘাত করা এবং অপহৃতা স্বর্ণময়ীকে উদ্ধার[6] করা ছাড়া মাহতাব খাঁর বীরত্বের প্রকাশ আর কোথাও নেই। বরং প্রতাপাদিত্যের অপকর্মের প্রতিবাদী মাহতাব খাঁ রমণীপ্রেমের মূর্ছনায় ডুবে গেছেন মুসলমান সেনাপতি হিসাবে তার অত্যন্ত দায়িত্বহীন। তিনি বাসনার উদ্রেক মধুপুর বাসী অরণ্যের অপার সৌন্দর্য দেখেছেন, গজল শুনেছেন, অরুণাবতীর মুখমদিরা পান করে মানুষের নির্মমতা ভুলে গেছেন। অরণ্যবাস কালে অরুণাবতীকে দাওয়াত এবং দিয়ে নামাজ পড়া ছাড়া মুসলমান হিসাবে উল্লেখযোগ্য আর কোন কাজ করেননি। ফলে শুধু মাহতাব খাঁর জীবনের রোমান্স প্রকৃতি এসেছে। অরণ্যবাস শেষ হবার পর মাহতাব খাঁ ঈশা খাঁর সেনাবাহিনীতে চাকুরী নিলেন, কিন্তু প্রতাপাদিত্যের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে যুদ্ধকালের জন্য অরুণাবতীকে হারাতে হয়েছে।[7] শেষে ঈশা খাঁর সহায়তায় তাঁদের মধ্যে মিলন সংঘটিত হয়েছে।

মাহতাব খাঁর তুলনায় অরুণাবতী নিষ্ক্রিয়, প্রতাপাদিত্যের বিভিন্ন প্রকার পরাজয়ের নিমিত্ত মাত্র। লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্যের বাহন হবার ফলে অরুণাবতী নিজস্ব প্রকৃতিতেই আত্মসচেতন ও পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারেননি। প্রতাপাদিত্যের অবমাননা চূড়ান্ত করার জন্য যেমন মাহতাব খাঁর সৃষ্টি, তেমনি মাহতাব খাঁর প্রয়োজনে অরুণাবতীর সৃষ্টি, কিন্তু অরুণাবতীর আবির্ভাব তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনে নয়। মাহতাব খাঁ এ উপন্যাসে

১। রাজনন্দিনী, দ্বি-স, পৃঃ ৮০।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৭।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০-০৩।
৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২-৩৬।
৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩।
৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছেন, ঈশা খাঁ - দুর্বিনয়ার তুলনায় মাহতাব খাঁ - মৃণালবতীর প্রেমের প্রকাশ কোন কোন দিক দিয়ে উজ্জ্বল, বিশেষতঃ অন্তঃপুরবাসের মধ্যে শিরাজীর কবি হৃদয়ের নিঃসংকোচ প্রকাশ ঘটেছে। ঈশা খাঁকে দিয়ে অধিকতর জাতীয় দায়িত্ব পালন করানোর ফলে তার প্রেমের মধ্যে রোমান্টিক আবেগ তেমন যুক্ত হয়নি। সেকারণে ঈশা খাঁর চরিত্র ব্যাপক হলেও তুলনামূলকভাবে মাহতাব খাঁ একটি রমণীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে তুলেছেন, মৃণালবতী ও মাহতাব খাঁ পাঠকের চিত্তে একটি মধুর আনন্দবোধ সৃষ্টি করে দেয়। লেখক প্রতাপাদিত্যের আত্মচরিতে অবতারণা করেছেন কিন্তু প্রতাপাদিত্যকে নয়, তার ফলে প্রতাপাদিত্যের প্রতি লেখকের ঘৃণা উপন্যাসের বাইরেই আটকে আছে। রায়নন্দিনী উপন্যাস ঠিক দুর্গেশনন্দিনীর জবাব নয় অথবা জবাব দানের ব্যাপারে লেখকের সচেতন প্রয়াসও স্তিমিত হয়ে এসেছে। প্রতাপাদিত্য উৎসবের জবাবও উপন্যাসের অধিকাংশে, ঈশা খাঁর প্রতি জাতীয় বীরের পূজার মত প্রযুক্ত হয়নি। উপন্যাসে কাহিনীর আরম্ভাংশ অবহিত, চরিত্র অনেকাংশে অবিকশিত কিংবা অস্পষ্ট, কিন্তু ইসলাম প্রচারক শিরাজী এ উপন্যাসের ঘটনার অন্তরালে তেমন স্পর্শ করতে পারেননি। তবে উপন্যাসে প্রায় সুস্পষ্টই লেখকের উপস্থিতি অনুভবযোগ্য, এটা উপন্যাসের দুর্বলতা।

খ। তারাবাঈ

এক

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুরীয় বিনিময় উপন্যাসে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের কন্যা রোশিনারার সঙ্গে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী তাঁর মারাঠা রাজ্য প্রতিষ্ঠার যুদ্ধকে জড়িয়ে দিয়েছেন,[1] প্রকৃত অর্থে শিরাজীর তারাবাঈ উপন্যাসের সূচনা এখান থেকে; এর সঙ্গে শিবাজী উৎসবের সম্পর্ক যুক্ত হয়েছে। 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসে প্রতাপাদিত্যের মত শিবাজী উৎসব প্রতিহত করতে গিয়েই লেখক শিবাজী তনয়া তারা-বাঈকে নিয়ে উপন্যাসে আবির্ভূত হয়েছেন। রায়নন্দিনী উপন্যাসের মত এখানেও ইতিহাসের অনুসরণ গৌণ।

তারাবাঈ উপন্যাস কাহিনীর অবলম্বন হল বিজাপুর ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ, ইতিহাস কাহিনীর অনুসরণে নর নারীর হৃদয়বৃত্তির আকর্ষণ করেই তিনি একে ঐতিহাসিক উপন্যাসের রূপ দিয়েছেন।

বিজাপুরের অন্তর্গত কৃষ্ণনগর পরগণার জায়গীরদার নুরুল্লাহ খানের কন্যা আমিনা বানুর সঙ্গে শিবাজী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন। কৃষ্ণগড় দুর্গে আমিনা বানু বাহাদুর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। যুদ্ধে বিজয়

১। "আমি এই অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত প্রস্তর স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, তোমার মহারাষ্ট্র সেনা যেখানে নির্বিঘ্নে হইয়া সমুদয় উপত্যকা আক্রমণ করিবে এবং অচিরকাল মধ্যে সমুদয় ভারতরাজ্য প্রসারিত হইবে। তাহাকে অবশ্যই জীবনদান করিতে হইবে না। কিন্তু যদি সেই দিন অদূরে দেখিতেছি যখন সং প্রতিষ্ঠিত হিন্দুসাম্রাজ্যের পরিচালকগণ দিল্লীর রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিবে।"— অঙ্গুরীয় বিনিময়, ভূদেব রচনাসম্ভার, পৃঃ ২২০।

Dhaka University Institutional Repository

রাজের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পেরে শিবাজী কৌশলে তাঁকে বশীভূত করার চেষ্টা করেন।[১]

ইতিহাসের অন্য একটি ঘটনা প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণ করা যেতে পারে। আকবরের পুত্র মুরাদের সঙ্গে যুদ্ধে বিজাপুরের রাজমহিষী চাঁদ বিবি পুরুষের বেশ ধারণ করে অসীম বীরত্বের সঙ্গে সৈন্য পরিচালনা করে দুর্গ রক্ষার চেষ্টা করেন। সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করতে না পেরে মুরাদ কৌশল অবলম্বন করে চাঁদ বিবির নিজ দলের সৈন্যদের দ্বারাই তাঁকে নিহত করান।[২] শিবাজী সম্ভবতঃ চাঁদ বিবির এ ঐতিহাসিক ঘটনাটিকেই ভিন্নভাবে সাজিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু মুরাদের স্থানে শিবাজীকে স্থাপন করার ফলে এক ধরণের অসংগতি সৃষ্টি হয়েছে। চাঁদ বিবির সঙ্গে মুরাদের যুদ্ধ হয় ১৫৯৫-৯৯ সালের দিকে, শিবাজীর জন্ম হয়েছে এ ঘটনার অনেক পরে, ১৬২৭ সালের ১০ই এপ্রিল।[৩] সুতরাং ইতিহাসের সত্যতা বজায় রাখলে কোন অবস্থাতেই চাঁদ বিবির প্রতিপক্ষ শিবাজী হতে পারেন না। সেজন্যই লেখক চাঁদ বিবির স্থলে সাকিনা বানুর কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করে তাঁর বিপরীতে শিবাজীকে দাঁড় করিয়েছেন। সাকিনা বানুর মত তাঁর সেনাপতি মোহাম্মদ খাঁ ও কাল্পনিক চরিত্র। মোগল সম্রাট শাহজাহানের সেনাপতি হিসাবে জনৈক মোহাম্মদ খাঁর নাম পাওয়া যায়।[৪] মোহাম্মদ খাঁর সাহসিকতাকে লেখক সাকিনা বানুর সঙ্গে যুক্ত করে দিতে পারেন। উপন্যাসে তানাজী মালুশ্রের প্রেমপ্রার্থী এবং শিবাজীর অন্যতম সাহসী সেনাপতি মালোজী চরিত্রের ইঙ্গিতটিও লেখক পেতে পারেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ থেকে।[৫] সম্ভবতঃ 'মালজী' তারাবাঈ উপন্যাসে মালোজী হয়েছেন, এবং শিবাজী ও মালোজী উভয়কে

১। তারাবাঈ, পি-র, পৃঃ ১৫১-৫৫।
২।(ক) Oxford History of India, p.295.
(খ) Cambridge History of India, Vol.III, p.59.
(গ) "[illegible] চাঁদ বিবির বীরত্ব ও সাহসের কাহিনী অবলম্বন করিয়া কর্ণেল মেডোজ টেলর সাহেব The Noble Queen বলিয়া একখানি উত্তম ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালায় চাঁদ বিবির বিষয় লইয়া যদি কেহ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন, তাহা হইলে তাহাতে বঙ্গ সাহিত্যের অনেক লাভ হয়।" দ্রষ্টব্য, শ্রী রাজনারায়ণ বসু-সাহিত্যসেবক, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।
৩। Sir Jadunath Sarkar - Shivaji and His Times, Calcutta, M.C.Sarker & sons private limited, 1961, pp. 245-46.
৪। [illegible], ১৮২২।
৫। মুসলমানদের সম্পর্কে বলেছেন, "আপনারাই অন্যান্যকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাগসকল ক্রমে ক্রমে জয় করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা যে পারিয়াছিল তাহার মুখ্য কারণ এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা অনুর্বিবাদে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল এবং যুদ্ধ কার্যটিকে রাজপুতদিগের সম্প্রদায়বিশেষের কার্য বলিয়াই নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। যখন এরূপ করে নাই অর্থাৎ যখন যুদ্ধ করা জনসাধারণের কার্য বলিয়া মনে করিয়াছিল তখনই মুসলমানেরা পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। শিবাজীই মহারাষ্ট্র দেশে ঐ প্রণালী প্রবর্তিত করেন। তাহার প্রতি বিশুদ্ধ গরিমর যিনি লিখেন; বিজেতা বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ সেই টীমাজী মালজীকে বিজাপুর রাজ সেনাপতি একদা জিজ্ঞাসা করেন তোমাদিগের সৈন্য কোথায়? মালজী হলবাহী কৃষকদিগকে দেখাইয়া বলেন ইহারাই আমাদিগের সৈন্য।"
— সামাজিক প্রবন্ধ-হিন্দু সমাজ, ভূদেব রচনা সম্ভার, পৃঃ ৩১।

দিয়েই উদীয়মান হিন্দু জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে লেখক প্রতিক্রিয়াশীলতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সেজন্য কোন কোন অংশে নায়ক আফজাল খাঁর চেয়েও শিবাজী গুরুত্বপূর্ণ, এবং উপন্যাসের ঘটনা আফজাল খাঁর তুলনায় শিবাজীকে কেন্দ্র করেই অধিকতর আবর্তিত হয়েছে। শিবাজী ও আফজাল খাঁর ঐতিহাসিক চরিত্রকেও অনৈতিহাসিক করে তুলে লেখক সে উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছেন।

উপন্যাসে শিবাজী আমিনা বানুকে কৌশলে বশীভূত করে কামলিপ্সা চরিতার্থ করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমিনা বানু তাঁকে বাহু যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর প্রাণ সংহার করার উপক্রম করলে শিবাজী আমিনা বানুকে মাতৃসম্বোধনে তুষ্ট করে তাঁর নিকট প্রাণভিক্ষা করেছেন।[১]

একটি ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়, বিজাপুরের কল্যাণ প্রদেশের জনৈক শাসক মোল্লা আহমদকে পরাজিত করে তাঁর পুত্রবধূকে সেনাপতি আবাজী সোনদেব শিবাজীর ভোগের জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু শিবাজী তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসা করে মাতৃতুল্য সম্মান প্রদর্শন করে মুক্তি দেন।[২] এ ঘটনাটিকেই লেখক সম্ভবতঃ ভিন্নরূপে উপস্থাপিত করেছেন। শিবাজীর মাতৃভক্তি ছিল দেবোপাসনার মত ঐকান্তিক হয়েছিল[৩] এবং তুলজাপুরের মত প্রতাপগড় দুর্গে ভবানীমূর্তি স্থাপন করে তিনি অনেকবার সেখানে তীর্থযাত্রা করেন।[৪] শিবাজীর মাতৃভক্তি ও ভবানীভক্তির জন্য পদতলে চেপে ধরে আমিনা বানু কর্তৃক শাস্তিদানের সময় লেখক মাতৃমূর্তি এবং ভবানী মূর্তিকে একাকার মিশ্রিত করে দিয়েছেন।

রমনী সম্ভোগে আসক্ত না থাকলে শিবাজীর সেনাপতি যুদ্ধজয়ের পর তাঁর নিকট যুবতী রমনী উপঢৌকন পাঠাতেন না, একথা মেনে নিলেও ইতিহাসের সাক্ষ্য হল শিবাজীর নৈতিকতাবোধ প্রায় প্রশ্নাতীত।[৫]

তারাবাঈ উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে শিবাজী কর্তৃক আফজাল খাঁকে হত্যার প্রসংগ নিয়ে। হত্যা ঘটনাটি ঐতিহাসিক, কিন্তু উপন্যাসে হত্যার পটভূমিকা যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তার সংগে ইতিহাসের সম্পর্ক সুদূর। ইতিহাসকে এভাবে পরিবর্তন করে নেবার পশ্চাতে একটি সাম্প্রদায়িক কারণ বিদ্যমান।

১৮৯৪ সালে মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাধর তিলক শিবাজী উৎসবের প্রচলন করেন।[৬] শিবাজী উৎসবের মধ্য দিয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে শিবাজীর বিদ্রোহকে গৌরবের সংগে স্মরণ করা হয়। জীবনের সূচনাতেই শিবাজীর

১। (ক) "[illegible] আমেনা বানু ভীষণ রণরঙ্গিনী মূর্তিতে ভ্রূকুটি কুটিল নেত্রে শিবাজীকে পদতলে চাপিয়া দণ্ডায়মানা।"
তারাবাঈ, পি-র, পৃঃ ১১৫।
(খ) "সত্যই তুমি দানবদলনী পাপ-তাপ নাশিনী দুর্গা। এতদ্ব্যতীত নারীতে কখনও এমন তেজঃ ও সাহসের সঞ্চার সম্ভব নহে।" প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬।
২। (ক) Shivaji and His Times, p.56.
(খ) যদুনাথ সরকার-শিবাজী, কলিকাতা, ৪র্থ সং, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স, পৃঃ ৪১।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।
৪। (ক) প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫।
(খ) Jadunath Sarkar, History of Aurangzib, Vol.IV, Calcutta, M.C. Sarkar & sons, 1919, p.31.
৫। (ক) History of Aurangzib Vol.IV, p.235.
(খ) Shivaji and His Times, Appendix, p.383.
(গ) বীরপূজা, সামাজিক প্রসংগ, মাসিক বসুমতী, বৈশাখ, ১৩৩৩।
৬। পূর্বে, পৃঃ ২১।

স্বাধীন নৃপতি হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, হিন্দু জাতিকে উদ্ধার কিংবা রক্ষা করার ইচ্ছা তাদের অনেক পরে।[১] কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু জাতি অধ্যুষিত ভারতে আওরঙ্গজেবের সর্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা যে কারণে গ্রহণযোগ্য নয়, শিবাজীর হিন্দু-স্বরাজ্য সেই একই যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।[২] কিন্তু পরবর্তীকালের রাজনীতিতে হিন্দুর ধর্মবোধ গভীরভাবে যুক্ত হবার ফলে আওরঙ্গজেবের স্থানে শিবাজী প্রতিষ্ঠা পেলেন এবং হিন্দুরা মুসলমান ঘাতক শিবাজীকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলেন। এ প্রচেষ্টার অন্যতম ফল তারাবাঈ উপন্যাস।

আফজল খাঁর হত্যা সম্পর্কেও শিবাজীর সুনাম ও দুর্নামের কারণ হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের জন-মানসে এর গভীর প্রভাব পড়েছিল।[৩] আফজল খাঁর পরিণাম নিয়ে অনেক অজ্ঞাতনামা গাথা রচনা করেন। কিংবদন্তীও সৃষ্টি হয়েছিল, এগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয়।[৪] শিবাজী উৎসবের মধ্য দিয়ে তাঁর ক্ষমতার পুনরাবির্ভাব কামনা এবং হিন্দু জাতীয়তার উদ্বোধন মুসলমানদের বিচলিত করেছিল। সেকারণে মুসলমানরা আফজল খাঁর পরাজয়কে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি বলে একে ষড়যন্ত্রের ফল বলে চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। শিবাজী উৎসবে তাঁর বীরত্ব প্রদর্শনের বিপরীত ধারায় হল উপন্যাস। তার নিশ্চিত প্রমাণ।

শিবাজীর সর্বমোট পুত্র কন্যার সংখ্যা আট জন, এদের মধ্যে তারাবাঈ নামে কোন কন্যা ছিল না।[৫] তাছাড়া বয়সের দিক থেকেও এটা সম্ভাব্য নয়। শিবাজীর জন্ম ১৬২৭ সালের ১০ই এপ্রিল এবং তার প্রথম

সম্ভ্রম, পুত্র শম্ভুজীর জন্ম হয় ১৬৫৭ সালের ১৪ই মে। আফজাল খাঁ হত্যার ঘটনাটি ঘটে ১৬৫৯ সালের ১০ই নভেম্বর। অর্থাৎ শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর জন্মের পর থেকে আফজাল খাঁর হত্যার সময়ের ব্যবধান হয় প্রায় আড়াই বছর। শিবাজীর নিজেরও বয়স এ সময় প্রায় ত্রিশ বছর, এ সময়ের মধ্যে শিবাজীর তারাবাঈ নামে যৌবন-প্রাপ্ত কোন কন্যার জন্ম অসম্ভব ঘটনা। তা সত্ত্বেও মুসলমান শাসকের মাধ্যমে আফজাল খাঁর হত্যাকে বুদ্ধি পেত রূপ দেবার জন্য তারাবাঈয়ের সৃষ্টি হয়েছে এবং দুর্বলচরিত্রের মানুষেরা কর্তৃক জনৈক শিবাজীর দেবার মত যোগ্য তারাবাঈকে দিয়ে আহত আফজাল খাঁর সেবা করার সুযোগ করে দিয়েছেন।[৬]

১। (ক) History of Aurangzib, Vo.IV, pp.23–24.
(খ) Shivaji and His Times, pp.31–32.
(গ) শিবাজী, পৃঃ ২৫, ২৫০।

২। "Thus Shivaji's power was exactly similar in origin and theory to the power of the Muslim states in India and elsewhere, and he only differed from them in the use of that power. Universal toleration and equal justice and protection for all his subjects were his distinctive policy in the permanently occupied portion of his realm". Shivaji and His Times, Appendex-p.375.

৩। Ibid, pp.71–72.

৪। শিবাজী, পৃঃ ৫০।

৫। (ক) Shivaji and his Times, p.399.
(খ) শিবাজী, পৃঃ ২৩৫–৩৬।

৬। তারাবাঈ, দ্বি-খ, পৃঃ ১৮৬–৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

শিবাজীর পৌত্র এবং শম্ভুজীর পুত্র শাহুর নাম ছিল শিবাজী, এবং শম্ভুজীর স্ত্রীর নাম তারাবাঈ। মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে তারাবাঈ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১] শাহু বা শিবাজীর মাতাকেই সম্ভবতঃ লেখক উপন্যাসে শিবাজীর জন্যাকুল মাতৃ কল্পিত করেছেন। কিন্তু সে অনুমানও ইতিহাস তাঁকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। কেননা তারাবাঈয়ের আবির্ভাব আফজল খাঁর হত্যার অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা।[২]

আফজল খাঁকে হত্যা না করে সম্ভব হল না বলে মহাপরাক্রান্ত শিবাজী আফজল খাঁকে হত্যা করেন [৩] ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। মূল ইতিহাসের ঘটনাও কোন কোন দিক দিয়ে বিতর্কিত।[৩] ঐতিহাসিক তর্ক বলেছেন, শিবাজী প্রথমে বিশ্বাসঘাতকতা করে আফজল খাঁকে আঘাত করেছেন, যদুনাথ সরকার বলেছেন, আফজল খাঁ প্রথমে আঘাত করেন, কিন্তু দুজনের ভূমিকাই এক রকম ছিল। বাংলায় শিবাজী উৎসবকে জনপ্রিয় করার অন্যতম ব্যক্তি সখারাম গণেশ দেউস্কর তর্কের সমালোচনা করে বলেছেন, "তর্ক প্রধানত মুসলমান লেখকগণের গ্রন্থ হইতেই সংকলন করিয়াছেন" এবং "আফজল খার মনেই কপটতা ছিল, ইহাই অধিকতর সম্ভব মনে হয়।"[৪] যোগীন্দ্রনাথ বসুর শিবাজী কাব্যেও একথা আছে।[৫] ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুরীয় বিনিময় উপন্যাসে শিবাজীকে প্রতিষ্ঠা দান করা হয়। রমেশ দত্ত মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত উপন্যাসে শিবাজীর চরিত্রের বীরত্ব ব্যঞ্জক দিকের প্রতিই আলোকপাত করেন। এ ক্ষেত্রে ইতিহাস ভেদন নেই।[৬] এসব গ্রন্থের জনপ্রিয়তা লেখককে বিপরীত পথে যাবার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল। তবে তিনি ইতিহাসের সঙ্গে একটি সুদূর সম্পর্ক রেখেই তার উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হন। কেবল প্রধান ঘটনা নয়, অপ্রধান ঘটনার ক্ষেত্রেও ইতিহাসের সঙ্গে মিল এবং অমিল দুটোই রয়েছে। আফজল খাঁ কৃষ্ণাজী ভাস্করকে শিবাজীর নিকট দূত হিসেবে প্রেরণ করেন শিবাজী তাঁকে ঘুষ দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সম্মত করে তোলেন।[৭] এ যদি তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়। ঘটনাটি ঐতিহাসিক, উপন্যাসে এর সঙ্গে আর একটু যুক্ত করে কৃষ্ণাজী ভাস্করের আপ্যায়নের ঘটনার সঙ্গে সম্ভবতঃ কল্পিত আফজল খাঁর প্রথম আতিথ্য গ্রহণ, তাঁকে আপ্যায়ন ও শিবাজী তনয়ার প্রণয়োপাখ্যানকে লেখক যুক্ত করে দিয়েছেন।[৮] মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত উপন্যাসে আফজল খার নাম আবুল ফাজল। দূতের নাম গোপীনাথ

১। James Grant Duff-A History of the Maharattas, Vol.I, Calcutta R. Cambray xxxxx & Co. ,1912, Xxx, pp.338-44.

২। তারাবাঈ, দি-ম, পৃঃ ২২০-২১।

৩। (ক) শিবাজী, পৃঃ ৪২-৫২।
(খ) Shivaji and His Times, pp.58-59.
(গ) A History of the Maharattas, Vol.I, pp.134-38.
(ঘ) History of Aurangzib, Vol.IV, pp.34-40.

৪। সখারাম গণেশ দেউস্কর -আফজল খাঁর অভিযান, সাহিত্য, ফাল্গুন, ১৩০৯।

৫। শিবাজী, পৃঃ ৬৮-৭০।

৬। "যদি শিবাজীর চরিত্র হইতে কলঙ্ক রেখা নিঃশেষে মুছিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের দেশপ্রীতি প্রবল হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু শিবাজী কল্পবিদের অনুগৃহীত হইয়া যে অলৌকিক জ্যোতির্মণ্ডল বেষ্টিত আদর্শ মহাপুরুষের ন্যায় ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে বিচরণ করিয়াছেন, আমাদের সহানুভূতি অধিকার করিবেন না।" -শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলিকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮০

৭। (ক) শিবাজী, পৃঃ ৬৬-৬৭।
(খ) Shivaji and His Times, pp.65-67.

৮। তারাবাঈ, ত্রি-দ্বি, পৃঃ ১৮১-৮২।

Dhaka University Institutional Repository

তার মধ্যেই শিবাজী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।[১] ঐতিহাসিক ডাফও আফজালের দূতের নাম পন্তজী গোপীনাথ বলেছেন।[২]

শিবাজী তাঁর গুরু রামদাস স্বামীকে রাজ্য দান করেছেন। তিনি মনে করতেন, মহারাষ্ট্রের প্রকৃত অধিকর্তা রামদাসস্বামী, রাজ্য পরিচালনায় ক্ষেত্রে শিবাজী তাঁর প্রতিনিধি হয়েছেন মাত্র।[৩] এ কারণে উপন্যাসে রামদাসস্বামীর চরিত্রকে ইতিহাসের সমর্থন ছাড়াই কল্পনালিপ্ত করে তোলার চেষ্টা হয়েছে, অতিথি আফজাল খাঁকে তিনিও সেবা করেছেন।[৪] উপন্যাসে শাহজী তাঁর পুত্র শিবাজীর সম্প্রীতি অনুমোদন করেননি।[৫] ঐ ঐতিহাসিক বিবরণ এর প্রায় অনুরূপ।[৬] ইতিহাসে তানাজী মালুশ্রী শিবাজীর অন্যতম বিশ্বস্ত সেনাপতি, আফজাল খাঁর হত্যা মুহূর্তেও তিনি উপস্থিত ছিলেন।[৭] এই মালশ্রী উপন্যাসে মালোজী হতে পারেন,[৮] তার মধ্যে শিবাজীর অনুগত ও দক্ষ সাহসী সৈনিক। উপন্যাসের শেষে লেখক দেখিয়েছেন মোঘলশক্তি কর্তৃক দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্য সমূহ আক্রমণের ফলেই মুসলিম শক্তি দুর্বল হয় এবং শিবাজীর ক্ষমতাবৃদ্ধির পথে তা সহায়ক হয়ে ওঠে।[৯] এটা আংশিক সত্য।[১০] দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের তারাবাঈ(১৯০৩) কাব্য নাটকের কাহিনী টডের রাজস্থান থেকে গৃহীত হয়। এখানে তারাবাঈ সোলাঙ্কি বংশপতি সুরতানের কন্যা। এ তারাবাঈয়ের সঙ্গে মহারাষ্ট্র অধিপতি শিবাজীর কন্যা তারাবাঈয়ের কোন মিল নেই। তা সত্ত্বেও কাহিনী পরিকল্পনার মধ্যে ডি-এল-রায়ের কিছু প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক নয়। তারাবাঈ নাটকে পৃথ্বী তারার প্রতি মুগ্ধ, এবং তারা মুগ্ধ জয়মলের প্রতি।[১১] উপন্যাসে মালোজী তারাবাঈয়ের প্রতি মুগ্ধ তারাবাঈ আফজাল খাঁর প্রতি আকৃষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের সঙ্গেও তুলনীয়, দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েষা মুগ্ধ জগৎসিংহের প্রতি, জগৎসিংহ তিলোত্তমার প্রতি মুগ্ধ। তবে দুর্গেশনন্দিনীর প্রভাবই সম্ভবতঃ বেশী, এখানে মুসলমান রমণী হিন্দু পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট, তারাবাঈ উপন্যাসে হিন্দু রমণী মুসলমান পুরুষের প্রতি মুগ্ধ। তারাবাঈ নাটকে পুরুষবেশী তারাবাঈয়ের শিকারযাত্রা[১২] উপন্যাসে তারাবাঈয়ের পুরুষবেশী মূর্তিতে[১৩] সহায়তা করতে পারে।

১। মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, (যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত), রমেশ রচনা সম্ভার, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৬, পৃঃ ৪৭১-৭২।
২। A History of Mahrattas, Vol. I pp. 134-35.
৩। শিবাজী, পৃঃ ২৫০-৫৩।
৪। তারাবাঈ, শি-স, পৃঃ ১৬১-৬৫।
৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭-৬৮।
৬। Shivaji and His Times, p. 351.
৭। A History of the Maharattas, Vol. I, p. 137.
৮। পূর্বে, পৃঃ ১১৭।
৯। তারাবাঈ, শি-স, পৃঃ ২২২।
১০। "The mutual conflict and internal weakness of the Muslim powers of the Deccan were no doubt contributory causes of the rise of shivaji. But his success sprang from a higher source than the incompetence of his enemies. I regard the last great constructive genius and nation builder that the Hindu race has produced". Shivaji and His Times, Appendix, p. 388.
১১। তারাবাঈ, দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৪, পৃঃ ৫৫-৫৬।
১২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০-৫৪।
তারাবাঈ, শি-স-, পৃঃ ৫৫-৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' উপন্যাসে পশুপতি ও [illegible] (ধুরন্ধর) [illegible] গোপন মন্ত্রণা জেনে ফেলেছে মনোরমা, এবং পরে তা হেমচন্দ্রের নিকট প্রকাশ করে দিয়েছে।[১] এখানে তারাবাঈ আফজাল খাঁর হত্যার ষড়যন্ত্র জেনে তা পৌঁছে দিয়েছে আসমান খাঁর নিকট।[২] তারাবাঈ শিবাজীর কন্যা, অন্যদিকে পশুপতির প্রণয়াস্পদ এবং বাগদত্তা স্ত্রী। পশুপতির প্রতি মনোরমার বিশ্বাসঘাতকতাও আংশিকভাবে তুলনীয় আফজাল খাঁর প্রতি শিবাজীর বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে। [illegible] উপন্যাসে দুর্গম অঞ্চলের [illegible] শিবাজী [illegible] জু, বলে দিয়েছিলেন।[৩] আমিনা বন্দুকের [illegible] গুলিতে [illegible] শিবাজীকে প্রতিশোধ নিয়েছে আমিনা বন্দুক মাধ্যমে শিবাজীকে শাস্তি প্রদান করে, কেবল তাই নয়, তাঁর কন্যাও মুসলমান [illegible] অনুরাগিণী হয়েছে।

শিবাজীর প্রথম উপন্যাস 'রাজনন্দিনী'-এর মধ্যে তারাবাঈ উপন্যাসের কোন কোন দিক নিহিত আছে। এমন কি প্রতাপসিংহ উৎসব এবং শিবাজী উৎসবের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে পর্যায় উপন্যাসটিকে প্রতাপসিংহ সম্পৃক্ত [illegible] বলে মনে হতে পারে।

দুর্গমধ্যে দস্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার পর ঈশা খাঁর প্রতি [illegible] কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন[৪], তারাবাঈও মত্ত হাতীর হাত থেকে উদ্ধার পাবার পর আফজাল খাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থেকেছেন।[৫] উভয় ক্ষেত্রেই এ কৃতজ্ঞতা পরে প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতাপসিংহ-অরুণাবতী-আফজাল খাঁর [illegible] শিবাজী যখন আফজাল খাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র [illegible] তারাবাঈ সে মুহূর্তে আফজাল খাঁর জীবনের মূল্য বিদ্যুৎ। শিবাজী-প্রতাপসিংহ [illegible] হয়েছেন এবং [illegible] উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়েছেন। উপন্যাসের ঠিক একটা কারণে ঐতিহাসিক শিবাজী চরিত্রের মূল [illegible] পরিস্ফুট হয়েছে। প্রথম উপন্যাসে প্রতাপসিংহের প্রতিপক্ষ ঈশা খাঁ, অনুরূপ তারাবাঈ উপন্যাসে শিবাজীর প্রতিপক্ষ আফজাল খাঁ। [illegible] কোনভাবেই [illegible] না হলে, শিবাজীর হাতে আফজাল খাঁর [illegible] সম্ভব হয়নি। সুতরাং ঈশা খাঁর ওপর [illegible] নির্ভর করতে হয়েছেন, আফজাল খাঁর [illegible] ভিত্তিতেই অনেক দুর্বল [illegible] এ উপন্যাসে [illegible] হতে পেরেছে।

দুই

রাজনন্দিনী উপন্যাসের মত তারাবাঈ উপন্যাসেও একই কাহিনী [illegible] মধ্যে দুটো উপাখ্যান রয়েছে, শিবাজী আমিনা-বানু এবং আফজাল খাঁ-তারাবাঈ। রাজনন্দিনী উপন্যাসে দুটো কাহিনীর মধ্যে [illegible] যেমন

১। মৃণালিনী, ব-র, ৩, পৃঃ ২১২-১৫।
২। তারাবাঈ, দি-র, পৃঃ ১৭২, ১৭৭-১৮০।
৩। "[illegible] শিবাজীর হস্তে এবং [illegible] বন্দী হইবেন। তিনি [illegible] জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন এবং [illegible] করিতে পারেন নাই। [illegible] করিয়াছেন তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইতেন।" ঐতিহাসিক কাহিনী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৯২।
৪। পূর্ব, পৃঃ ১১০।
৫। তারাবাঈ, দি-র, পৃঃ ১৬০-৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

শিথিল, এখানে ঠিক তেমন নয়। এখানে কাহিনীসূত্র মোটামুটিভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়ে প্রবহমান, চারিত্র এবং তা পূর্ণতা দানের জন্য উপন্যাস কাহিনী এখানে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করেছে।

তারাবাঈ উপন্যাসের বিয়োগান্তক পরিণতির কারণ আফজাল খাঁর সুনিশ্চিত মৃত্যু, ইতিহাসে এটা এত বেশী সর্বজনবিদিত যে ঔপন্যাসিকের কল্পনা দ্বারাও তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। তা সত্ত্বেও ঘটনা যেভাবে অগ্রসর হয়েছে, তারাবাঈয়ের সঙ্গে আফজাল খাঁর মিলন তাঁর মৃত্যুর পূর্বেও সম্পন্ন হত না। কিন্তু তা না হবার কারণ এও হতে পারে যে, শিবাজীকে প্রতিরোধ করার চিন্তাই সর্বাগ্রে প্রবল ছিল এবং এ জন্য তাঁর কন্যার সঙ্গে আফজাল খাঁর মিলনে তাঁদের দুজনেরই অনাগ্রহ ছিল। উপন্যাসে শিবাজীর চরিত্রটিকে ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্ভবতঃ তাঁর মাহাত্ম্য স্থাপনে অনুমাত্রা রোধ করাও লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য বলা যায়, শিবাজীর প্রয়োজনে আফজাল খাঁর সৃষ্টি এবং আফজাল খাঁর ~~প্রয়োজনে~~ প্রয়োজনেই তারাবাঈয়ের সৃষ্টি। শিবাজীকে উপেক্ষা করা কিংবা সমুচিত শিক্ষা দানের জন্য আদিলশা বানুর সৃষ্টি এবং আদিলশা বানুর প্রয়োজনেই মোতাহেদ খাঁ এসেছেন। শিবাজীর সঙ্গে আফজাল খাঁর একটি কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা দাঁড় করানো হয়েছে।

আফজাল খাঁর প্রথম আবির্ভাব অসামান্য বীর হিসাবে, প্রথমেই তিনি তাঁর বর্শাঘাতে এক ব্যাঘ্রকে নিহত করেন।[১] পরে অরণ্যে শিকার করতে গিয়ে প্রচণ্ড তরবারির আঘাতে সিংহের শিরশ্ছেদন করেছেন।[২] এর পর পরই তরবারির আঘাতে বাঘকে দ্বিখণ্ডিত করে বাঘের আক্রমণে বিপর্যস্ত শিবাজীকেও উদ্ধার করেছেন।[৩] পুথির জঙ্গনামার বীরদের মত লেখক আফজাল খাঁকে বারবার বীরত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেছেন, এবং প্রধান তুলনাটি হয়েছে শিবাজীর সঙ্গে।[৪] কেবল তাই নয়, শিবাজীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ শক্তি ও চাতুর্যের পরীক্ষাতেও আফজাল খাঁ উত্তীর্ণ। শিবাজীর মেয়ে গোয়েন্দাবৃত্তিতে কিংবা গুপ্ত আক্রমণে আফজাল খাঁকে হত্যার সংকল্পও সফল হয়নি।[৫] রায়নন্দিনী উপন্যাসে আওরঙ্গজেব শিবাজীকে ক্ষমা করে আত্মসমর্পণ করেন।[৬] প্রায় একই পরিস্থিতিতে আফজাল খাঁ তানাজীর সঙ্গে যুদ্ধ করে সমুচিত শাস্তি দিতে পেরেছেন। তবে আফজাল খাঁর মৃত্যুর পরে তাদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। শিবিরে সসম্মান মত তারাবাঈই তাঁকে প্রায় দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের আয়েষার মত, রায়নন্দিনী উপন্যাসে দুর্গেশ্বরীর মত আহত আফজাল খাঁকে সেবা করেছেন। আফজাল খাঁর মাহাত্ম্যের প্রধান তুলনা সৃষ্টি করা হয়েছে তারাবাঈয়ের মধ্য দিয়ে। অন্যের মত তারাবাঈয়ের মনে হয়েছে আফজাল খাঁর মত এমন পুরুষরত্ন

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬০–৬১।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ১৭৫।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ১৭৬।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬২–৬৩।
৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ১৮৯–৮০।
৬। (ক) রায়নন্দিনী, খ–১ম, ৩, পৃঃ৩৮৮।
(খ) "শিবাজী, অন্যান্য দস্যু সর্দারগণ আওরঙ্গজেবের বেত্রাহত কুক্কুরের মত বদনে মস্তক নিচিত করিয়া রাজসিংহাসনের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ৭০৬।
(গ) "ঔরঙ্গজেব পুনঃ পরাজিত ও অপমানিত হইয়া বেত্রাহত কুক্কুরের ন্যায় পলায়ন করিলেন, রাজপুতেরা তাহার বহু সৈন্য লুটিয়া লইল। ঔরঙ্গজেবের কিছু সেনা মরিল," প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১২।

তিনি জীবনে দেখেননি ,এবং দীপ্ত সূর্যের মত আফজাল খাঁকে দেখেই তিনি মালোজীর কথা ভুলে গেছেন । প্রথম দর্শনের পর তারাবাঈ আফজাল খাঁর গমন পথে আত্মবিভোর হয়ে পুষ্পবর্ষণ করেছেন।[১]

আফজাল খাঁর চরিত্রের দুটো দিক, একদিকে তিনি অসামান্য বীর, রণকুশল সেনাপতি, অসীম সাহসী,অন্যদিকে প্রেমিক। অবশ্য, লেখক আফজাল খাঁকে মুসলমানদের জাতীয় দায়িত্ব পালন করার উপযুক্ত করে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন ,কিন্তু প্রেমের তুফানে তিনি আত্মবিস্মৃত হয়েছেন,সে দায়িত্ব পালন করতে ভুলে গেছেন। তিনি হয়ে উঠেছেন প্রেমসর্বস্ব একটি চরিত্র, এবং প্রেমের কারণেই তার জীবনের পরিসমাপ্তি হয়েছে মর্মান্তিক । আফজাল খাঁর প্রেমের প্রকাশ সমন্বয়বিহীন ,তার বীরত্বের প্রকাশ কোন কোন অংশে রূপকথার রাজপুত্রের মত ,ফলে প্রেম ও বীরত্ব কোন ক্ষেত্রেই ঠিক মিশ্রিত হয়নি এবং এসবের প্রায় হাস্যকর পরিণতি হয়েছে।

আফজাল খাঁর গমন পথে তারাবাঈয়ের পুষ্পবর্ষণ মূর্ণিঝড়ের মত প্রেম ও কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত রূপ। এর পর আফজাল খাঁকে তারাবাঈয়ের মঞ্চেই পাওয়া যাচ্ছে, তিনি তারাবাঈয়ের সেবা নিয়েছেন তারাবাঈয়ের প্রেমের প্রকাশ দেখে বিস্মিত হয়েছেন কিন্তু তাঁর কোন প্রকার আত্ম জিজ্ঞাসা নেই।[২] এভাবে প্রেম এবং সেবাগ্রহণের একটি শুভক্ষণে তিনি তারাবাঈকে চুম্বন দান করেছেন[৩] এবং লেখকের প্রার্থিত বীর সেনাপতির ভূমিকা থেকে মুহূর্তেই চলে এসেছেন প্রেমিকের ভূমিকায়। শিবাজীর ধ্বংস সাধনের জন্য বিজাপুরের বিরাট সেনাদল যখন যুদ্ধক্ষেত্রে[৪] জীবনপণ সংগ্রামে রত সেনাপতি আফজাল খাঁ তখন শত্রুর কন্যা তারাবাঈয়ের প্রেমে নিমগ্ন । তারাবাঈয়ের প্রেমে তিনি সন্দেহ করেননি যেমন করেননি শের মর্দান খা ছদ্মবেশধারী মহারাজীকে। মারাঠারা দুর্গ কেটে এক রাত্রিতে আমিনা বানুকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।[৫] এবং তার পর যখন শের মর্দান খাঁ তারাবাঈকে হরণ করে নিয়ে গেলেন তখনও আফজাল খাঁর শিবিরের কেউ টের পায়নি।[৬] লেখক দেখাতে চেয়েছেন, দস্যুসুলভ মত্ত ,কৌশলেই মারাঠারা এসব অসাধ্য সাধন করেছে । মারাঠাদের রণকৌশল ঐতিহাসিক সত্য কিন্তু তাঁদের সামনে আফজাল খাঁ নিতান্ত অসহায়ের মত ঘটনা অবলোকন করেছেন কিংবা ঘটনায় ক্রীড়নক হয়ে উঠেছেন। সেনাপতি হিসাবে আফজাল খাঁর ব্যর্থতা এখানে যে, শিবাজীর দুষ্টতা সম্পূর্ণ জেনেও তিনি সতর্ক থাকতে পারেননি এবং এরকম ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। আফজাল খাঁ প্রেমেও এমন মত্ত ছিলেন যে, তিনি সেনাপতির দায়িত্ব

১। প্রাগুক্ত,পৃঃ ১৬৪ ।
২। প্রাগুক্ত,পৃঃ ১৮৭।
৩। প্রাগুক্ত,পৃঃ ১৮৭ ।
৪। প্রাগুক্ত,পৃঃ১৮৮।
৫। প্রাগুক্ত,পৃঃ ১৯০ ।

[redacted]

৬। প্রাগুক্ত,পৃঃ ১৯৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

ভুলে গেছেন এবং শিবাজীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ করেননি। এর ফলাফলও সরাসরি পেয়েছেন, তারাবাঈয়ের মৃত্যুর পর আফজাল খাঁ যখন আশাভঙ্গের বেদনায় মুহ্যমান, সেই মুহূর্তে তাঁর শোক সন্তাপও বেদনার অবসান ঘটান প্রেমিকার পিতা, প্রধান শত্রু শিবাজীর হাতে[1]। যে ব্যক্তি শত্রুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিঃসংশয় তাঁর দ্বারা আর যাই হোক, সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতে দেয়া যেত না। আফজাল খাঁকে হত্যা করা কিংবা আটক করা যেখানে শিবাজীর অভিপ্রায় ছিল, অতিথি হিসেবে একদা আফজাল খাঁকে গ্রহণ করার পর তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত ছিলেন। সেবার তারাবাঈ তাঁকে কৌশলে রক্ষা করেছিলেন। এরকম প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আফজাল খাঁর অসতর্কতা তার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। বিজাপুরের নিকট পরাভব মেনে শিবাজীর পক্ষে আফজাল খাঁকে কন্যা সম্প্রদান আদৌ সম্ভব কিনা সে ব্যাপারে আফজাল খাঁর মনে কোন সংশয় ছিল না এটা তাঁর নিয়তি।

লেখক চেয়েছিলেন হিন্দু রমনীকে মুসলমান নায়কের অনুরাগিনী করে তুলতে। কিন্তু উপন্যাসে প্রকৃত অর্থে তার বিপরীত চিত্র পাওয়া যায়। তারাবাঈ আফজাল খাঁর প্রতি অনুরাগের কারণে কুলমান সবই ছেড়েছেন, কিন্তু আফজাল খাঁর মত বীরপুরুষও তারাবাঈয়ের প্রেমে মগ্ন হয়ে বিজাপুরের সোলতানেরও নিজের সম্মান বাড়াননি। বিজাপুরের সোলতান প্রথমে এ বিয়েতে সম্মত ছিলেন না, তারাবাঈয়ের "করুণ প্রার্থনা এবং গভীর ব্যাকুলতাপূর্ণ পত্র পাইয়া পরে অনুমোদন করিলেন"[2]। শত্রুর নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে শত্রু যখন সন্ধির জন্য বারবার প্রার্থনা করছে, সে অবস্থায় শত্রুর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে বহুবেশী আফজাল খাঁ মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছেন। মুকুতে হাতা, সিংহ ও বাঘের সঙ্গে আফজাল খাঁর যুদ্ধ পৃথিবীর জগতে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার ঘটনার মত মনে হয়।

তারাবাঈয়ের পাণিপ্রার্থী মালোজী, শিবাজীও তাতে সম্মত ছিলেন, সুতরাং তারাবাঈকে নিয়ে আফজাল খাঁর মাধ্যমে বিজাপুর পক্ষের সঙ্গে শিবাজীর বড় কথাকথি আফজাল খাঁর অজানা ছিল না। যেখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠাই শিবাজীর লক্ষ্য এবং আফজাল খাঁর আগমনের কারণ শিবাজীর সেই রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় বাধা দান, সেক্ষেত্রে আফজাল খাঁর অসতর্কতা অমার্জনীয়, বরং সেনাপতি হিসাবে তাঁর অসতর্কতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অনুপযুক্ত হয়নি। পার্থক্য এই, শাস্তিটা বিজাপুরের সোলতানের পক্ষ থেকে আসেনি, তিনি পেয়েছেন প্রত্যক্ষ শত্রু এবং প্রতিদ্বন্দ্বী শিবাজীর নিকট থেকেই। আফজাল খাঁ একা নন, উদীয়মান মারাঠাশক্তির কাছে সমগ্র বিজাপুর, এমন কি, লেখকের সমকালীন আবেষ্টনীতে শিক্ষিত হিন্দুর শিক্ষিত মুসলমান প্রতিপক্ষও একই সঙ্গে সমুচিত শিক্ষা পেয়েছেন।

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২১।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

অথচ আফজল খাঁর চরিত্রে বিপুল সম্ভাবনা ছিল। লেখক তাঁকে যদি কেবলমাত্র আদর্শ প্রচারের বাহন করে না তুলতে চাইতেন, উপন্যাসের চরিত্র হিসাবে স্বচ্ছন্দে বিকশিত হতে দিতেন তাহলে তাঁকে হয়ত এভাবে গ্লানিকর মৃত্যু বরণ করতে হতনা। কিংবা তাঁর মৃত্যুও বীরোচিত ও মর্যাদামণ্ডিত হয়ে উঠতে পারত। আফজল খাঁর মূল দ্বন্দ্ব ছিল একদিকে বিজাপুরের সম্মান, অন্যদিকে নিজ হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ, শত্রু কন্যার সঙ্গে প্রণয়ের ফলে তিনি শিবাজীকে বন্দি করে নিতে পারতেন না, আবার তারাবাঈয়ের হৃদয় দানকেও উপেক্ষা করতে পারতেন না। এ পরিস্থিতিতে পুরুষকারের মত তাকে জয় করতে চাইলে তিনি শিবাজীর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়ে তারাবাঈকে পেতেন, কিংবা গৌরবময় মৃত্যু বরণ করতেন। বিপুল অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তাঁর মৃত্যু বা জীবনের পরিসমাপ্তি ট্র্যাজেডির পর্যায়ে উন্নীত হত। আফজল খাঁর চরিত্র সেভাবে গড়ে ওঠেনি বলে তাঁর মৃত্যু করুণ রসের উদ্রেক করে মাত্র। প্রথম উপন্যাস রায়নন্দিনীতে ঈসা খাঁর যে ভূমিকা ছিল তারাবাঈ উপন্যাসে আফজল খাঁর মধ্যে তাটুকুও অনুপস্থিত। ঈসা খাঁ নিজের প্রাণ শক্তিতে বেঁচে ছিলেন, শিবাজীর পাশে আফজল খাঁ তা পারেননি।

তিন

উপন্যাসের তারাবাঈ চরিত্রের সঙ্গে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নেই, সুতরাং মনে করা যায় লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্যের বাহন হয়েই এ চরিত্রের সৃষ্টি। লেখকের লক্ষ্য ছিল শিবাজী, শিবাজী কর্তৃক আফজল খাঁর হত্যাকাণ্ডের গ্রহণযোগ্য পটভূমিকা সৃষ্টির জন্য তারাবাঈ আবির্ভূত হয়েছেন। তারাবাঈ লেখকের অন্য একটি উদ্দেশ্যেরও চরিতার্থতা করেছেন, তারাবাঈয়ের মধ্য দিয়ে হিন্দুর বিশেষতঃ শিবাজীর ধর্ম-ধ্যানের অবমাননা করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সেজন্য তারাবাঈ চরিত্রের দুটো বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, একদিকে এ চরিত্রের বিকাশ প্রেমে, অন্যদিকে ধর্মের, দেবতা, এবং পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধকে অস্বীকার করে তিনি লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হয়ে উঠেছেন। রায়নন্দিনী উপন্যাসের স্বর্ণময়ী-অরুণাবতীর মত তারাবাঈয়ের ক্ষেত্রেও অবমাননার দিকটি উপন্যাসের বহিরঙ্গেই আটকে আছে। তারাবাঈ চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে প্রেমের মধ্য দিয়ে, এবং প্রেমের কারণেই তাঁর জীবনাবসান। তারাবাঈ অনেকাংশে বাইরের ঘটনা দ্বারা পরিচালিত, তার অনুরাগকে প্রেম কিংবা দ্বন্দ্ব সেভাবে সৃষ্টি হয়ে ওঠেনি। তাঁকে দিয়ে লেখক যাকে তাকে ধর্মবাক্য উচ্চারণ করিয়েছেন, তাও কতটুকু মনের বিপুল পরিবর্তন এবং কতটুকু আফজল খাঁর প্রতি প্রেমের কারণে তা স্পষ্ট নয়। পৈতৃক ধর্ম তারাবাঈয়ের হৃদয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে আবদ্ধ ছিল না যে এ পরিবর্তন চোখে পড়তে পারে। তারাবাঈয়ের নাম এবং শিবাজীর কন্যা এ পরিচয় বাদ দিলে তাকে একজন প্রায় মুসলমান রমণী বলেই ভ্রম হয়।

তারাবাঈয়ের প্রণয় প্রার্থী ছিলেন দুজন, -একজন শিবাজীর অন্যতম সেনাপতি মাল্লোজী এবং অন্যজন বিজাপুরের সেনাপতি আফজল খাঁ। মাল্লোজীর সঙ্গে তারাবাঈয়ের বিয়ে একরূপ পূর্ব নির্ধারিত ছিল,

Dhaka University Institutional Repository

তারপর এ সংবাদটুকু লেখক দিয়েছেন যে, আফজাল খাঁকে দেখার পর তাঁর মনে হয়েছে, দুগ্ধপান করার জন্য আফজাল খাঁই একমাত্র উপযুক্ত পুরুষ, মালোজীকে তিনি বিস্মৃত হতে চেয়েছেন।[১] মালোজী ও আফজাল খাঁর মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচিত হবার ব্যাপারে সংস্কার ও দুর্বল বৃত্তির সংঘাতে তারাবাঈয়ের চরিত্র যেভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারত তা ঠিক হয়নি। বরং প্রথম দর্শনেই আফজাল খাঁর প্রতি তারাবাঈ একাগ্রচিত্ত হয়ে উঠেছেন, কুল মান বিসর্জন দিয়ে আফজাল খাঁর কল্যাণ চিন্তায় মগ্ন হয়েছেন। লেখক দেখাতে চেয়েছেন তারাবাঈয়ের প্রেমে কোন সন্দেহ নেই।[২] লায়লী-মজনু, শিরী-ফরহাদ এমন কি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ও এখানে তারাবাঈয়ের মধ্যে রূপায়িত। এ প্রেমের সঙ্গে রয়েছে কল্যাণচিন্তা, সেকারণে আফজাল খাঁকে হত্যার গোপন ষড়যন্ত্র জেনে[৩] তিনি তাঁকে বাঁচাবার জন্য ছদ্মবেশী অশ্বারোহী হয়ে শিকাররত আফজাল খাঁর কাছে জোড়াভুরি গর্তের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন[৪] এবং এর ফলেই আফজাল খাঁ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন।[৫] এরপরই আহত আফজাল খাঁকে তাঁর শিবিরে থেকে তারাবাঈ সেবা করছেন এবং সেবার মধ্য দিয়েই দুজনের পারস্পরিক আকর্ষণ আরো গভীর হয়েছে। তারাবাঈ আফজাল খাঁর প্রতি প্রেমাবেগে মুগ্ধ[৬] এবং তাঁকে সেবা করতে পেরে কৃতজ্ঞতায় ক্রন্দনরত, দুটো বিমুগ্ধ হৃদয়ের দুর্লভ মুহূর্তে আফজাল খাঁ চুম্বন দান করেছেন এবং তারাবাঈয়ের উষ্ণ অশ্রু আফজাল খাঁর বুক প্লাবিত করে দিয়েছে।

প্রকৃত অর্থে তারাবাঈয়ের জীবনে এটাই হল প্রেমের প্রথম এবং শেষ অভিজ্ঞতা। এর পর থেকেই তিনি নিয়তির হাতে ক্রীড়নক, ঘটনার গতি একবার তাঁকে দূরে নিয়ে গেছে আবার কাছে নিয়ে এসেছে। আফজাল খাঁর শিবির থেকে শিবাজীর ক্যাম্পে যাবার পথেই তারাবাঈ মালোজীর দ্বারা অপহৃতা হয়েছেন, আমিনাবানুর কর্তৃক পুনরুদ্ধার প্রাপ্ত হয়ে যাবার পথে আফজাল খাঁর কাছাকাছি এসেছেন তখন মালোজীর ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার অন্তিম মুহূর্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর উদ্ধার পর্বটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে শিবাজীর উপাস্য বিঠঠলজীর মন্দির অবমাননা এবং প্রতিমার অসারতা প্রমাণের জন্য সংযোজিত।[৭] তারাবাঈ চরিত্র পরিস্ফুট করার সঙ্গে এর সংযোগ ক্ষীণ।

তারাবাঈয়ের অন্তরে কোন দ্বন্দ্ব নেই বলে উপন্যাসে এ চরিত্রটি যেমন গুরুত্ব পেয়েছে সে পরিমাণে বিকাশপ্রাপ্ত হয়নি। আফজাল খাঁর প্রতি তাঁর ভালবাসা আন্তরিক কিন্তু মালোজীর প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। তারাবাঈ যখন আফজাল খাঁর শিবিরে তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থানরত, মালোজী তখন শের পর্যান খাঁর ছদ্মবেশে

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭০।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭১।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭২।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৭।
৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮১।
৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৭।
৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৯-১১।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁকে অপহরণ করেছেন। উপন্যাসের শেষে আফজাল খাঁর সঙ্গে বিবাহ ও ঈপ্সিত মিলন মুহূর্তে প্রেমিকরূপী ঘাতক মালোজীর হাতে তিনি জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। মালোজীর বর্বরতাটুকু জড়িত না থাকলে তারাবাঈয়ের জীবন একেবারেই নিষ্প্রভ হত।

নীতি প্রচার অন্যতম লক্ষ্য হলেও তারাবাঈ এখানে উপন্যাসের চরিত্র হয়েই প্রতিষ্ঠিত। তিনি কেবল শিবাজীর কন্যা নন, বরং এই একজন চিরন্তন রমণী যার হৃদয় আছে, সৌন্দর্য আছে, হৃদয় এবং রমণীত্বের সংঘাতে হিংসার শিকার হয়ে তাঁকে প্রাণ ত্যাগও করতে হয়েছে। উপন্যাসে শিবাজী তনয়াকে দিয়ে আফজাল খাঁর প্রতি প্রেম নিবেদন [illegible] উদ্দেশ্য থাকলেও উপন্যাসের পরিসমাপ্তি সে সংকটকে অতিক্রম করে গেছে। প্রেম ও হিংসার দ্বন্দ্বে তারাবাঈয়ের আত্মোৎসর্গই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, অন্যান্য পরিচয় গৌণ। তারাবাঈকে লেখক নিজেও ভালবেসেছেন বলে তাঁর মৃত্যুর মধ্যে বিপুল সহানুভূতি সৃষ্টি না করে পারেন নি।

চার

উপন্যাসে মালোজীর চরিত্রটি ক্ষুদ্র হলেও উজ্জ্বল এবং উপন্যাসের জন্য প্রয়োজনীয়, কোনদিক থেকে এটা গ্রহণের দাবি পেয়েছে। মালোজী শিবাজীর রাজ্য স্থাপনের সহচর এবং শিবাজী তনয়া তারাবাঈয়ের প্রণয়প্রার্থী। শিবাজীও তারাবাঈকে মালোজীর নিকট সমর্পণ করবেন বলে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু আফজাল খাঁর আবির্ভাবের ফলে তাঁদের বন্ধনের উদ্দেশ্যের মধ্যে ছেদ পড়েছে। মালোজী তাদেরকে সহজে মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, আফজাল খাঁর শিবিরে অবস্থানরত তারাবাঈকে হরণ করার জন্য শেখ মর্দান নামের ছদ্মবেশ ধারণ করে আফজাল খাঁর সেনাবাহিনীতে চাকুরী নিয়েছেন এবং কৌশলে তাঁকে হরণ করে নিয়ে গেলেন।[1] আবার তারাবাঈকে উদ্ধার করতে গেয়ে মালোজী নিজেই আমিনা বানুর নিকট বন্দী হন এবং শিবাজী তাঁর নিকট থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন।[2] তারাবাঈয়ের সঙ্গে আফজাল খাঁর বিবাহদৃশ্যই ছিল মালোজীর জন্য মহাপরাজয়ের মুহূর্ত। তারাবাঈকে সবল প্রকারে লাভ করে নেওয়া ছিল মালোজীর যৌবন বাঞ্ছিত স্বপ্ন, কিন্তু আফজাল খাঁর সঙ্গে বিয়ের ফলে তাঁর সে স্বপ্ন সৌধ ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছে। মালোজীর কাছে প্রত্যাখ্যান হয়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যার উপায়ই হল তাঁর জীবনাবসান কি ঘটিয়ে। আফজাল খাঁর বীরত্বের সামনে দাঁড়ানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল বলে পরিণামে নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তিনি তারাবাঈকে হত্যার পথ বেছে নেন। শাণিত ছুরি দিয়ে তিনি প্রিয়জনকে বিদ্ধ করেন এবং নিজেও ছুরে চড়ে প্রাণত্যাগ করলেন।[3]

মালোজীর প্রাণ বিনাশ ঘটল কিন্তু জীবন অবশিষ্ট থাকতে নিজের প্রণয়াস্পদকে অন্যের হাতে তুলে দিতে পারেননি। আফজাল খাঁর মৃত্যুকে নিশ্চিত ও সুনিশ্চিত করে তোলার জন্যই এর পূর্বমুহূর্তে তারাবাঈ

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮-১৯।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪-১৬।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৯-২০।

ও মালোজীর অপমৃত্যু দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে, কিন্তু মৃত্যুর মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। মালোজী আত্মদান করেছেন প্রেমকে মহীয়ান করে তোলবার জন্য, নিয়তি এবং পুরুষকারের সংঘাতই এ মৃত্যুকে নিশ্চিত করে তুলেছে। কিন্তু মালোজীর বিপরীতে আফজাল খাঁর প্রেম কিংবা বীরত্ব কোনটিই মহিমান্বিত নয়, মালোজীর মত সৈনিকের জীবনে প্রেম যেমন সত্য পুরুষকার প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মদানও তেমনি অম্লানভাবেই সত্য। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মালোজী উপন্যাসে বেঁচে থাকবেন, অনেকগুলো জীবন-মৃত্যুর ভীড়ে মিশে যাবার মত নয়। ইতিহাসের "মালশ্রী" চরিত্রের ছায়া পড়লেও উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত মালোজী স্বতন্ত্রভাবে এবং উপন্যাসের মত করেই সৃষ্ট। ইতিহাসে মালজী আফজাল খাঁর সংগে যুদ্ধের পরও বেঁচে ছিলেন, কিন্তু উপন্যাসে তাঁর ভাগ্য পৃথক। উপন্যাসে মালোজী মর্যাদার কল্যাণ হাতের স্পর্শে মৃত্যুবরণ করেই প্রকৃতপক্ষে বেঁচে উঠেছেন।

পাঁচ

অন্যান্য চরিত্রের মত আমিনা বানুও লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্যের কারণে সৃষ্ট এবং আমিনা বানুকে পারস্থ করার প্রয়োজনেই[1] সেনাপতি মোতামদ খাঁ আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু শুরুতে আমিনা বানু ও মোতামদ খাঁর চরিত্র যেভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, পরে তা আর তেমন নেই। মোতামদ খাঁর আবির্ভাব অত্যন্ত সুন্দর পরিণত, প্রথমে অসীম সাহস প্রদর্শন এবং শেষে আমিনা বানুকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ উপন্যাসে তাঁর ভূমিকা এটুকুমাত্র। কিন্তু আমিনা বানু প্রায় শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য বজায় রেখেছেন, এমন কি প্রায় টাইপ চরিত্রে পরিণত হয়েছেন এবং পরবর্তী উপন্যাসে পোশাক পরিবর্তন করে ফিরোজা বেগম নামে আবির্ভূত হয়েছেন।

উপন্যাসে আমিনা বানুর ভূমিকা বহুমুখী, নারীমাংসলোলুপ শিবাজীকে শাস্তি প্রদান, অপহৃতা তারাবাঈকে উদ্ধার ও আফজাল খাঁর সংগে মিলনে সহায়তা করে তিনি সাহিবীর মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করেছেন। এদিক দিয়ে উপন্যাসে আমিনা বানুর ভূমিকা একেবারে বাহুল্য নয়। তবে উদ্দেশ্যমূলক প্রধান ভূমিকা হল শিবাজীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করা।[2] অসদুদ্দেশ্যের জন্য শিবাজীকে তিনি শাস্তিপ্রদানও করেছেন।[3]

আমিনা বানুর চরিত্রের অন্য একটি দিক হল প্রেম। তিনি শিবাজীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছেন। মোতামদ খাঁর বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও আমিনা বানু যে মোতামদ খাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন তেমন কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। এ কারণে তাঁদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার মুহূর্তটিও বিবর্ণ।[4]

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৫-৯৬।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬০।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯০-৯১।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২২।

যুদ্ধক্ষেত্রে আমিনা বানুর বিকাশ যেমন উজ্জ্বল তেমনি নিষ্প্রভ। যুদ্ধের পাশাপাশি তাঁর নারী সুলভ রূপ, প্রকৃতির প্রকাশকে লেখক আবিষ্কার করে তুলতে পারেননি। কেবল বীরত্ব প্রদর্শনই হয়েছে তাঁর অন্যতম পরিচয়, আফজাল খাঁর শোচনীয় মৃত্যুর পর আমিনা বানুর প্রত্যাশা পূর্ণ দিয়ে এসেছে, তিনি আত্মমর্যাদাহীনভাবে মোহাম্মদ খাঁকেই স্বামীত্বে বরণ করেছেন একথা মনে এখানে উপযুক্ত বোধ করেননি।[১] এর পর তিনি পুত্রহীন, তাঁকে নিয়ে লেখকের প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে। অসাধারণ রমণী হলেও আমিনা বানুর পক্ষে আর কোন পরিণতি সম্ভব ছিল না। বঙ্কিমের দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে প্রফুল্ল যেমন বিপ্লবীর জীবন শেষে ব্রজেশ্বরের গৃহে অন্যতম বৌ হিসেবে নিজেকে পুনর্বাসিত করেছেন[২], এখানে সুন্দরী বিক্রমশালিনী আমিনা বানুও রাজ্যস্থাপনের জন্য উদ্যোগহীন মোহাম্মদ খাঁর গৃহেই আশ্রয় পেয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে আমিনা বানুর সঙ্গে শিবাজীর সম্পর্কের মধ্যেই উপন্যাসের তের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু লেখক সচেতনভাবে তা গ্রহণ করতে সম্মত ছিলেন না বলে সূচনাতেই শিবাজীকে দিয়ে মাতৃসম্বোধন করিয়ে তার অবকাশ ঘটিয়েছেন। আফজাল খাঁ তারাবাঈকে চুম্বন দান করে পৌরুষের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, কিন্তু শিবাজী আমিনা বানুর ওষ্ঠের স্পর্শ পাবার আগেই পরাভূত হয়েছেন। এক্ষেত্রে যুদ্ধের ধর্ম বিঘ্নিত ছিল না বলে কিংবা বিপরীত হলে লেখক সংকোচ ও সামনে চিত্রিত সে সংলাপ পাঠককে দিতে পারতেন। অঙ্গুরীয় বিনিময় উপন্যাসে শিবাজী রোশিনারার হৃদয় জয় করে নিয়েছেন।[৩] কিন্তু এখানে তিনি আমিনা বানু কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, এমনকি বাহুবলেও তিনি আমিনা বানুর নিকট পরাজিত।

রাজসিংহ উপন্যাসে চঞ্চল কুমারী আওরঙ্গজেবের চিত্রের ওপর অবজ্ঞাসূচক পদাঘাত করে চিত্রের শোভা বৃদ্ধি করেছেন।[৪] আমিনা বানু শিবাজীকে পদাঘাত করতে চেয়েছেন।[৫] কেবল ইচ্ছা নয়, চরিত্র হিসেবে তার প্রতিরূপ হিন্দু ধর্ম ও রাজশক্তির নব প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীকেই পদদলিত ও পদতলে লুণ্ঠিত করে দিয়েছেন।[৬] আমিনা বানুর সম্পর্কে শিবাজীর দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার হয়েছে। আমিনা বানুর জীবনে ট্র্যাজেডি এখানে যে, চিরন্তন অনুভূতিসম্পন্ন নারী নয়, বরং আদর্শ মুসলিম বীর রমণীরূপে দাঁড় করাতে গিয়েই লেখক তাঁকে অতি সহজে হারিয়ে ফেলেছেন। তা সত্ত্বেও এগুলো বাহ্যিক, উপন্যাসে আমিনা বানুর সবচেয়ে বড় ভূমিকাই হল শিবাজীর চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি হয়েছেন মাধ্যম, শিবাজীর চরিত্রের অন্যতম প্রধান দিকটি সৃষ্টি হয়ে উঠেছে তাঁকে কেন্দ্র করে।

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৮।
২। দেবী চৌধুরাণী, ব-র, ১, পৃঃ ৮৬৭-৭২।
৩। অঙ্গুরীয় বিনিময়, ভূদেব রচনা সম্ভার, পৃঃ ২৯২।
৪। রাজসিংহ, ব-র, ১, পৃঃ ৬৯০।
৫। তারাবাঈ, শি-রণ, পৃঃ ১৬০।
৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসে শিবাজীর আবির্ভাব সবচেয়ে উজ্জ্বল, এমন কি লেখকের উপন্যাস চতুষ্টয়ের মধ্যেও এত বিপুল সম্ভাবনাময় চরিত্র আর নেই। শিবাজীর চরিত্রের দুটো রূপ, একদিকে তিনি রিপুতাড়িত, অন্যদিকে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর। অমিতচারিত্র শিবাজী তাঁর চেষ্টার এবং সমকালীন মুসলমান প্রতিপক্ষের সকল অভিপ্রায় নষ্ট করে দিয়ে নতুন রাজ্য কিংবা স্বাধীন জনপদের স্রষ্টা হিসাবেই অবতীর্ণ হয়েছেন। শিবাজী যুদ্ধ এবং রমণীর মধ্যে কোন নীতি মানেননি, দুটো ক্ষেত্রেই জীবিত মানুষের উত্তপ্ত আবেদন নিয়ে তিনি উপস্থিত।

আমিনা বানুর মাধ্যমে লেখক শিবাজীর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু পরিণামে নিষ্ফল হয়ে লেখকের কাছেই ফিরে এসেছে। আমিনা বানুকে নিয়ে শিবাজীর স্বপ্ন ছিল দুটো, অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী ও বীর্যবতী আমিনা বানুকে স্ত্রী রূপে লাভ এবং এর মধ্য দিয়েই সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তিনি গোপন রাখেননি। শিবাজী আমিনা বানুকে লাভ করেননি কিন্তু তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনা অপূর্ণ থাকেনি, এবং আমিনা বানু প্রকারান্তরে শিবাজীর সে স্বপ্ন প্রতিষ্ঠাতেই নিমিত্ত মাত্র।

শিবাজীর অবমাননা করার জন্য, তাঁর কন্যার সঙ্গে আফজাল খাঁর প্রেম ও মিলনের উপেক্ষা সফল করে তোলার জন্য আমিনা বানু মধ্যবর্তিনীর ভূমিকা নিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ মিলনের কারণেই আফজাল খাঁর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়েছে। অর্থাৎ মিলন ঘটনা না ঘটলে মারাঠা সেনাবাহিনীকে হত্যা করতেন না এবং পরিণামে আফজাল খাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হত না। আবিষ্ট আফজাল খাঁকে জাহান্নামে পাঠানোর বাসনা ছিল,[2] মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আফজাল খাঁ শিবাজীর স্বপ্নকে নিষ্কণ্টক করে দিয়ে গেছেন। বস্তুতঃ আমিনা বানুর মাধ্যমে শিবাজীর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে, সে শাস্তি প্রথম উপন্যাসের বহিরঙ্গে সীমাবদ্ধ, আমিনা বানুর ভূমিকা শিবাজীর অগ্রযাত্রা আরো সুগম করে দিয়েছে। সেকারণে শিবাজীর চরিত্রকে যতই দুশ্চরিত্র রূপে চিত্রিত করার চেষ্টা থাক না কেন, তার রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে এবং শিবাজী তাঁর পরিবেশের ঊর্ধ্বে উঠে এসেছেন। সমকালের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে শিবাজীর সংগ্রাম লেখকের অভিনিবিষ্ট প্রতিরোধিতার বোধ ছিল,[3] এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে লেখক

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬।

২। তিনি আমিনা বানুকে বলেছেন, "আফজাল খাঁকে বন্দী না করলেই বা কি লাভ হবে? তিনি কি আমার প্রভাবমুক্ত হয়ে বিজাপুর দরবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন"? অথবা
"আফজাল খাঁ যদি আমার প্রধান শত্রু তাঁর মত সেনাপতি না থাকলে বিজাপুর বাহিনীকে অনেক পূর্বেই পর্যুদস্ত করতে পারতাম"। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০০।

৩। রোশিনারাঃ কেন, তোমাদের শাহ কি উপযুক্ত নন?
মাঃ তোমাদের শাহ একজন উপযুক্ত সেনাপতি কিন্তু আর কিছুই নয়। তাকে বীরপুরুষ বললে অন্যায় হবে না বটে, কিন্তু যদি সে শ্রেণীর বীরপুরুষ চাই, সে শ্রেণীর নহেন। তোমাদের শাহ যদি বাদশাহ হয়ে রাজ্য সংস্থাপন করতে পারতেন অথবা মুঘলকে স্বাধীন করতে পারতেন, তবে উঁহাকে বীরপুরুষ বলে স্বীকার করতাম।
রোঃ তবে শিবাজী?
মাঃ বটে। শিবাজী সাহসী পুরুষ এবং রাজ্য সংস্থাপনেরও চেষ্টা করছেন। কিন্তু অতি নীচ প্রকৃতি বিশিষ্ট। শিবাজীকে বীরপুরুষ বলা কিছুতেই সংগত নহে, দস্যু বরং বীরপুরুষের মহত্ত্ব ও বীরত্ব তাতে নাই। "পার্বত্য মূষিক" উপাধিই তার পক্ষে যথার্থ। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৮-৪৯।

ইতিহাস থেকে বর্তমান মুহূর্তের কাছে টেনে এনেছেন। কেননা ইতিহাসে শিবাজীর চরিত্রের সবচেয়ে বড় উজ্জ্বলতা মোগলদের সঙ্গে সংঘাতের কারণে, মোগলরা শিবাজীকে বহুবার পর্যুদস্ত করলেও অনেকবারই তিনি জয়ী হয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিবাজী উৎসবকে প্রতিহত করার জন্য আফজাল খাঁর কাহিনীটি লেখক গ্রহণ করেছেন। আফজাল খাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য আক্রমণমূলক নয়, বরং আত্মরক্ষামূলক। কিন্তু আফজাল খাঁকে দিয়ে লেখকের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি, উপন্যাসের শেষে আফজাল খাঁ মৃত্যু, শিবাজীর রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হল। লেখকের আরাধ্য ছিল বোধ হয় আফজাল খাঁ নয়, বরং বাহ্যিক প্রণয়ে অনুরাগে শিবাজী নিজেই, লেখক বিপর্যয়ের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন কিভাবে নামহীন খ্যাতিহীন একটি একক ব্যক্তিত্ব, সুলতান শাহর শত্রু, বিজাপুরের শত্রু, মোগলদের শত্রু, মুসলমানের শত্রু শিবাজী সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে গোলকুন্ডা, আদিলশাহের অন্যান্য মুসলমান শক্তির আধিপত্য একটু একটু করে সংকুচিত করে তার মধ্যেই একটি নতুন স্বাধীন রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন। শিবাজীর জীবনে দুর্ধর্ষ সংগ্রামের দ্বারা রাজ্য স্থাপনের মধ্যে এক ধরনের রোমান্টিক সৌন্দর্যবোধ লেখককে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল, কিন্তু তাকে গ্রহণ করার বাধা ছিল অনেক। এজন্য লেখক বারবারই তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন, তাঁর প্রতি মুগ্ধ আকর্ষণও বোধ করেছেন। উপন্যাসের পরিসরে শিবাজীর প্রতি লেখকের ঘৃণা প্রকৃত অর্থে তাঁর অনুরাগেরই প্রকাশ। শেষে মৃত আফজাল খাঁ এবং জীবিত শিবাজীকে সামনে নিয়ে লেখক ইতিহাসের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন,

"এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদিগের পুনরভ্যুত্থানের আশা সমূলে নির্মূল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যে, এই সময়ে তাহাদেরই অদূরদর্শী পুত্র সম্রাট মহাপরাক্রান্ত মহামান্য বাদশাহ আওরঙ্গজেব সমস্ত ভারতের একচ্ছত্র প্রভুত্বের লালসায় অকারণে গোলকুন্ডা এবং বিজাপুর রাজ্যে আক্রমণ করেন।---আওরঙ্গজেবের মহামান চরিত্রে এবং সর্বতোমুখী বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার পূত-অঙ্গে এই উভয় রাজ্য আক্রমণ কার্যই হইতেছে অদূরদর্শিতা এবং স্বজাতিদ্রোহিতার দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা।"[1]

গ্রন্থকার শিবাজী চরিত্রকে সচেতনভাবে ভীরু, কাপুরুষ, শঠ, প্রবঞ্চক, নারী মাংসলোভী রূপে চিত্রিত করার প্রয়াস করলেও উপন্যাসের শেষ অংশে, আফজাল খাঁর করুণ মৃত্যুর পর লেখক দেখেছেন, শিবাজী নয়, বরং আওরঙ্গজেবই স্বজাতিদ্রোহিতার দুরপনেয় কলঙ্ককালিমায় লিপ্ত এবং শিবাজী স্বজাতিপ্রেমে উজ্জ্বল, আফজলখাঁর মৃত্যুর পর শিবাজীর হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা অপ্রতিহত, এটা শিবাজী উৎসবেরও মূল-সুর। সুতরাং শিবাজী চরিত্রের কালিমা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়, লেখকের কাছেও বড় কথা হল শিবাজীর স্বজাতি-প্রেম এবং এর বিপরীতে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের স্বজাতিদ্রোহিতা। শিবাজী যে বাহুবলে রাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টা করেন এটা লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি, অন্যদিকে, আওরঙ্গজেবের বিচ্যুতির তিনি সমালোচনা করেছেন।

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২২।

Dhaka University Institutional Repository

শিবাজীর প্রসঙ্গে[1] মোঘল ইতিহাসের ভিন্ন ব্যাখ্যা দান করে জাতীয়তাবোধ জাগানোর চেষ্টা হয়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী বিতর্কিত হয় ঔরঙ্গজেবের চরিত্র। কোন কোন হিন্দু লেখক শিবাজীর ভূমিকা মূল্যায়ন করতে গিয়ে ঔরঙ্গজেবের প্রতি বিষোদগার করেছেন তেমনি মুসলমান বা মোঘল বাদশাহের বিশেষতঃ ঔরঙ্গজেবের পক্ষ নিয়ে শিবাজীকে নিন্দিত করার চেষ্টা করেছেন। তারাবাঈ উপন্যাসটি রাজারাম এর কাহিনী নিয়ে লিখিত হলেও এর মূল পটভূমিতে ছিল মোঘল মারাঠা সংঘাতের স্মৃতি। এ সত্ত্বেও ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি নাকি লেখক যেভাবে স্পষ্ট মূল্যায়িত করেছেন, সমকালের মুসলিম অনুভূতির তুলনায় এটা ব্যতিক্রম। লেখক তারাকে মুসলমানের স্বাধীনতার সুহৃদ দিয়েছেন, ঔরঙ্গজেবের ভুল নীতি মুসলমান শাসকদের পরিবর্তে ধর্ষ করেছে বলেও শিবাজী প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পেরেছিলেন। সমকালীন ভারতে ইংরেজের শাসনাধীনে থেকে তাকে পাপ করে, শিবাজীর স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষাকে অনুমোদন না করলেও লেখক সমগ্রভাবে ব্যক্তিটিকেই অবমাননা করেছিলেন। শিবাজী উপন্যাস তাঁর মূলভাবকে আহত করেছিল বলে তারাবাঈ উপন্যাসটি বহির্মুখী এবং অন্তরে দুটো দিক নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল। শিবাজী চরিত্রটি যেভাবে অন্তর ও বাইরের উদ্বেলতা পেয়েছে সেভাবে আরাধ্য সাফল্য তা পায়নি।

শিবাজী তারাবাঈকে ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং এজন্য তারাবাঈ যখন কমল আফজাল খাঁকে যুদ্ধে সমর্পণ করে তখন সে সংবাদে শিবাজী প্রাণ দণ্ডের আদেশ তারাবাঈকে অর্পিত করা হবে মারাঠা বিদ্রোহী হবে, আত্মসমর্পণ মুক্ত ও বিরক্ত হবে। তিনি তারার মৃত্যু কামনা করেছেন।[2] শিবাজীর নিজ চরিত্রের বিপুল দ্বন্দ্ব এখানে প্রতিভাত। মারাঠা যামিনী বানুর প্রতি প্রেম, রূপমোহ বা স্নেহ মাতৃভক্তি অর্জনের মধ্যে নয়, শিবাজীর চরিত্র পরীক্ষিত হয়েছে অন্যভাবে। স্বাধীনতা বা রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা ও তার সংঘাত ব্যর্থতাবোধ, তারাবাঈর নিকট প্রতিশ্রুতি ও তারার অন্তর দুঃখ প্রদর্শনের জন্য তা ব্যর্থ হবার আশঙ্কা, কন্যা দান করলে আফজাল খাঁ বিজাপুর পক্ষ ত্যাগ করে নিজ পক্ষে থাকবেন কিনা সে সম্পর্কে অনিশ্চয়তা নিরন্তর শিবাজীকে দগ্ধ করেছে। শিবাজীর অন্তরে যে বিপুল ঝড় প্রবাহিত হয়েছিল তা ক্রমে তারাবাঈর অন্তঃস্থলকেই দিন দিন ব্যস্ত করে তুলেছে এবং একটি ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে অনবরত টেনে নিয়ে গেছে। কিন্তু তুলনা বিচারে উপন্যাসটি সম্পূর্ণতঃ ট্র্যাজেডী নয় ও বলা যেতে পারে, তার কারণ শিবাজীর অন্তরপুরুষ সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এসেছে, তাদের জয় করে নিয়েছে। শিবাজী এ উপন্যাসের অন্যতম প্রধান পুরুষ চরিত্র, প্রাথমিক দ্বন্দ্বের প্রতিকূলতা ঠেকে প্রায় নায়কের পর্যায়েও উন্নীত হয়েছে।

যামিনী বানুর সঙ্গে প্রথমে যুদ্ধ ও সন্ধি, পরে তাঁর নিকট পরাজয় ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রেই তারা শিবাজীর প্রতি প্রসন্ন ছিল না। বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী শিবাজী নিজের ওপরই নির্ভর করেছিলেন, অদৃষ্ট

১। পূর্বে, প্রথম অধ্যায়।

২। তারাবাঈ, দি-ম, পৃঃ ২০২।

Dhaka University Institutional Repository

বাদে আদৌ নয়। সেকারণে বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে তারাবাঈয়ের মৃত্যু মুহূর্তে শোকাতুর পিতা "শিবাজী কন্যার শোকে নিতান্ত বিমনায়মান এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। আফজাল খাঁর নিকটে গভীর দুঃখ ও করুণ বিলাপ প্রকাশ করিলেন।"[১] অনন্যোপায় শিবাজী নিজের ক্ষুদ্র বাহিনী বাদ্ধকে আফজাল খাঁর নিকট সমর্পণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু আফজাল খাঁ তাতে সম্মত হননি। শিবাজী তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখলেন, আজন্মলালিত বিরাট একটি আশা পূর্ণ হবার মুহূর্তে এসে ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু তলোয়ার হাতে নিশ্চিন্ত আত্মসমর্পণ তাঁর রক্তে ছিল না। তাকে তিনি নিজেই নির্বাচন করেছেন সুতরাং পরাজিত হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। আশা ও নিরাশার বিপুল দ্বন্দ্বে আন্দোলিত শিবাজী আত্মজার মৃত্যুর করুণ মুহূর্তেই স্থির করে ফেললেন, নিয়তিকে প্রতিহত করবার একমাত্র উপায় হল বিজাপুরের শক্তির অন্যতম উৎস আফজাল খাঁর বিনাশ সাধন এবং "বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সকলে চমকিত এবং স্তম্ভিত ভাবে দেখিল শিবাজী ভীষণ ব্যাঘ্র নখাকৃতি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা আফজাল খাঁর বুকে আমূল বসাইয়া দিয়াছেন। সকলে ভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিল।"[২]

শিবাজীর বিজয় সম্পূর্ণ হল, উপন্যাসে শিবাজীর চরিত্র যেভাবে বিকশিত হয়েছে তাতে এটা মোটেই অস্বাভাবিক হয়নি। শোকাহত পিতা কন্যার মৃত্যুর বেদনা ভুলে গেছেন, কন্যার মৃত্যু, আফজাল খাঁর মৃত্যু, অগণিত সৈনিকের মৃত্যুর করুণ বেদনার মধ্য দিয়ে যে একটি নতুন রাষ্ট্রের জীবনে সূর্যোদয় ঘটেছে তার নাম মহারাষ্ট্র।

'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' উপন্যাসে শিবাজী কর্তৃক আফজাল খাঁর হত্যাকে সমালোচনা করা হলেও[৩] রমেশ দত্ত শিবাজীর "সুন্দর বিগ্রহ, রণনীতি অপেক্ষা তার দুষ্কর্মকেই বড়ো করে দেখিয়েছেন।"[৪] তারাবাঈ উপন্যাসে লেখক শিবাজীর সে দুষ্কর্ম ঢাকতে পারেননি, বরং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এবং রমেশদত্তের 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' উপন্যাসে প্রকাশিত শিবাজীর দুষ্কর্মকে অপরাধের রূপ দান করে তাকেই আরো সম্প্রসারিত করে তুলেছেন। এ উপন্যাসে শিবাজী চরিত্রের নিন্দিত দিকগুলো এ সবের তুলনায় অতি সাধারণ ব্যাপার মাত্র।

ঘ। ফিরোজা বেগম

এক

ফিরোজা বেগম উপন্যাসটি দ্বিতীয়ধারা মোঘল ইতিহাসের কাহিনীতে আশ্রিত, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ এ উপন্যাসের উপজীব্য। তারাবাঈ উপন্যাসে উদীয়মান মারাঠা শক্তির সঙ্গে লেখকপ্রতিবেশিতা

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২০।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২১।
৩। "কিন্তু এই গর্হিত কার্য্যে তাহার যশোরাশি চিরকাল কলুষিত থাকিবে।"—মহারাষ্ট্র-জীবন-প্রভাত, রমেশ রচনা সম্ভার, পৃঃ ৪৭২।
৪। বিজিত কুমার দত্ত—বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬৯, পৃঃ ১৭৭।

করেছেন কিন্তু শিবাজীর অন্তরাত্মা বোধ করতে পারেননি, ফিরোজা বেগম উপন্যাসে মারাঠা প্রতিপক্ষকে পরাভূত করেছেন।[১]

বঙ্কিমের মৃত্যুর পরবর্তীকালে জাতীয় রাজনীতিতে আনন্দমঠ উপন্যাসের একটি বাস্তব ভূমিকা ছিল, হিন্দু জাতীয়তাবোধ এ গ্রন্থকে কেন্দ্র করে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল।[২] আনন্দমঠ উপন্যাসের সামাজিক প্রভাব শিরাজীর গ্রন্থ রচনায় পথ প্রদর্শন করেছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আনন্দমঠে মুসলিম প্রসঙ্গ ফিরোজা বেগম উপন্যাসে হিন্দু প্রসঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে, তবে এগুলো বাহ্যিক। শিরাজী ফিরোজা বেগম উপন্যাসটিকে আনন্দমঠের মত শক্তির উৎস হিসাবে দিতে চেয়েছিলেন। আনন্দমঠ উপন্যাসের শেষে মহাপুরুষ ইংরেজ রাজ্য স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছিলেন।[৩] ফিরোজা বেগম উপন্যাসের শেষে মুসলমান পক্ষ বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু "মুসলমান কর্তৃক ভারতবর্ষ দ্বিতীয়বার বিজিত হইয়াও মুসলমান-ভাগ্যে তাহার ফলভোগ ঘটিল না। বিধাতার ইচ্ছায় উদ্যমশীল ইংরেজ জাতি ফলভোগের অধিকারী হইলেন।"[৪]

উপন্যাসের রচনাকাল মনে রাখলে এ ইঙ্গিত এসেছে এমন এক সময় যখন খিলাফতের বিপন্ন অবস্থায় ভারতীয়রা ইংরেজ রাজত্বের অবসান কামনা করছিলেন। ইংরেজ ছিল খিলাফত ও অন্যান্য মুসলমানের প্রতি অবন্ধুসুলভ, ইতিহাস ছেড়ে বর্তমান মুহূর্তে এসে লেখকের হতাশা দীর্ঘশ্বাস হয়ে দাঁড়ায়। আফগান শাহীর সম্পর্কে ভারতীয় মুসলমানদের মনে আস্থা সৃষ্টি করে দেবার জন্য তিনি উপন্যাসের আশ্রয় নিলেন, কিন্তু উপন্যাসটি সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস আশ্রিত হলে বিপুল ঐতিহাসিক সত্যকে তিনি নিজের মত করে তুলতে পারেননি। ফিরোজা বেগম উপন্যাসটিতে বিপুল ইতিহাসের অসংগতি থাকলেও তাঁর বাকী তিনটি উপন্যাসের তুলনায় কম। এখানে মূল ঘটনা ঐতিহাসিক পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ, এছাড়া উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রও মোটামুটি ঐতিহাসিক।

মারাঠা পক্ষের অন্যতম সাহসী সেনাপতি সদাশিব রাও ঐতিহাসিক চরিত্র, কিন্তু উপন্যাসে যেভাবে তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের ইতিহাসের সাক্ষ্য এর বিপরীত।[৫] বোঝা যায়, সদাশিব রাওয়ের চরিত্রে কালিমা সৃষ্টি এবং এর বিপরীতে মুসলমান পক্ষের বিজয়-গৌরব প্রধান লেখকের

১। "Never was a defeat more complete and never was there a calamity that diffused so much consternation ,grief and despondency spread over the whole Maratha people,most had to mourn relations and all felt the destruction of the army as a death XXXXXX afxix Blow to their national greatness". The History of India, p.734.

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬।

৩। আনন্দমঠ, ব-র,৩,পৃঃ ৭৮৭-৮৮।

৪। ফিরোজা বেগম, শি-র, পৃঃ ৩৯৬।

৫। Oxford History of India,p.438.

উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ বিনিময় উপন্যাসে শিবাজী তাঁর উত্তরপুরুষদের সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করেছিলেন।[১] আহমদ শাহ দোররানীর সহায়তায় নজীবউদ্দৌলার মাধ্যমে লেখক শিবাজীর উত্তরপুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছেন।

মোগল রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে মারাঠারা প্রায় অপরাজেয় হয়ে উঠেছিল। এমন সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়েছিল যে, এক সময় তারাই মোগলদের পরিবর্তে সর্বভারতের অধীশ্বর হতে পারে। এবং কেউ কেউ মুসলিম সার্বভৌমত্বের স্থলে হিন্দুর সার্বভৌমত্ব অর্জনের প্রয়াস মনে করেছেন।[২]

মকদম ফৌজদারের সঙ্গে রোহিলাদের সম্পর্ক ভালো ছিল না।[৩] শিবাজী সম্ভবতঃ এ কারণেই মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনে মকদম ফৌজদারের কাল্পনিক কন্যা ফিরোজা বেগমের সঙ্গে রোহিলা প্রধান নজীবের বিয়ের ঘটনা সৃষ্টি করেছেন। উপন্যাস কাহিনীতে বিয়ের পর ফিরোজা সদাশিবের সৈন্যদল কর্তৃক অপহৃতা হয়েছেন এবং অপহরণের ঘটনার জন্য কৌশলে জাঠদের দোষারোপ করায় জাঠদের সঙ্গে মকদম ফৌজদারের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছে।[৪] ইতিহাসের সঙ্গে এ ঘটনার কোন সঙ্গতি নেই। জাঠরা মারাঠাদের সমর্থক ছিল, সদাশিবের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে মারাঠা পক্ষ ত্যাগ করে।[৫] এটিকেই লেখক সম্ভবতঃ ফিরোজা অপহরণের পরবর্তী ঘটনা হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

ইতিহাসের মত উপন্যাসেও পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নজীবউদ্দৌলা। নজীব উদ্দৌলা আহমদ শাহ দোররানীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসেন।[৬] মতান্তরে শাহ ওয়ালীউল্লাহ আহমদ শাহ দোররানীকে আমন্ত্রণ জানান, তিনি নজীবকেও সেভাবে প্রস্তুত করে তোলেন এবং তাঁর চেষ্টাতেই মুসলমান শক্তিসমূহ আবদালীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়।[৭] কিন্তু উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে, গিরীপুর ও অন্যান্যের পর নিয়ে পুরুষবেশী ফিরোজা বেগম আফগান বাদশাহের দরবারে যেয়ে বুদ্ধিমত্তা, সাহস ইত্যাদির পরিচয় দিয়ে দোররানীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এসেছেন।[৮] ফিরোজা বেগম চরিত্র

১। পূর্বে, পৃঃ ১১৮।
২। (ক) S. Moinul Haq.-Shah Abdali and the third battle of Panipath. A History of Freedom Movement, Vol.I.p.279.
(খ) Oxford History of India, p.438.
৩। (ক) Mirza Ali Azhar-The Nawab Wazir of Oudh, A History of Freedom Movement, Vol.I, p.214.
(খ) A History of the Maharattas, Vol.I, p.214.
৪। ফিরোজা বেগম, পি-ব, পৃঃ ২০৭-৩৪।
৫। (ক) Oxford History of India, pp.438-39.
(খ) The History of India, p.727.
৬। Ibid, p.728.
৭। S. Moinul Haq.-Shah Abdali and the Third battle of Panipath. A History of Freedom movement, Vol.I, pp.280, 302.
৮। ফিরোজা বেগম, পি-ব, পৃঃ ২৮৫-৯২।

Dhaka University Institutional Repository

[illegible] পরিকল্পনায় ইতিহাসের ন.., গিরিশচন্দ্র ঘোষের সিরাজদ্দৌলা[১] (১৩১২) নাটকের ও মহাশ্মশান[২] (১৩১২) কাব্যের প্রভাব পড়তে পারে। সিরাজদ্দৌলা নাটকে হোসায়ন কুলিখাঁর বিধবা স্ত্রী জহুরা সিরাজদ্দৌলা কর্তৃক তাঁর স্বামী হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য কখনও পুরুষ বেশে, আবার কখনও রমণী বেশে মীরজাফর ও ইংরেজ পক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। কেউ কেউ মহাশ্মশান কাব্যে সিরাজদ্দৌলা নাটকের এবং অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।[৩] তবে ফিরোজা বেগম এর সঙ্গে মহাশ্মশান কাব্যের সম্পর্ক অধিকতর প্রত্যক্ষ বলে মনে হয়।

সুজাউদ্দৌলা মারাঠা বিরোধী অভিযানে অংশ নিতে সম্মত ছিলেন না এটা ঐতিহাসিক সত্য। নজীবউদ্দৌলা ও সদাশিব রাও উভয়েই তাঁর সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। নজীব নিজেই তাঁর কাছে যান, এবং সুবর্ণ ও সুজাউদ্দৌলার আবেগ সৃষ্টি করে তাঁর সমর্থন লাভ করেন।[৪] অনুরূপভাবে উপন্যাসে সেনাপতি তাহের খান সুজাকে সম্মত করানোর জন্য যেয়েছেন, মাতার আদেশে এবং স্ত্রীর উৎসাহে সুজা মুসলমান পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করার জন্য সম্মত হয়েছেন।[৫] কিন্তু সদাশিবের পত্র পেয়ে সুজা কোন আমন্ত্রণ পেয়েছেন কিনা উপন্যাসে সে ব্যাপারে উল্লেখ নেই।

যুদ্ধক্ষেত্রে মারাঠাগণ প্রথমে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তারপর নিশ্চিত মৃত্যু অনুভব করে আত্মরক্ষার শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে মারাঠারা বেরিয়ে এসে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেয়। তাঁরা অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করেন, কিন্তু ভাগ্য তাঁদের প্রতিকূল ছিল। যুদ্ধের একটি উত্তেজনাকর মুহূর্তে সদাশিব রাও আহত হয়ে পড়েন ও মৃত্যু বরণ করেন। মারাঠা পক্ষ বিপুলভাবে পরাজয় বরণ করে। সদাশিব রাওয়ের মৃতদেহ সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায়নি।[৬] উপন্যাসে সদাশিব রাওয়ের পরাজয়কেই মুখ্য করে তোলা হয়েছে এবং এ পরাজয়ও ঘটেছে ফিরোজা বেগমের নেতৃত্বে রমণীবাহিনীর নিকট। ফিরোজা নিজেই সদাশিব রাওয়ের মস্তক কেটে তরবারিতে বিদ্ধ করে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করেছেন।[৭] মারাঠাদের ক্রন্দন ধ্বনির উল্লেখ করে লেখক যুদ্ধের বিজয়ের সংবাদ দিয়েছেন,[৮] এবং উপন্যাসের শেষে বিজয়ী আহমদ শাহ দোররাণীর আফগানিস্তানে পুনঃপ্রত্যাবর্তনকে নিজের প্রয়োজনে মত সৃষ্টি করে নিয়ে বলেছেন, "দিল্লীর প্রভুত্বকে

১। গিরিশচন্দ্র ঘোষ-সিরাজদ্দৌলা, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত-গিরিশ রচনা সম্ভার, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭০, পৃঃ৬০৭-৭৭৮।

২। কায়কোবাদ, মহাশ্মশান, ঢাকা স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৭, পৃঃ ৫৪-৬৫।

৩। সৈয়দ এমদাদ আলী-মহাশ্মশান কাব্যে জোহরা চরিত্র, বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা, শ্রাবণ-১৩২৬।

৪। (ক) Mirza Ali Azhar -The Nawab Wazir of Oudh, A History of Freedom Movement, Vol.I, pp. 217-18.
(খ) The History of India, p.931.
(গ) A History of Mahratta, Vol.II, p.142.
(ঘ) Jadunath Sarkar-Fall of the Mughal Empire, Vol.II, Orient Longmans, 1971, pp.192-95.

৫। ফিরোজা বেগম, পি-য, পৃঃ ১১০-১৭।

৬। (ক) Oxford History of India, pp.438-41.
(খ) Cambridge History of India, Vol.IV, pp.422-26.

৭। ফিরোজা বেগম, পি-য, পৃঃ ৩০৮-১৩।

৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৬।

Dhaka University Institutional Repository

অপদস্থ এবং মজবুত করিয়া ভারতব্যাপী বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য সংগঠনের জন্য আহমদ শাহ যখন কঠোর পরিশ্রম করিতেছিলেন, ঠিক এমন সময় আফগানিস্থানে রাজপরিবারে ঘোরতর বিপ্লব ঘটায় আহমদ শাহ অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিল্লী ত্যাগ করিয়া কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেন।[১] ইতিহাসের সাক্ষ্য এর বিপরীত, প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনীতে অসন্তোষের ফলেই আবদালী স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন।[২] সুতরাং লক্ষ্য করা যায়, প্রধান প্রধান চরিত্র এবং ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের আংশিক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ইতিহাসের অনুসরণে মানব জীবনের বিপুল আনন্দ কিংবা দুঃখ বেদনার উপলব্ধি সমূহ কতদূর রূপায়িত হয়েছে তা বিবেচ্য।

ফিরোজা বেগম উপন্যাসের অন্যতম দুর্বলতা এখানে যে ঘটনার অনিবার্যতা এবং তার সঙ্গে চরিত্র বিকাশের সম্পর্কযুক্ত কাহিনীর যুক্তি প্রায় নেই বললেই চলে। মনে হয় লেখকের মূল উদ্দেশ্য হল মুসলমান নরনারীর সাধুত্ব এবং সার্বিকভাবে মুসলমান পক্ষের শৌর্যবীর্যের বর্ণনা। উপন্যাসের কোন কোন ঐতিহাসিক চরিত্রের চারপাশে ইতিহাসের ঘটনাবলী জড়ানো, কিন্তু তাঁরা পরিপূর্ণ মানুষ রূপে প্রায়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

নজীব ও ফিরোজার জীবনের সঙ্গে লেখক ভারতের সমসাময়িক এবং লেখকের সমকালীন মুসলমানদের আশাকেও জড়িত করে তুলেছেন, লেখকের কৃতিত্ব এখানেই। উপন্যাসের ঘটনা এবং চরিত্র কেবলমাত্র উপন্যাস কিংবা ইতিহাসে বন্দী হয়ে নেই।

দুই

উপন্যাসের শুরু হয়েছে ফিরোজা বেগমকে অপহরণের ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে, সেই ষড়যন্ত্রের অবসান হবার সঙ্গে উপন্যাসের গতি মন্থর হয়ে এসেছে, এর পরও কাহিনী অগ্রসর হয়েছে মারাঠী শক্তির প্রতিভূ নারী হরণকারী সদাশিব রাওয়ের শাস্তি প্রদান ও মুক্তির জন্য। অপহৃতা ফিরোজাকে কেন্দ্র করে জাঠদের সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধ এবং জাঠদের পরাজয়ের মুহূর্তে উদ্ধারকৃত ফিরোজা ও নজীবের আবির্ভাব রাজনন্দিনী উপন্যাসে অপহৃতা দুর্গবাসীর উদ্ধারের সঙ্গে কোন কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ।[৩]

ফিরোজা বেগম ও নজীবের দেহরক্ষীদের দ্রুত মধ্যস্থ করে তোলবার জন্য একটি সম্ভাবনাময় পথ তাঁদের নিকট উন্মুক্ত হয়। তাঁরা মারাঠীদের দুর্গদ্বারের সন্ধান পেলেন এবং কৌশলে তা উদ্ধার করে আনলেন।[৪]

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৬।

২। (ক) Oxford History of India, p.441.

(খ) Cambridge History of India, Vol.IV, p.426.

৩। রাজনন্দিনী, পি-স, পৃঃ ৯৬-১০০।

৪। ফিরোজা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৪, ৬৭, ৩৯ ও ৮৪।

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাসে মবারক মিত্রের মাধ্যমে প্রেরিত চঞ্চল কুমারীর পত্র দস্যুদের নিকট থেকে মানিকলাল এভাবেই উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।[১] আনন্দমঠ উপন্যাসে সন্তানদের লুণ্ঠিত ধনরত্ন সম্পদ[২] এবং দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে লুণ্ঠিত অর্থ[৩] প্রায় একই ভাবে ব্যয়িত। বলা বাহুল্য নজীব এবং ফিরোজা দুজনেই এ প্রাপ্ত ধনরত্ন দেশোদ্ধারের কাজে লাগান, শিরাজীর সমসাময়িক কালে। তিনি সন্ত্রাসবাদীরাও অর্থ সংগ্রহ করে দেশোদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন।

মূল উপন্যাস কাহিনীর সঙ্গে আহমদ শাহ দোররানীর যোগ এটুকুই যে, তিনি সম্মিলিত মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও দোররানীর ভারত আক্রমণের ব্যাপারে লেখক নিজেও নিঃসংশয় ছিলেন না বলে এ ব্যাপারে একটি যুক্তিও দাঁড় করিয়েছেন যে, "আহমদ শাহ ভারত জয় করলেও কাবুর রাজ্য কখনও অপহরণ করবেন না।"[৪] সমকালের রাজনীতিতে খেলাফত আন্দোলনের প্রভাব উপন্যাসে পড়েছে। খিলাফত আন্দোলনে উদ্ভূত কোন প্রশ্রয় না পেলেই মওলানা মহম্মদ আলীর মত শিরাজী একথা ঘোষণা করেন যে, আফগান আমীর ভারত আক্রমণ করলে ভারতীয় মুসলমানদের উচিত সহায়তা করা কর্তব্য।[৫] এসব যুক্তের বাস্তব প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল, উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক এর একটি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। ভারতের মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপনে সহায়তা করার পর দোররানীর দেশে ফেরার কথা উপন্যাসে বলা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে সেনা মনঃক্ষুণ্ণের ফলে দোররানীর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। আলেকজান্ডারের মত সেনা অসন্তোষ না ঘটলে দোররানী লেখকের ইচ্ছা-পূরণ করে দেশে ফিরতেন কিনা বলা সহজ নয়। ইতিহাসের আংশিক সমর্থন পেয়েও লেখক দেখেছেন, দোররানীর দেশে প্রত্যাবর্তন ও মৃত্যুর পর "ভারতের মুসলমান শক্তিসকল আবার বিচ্ছিন্ন এবং দুর্বল হইয়া পড়ে।

আবার বিদ্রোহ আবার মস্তকোত্তোলন করে। বাদশাহ এবং উমরাগণ আবার মারাঠীদিগের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া পড়েন।"[৬] এ পরিস্থিতিতে ইংরেজ সহজে তাদের অধীশ্বর হয়ে ওঠে। ম

তারাবাঈ উপন্যাসে লেখক শিবাজীর রাজ্য প্রতিষ্ঠা দেখিয়েছেন, ফিরোজা বেগম উপন্যাসে ভারতের অধিকার পেয়েছে ইংরেজ। ফিরোজা বেগম উপন্যাসের ঘটনাবলী এবং চরিত্রসমূহ এ পরিণতিরই নির্দিষ্ট মাত্র, প্রায় সকল চরিত্রই [illegible] কল্পনাপ্রসূত। উপন্যাসের শেষে পাত্রপাত্রীর মিলন হয়েছে, মুসলমান গৌরবের প্রতীক নির্মিত হয়েছে[৭] কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য বিচ্যুত হওয়া যায় না। অর্থাৎ যে

১। রাজসিংহ, ব-র, ১, পৃঃ ৬৩৩-৩৪।
২। আনন্দমঠ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩০।
৩। দেবী চৌধুরাণী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০৪-০৫।
৪। ফিরোজা বেগম, শি-র, পৃঃ ২১৫।
৫। পূর্বে দ্রঃ ২৮,৬৬।
৬। ফিরোজা বেগম, শি-র, পৃঃ ৩১৬।
৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৬।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার জন্যই এত সংগ্রাম, বিপুল রক্তক্ষয়ী বিজয়ের পরও তা তুলে দিতে হয় শ্বেতদ্বীপবাসীদের হাতে। এখানে সাময়িক মুসলমান বিজয় এবং শাহপাটীর মিলনের অনুরাগে উপন্যাসে একটি ট্র্যাজিক উপলব্ধিও অনুভূত হয়।

তিন

উপন্যাসে নজীবউদ্দৌলা ও ফিরোজা বেগমের সম্ভাব্য আবির্ভাবের সংবাদ পাওয়া যায় তাজকর পণ্ডিত ও সদাশিব রাওয়ের কথোপকথনের মধ্যে। প্রথম থেকে তাঁদের দুজনকেই অসাধারণ বীর হিসাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে।[১] এর পর নজীবউদ্দৌলা নানারূপে আবির্ভূত হয়েছেন, প্রথমে বহুরূপে জাঠদের ছদ্মবেশী মারাঠাদের সংগে যুদ্ধে এর পর অপহৃতা স্ত্রীর অনুসন্ধানরত বিরহদশায়, মারাঠা সৈনিকদের হাতে বন্দী অবস্থায় ও মুক্তির মাধ্যমে স্ত্রীর সংগে মিলন মুহূর্তে, পুণ্ডুন উদ্ধারে এবং সবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে। নজীবের চরিত্রের প্রধানতঃ দুটো দিক, স্ত্রীর সংগে বিরহ ও মিলন, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ও অন্যান্য অবস্থায় বাঞ্ছিত জাতীয় দায়িত্ব পালনের মধ্যে। প্রথম অংশটি নজীবের অর্ন্তজীবনের অনুভূতি এবং দ্বিতীয় অংশটি মোটামুটিভাবে ইতিহাস নির্ভর। অনুশীলন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি আত্মপ্রবঞ্চনা করেছেন, বলবীর্য প্রকাশের ব্যাপারে ইতিহাসে যতসম্ভাবনাটুকু ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। সে কারণে সিংহের মতো সিংহিনীর সংযোগ বলে প্রথমেই নজীব ফিরোজার মিলনের যে আভাস পাওয়া যায় তা যথার্থভাবে সৃষ্টি হয়ে ওঠেনি, না প্রেমে না শৌর্যে।

বহুবেশী নজীবউদ্দৌলা মুসলমান সমাজের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মওলানা ক আমিনর রহমানকে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।[২] ফলে নাচ গানের পরিবর্তে সৈনদের কৃত্রিম যুদ্ধ ও পালোয়ানদের কুস্তি অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপন্যাস কাহিনীতে নজীবের যোদ্ধার জীবনকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে প্রেমের উপাখ্যান এসেছে যোদ্ধা জীবনের সহায়ক ভূমিকা নিয়ে। এ কারণে ফিরোজা অপহরণের সময় নজীব অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেও ফিরোজাকে রক্ষা করতে পারেননি, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং সম্মুখ যুদ্ধে জয়মাল্য অর্জনের জন্য লেখক তাঁকে প্রস্তুত করে তুলেছেন। প্রকৃত বীরের বীরত্ব প্রদর্শনের সুযোগ কেবলমাত্র কি সম্মুখ যুদ্ধে, একজন্য মারাঠাদের গোপন আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে নজীব বীরত্ব প্রদর্শন করলেও ফিরোজাকে রক্ষা করতে পারেননি। নজীবের চরিত্রে প্রেম তাঁকে দুর্বল করেনি, বরং লেখকের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী জাতীয় দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে প্রস্তুত করে তুলেছে। একজন্য ফিরোজা অপহরণের পর তিনি মারাঠাদের অনুসরণ করেছেন, এবং একই সঙ্গে ফিরোজাকে উদ্ধার ও মারাঠাদের

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ২২৪।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্বপালনের মধ্যেই তাঁর জীবনের পরবর্তী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে। বিয়ের পর এবং ফিরোজা অপহরণের আগে পর্যন্ত বিবাহিতা স্ত্রী ফিরোজার প্রতি তাঁর কতটুকু প্রণয় বা আকর্ষণ এবং কতটুকু মুসলমান রমণীর মর্যাদা রক্ষার জন্য দায়িত্ববোধ যুক্ত ছিল তা বলা কঠিন। তাসত্ত্বেও নজীবউদ্দৌলা "পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।"[১] এ কারণে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করে ফিরোজাকে দাক্ষিণাত্যে অনুসন্ধান করতে গিয়ে মারাঠা সৈনিকদের হাতে বন্দী হন।[২] বিবাহিতা স্ত্রীকে উদ্ধারের আশায় তিনি বিপুল ত্যাগ স্বীকার করেন, কিন্তু যে রমণীর কারণে রাঠোরের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ, মারাঠাদের প্রতি সন্দেহ ও বৃহত্তর যুদ্ধের ঘনঘটা তাঁর সঙ্গে মিলন মুহূর্তটি সে রকম উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। ইতিহাসে নজীবের মারাঠা বিরোধিতা ছিল প্রতিষ্ঠিত ঘটনা এবং তাঁর অসাধারণ বীরত্বের কারণে মারাঠা শক্তির প্রতিপক্ষ হিসাবে নজীবকেই লেখক গ্রহণ করতে পেরেছেন। নজীব-ফিরোজার বিবাহ ও পুনর্মিলন মুহূর্ত লেখকের নিকট গৌণ, নজীবের বীরত্ব ও মারাঠা বিরোধিতাই বড় কথা। সেজন্য নজীবের চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতি নেই, শুরুতেই তিনি যে বুদ্ধির চাতুর্য, মারাঠা বিরোধিতা ও রণনিপুণ যোদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর অন্তর্জীবনের পরিচয় সেভাবে দাঁড়ায়নি। যে নজীব ফিরোজা উদ্ধারের জন্য বিপুল নির্যাতন বরণ করেছেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকে পেয়েছেন এবং অবশেষে মিলন মুহূর্তে ফিরোজা মরে গিয়েছেন।[৩] নজীবের চৈতন্যোদয় হয়েছে এবং তিনি জীবন সুখ উপভোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৪] স্ত্রীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ না হলে প্রেমের মধ্যে দেশ বিলীন হয়ে যেতে পারত। স্ত্রীর কথায় নজীবের সংশয়ের মেঘ কেটে গেছে, তিনি স্ত্রী এবং দেশকে একই ভাবে দেখতে চাননি। একদিকে হৃদয় ধর্ম, অন্যদিকে দেশ মন্ত্র, যুদ্ধক্ষেত্রসার। একারণে উপন্যাসের শেষে তাঁদের পুনর্মিলনের সংবাদ সমারোহহীন, এবং প্রায় অনুল্লেখ্য। নজীবের জন্য এটা আত্মপ্রবঞ্চনার সমতুল্য, মানুষে আদর্শবাদ শীলের যে মূল্যই থাক না কেন, উপন্যাসে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-হীন আত্মনিবেদিত চরিত্রের বিকাশের কোন সম্ভাবনা নেই। নজীব চরিত্রের মহত্ত্ব অন্তরের নয়, বাইরের, সুতরাং উপন্যাসে ইতিহাসের ঘটনাক্রম বাহ্যিকভাবে রয়ে গেছে, মানব জীবনের অনুনিহিত সৌন্দর্যানুভূতির কোন প্রকাশ ঘটেনি। লেখক ধরে নিয়েছেন জাতীয় যে দায়িত্ব পালন করার জন্য নজীবের সৃষ্টি, এর মধ্যেই তাঁর সার্থকতা। এ কারণে দস্যুর হাত থেকে উদ্ধার পাবার পর উপন্যাসে তাঁর বাকী সময়ের উপস্থিতি গতানুগতিক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, জাতীয় দায়িত্ব পালন করার জন্য শিবাজী এক সময় অবিবাহিত যুবকদের চেয়েছিলেন।[৫] নজীব বিয়ে করলেও তাঁকে দিয়ে তিনি ব্রহ্মচর্য পালন করিয়েছেন, প্রিয় মিলনের মাধ্যমে কর্তব্য

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩২।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৮-৩৯।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭০।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭০।
৫। পূর্ব, পৃঃ ৪২-৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠকের দেয়াল তুলে রেখেছেন। ফলে ধনুরে সজীব পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারেননি, তার সজীব চরিত্রে এ অসম্পূর্ণতা ছিল বলে তাঁর বীরত্ব প্রকাশের দিকটিও অনুজ্জ্বল। নিরস্ত্র থেকেই সজীব মারাঠীদের সঙ্গে অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন।[1] নিরস্ত্র বর্গী দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম একজন তরবারি,[2] এবং তিন জন দস্যুকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে পানিপথ প্রান্তরেও তিনি অসামান্য কৌশল, সাহস, ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন।[3] কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, মুসলিম ঐক্য রক্ষাতেও তিনি যত্নের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার প্রবল যুক্তিতে সুজাউদ্দৌলা মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সম্মত হয়েছেন। তা সত্ত্বেও এগুলো উপন্যাসের বাহ্যিক দিক মাত্র। ধনুরে সজীব চরিত্রের সম্ভাবনা অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।

<u>চার</u>

উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ফিরোজা বেগম, কাহিনী সৃষ্টিতে তার সক্রিয় ভূমিকা দেখে মনে হয় অনেকাংশে তাঁকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের সূচনাতে ফিরোজা বেগম নিমিত্ত মাত্র, পরে ফিরোজা বেগম কাহিনীর গতি নিরূপণ করে দিয়েছেন এবং নিজেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ফিরোজা বেগম চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে কোন নূতনত্ব নেই, তাঁকে তারাবাঈ উপন্যাসের নায়িকা আমিনা বানুর সম্প্রসারিত রূপ বলে মনে হয়। আমিনা বানুর মত ফিরোজাও অপহৃতা হয়েছেন কিন্তু আমিনা বানু যেভাবে শিবাজীকে শাস্তি প্রদান করতে পেরেছেন, সদাশিবের ক্ষেত্রে ফিরোজা অপহৃতা অবস্থায় তা পারেননি। আত্মরক্ষার জন্য তিনি পলায়ন করেছেন এবং দুষ্প্রাপ্য শান্তিপ্রদান হিসাবে যুদ্ধে মাত্র এক হাতের সাহায্যেই সদাশিবের শিরচ্ছেদ করে তরবারির প্রান্তে তাঁকে বিদ্ধ করেছেন।[4] আমিনা বানুর মত তিনি পুরুষের বেশ ধারণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করেছেন। একাধিক উপন্যাসে প্রায় একই ঘটনা ব্যবহার করার ফলে ফিরোজা বেগম চরিত্রের স্বাধীন বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। জাতীয় জীবনের প্রয়োজনে উদ্বুদ্ধ প্রেম ও জীবনকে প্রায় উপেক্ষা করে শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করেছেন, সে দেশের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছেন। এদের মধ্যে লেখক মুসলিম রমণীর এক ধরণের আদর্শ দিয়েছেন যাদের পরিপূর্ণতা হল জাতীয় জীবনে, যুদ্ধে ও সৈন্য পরিচালনার কৌশল প্রতিষ্ঠায়। পৌত্তলিকতা থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরোজা বেগমকে এত বেশী দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে যে তাঁর মনোজীবনের প্রকাশ প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে। অথচ ফিরোজা বেগমের আবির্ভাবের সম্ভাবনাকে লেখক উদ্ভাবন করে তুলেছিলেন।[5] কিন্তু ফিরোজা বেগমের চরিত্রের বিকাশকে অনুসরণ করলে দেখা যাবে, বিদ্রোহের

১। ফিরোজা বেগম, পি-র, পৃঃ ২৪২।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৫।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৮–৪০।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৫।
৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৬।

সংগে চাঁদের হাসির ঠিক সংযোগ ঘটেনি, বরং বিদ্যুতের মধ্যে উত্তাপের চেয়ে শীতলতা বেশী।

ফিরোজা বেগম চরিত্রের সংগে আজিনা বানুর সাদৃশ্য রয়েছে অনেক, তা সত্ত্বেও প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠ উপন্যাসের শান্তি,[১] সীতারাম উপন্যাসের শ্রী,[২] সিরাজদ্দৌলা নাটকের জহরা[৩] এবং কায়কোবাদের মহাশ্মশান কাব্যে জোহরা বেগম[৪] চরিত্রের প্রভাব পড়েছে। নারী বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন[৫] মেঘনাদবধ কাব্যে প্রমীলার যুদ্ধযাত্রাকে[৬] আংশিকভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়।

সেতারায় একটি প্রাসাদ কারাধ্যায় শাহবিভিরেখর সংগে পর্যন্ত ফিরোজা বেগমের ভূমিকা ছিল সক্রিয়, এখান থেকে কৌশলে ই তিনি পলায়ন করেন।[৭] আজিনা বানুর মত তিনিও সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করেছেন এবং রায়মুকুন্দ প্রভু বাবা একলিঙ্গের মন্দিরে এসে উপনীত হয়েছেন।[৮] এর মধ্য দিয়ে মন্দিরের মাহাত্ম্য-প্রকাশের চেষ্টা করলেও সন্ন্যাসিনীর লেবাস যখন লেখকের একটি প্রিয় প্রসঙ্গ বলে মনে হয়, তেমনি বৈষ্ণব কবিতার সৌরভেও তাঁর মন ছিল সুবাসিত। সেকারণে আদর্শপুষ্ট মুসলমান রমণীকেও লেখক সন্ন্যাসিনীর ছদ্মবেশ পরিয়ে দৃশ্য সৃষ্টিতে মেতেছেন। ফিরোজা বেগমের অন্য পরিচয় কবি, সেতারা থেকে পলায়ন করে কানন পথে বিপুল ধাপে বিন্ধ্যপর্বতের দিকে অগ্রসর হতেই বসন্তকালীন মুক্তির সমারোহ দেখে তাঁর কবি মন প্রকৃতির সংগেই সাড়া দিয়ে সপ্রাণ হয়ে উঠেছে, ফিরোজার আধ্যাত্মিক অনুভূতি সংগীতে পরিণত হয়েছে।[৯] ফিরোজার সংগীত মাধ্যমে সুরলা ভঙ্গিতে বাস্তব হয়ে উঠেছে,[১০] এ ভঙ্গিমাটি লেখকের নিজেরই। উক্ত ফিরোজা বেগম দৈবী প্রেমের কথা বললেও বোঝা যায়, সুখের সৌন্দর্য ও পবিত্রতার প্রতি ভক্তি তার হৃদয় কেড়ে নিয়েছিল। জীবন ও প্রকৃতি থেকে ভিন্ন ভিন্ন সৌন্দর্য আহরণ করে তিলোত্তমা সৌন্দর্য প্রতিমা হিসবেই তিনি ফিরোজা বেগমকে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রাতঃ দার্শনিক স্মরণ করে তাঁকে আকণ্ঠ রাজনগরের সুখ ঘুমে পাঠিয়েছেন।

ফিরোজা বেগমকে কিভাবে গড়ে তুলবেন সে ব্যাপারে লেখক প্রায় স্থির নিশ্চিত ছিলেন। সেজন্য তিলোত্তমা ফিরোজা পেয়েছেন পুরস্কারে, সেজন্য ফিরোজার প্রতিষ্ঠা দেহ সৌরভ কিংবা সৌন্দর্যে নয়, বরং

১। মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৪০৮।
২। সীতারাম, ব-র, ৩, পৃঃ ৮৮১।
৩। পূর্বে, পৃঃ ১৬৭।
৪। পূর্বে, পৃঃ ১৬৭।
৫। ফিরোজা বেগম, দি-র, পৃঃ ৩১১-১৪।
৬। মেঘনাদবধ কাব্য, মধুসূদন রচনাবলী, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭১, তৃতীয় সর্গ, পৃঃ৫৫-৬০।
৭। ফিরোজা বেগম, দি-র, পৃঃ ২৪৫-৪৭।
৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ২৫৮।
৯। "ইচ্ছা করে, এই সরোবরতটে বাস করে, জীবন ভরে সাধ মিটিয়ে তোমার সেবা করি। আর রক্তোৎপল তুলে প্রাতঃসন্ধ্যা তোমার চরণে দেই। তোমার দর্শনে কি আনন্দ। তোমার আরাধনায় কি সুখ। তোমার পূজায় কি পুণ্য।" প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

বাঁচবার অধিকার। এ ব্যাপারে পিয়ারীর নিজের অবশ্যই দুটো ভিন্ন দৃষ্টিকোণ, সেকারণে দুঃখ, কষ্টকে আদর্শ করে তুলতেও তাকে সংসারে প্রবেশ করতে দেয়নি। অথচ যে ফিরোজার কবি, আকাশ্য বসন্তের স্পর্শে বিপুল অনুভাব মনে কবিতা ও সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়, যুদ্ধ শেষে এবং বিবাহোত্তর সংসারে তাঁর প্রথম প্রবেশ ঘটেছে অনাড়ম্বর, অনুষ্ঠানবিহীন।৬ কেবল এখানে নয়, অপহৃতা ফিরোজা বেগমের সংসার নবীনের সাক্ষাৎকারের দুর্যোগেও বিপুল কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে না।

দস্যুর হাত থেকে উদ্ধার পাবার পর ফিরোজা নবীন ফিরোজাকে কাছে পেয়েছে, কিন্তু নিজেকে সমর্পণ করেনি, বাঁধা এসেছিল ফিরোজার নিজের কাছ থেকেই। ফিরোজা বেগম তাঁর রচনা কুসংস্কার প্রতিরোধ্য বাসনাকে গৌণ করে তুলেছেন জাতীয় সংস্কৃতির কথা মনে রেখে।৭ ফিরোজা বেগম কোনোখানেই ভিরমুখ মায়া নয়, পুরুষকে সমাজের একটি অংশ এবং নারীকে তার অন্যতম হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং পারিবারিক জীবনের ভোগ-বিলাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, দুঃখের জীবন কিংবা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগ তাঁর কাম্য নয়। তার ফলে দুঃখের কষ্টাক্ত বাসনাকে তিনি উপেক্ষা করে, সংসার জীবনের মোহজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন, দুঃখী ও অসহায়দের তাঁর প্রতিশ্রুতি কথা ঘোষণা করতে পেরেছেন। কিন্তু ফিরোজা বেগমের দুর্ভাগ্য, নিজের হৃদয়, প্রেম ও দেশকে একত্রে মিলিত করে তুলতে পারেননি, দেশের স্বাধীনতার পথে নিজের প্রণয়কে এক সূত্রে গ্রথিত করে

দিতে পারেননি। তবে তাঁর মনে মনুষ্যের জীবনকে পূর্ণতাদানে কবিত্ব প্রাধান্য হয় দেশ সেবার জন্য চরম আত্মোৎ-সর্গ। কিন্তু এ সেবার মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা তিনি অনুভব করতে পারেননি। একারণেই আমরা ... শান্তির মধ্যে কি-শোরের বেদনার বিশেষ প্রকাশ, যে শান্তির জন্য যা সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছে, কিশোর বেদনার মধ্যে তা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। কিশোর বেদনার তীব্রতা শান্তির মত জীবনকে উদ্ভ্রান্ত করে তোলেনি। কিশোর চরিত্রের মধ্যে এ দুর্বলতা ছিল বলেই নজরুলের মধ্যে পুরুষ উপাদান এবং ... সমান অস্বাভাবিক ও বাড়াবাড়ি মনে হয়। লেখকের অভিপ্রায় অনুযায়ী কিশোরকে তা করতে হয়েছে, এবং পুরস্কার স্বরূপ ফুল হারানো কিশোর বেদনার পবিত্র হাত দিয়ে ...র্ঘের আত্মবন্ধুত্ব পরিবেশন হয়েছে।

চোরকাঁটা উপন্যাসে ... নতুন যুগ ... করেছিলেন, কিন্তু বিবাদের বিপুল ভাবকল্পের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন। পূর্ববর্তী কিশোর ... মতো, "কিশোর যোদ্ধা, তার ... বন্ধু, নতুন একটা ... তীব্র ও ...। কিন্তু এবারে কিশোরকে নতুন যুগই করতে হবে।"কিশোর নজরুলের মাধ্যমে লেখক নিজের উদ্দেশ্য ... নতুন ফুল তৈরি নিয়ে এসেছেন, ... কিশোর

১। অনুরূপ, পৃঃ ৩৯৬।
২। অনুরূপ, পৃঃ ২৭০–৭১।
৩। অনুরূপ, পৃঃ ৩৯৬।
৪। অনুরূপ, পৃঃ ২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

নিজেই হত্যা করেছেন কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানের নির্বাপিত রাজশক্তির ওপর ইংরেজের আধিপত্য বিস্তার রোধ করা সম্ভব হয়নি।

লেখক ফিরোজা বেগমকে দিয়ে অসাধ্য সাধন করতে নিয়োজিত করে তুলেছেন। ফিরোজা পরিপূর্ণ রমণী নন, রমণী চরিত্রের মাধুর্য ও সৌন্দর্য তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত। এমন কি নজীবের চরিত্রের দুর্বলতাটুকুও তাঁর মধ্যে নেই। আমিনা বানুর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও তিনি উপন্যাস কাহিনীর মধ্যে কোন সমস্যা সৃষ্টি করেননি, কিন্তু ফিরোজা বেগমের চরিত্রকে ঘিরেই এ উপন্যাস, সুতরাং ফিরোজার ব্যর্থতা কিংবা অসম্পূর্ণতা উপন্যাসের রসাস্বাদনেও প্রতিফলিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম উপন্যাসে দুটি মুরলী আংশিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে ফিরোজা বেগম উপন্যাসে পরিচারিকা মুরলায় পরিণত হয়েছে[১]।

পাঁচ

নজীব, সুজা এবং আবদালীর ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রতিপক্ষ যে সদাশিব রাও তাঁর চরিত্র অপরিস্ফুট। তাঁর চরিত্রের যে একটি উজ্জ্বল দিক, মারাঠাদের লোলুপতার পরিচয় দেয়া হয়েছে, ইতিহাসে তা অনস্বীকার্য। তবে মারাঠাদের সঙ্গে মুসলমান পক্ষের আগে যুদ্ধের অন্যতম কারণ এবং সদাশিবের মৃত্যুর ঘটনা সাজানো বলে প্রতীয়মান হতে পারে। তা সত্ত্বেও মুসলমান পক্ষের বিজয়লাভের ব্যর্থতা, অর্থাৎ, বিজয়ের পরও ইংরেজের পথ নির্মাণ করে দেয়ার কথা সদাশিব রাও অবলুপ্ত হয়ে গেছেন। তবে বহু মুসলমান পক্ষ আপন নিয়তি বা ভাগ্যের সঙ্গেই যুদ্ধ করেছেন এবং পরিণামে তাঁদের বিপুল পরাজয়ের গ্লানি, আপন ভাগ্যকেই বরণ করে নিতে হয়েছে।

উপন্যাস বহির্ভূত কিছু প্রসঙ্গও এখানে যুক্ত হয়েছে, যেমন মওলানা আমিনর রহমান এবং রাজকবি আহমদুল্লাহ। আমিনর রহমানের হত্যাকারী প্রচারক শিবাজী নিজেই সেখানে নজীবের নিকট থেকে অনুমোদন অর্জন করে ছিলেন। মুসলমান সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে বক্তব্য প্রদানের জন্য তিনি বিয়ের উৎসবকে কেন্দ্র করে একটি উপলক্ষ সৃষ্টি করে নিয়েছেন[৪]। দোররানীর রাজসভায় কবির দীর্ঘ সাময়িক কবিতা পাঠ রবীন্দ্রনাথের "পুরস্কার"[৫] (১৩০০) কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ফিরোজা বেগম উপন্যাসে মুসলমানের বাহুবল এবং যুদ্ধ কাহিনী ছাড়া তেমন আর কিছু প্রকৃতপক্ষে নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ যেমন হিন্দুর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল ফিরোজা

১। সীতারাম, ব-র, ৩, পৃঃ১০১।
২। ফিরোজা বেগম, দি-র, পৃঃ২০৫।
৩। পূর্ব, পৃঃ ১৬৮-৬৯।
৪। ফিরোজা বেগম, দি-র, পৃঃ ২৩৮-৪০।
৫। সোনার তরী, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৫৭, পৃঃ ১০৯-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

বেগমের ক্ষেত্রে তা হয়নি। তা সত্ত্বেও সমকালীন মুসলমান পাঠক বিরাজ্যত আন্দোলনের মধ্যে এরকম একটি পটভূমি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, শিরাজী তাদের মনে তেমন নির্ভরযোগ্য আশ্রয় স্থল দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণেই শেষ রক্ষা হয়নি, ইংরেজের অবস্থান অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক বাস্তবের সঙ্গে ইতিহাসের সংযোগ স্থাপন করেছিলেন এখানেই এ উপন্যাসের যেটুকু সার্থকতা। শিরাজীর উপন্যাস চতুষ্টয়ের মধ্যে বীরত্ব কাহিনী এ উপন্যাসটিতে সবচেয়ে বেশী এবং উপন্যাস হিসাবে এটা দুর্বলতম।

ঙ) নূরউদ্দীন

এক

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ (১৮৮২) উপন্যাসের শেষে রাজসিংহের মন্ত্রী দয়াল শাহ "কুমার প্রভৃতি সাহেব মুসলমানদের সর্বনাশ করিতে লাগিলেন। ঔরঙ্গজেব হিন্দু ধর্মের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। প্রতিশোধের স্বরূপ ইনি কাজিদিগের দাড়ি মুণ্ডন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে লাগিলেন। কোরাণ দেখিলেই কূপায় ফেলিয়া দিতে লাগিলেন।"[১] প্রকৃতপক্ষে নূরউদ্দীন উপন্যাসের সূচনা এখান থেকে, রাজসিংহের মন্ত্রী সাহেব নির্যাতন করেন বলে ইতিহাসের ঘটনাকে উপেক্ষা করে চিত্রকরের সঙ্গে সাহেবের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। নূরউদ্দীন উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ, শিরাজীর অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় ক্ষীণতম।

গুজরাটের সুলতান আহমদ শাহ চিতোর আক্রমণ করেন,[২] এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিবরণ নিম্নরূপ:

"Ahmed Shah, who reigned for thirty years from 1411 to 1441, may be regarded as the real founder of the independent kingdom of Gujrat.. Ahmed shah devoted his energy and considerable ability to extending his teritories, spreading the religion of the prophet and improving the administration of the Prophet. Throughout his reign, he never suffered a defeat.[৩]

১। রাজসিংহ, ব-র, ৪, পৃঃ ৭৬০।
২। নূরউদ্দীন, শি-র, পৃঃ ৩২৬-৩৮।
৩। Oxford History of India, p.276.

Dhaka University Institutional Repository

এবং বাহাদুর শাহ, "earned a full share of military glory by his defeat of Mohammed II Khilji involving the annexation of Malwa in 1531-2 and his storm of Chitor in 1534 when the Rajputs made their usual dreadful sacrifice".[১]

রানা উদয়সিংহ সিংহাসনে আরোহন করেন ১৫৪১-৪২ সালে।[২] সুতরাং উদয়সিংহের সংগে আহমদ শাহের যুদ্ধের ঘটনা সম্ভব নয়। এমনকি বাহাদুর শাহ কর্তৃক চিতোর আক্রমণের পরে উদয়সিংহ সিংহাসনে আরোহন করেছেন বলে অসংগতিটুকু এখানেও দূর হয়ে যাচ্ছে না। উদয়সিংহের রুক্মিনী নামে কোন কন্যার সন্ধানও পাওয়া যায়না।

আহমদ শাহ এমন কি বাহাদুর শাহের সময়কালে মালবে রোস্তম উদ্দীন নামে কোন সম্রাট ও নূরউদ্দীন নামে তাঁর কোন পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়না।[৩] রুক্মিনী নামটি রাজসিংহ উপন্যাস থেকেও আসতে পারে।[৪] রোস্তম উদ্দীন নামে অন্য যে একজন সম্রাটের বিবরণ ইতিহাসে আছে উপন্যাসে কথিত মালব সুলতানের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই।

সুতরাং রাজসিংহ উপন্যাসের সূত্র ধরে এবং গুজরাট কর্তৃক চিতোর আক্রান্ত হয়েছে এই ঐতিহাসিক ঘটনাটুকু সামনে রেখেই উপন্যাস কাহিনীর কাঠামো প্রস্তুত হয়েছে। রাজসিংহ উপন্যাসে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব রাজসিংহ কর্তৃক পর্যুদস্ত হয়েছেন, কিন্তু নূরউদ্দীন উপন্যাস রাজসিংহের উপসংহার সামনে নিয়ে রচিত হলেও লেখক রাজসিংহের ঘটনার পূর্বকালে চলে গেছেন। মোঘলদের সংগে জয়পুরের বিরোধ থাকলেও উক্ত উপন্যাস কাহিনীতে মোঘল ইতিহাস আসেনি কিন্তু মোঘল ইতিহাসের নেপথ্য থেকে চিতোর এবং জয়পুর উভয়ই এসেছে। রাজসিংহের মন্ত্রী ময়ূর শাহ মুসলমান ও তাদের ধর্ম অবমাননা করেছিলেন। নূরউদ্দীন উপন্যাসে লেখক এর উত্তর দিয়েছেন দুভাবে, প্রথমতঃ উদয়সিংহ কর্তৃক মুসলমান নির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণের

১।(ক) Op.cit., p.277.
(খ) এ ছাড়া দ্রষ্টব্য: Cambridge History of India, Vol.IV, p.158.
২। James Tod-Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol.I, London, Routledge & kegan paul Ltd. Reprinted, 1960, p.255.
৩। Ibid, pp. 255-64
৪। [illegible] কুমারী চঞ্চল কুমারীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "তা রাজার ঘরে এমন হইয়া থাকে। তুমি যদি রুক্মিনী হইতে পার যদুপতি আসিয়া অবশ্য উদ্ধার করিতে পারেন।"-রাজসিংহ, বঙ্ক-র, ৩, পৃঃ৬২৯।
৫। The History of India, p.367.
৬। "মোগল শাসন যুগে হিন্দুগণের তিনটি প্রবল রাষ্ট্রীয় শক্তিকেন্দ্র ছিল, যথা জয়পুর, যোধপুর ও উদয়পুর। তন্মধ্যে জয়পুর ও যোধপুর সম্পূর্ণরূপে মোগল রাজশক্তির বশীভূত হইয়া গিয়াছিল কিন্তু উদয়পুরের অবস্থা আকবরের সময় হইতে সম্রাট শাহজাহানের শাসনকাল পর্যন্ত সর্বদাই পরিবর্তনশীল ও অত্যন্ত বিচিত্রময় পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। মোগল সৈন্য উদয়পুর আক্রমণে ধাবিত হইলে রাজা বশ্যতা স্বীকার ও সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইতেন। কিন্তু বিজয়ী মোগল সৈন্যের প্রত্যাবর্তনের সংগে সংগেই আবার সেই স্বাধীনতা ও বিদ্রোহাচারণের পূর্বমূর্তি ধারণ করিতেন।" এসলামাবাদী–আওরঙ্গজেব, আল এসলাম, আষাঢ়, ১৩২৪।

Dhaka University Institutional Repository

কারণে যুদ্ধ[১] এবং দ্বিতীয়তঃ চিতোরে প্রথম মসজিদের প্রতিষ্ঠা[২]। রাজসিংহ উপন্যাসে মুসলমানের অবমাননা হয়েছিল নূরউদ্দীন উপন্যাসে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে, শিরাজী এর সংগে সমকালীন রাজনীতি ও জীবনকেও যুক্ত করে তুলেছেন।

গুজরাট ও চিতোরের বিরোধের অন্যতম কারণ লেখক দেখিয়েছেন চিতোরের রাণা উদয়সিংহ কর্তৃক মুসলমানের গো-কোরবানীতে বাধা প্রদান, গো কোরবানীর অপরাধে চিতোরের একজন মুসলমান নাগরিক আহমদ রেজা খানের পুত্রকে কালীমন্দিরে বলিদানের মাধ্যমে শাস্তিপ্রদান। গুজরাট কর্তৃক চিতোর আক্রমণের এটাই উপলক্ষ।

বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম উপন্যাসে কাজির বিচারের প্রহসন দেখান হয়েছে। কাজী গঙ্গারামকে জীবন্ত সমাধি দেবার জন্য আদেশ দেন এবং সীতারাম শক্তিপ্রয়োগ করে গঙ্গারামকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।[৩] নূরউদ্দীন উপন্যাসে লেখক রেজা খানের পুত্রকে হত্যার জন্য উদয় সিংহের শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন এবং আহমদ খানের মাধ্যমে গো রক্ষার পবিত্রতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন।[৪] উপন্যাসের বহিরঙ্গে মনে হয় রাণা উদয়সিংহকে শাস্তি প্রদানের জন্যই উপন্যাসের অবতারণা। অসংগত রাণার কন্যার সংগে মুসলমান নূরউদ্দীনের প্রেম ও বিয়ে প্রায় শাস্তিতুল্য। সমকালীন রাজনীতিতে গো রক্ষাকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সংঘাত[৫] লেখক এ উপন্যাসে টেনে নিয়ে এসেছেন। রাণা উদয়সিংহকে যুদ্ধে পরাজিত করে কিন্তু ক্ষমতায় বহাল রেখেই অবাধ গো-কোরবানীর আদেশ জারী করা হয়েছে এবং চিতোরে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। রায়নন্দিনী উপন্যাসে প্রতাপাদিত্যের মত উদয়সিংহও কন্যা-জামাতাকে বরণ করে নেবার জন্য বেঁচে ছিলেন।[৬] অবশ্য প্রতাপাদিত্যের মত উদয়সিংহের সংগে লেখকের প্রতিযোগিতা বোধ এত প্রচণ্ড নয়, এবং সে কারণে প্রেমকাহিনীটিই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপন্যাসে একদিকে রয়েছে গুজরাট কর্তৃক চিতোর আক্রমণ ও বিজয়, অন্যদিকে মালবের সুলতান পুত্র নূরউদ্দীনের সংগে চিতোরের রানা উদয় সিংহের কন্যার বিরহমিলনের কাহিনী। দুটো অংশই প্রাধান্য পেয়েছে, তবে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি। প্রেম ও প্রার্থনায় দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য এ কাহিনীতে মালবের অবতারণা করা হয়েছে, অন্যথায় আহমদনগর-চিতোরের বিরোধে মালবের ভূমিকা থাকার কথা নয়। রাজসিংহের রূপনগর-

----

১। নূরউদ্দীন, শি-র, পৃঃ৩২২-২৫, ৩০৭-০৮।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ৩০৮।
৩। সীতারাম, ব-র, ১, পৃঃ৮৭৯-৮১।
৪। নূরউদ্দীন, শি-র, পৃঃ ৩২৩।
৫। পূর্বে, পৃঃ ২১-২২।
৬। নূরউদ্দীন, শি-র, পৃঃ৩০৬।

ইন্দুর-দিল্লার মতই এ উপন্যাসে আহমদনগর-চিতোর-মালবের বিরোধ মিলনের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট। আওরঙ্গজেবের অবমাননার আংশিক প্রতিকার হয়েছে অরুণ সিংহের স্ত্রীনাকে ব্যর্থতার মধ্যে।

দুই

নূরউদ্দীন উপন্যাসে রাজনন্দিনীর মত প্রনয় কাহিনী দুটি, নূরউদ্দীন-রুক্মিনী এবং নুরী খাঁ-স্বর্ণময়ী মুর্শিবাই। প্রথম কাহিনীটিতে আংশিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর ও রাজসিংহ উপন্যাসের প্রভাব পড়তে পারে, দ্বিতীয় উপাখ্যান দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস দ্বারা প্রভাবিত। এছাড়া চন্দ্রশেখর উপন্যাসে দুজন পুরুষের জন্য একজন প্রণয়ী, নূরউদ্দীন উপন্যাসেও রুক্মিনীর ক্ষেত্রে প্রায় সেরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসে রাজনন্দিনীর সংগে সাদৃশ্য আছে।

উপন্যাসের শুরু হয়েছে বাল্য প্রণয়ের মধুর মুহূর্তের মধ্য দিয়ে। লেখক বলেছেন, "এহেন মধুর ও সুন্দর প্রাতঃকালে চিতোরের রাজ-উদ্যানে দুইটি সুন্দর বালক-বালিকা মনোহর জলকুসুম-দাম-শোভিত সরোবর তীরে একটি হরিণশিশু লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। প্রভাত পবন নাচিয়া নাচিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বালারুণের হেমচ্ছটা দুইজনের মুখের উপর পড়িয়া এক অনির্বচনীয় শোভার সৃষ্টি করিয়াছে।" এবং "কুমারের একগাছি মালা বড় সুন্দর ছিল। কুমার তাহা গলা হইতে খুলিয়া কুমারীর গলায় পরাইয়া দিল। কুমারী তৎপরিবর্তে আর এক গাছি বেল ও গোলাপ গ্রথিত মালা হাসিতে হাসিতে কুমারের গলায় পরাইয়া দিল।"[১]

এর সংগে প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রণয়দৃশ্য তুলনীয়।[২] নূরউদ্দীন উপন্যাসে বাল্য প্রনয় রাজপুত্র ও রাজদুহিতার মধ্যে, আর চন্দ্রশেখর উপন্যাসে সাধারণ দুটি কিশোর কিশোরীর মধ্যে। উভয়তঃ প্রনয়দৃশ্য ঘটেছে সরোবর ও নদীতীরে। প্রতাপ শৈবলিনীকে পাননি, নূরউদ্দীন পেয়েছেন অনেক বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হবার পর। দুটো উপন্যাসের কাহিনী এক না হলেও চন্দ্রশেখর নূরউদ্দীনের মধ্যে ছায়া ফেলেছে। বাল্য প্রনয়ের ক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের বীরবাহু কাব্যের কনোজরাজপুত্র ও হেমলতা[৩], রমেশচন্দ্রের মাধবীকঙ্কন উপন্যাসে নরেন্দ্রনাথ ও হেমলতার[৪] সুদূর প্রভাব পড়াও অস্বাভাবিক নয়।

এরপর নূরউদ্দীনের সংগে রুক্মিনীর যখন সাক্ষাৎ হয়েছে উভয়েই তখন যৌবনপ্রাপ্ত। তাঁরা পরস্পরকে গ্রহণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মিলনে যে অনুরাগ সৃষ্টি হয়েছে তা বাহ্যিক, নূরউদ্দীন এবং

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৯-২০।
২। "বালিকা ক্ষুদ্র করপল্লবে তদুৎ সুকুমার বন্য কুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া বালকের গলায় পরাইল, আবার খুলিয়া লইয়া আপন কবরীতে পরাইল আবার খুলিয়া বালকের গলায় পরাইল।--এইরূপ ইহাদের সর্বদা হইত। কখন বা মালার বিনিময়ে বালক নীড় হইতে পক্ষিশাবক পাড়িয়া দিত, আমের সময় সুপক্ক আম্র পাড়িয়া দিত।" দ্র: চন্দ্রশেখর, ব-র, প্র, পৃঃ ৩৯৯।
৩। বীরবাহু কাব্য, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, ১৩৬০, পৃঃ ১১-১২।
৪। মাধবী কঙ্কন, রমেশ রচনা সম্ভার, পৃঃ ৩৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

জয়পুরের অরুণসিংহ দুজনেই রুক্মিণীর পাণিপ্রার্থী হয়েছেন। রুক্মিণীর বিয়েকে কেন্দ্র করে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারে লেখক মাইকেল মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকও আংশিকভাবে অনুসরণ করতে পারেন বলে মনে হয়।[১]

বিয়ের পর রুক্মিণী অরুণ সিংহের সংগে যাবার সময় জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেছেন, কাপালিক সন্ন্যাসী সর্বানন্দ স্বামী নিমজ্জিতা রুক্মিণীকে উদ্ধার করেছেন। উদ্ধার দৃশ্যটি গোবিন্দলাল কর্তৃক বারুণী পুকুর থেকে নিমজ্জিত রোহিণী উদ্ধারের[২] দৃশ্য আংশিকভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। সর্বানন্দের আশ্রয়ে মন্দিরে রুক্মিণীর অবস্থান কোন কোন দিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে মৃন্ময়ীর[৩] অনুরূপ। মৃন্ময়ীর মতই তিনি কাপালিক সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে লালিত পালিত হয়েছেন। সর্বানন্দ কর্তৃক রুক্মিণীকে বলিদানের প্রস্তুতি হিসাবে তিনি মহামায়ার ইচ্ছাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "আজ কয়দিন রাত্রি হতে গভীর নিশীথে আমি শুনতে পাচ্ছি যে, "মায় ভুখাহো" "মায় ভুখাহো"। সুতরাং রুক্মিণীকে বলিদান ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই।"[৪] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সরোজিনী নাটকে চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরে লক্ষণসিংহের জবানীতে দেবীর কণ্ঠস্বর টিকেই পিশাচী এখানে বসিয়ে দিয়েছেন। সরোজিনী নাটকে লক্ষণসিংহ দেখেছেন, দেবী আবির্ভূত হয়ে "ম্যায় ভুখাহোঁ" বলেই তাঁর রক্ত পিপাসা জ্ঞাপন করেছেন।[৫] রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি উপন্যাসে (১২৯০/ বিসর্জন ১২৯৭) ভুবনে কালী প্রতিমার সামনে বলিদান, রাজ্যোদয়ের আশঙ্কা এবং রঘুপতি চরিত্রের অস্পষ্ট ছায়া[৬] কাপালিকের ওপর পড়া অসম্ভব নয়।

নূরউদ্দীন উপন্যাসে দূরাগত আলোকদর্শন করে রুক্মিণীর সম্ভাব্য বধ্যস্থানের সন্ধান করে নিয়েছেন,[৭] কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে নবকুমার দীপালোক দেখেই কাপালিকের আশ্রম চিনতে পারেন।[৮] রমেশদত্তের মাধবী কঙ্কণ উপন্যাসে নরেন্দ্রনাথ আলোক দেখে কালীর মন্দিরে এসে উপনীত হন,[৯] প্রজ্বলিত মশালকাষ্ঠের আলোকে "কয়েকখানি পুস্তক, একখানি শোণিতাক্ত খড়্গ ও স্থানে স্থানে শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে"[১০] দেখেন। কাপালিকের হাত থেকে উদ্ধার পাবার পর নূরউদ্দীন ও রুক্মিণীর সম্মিলিত

১। কৃষ্ণকুমারী, মধুসূদন রচনাবলী, পৃঃ ৩৪০-৫০।
২। কৃষ্ণকান্তের উইল, বঙ্কিম-১, পৃঃ ৫৫৪।
৩। কপালকুণ্ডলা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫১।
৪। নূরউদ্দীন, দ্বি-র, পৃঃ ৩৭০।
৫। সরোজিনী নাটক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, ৫ম ভাগ, কলিকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃঃ ২০৮।
৬। রাজর্ষি, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫০, পৃঃ ৪১৪-২০।
৭। নূরউদ্দীন, দ্বি-র, পৃঃ ৩৭০।
৮। কপাল কুণ্ডলা, ব-র, ১, পৃঃ ১৪১-৪২।
৯। মাধবী কঙ্কণ, রমেশ রচনাসম্ভার, পৃঃ, ১৪৭।
১০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

অরণ্যবাসের রায়নন্দিনী উপন্যাসে প্রায় মাহতাব খাঁ অনুপবতীর অনুরূপ[১] এখানে কপাল কুণ্ডলার প্রভাবও পড়েছে ।

তিন

নূরউদ্দীন উপন্যাসে হিন্দু মুসলমানের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার একটি প্রসঙ্গ হল সন্ন্যাসী সর্বানন্দ স্বামী এবং মহামায়ার মন্দির।[২] কিন্তু এখানে সন্ন্যাসী সর্বানন্দ স্বামী এবং মন্দির উপন্যাস কাহিনীর অনিবার্য পরিণামের সঙ্গে মিশ্রিত। সিরাজী সচেতনভাবে অন্যান্য উপন্যাসের মত এখানেও পৌত্তলিকদের ধর্মবোধকে খাটো করতে চেয়েছিলেন, মন্দির সামনে নিয়ে মন্দিরের ইতিহাস, ধিক্‌মুখ হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসের ভ্রান্তিবিলাস এবং ইসলাম ধর্মের তুলনায় মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। লেখকের অব্যবহিত লক্ষ্য ছিল মন্দির ও প্রতিমার অসারতা প্রমাণ। সে কারণে কুমিল্লাকে উদ্ধার করার পর মুসা খাঁ "মন্দিরস্থ মহামায়ার মূর্তিটি সদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ" করলেন এবং পরে মূর্তি উপাসনার ভ্রম দূর হলে সন্ন্যাসী ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।[৩]

সিরাজীর প্রায় উপন্যাসেই এ রকম ধর্মান্তর গ্রহণের বা ধর্মের প্রতি তুলনার বিবরণ আছে। সুফিস সাধকের অপরাজেয় কোন কোন বাবের মত উপন্যাসের দুয়েকটি চরিত্র কখনো বীরত্ব প্রদর্শন করেন, আবার কখনো বা ঐশী শক্তির মহিমায় ইসলাম প্রচার করেছেন। প্রচারক জীবনে[৪] যেসব মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন তাদের অনুশীলনের পরিমণ্ডল এভাবে গঠিত ছিল বলে তাদের মনোরঞ্জনও বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য এসব প্রসঙ্গ পুনরাবৃত্ত হয়েছে। তাছাড়া শুদ্ধি আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াও ছিল। মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে শক্তিমান হিন্দু প্রতিবেশীর পরাজয় প্রত্যয় করতে চেয়েছে,[৫] প্রচারক ও সংস্কারক সিরাজীর পক্ষে তাঁদের দাবী মেটাবার আবশ্যকতা ছিল। একই কারণে হিন্দু নায়িকা মুসলমান নায়কের অনুরাগিনী হয়েছেন, প্রেমের জন্য জাতিধর্ম বিসর্জন দিয়েছেন, এবং মুসলমান প্রেমিকের ঐ ধর্ম গ্রহণ করে পরিণীতা হয়েছেন। কেবল তাই নয়, পূর্বকালের অবিশ্বাসের জীবনের জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন, তুলনামূলকভাবে পূর্বেকার ধর্ম বিশ্বাস অপেক্ষা এখনকার জীবন তাঁদের নিকট আলোকিত মনে হয়েছে। দীক্ষিত অবস্থায় তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মাচরণ করেছেন, অনেক সময় ইসলাম ধর্ম পালনে বাড়াবাড়িও করেছেন। এসবের মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলমান সমাজকে যেমন খুশী

১। পূর্বে, পৃঃ ১১৪-১৬।
২। নূরউদ্দীন, সি-র, পৃঃ১০৬০-৬৪।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ১০৭৬।
৪। পূর্বে, পৃঃ ৩৭-৫২।
৫। পূর্বে, প্রথম অধ্যায়।

করেছেন, তেমনি হিন্দু সমাজের কাছেও তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করতে চেয়েছেন যে, তাদের নতুন দীক্ষার মধ্যে কোন ফাঁক নেই, এবং সত্যের স্পর্শে তাঁদের মনোভাবনের মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। এ কারণে নূরউদ্দীন উপন্যাসে প্রতিমা ভাঙ্গা হয়েছে, ফিরোজা বেগম উপন্যাসে ভাঙ্গা হয়েছে তারাবাঈ উপন্যাসে শিবাজীর উপাস্য বিঠ্ঠলদেবের প্রতিমা চূর্ণ করা হয়েছে রায়নন্দিনী উপন্যাসে শিবমন্দিরের অবমাননা করা হয়েছে কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই প্রতিমা চূর্ণকারীর বা অবমাননাকারীর কোন ক্ষতি হয়নি বরং অবিশ্বাসীর হৃদয় টলে গেছে। উপন্যাসে এ ধরণের প্রতিযোগিতা সৃষ্টির ফলে লেখক প্রচারধর্মিতা এড়াতে পারেননি।

চার

উপন্যাসে অন্য কাহিনীটিতে চিতোরের সেনাপতি নুরী খাঁর সংগে উদয়পুরী বেগের কন্যা মুর্শিদাবাঈ এবং ভগ্নী হীরাবাঈয়ের প্রণয় বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দুর্গেশনন্দিনী ও রাজসিংহ উপন্যাসের প্রভাব পড়েছে। জগৎসিংহের মত নুরী খাঁও যুদ্ধে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন থেকেছেন। এবং তাকে সেবা করেছেন মুর্শিদাবাঈ ও হীরাবাঈ দুজনেই। দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে আয়েষা জগৎসিংহকে ভালবেসেছেন, জগৎসিংহ তিলোত্তমা পরস্পরকে ভালবেসেছেন। এখানেও হীরাবাঈ ভালবেসেছেন নুরী খাঁকে এবং নুরী খাঁও মুর্শিদাবাঈ দুজনেই পরস্পরকে ভালবাসতে পেরেছেন। নূরউদ্দীন উপন্যাসে মুর্শিদাবাঈ ও হীরাবাঈয়ের মধ্যে সম্পর্ক হল একজন উদয়পুরী বেগের কন্যা ও অন্যজন ভগ্নী, তারা একই প্রণয়পাত্রের জন্য প্রতিযোগী। রাজসিংহ উপন্যাসে একই মদন মন্দিরে এরকম প্রতিযোগিতার দৃশ্য আছে।[২]

উদয়পুরী বেগ মুর্শিদাবাঈকে নুরী খাঁর সংগে বিয়ে দিতে সম্মত ছিলেন[৩] কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়নি এবং চিতোরের সেনাপতিত্ব ত্যাগ করে রায়নন্দিনী উপন্যাসে মাহতাব খাঁর মত[৪] নূরগড়ে নূরউদ্দীনের চাকুরী, মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেন।[৫] মাহতাব খাঁর সংগে নুরী খাঁর অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। উভয়ক্ষেত্রেই তাঁরা সেনাপতি, ভিন্নধর্মী রাজকন্যার সংগে তাঁদের প্রেম [illegible] সংঘটিত হয়েছে। মাহতাব খাঁ স্বর্ণময়ীকে উদ্ধার করে ঈশা খাঁর সংগে মিলন সম্ভব করে তুলেছেন, নুরী খাঁও কাপালিকের হাত থেকে লুৎফিনাকে উদ্ধার করে নূরউদ্দীনের সংগে তাঁর মিলনকে সম্ভব করে তুলেছেন।

নূরউদ্দীন উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনা এবং প্রণয় কাহিনী প্রায় পাশাপাশি প্রবাহিত, কিন্তু দুটোর মধ্যে সংযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। নূরউদ্দীন ও লুৎফিনার প্রণয় কাহিনী, লুৎফিনার ধর্মান্তর গ্রহণ, বিবাহ ও নূরগড়ে তাঁদের রাজ্য সংস্থাপনকে কেন্দ্র করে উপন্যাস গড়ে উঠেছে। রাজসিংহ উপন্যাসের উপসংহার এখানে মাজেবের

১। নূরউদ্দীন, দি-র, পৃঃ ৩২১-৩০০।
২। রাজসিংহ, ব-র, ৩, পৃঃ ৬১৬।
৩। নূরউদ্দীন, দি-র, পৃঃ ১০৪৬।
৪। পূর্বে, পৃঃ ১১৫।
৫। নূরউদ্দীন, দি-র, পৃঃ ১০৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

যৌক্তিকতা নিরূপণ করে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই পরাজয় উদয়সিংহের নিয়তি নির্ধারিত ছিল, প্রথমে গুজরাটের সেনাবাহিনীর নিকট এবং পরে নিজের বিবেক ও আত্মার নিকট। কিন্তু যেহেতু মানব মূল্যবোধকে দিয়ে এ জয় পরাজয়ের সুযোগ ছিল না, সুতরাং এর মধ্যে গুজরাট এসেছে এবং সেখানে মুসলমানের ঐক্য-বোধ কিংবা সমীকরণের মূল্য প্রমাণিত হয়েছে। একারণেই পরাজিত চিতোর ও বিজয়ী গুজরাটের মধ্যে মানবের মধ্যস্থতার জন্যে চিতোরের রাজপুরী লুণ্ঠিত হয়নি।[১] এভাবে নূরউদ্দীন ও রুক্মিনীর প্রেমের মধ্যে যুদ্ধ এসেছে, সংঘাত এসেছে, বিরহ এসেছে এবং শেষে মিলনও হয়েছে। কিন্তু গুজরাট ও চিতোরের বিবাদের মধ্যে নূরউদ্দীন-রুক্মিনীর প্রণয়ের কোন সম্পর্ক প্রায় নেই, তাঁদের প্রণয়জীবনের সূচনাপর্বে এ সবের সামান্য আভাস পাওয়া যায়। উপন্যাসের শেষে নূরউদ্দীন-রুক্মিনীর উদ্ধার এবং নতুন রাজ্য নূরগড় প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে আহমদ শাহ কাহিনীর যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কারণে মনে হয় রাজনৈতিক বিরোধের সংগে হৃদয় ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। চিতোরের রাণা উদয়সিংহ সব সম্পত্তিকে মেনে নিয়েছেন, তাঁদের প্রচুর উপঢৌকন দিয়েছেন, নূরউদ্দীনের পিতা রোকনউদ্দীন নিজ রাজ্যের কিছু অংশ তাঁদের দিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলেছেন। কেবলমাত্র নূরউদ্দীন রুক্মিনীর মিলন নয়, রাজ্যপ্রতিষ্ঠাও লেখকের উদ্দেশ্য ছিল, শেষোক্তটির ব্যাপারে লেখকের সাফল্য আংশিক কিংবা সীমাবদ্ধ।

কোন কোন চরিত্র বিকাশের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা থাকলেও উপন্যাস কাহিনীর সংগে প্রায়ই তা সংগতি-পূর্ণ। অর্থাৎ মুখ্য চরিত্রগুলো তাদের সক্রিয় ভূমিকার মধ্য দিয়ে উপন্যাস কাহিনীর স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছে এবং চরিত্রগুলোও রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষে পরিণত হয়ে উপন্যাসের গতি ত্বরান্বিত করেছে।

পাঁচ

নূরউদ্দীন চরিত্রে দুটো বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, একদিকে তিনি প্রেমিক, যার সূচনা হয়েছে বর্ণাঢ্য বাল্য প্রণয় দিয়ে, অন্যদিকে তিনি বীর এবং যুদ্ধজয়ী, যার পরিণতিতে তিনি নূরগড় রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছেন। তবে নূর উদ্দীনের পক্ষে রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেয়ে প্রেমের দিকটিই অধিকতর বর্ণবহুল।

উপন্যাসের সূচনাতে নূরউদ্দীন রুক্মিনীর সংগে মাল্যবদল করেছেন, এর পরই দেখা যাচ্ছে যৌবন-সীমায় পদার্পণ করে নূরউদ্দীনের হৃদয় প্রেমের সৌরভে পরিপূর্ণ।[২] বিহার তরনীতে চাঁদের আলোয় নূর-উদ্দীন দেখলেন, রুক্মিনীর মুখাবয়ব কি অতুলনীয় মনোহর, চাঁদ বা সরোবর কারো সংগে তুলনীয় নয়।

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৭।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪২।

কৈশোরের খেলার সংগীর প্রতি নূরউদ্দীনের ভালবাসার মুগ্ধতা জন্মায়, তিনি এর মধ্যে নিজের হৃদয়ের ভালবাসাকেই আবিষ্কার করে নিলেন। নূরউদ্দীনের প্রেম অনেকটা মা-র প্রতি, প্রেমাস্পদের প্রতি ভালবাসাকেই তিনি ভালবেসে ফেলেছেন, ভালবাসার জন্য প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন। এ কারণে নূরউদ্দীন যখন প্রেমের জন্য কারাবরণ করেছেন, মনে হয় নিজ হৃদয়ের প্রেমের প্রতি মুগ্ধ হয়ে কারাবরণের দুঃখকে তিনি বিস্মৃত হয়ে গেছেন। জ্যোৎস্নালোকিত রাতে রুক্মিনীর উজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে নূরউদ্দীন প্রণয়রসে নিমজ্জিত হয়েছেন। রুক্মিনী নূরউদ্দীনের প্রেমের প্রতীক হয়ে উঠেছেন, এবং রুক্মিনীর প্রতিকৃতির মধ্যেই তিনি তাঁর সমগ্র জীবনের ভালবাসার বেদনা কিংবা আনন্দ প্রতিফলিত দেখেছেন। জ্যোৎস্না মাখা রজনীতে সরোবরে প্রমোদতরীতে হৃদয়ের কথা তাঁরা দুজনকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। চঞ্চল মদীর রুক্মিনীর বক্ষের বসন বিমুক্ত করে দিয়েছে, "শিশিরভারাবনত-বৃন্তক পুষ্পকলিকার ন্যায় অবনত-মুখ" নূরউদ্দীনের সংগে ব্রীড়াবনত রুক্মিনীর বিরহিত হৃদয়ের মধুর সংযোগ ঘটেছে। নূরউদ্দীন তাঁর প্রেমকে দার্শনিকতামণ্ডিত করেছেন। রাজবধূ প্রথম যৌবনে রুক্মিনী প্রেমের প্রতিদান দিয়েছেন নীরব চোখের ভাষায়, অধরে অধর স্থাপন করে। [illegible] গ্রহণ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন।[২]

বাসায়নঃ নূরউদ্দীন ও রুক্মিনী উভয়ের জীবনকেই মহিমান্বিত করেছে। লেখক অচেতনভাবে হিন্দু

Dhaka University Institutional Repository

রমনীকে সুদনমধ্যা নায়কের প্রেমাকাঙ্ক্ষী করে তুলতে চেয়েছেন কিন্তু বস্তুতঃ নূরউদ্দীন নিজেই "মজনু" হয়েছেন। উভয়ের প্রেমের মধ্যে প্রতিজ্ঞাপালন মুখ্য হলেও প্রেমের স্বার্থে তাঁদের সম্প্রদায়গত পরিচয় অবলুপ্ত হয়েছে, তাঁরা চিরকালের প্রেমভারাক্রান্ত মানব মানবী হয়ে উঠেছেন। লায়লী-মজনুর মত তাঁদের প্রেমের মধ্যে চিরকালীন সু মানুষের বিরহ মিলনের বেদনা প্রতিভাত।

নূরউদ্দীন ও রুকিনীর মিলনের মধ্যে সংঘাত এসেছে বাইরে থেকে। তবে এ সংঘাত যেমন নিয়তি নির্ধারিত ছিল, তেমনি সমস্যার উত্তরণও নিয়তি নির্দেশিত উপায়েই হয়েছে। পুরুষকারের মত নূরউদ্দীন ভাগ্যকে আপন অধিকারে আনতে পারেননি, সে ইচ্ছার প্রকাশও কোথাও ঘটেনি। সেজন্য দেখা যায়, অনুপদিত্যের সংগে বিয়ে হবার সময় নূরউদ্দীন কোন বিদ্রোহ করেননি, কিন্তু পরে সংঘর্ষে গেছেন নিতান্ত বাধ্য হয়ে। তিনি শত্রু হবার চেষ্টা করেননি, এবং অন্তরে নিজের বেদনায় নিজেই পুড়েছেন। প্রচলিত লায়লী মজনু[৩] উপাখ্যানের নায়কের মত বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করেই মহৎ হয়ে উঠতে চেয়েছেন, সমাজের নিকট সেভাবেই আদর্শ স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। যন্ত্রণায় এ দহনক্রিয়ার মধ্যে একটি মধুর ভাবও বিদ্যমান। নূরউদ্দীনের নিকট রুকিনী বিরহ বেদনা সুখানুভবের প্রতীকমাত্র। রুকিনীকে পাবার চেয়েও আত্মগত বেদনার সুখানুভূতি এখানে মুখ্য হয়েছে। নূরউদ্দীন নিজে সে বেদনায় পুড়ে প্রেমের গরীমায়

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩০।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৪।
৩। দ্রষ্টব্য, আহমদ শরীফ (সম্পাদিত) -দৌলত উজির বাহরাম খান বিরচিত লায়লী-মজনু, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

উত্তীর্ণ হয়েছেন, রুক্মিনীও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং প্রেমিক ও প্রেমিকা উভয়েই কঠিন তপস্যায় জীবন যাপন করে একেবারে খাঁটি হয়ে উঠেছেন। এখানে প্রেম সম্পর্কেও লেখকের ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেম পৃথিবীর মলিন ধূলিকেও পদ্মেবর্ণে রঞ্জিত করে দিয়ে যায়, এ প্রেমে ভোগের চেয়ে ত্যাগ বেশী সেজন্য নূরউদ্দীনকে রাজ্যলোভ আকৃষ্ট করেনি। কিন্তু এ প্রেম পার্থিব জীবনের সংগে প্রায়ই যুক্ত নয়, সুখ, দুঃখ বাসনার বেদনা জড়িত প্রেম নয়, এ কেবল প্রেম নামক একটি অভিজ্ঞতা, প্রেমের জন্য প্রতিজ্ঞাপূরণ।[১] লেখকের দৃষ্টিতে এ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই নূরউদ্দীনের মানব জন্ম সম্পূর্ণ। প্রেমের এ আদর্শ ছিল বলেই নূরউদ্দীন নিজের মধ্যে জয় করে নেবার শক্তির পরিবর্তে আত্মনিগ্রহের শক্তিকেই ক্রমাগত নির্ভর করেছেন, পতিব্রতা বলে আদর্শ সতী নারীকুলশ্রেষ্ঠা সীতার অনুসন্ধানরত "পুন্যবতার শ্রীরামচন্দ্রের" মত দুঃখ কষ্ট ও পীড়ন স্বীকার করে তিনি প্রেমাস্পদের সন্ধানে বের হয়েছেন।[২]

নূরউদ্দীনের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হল শিপ্রাতটের অরণ্যে রুক্মিনীর সংগে পুনর্মিলনের পর। তাঁরা মিলন মুহূর্তে উভয়েই ক্রন্দন করলেন এবং প্রকৃতির মধ্যে সে ক্রন্দন প্রতিধ্বনিত হয়।[৩] লেখক নিজেও কান পেতে নূরউদ্দীন-রুক্মিনীর মিলনের আনন্দধ্বনি শুনেছিলেন, এ আনন্দকে প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে যেতে দেখেছিলেন। সেজন্য বিপুল দুঃখ যাতনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেই শিপ্রাতটের মিলন যোজনায় তিনি উদ্দেশ্য উপস্থিত করেছেন। নূরউদ্দীন রুক্মিনীর বিরহ মিলন লেখকের নিজেরও একটি সুখ-বিলাস, বেদনায় দগ্ধ না হলে মিলন হয় না কিংবা সে মিলন পবিত্র ও মধুর হয় না। শিরাজীর চারটি উপন্যাসেই এটা প্রায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে। নূরউদ্দীনের প্রেমে এ আদর্শবাদ ছিল বলে কারাযন্ত্রণা তাঁর প্রতিজ্ঞা ভাঙতে পারেনি,[৪] আহমদ শাহের কন্যা নূরন্নেহারের সংগে বিয়ের চেষ্টা সফল হয়নি। এমন কি সুন্দরী বিলাসিনী রূপবতী মেয়েদের দিয়ে তাঁর মন ভোলাবার চেষ্টাও বিফল হয়েছে, নূরউদ্দীনের মাতা মনে করেছেন এটা প্রতিজ্ঞা পালন।[৫] রাজত্যাগী, সংসারত্যাগী বৈরিকবাস পরিহিত সুদর্শন নবীন যুবক ফকির নূরউদ্দীন অরণ্যবাসের জীবনকে বেছে নিয়েছেন, মাহতাব খাঁর মত অরণ্য পাতার মর্মর, পাখীর কলরব এবং দূরে নদীর স্রোত-ধারায় মধুর ঝংকারে প্রকৃতির কবিতা অনুভব করেছেন। তাঁদের মিলন বিরহের মধ্যে লেখক হাসিকান্নাও রোদবৃষ্টির খেলা দেখেছেন। তাঁদের অরণ্যবাস ঠিক উপন্যাসের প্রয়োজনে নয়, বরং লেখকের কবি হৃদয়ের মধুর সৌন্দর্য পিপাসা চরিতার্থ করবার জন্যই সৃষ্ট, এ কারণে নূরউদ্দীন আর মানবে ফিরতে চাননি।[৬]

১। নূরউদ্দীন, দি-র, পৃঃ ৩৬৯।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৯।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৪।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৩-৫৫।
৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৩।
৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

নুরউদ্দীন রুফিনীর বাল্যপ্রণয়ের মাধুর্য অরণ্যের পটভূমিতে নতুন সৌরভ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে।[১] বর্ধমানু-ষিত ও বিবাহিত নুরউদ্দীন - রুফিনীর অরণ্যজীবন প্রায় তপোবনের আদর্শে সৃষ্ট, এ অংশে রুফিনীও প্রায় প্রতিমূর্ত শকুন্তলার প্রতিরূপ।

বিক্রমহীন রাজকুমারের প্রেম অসম্পূর্ণ বলে শিরাজী নুরউদ্দীনের বীর্যবত্তার পরিচয়ও দিয়েছেন। বিশেষতঃ ভবিষ্যৎ নুরগড় রাজ্যের অধিকর্তা নুরউদ্দীন তাঁর সাহস ও শক্তির পরিচয় হিসাবে কুঠার দিয়ে বাঘিনীকে হত্যা করে আহমদ শাহকে রক্ষা করেছেন।[২] নুরউদ্দীনের অধিকার থেকে রুফিনীকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলে অরুণসিংহের সংগে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়েছে, নুরউদ্দীন বিপুল সাহসের সংগে যুদ্ধ করেছেন এবং রুমী শাহর উপস্থিতির ফলে বিজয় সুনিশ্চিত হয়েছে।[৩] প্রেমের ক্ষেত্রে নুরউদ্দীন ও রুফিনীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী অরুণসিংহের প্রসংগ না থাকলে তাঁদের দ্বন্দ্বহীন জীবন উপন্যাসের প্রায় অনুপযোগী হয়ে পড়তে পারত। প্রেমের যে তীব্র সাহসের কথা নুরউদ্দীন মুখে বলেছেন, তার পরিচয় কষ্টসহিষ্ণুতা, কিংবা আত্মপীড়নের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু উপলব্ধিতে নেই। রুফিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখকের সৌন্দর্য পিপাসা চরিতার্থ হয়েছে। রুফিনীকে লেখক সৃষ্টি করেছেন সৌন্দর্য দিয়ে, প্রেম দিয়ে এবং আদর্শ দিয়ে। সেকারণে প্রেম ও সৌন্দর্যের মধ্যে তাঁর চরিত্রের বিকাশ পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

ছয়

রুফিনী চরিত্রের চারটি পর্যায়, কৈশোর ও প্রথম যৌবনে নুরউদ্দীনের সংগে প্রণয়কাল, অরুণসিংহের সংগে বিবাহ ও জয়পুর যাত্রা, জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাবার পর অরণ্যে কাপালিকের আশ্রয়ে অবস্থান, এবং নুরউদ্দীনের সংগে পুনর্মিলন ও বিয়ে, অরণ্যবাস, সমাজ ও রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

রুফিনী বিশেষভাবে প্রেমের জন্যই সৃষ্ট, লেখক তাঁকে অরণ্যে, সংসারে এবং শেষে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রথম পর্যায়ে তাঁর চরিত্রের বিকাশ হয়েছে বাধামুক্ত, কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। উভয়ের পিতামাতার, বিশেষ করে মাতার সম্মতিক্রমেই তাঁরা একত্রিত হয়ে জীবনকে পরিকল্পিত করে নিয়েছেন। নুরউদ্দীনের মত রুফিনীর প্রেমও ছিল মুক্ত ও প্রতিক্রিয়াহীন।[৪] এ প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই রুফিনী সকল

১। "সরোবরের নির্মল জলে নুরউদ্দীন ও রুফিনী অবগাহন করিয়া [redacted] স্নান করিতেন, সাঁতার কাটিতেন, কমলফুল তুলিতেন। --ময়ূর ময়ূরাপুলি প্রতিদিন সকালে আশ্রমে আহারের জন্য আগমন করিত, শস্যের দানা খাইয়া তাহারা আনন্দ প্রকাশ করিত-- রুফিনী যখন সুহস্তরোপিত পুষ্পবৃক্ষ হইতে ফুল চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া নুরউদ্দীনের গলায় পরাইয়া দিত তখন নুরউদ্দীনের চেহারায় নুর আলো ফুটিয়া উঠিত। সে নুরের দীপনায় রুফিনার হৃদয় আরও দীপ্ত হইয়া উঠিত।" প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮১-২।

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮৫।

৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯২-৯৩।

৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকার নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন, এমন কি কাপালিক সন্ন্যাসী কর্তৃক প্রাণ সংহারের মুহূর্তেও রুক্মিনীর মনে হয়েছে, জীবনে বিরহ যন্ত্রনা উপশম করার এটা অন্যতম অবলম্বন। এবং একারণে নিজের জীবনের প্রতি নির্মম হয়েছেন, আত্মনিগ্রহ করেছেন।[১]

নুরউন্নেসার মত রুক্মিনীর জীবনে সংঘাত বাইরে থেকে আসলেও তা দু'পেই রুক্মিনীর অন্তর স্পর্শ করেছিল এবং তাঁর অন্তরকেও ক্ষত বিক্ষত করে তুলেছিল, এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা ও উজ্জ্বলতা। অনুপসিংহ রুক্মিনীকে বিয়ে করতে চাইলে রুক্মিনীর পিতা তাতে সম্মতি দিয়েছেন, মুসলমানের চেয়ে হিন্দুই হিন্দু কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র।

নিজের ইচ্ছার বাইরে বিয়ে হলেও রুক্মিনী তার স্বামী অনুপসিংহের সংগে যেতে সম্মত হননি। রুক্মিনীর সামনে দ্বন্দ্বের কারণ দাঁড়াল দুটো, নুরউন্নেসার প্রতি প্রেম ও প্রতিশ্রুতিকে রক্ষা করতে হবে, অথবা অনুপসিংহের সংগে গমন করতে হবে। এর সংগে পিতা উদয় সিংহের সম্মান এমন কি প্রাণরক্ষার প্রশ্নও জড়িত হয়ে গেল। কারণ রুক্মিনীকে না দিলে অনুপসিংহ শক্রর সংগে যুক্ত হবেন, আর তাঁদের সংগে যুদ্ধ করতে হলে সম্মান বিনষ্ট হবে, এবং এভাবে সম্মান হারানোর চেয়ে প্রাণবিসর্জন দেয়াই শ্রেয়। এ দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে রুক্মিনী চরিত্রের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু রুক্মিনী তাঁর পিতার সম্মান ও প্রাণের আশংকায় সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত করে অনুপসিংহের সংগে যেতে সম্মত হয়েছেন। রুক্মিনীর জন্য একটি চরম সংকটের ক্ষণ উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু লেখক তাঁকে ব্যবহার করতে পারেননি। সিরাজীর প্রায় উপন্যাসেই আদর্শায়িত চরিত্রগুলো অন্তরের চূড়ান্ত সংঘাত মুহূর্তে এসে দুর্বল হয়ে পড়েছেন, ফলে সংঘাত অন্তর থেকে বাইরে এসেছে, কষ্ট সহিষ্ণুতাকেই আদর্শ করে তুলতে হয়েছে। রুক্মিনী চরিত্র উৎকর্ষে পরিণত হয়েছে, কিন্তু ব্যক্তিত্বে বিভূষিত নয়। সিরাজীর অন্যান্য হিন্দু রমণী চরিত্রের তুলনায় রুক্মিনী শক্তিহীন। স্বর্ণময়ী সমাজের অপেক্ষা করেননি, তারাবাঈও নয়, কিন্তু রুক্মিনী তা পারেননি। এমন কি উদয়-উদয়সিংহ নুরউন্নেসাকে যখন কন্যা সমর্পণ করলেন না, রুক্মিনী তখনো পিতার অনুগত থেকেছেন এবং পিতার ইচ্ছাকেই মেনে নিয়ে সকল সংকটের অবসান ঘটিয়েছেন। সিরাজীর অন্যান্য রমণী চরিত্র যেখানে প্রেম ও বীর্যে মহীয়ান, রুক্মিনী সে তুলনায় সহিষ্ণুতায় প্রতিমূর্তি। মুসলিম প্রেমোপাখ্যানের চরিত্র লায়লীর মত লেখক রুক্মিনীর যন্ত্রনা এবং সহিষ্ণুতাকেই সুন্দর করে তুলেছেন। রুক্মিনীর এ যন্ত্রনা অনিবার্য ছিল, কিন্তু অবমাননা নয়। সে কারণে অনুপসিংহের প্রেমের কৌশল ব্যর্থ হল, এমনকি তাঁর অবমাননা, কিংবা তাদের সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ওঠার আগেই তাঁকে রক্ষা করেছে বন্ধু ও জনোচ্ছাস। নায়ক নায়িকার সমাপ্তিহীন মিলন লেখক অনুমোদন করেননি, সেকারণে অনুপসিংহের হাতে তাঁর সম্ভাবনা নির্বাপিত হবার আগেই সর্বানন্দ স্বামীর আশ্রমে তিনি উপনীত হয়েছেন।

১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭১-২।

Dhaka University Institutional Repository

সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে রুক্মিণীর সৌন্দর্য কিংবা লাবণ্য বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অরণ্যের মধ্যে স্নিগ্ধ রূপসৌন্দর্য প্রতিমার মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন রুক্মিণী, কিন্তু নারী বলে তাঁর যৌবনের উত্তাপ চাপা থাকেনি। এক বৈশাখ প্রত্যুষে স্নানরত বিবসনা রুক্মিণী সর্বানন্দের প্রাণ চঞ্চল করেছেন।[১] শিষ্যদের কেউ কেউ দুর্বলতা বোধ করছিলেন বলে তাঁকে মহামায়ার পূজায় উৎসর্গ করে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এ কেবল পূজার উৎসর্গ নয়, নিজের এবং শিষ্যদের দুর্বলতার হাত থেকে মুক্তি অর্জনের জন্যও এটা প্রয়োজন হয়েছিল। সুতরাং সর্বানন্দ একবার কন্যাসম স্নেহে তাঁকে লালন করেছিলেন আবার নিজ হৃদয়ের বাসনার দায় থেকে মুক্তি পাবার জন্যই তাঁকে বলিদানের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। রুক্মিণী এখানে নিমিত্তমাত্র, রুক্মিণীকে নিয়ে, তাঁর অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নিয়ে লেখক নিজের সঙ্গেই সংগ্রাম করেছেন, এবং রুক্মিণী আরো সুন্দর হয়ে উঠেছেন। সর্বানন্দের আশ্রম রুক্মিণীর লালন ক্ষেত্র, অরুণসিংহের অধিকার থেকে রক্ষা পাবার জন্য নিশ্চিত ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল। সিরাজী রুক্মিণীকে কামনার অতীত করে তুলতে চাইলেও উত্তাপ তাঁকে স্পর্শ করেছে, এবং তিনি সে উত্তাপকে ব্যর্থ করতে চেয়েছেন বলিদানের আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে। বলিদানের পূর্বমুহূর্তে মুসা খাঁ ও নূরউদ্দীনের দ্বারা রুক্মিণী উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছেন। অরণ্যে রুক্মিণীর চরিত্র দু ভাবে বিকশিত—প্রথমে সর্বানন্দের আশ্রয়ে এবং পরে ধর্মান্তরিত নলিনারূপে তাঁদের বৈবাহিক জীবনে। অরুণসিংহ তাঁদের দুজনের মধ্যে অন্তরায়রূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁদের মিলনের মাধুর্যকেই বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। অরুণসিংহের সঙ্গে বিয়ের পর চিত্রাভটের জলোচ্ছ্বাস তাঁকে রক্ষা করেছিল, নূরউদ্দীনের সঙ্গে বিয়ের পর চিত্রাভটের গভীর অরণ্য তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে। সর্বানন্দের আশ্রমেই প্রকৃতির সঙ্গে রুক্মিণীর সাক্ষাৎকার, প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার প্রতিদান পেয়েছেন তিনি নূরউদ্দীনের সঙ্গে সম্মিলিত জীবনযাপনে। এ সম্পর্ক এত নিবিড় হয়েছে যে, প্রকৃতির এ অনুপম ও সুষমার আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং প্রার্থনাময় জীবন উপেক্ষা করে তাঁরা লোকালয়ে ফিরতে চাননি। এ পর্যায়ে রুক্মিণী ভালবাসার তপস্যায় উজ্জ্বল, সহিষ্ণুতায় তুলনাবিহীন। সিরাজীর উপন্যাসের আর কোন নায়িকা প্রেমের জন্য এত নিগ্রহ সহ্য করেনি। অরুণসিংহের সঙ্গে বিয়ের পর রুক্মিণী নিজের হৃদয় জুড়ে যেভাবে ভালবাসার বেদনা অনুভব করেছিলেন, নূরউদ্দীনের সঙ্গে মিলনের পর সে আনন্দ ও বেদনা বিপুল অনুভূতিময় কবিতায় পরিণত হয়েছে। রুক্মিণী এবং নূরউদ্দীনের জীবন অরণ্যে আনন্দময় কবিতার উপযুক্ত, রাজ্যশাসনের জন্য তেমন নয়। সেজন্য মনে হয়, নূরউদ্দীনের ভবিষ্যৎ দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করেই লেখক আহমদ শাহের মাধ্যমে তাঁকে উদ্ধার করে নূরগড়ে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

পাত্র

অরুণসিংহ ও মুসা খাঁর ভূমিকা উপন্যাসে অপ্রধান হলেও উজ্জ্বল। অরুণসিংহ ভাগ্যকে মানতে চাননি রুক্মিণীকে প্রায় জোরপূর্বক বিয়ে করে এবং নিজের সঙ্গে যেতে বাধ্য করে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেছেন। কিন্তু ভাগ্য

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬২-৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর প্রতিকূল ছিল বলে জগোৎসুয়েলে লুৎফুন্নিসাকে হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন। এর পরেও লুৎফুন্নিসা মুরাউদ্দীনের অরণ্যচারীকালে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন অরুণসিংহ, তিনি স্বাধীনতার অনিবার্য দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে কতলু খাঁর ওসমান জগৎসিংহের সংগে যুদ্ধ করেছেন।[২] অরুণসিংহও হিংসায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে লুৎফুন্নিসাকে লাভের বাসনায় যুদ্ধ করেছেন। ওসমানের মত তিনিও স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন। উপন্যাসে ভূমিকা অত্যন্ত কম হলেও পুরুষকারের মত তিনি নিয়তিকে জয় করে নিতে চেয়ে উন্মুখ হয়ে উঠেছেন।

রুস্তম খাঁ চরিত্রের সংগে ইতিহাসের কোন যোগ নেই। রাজসিংহ উপন্যাসের মাহতাব খাঁর সংগে তাঁর কিছুটা সাদৃশ্য আছে, নুরউদ্দীনের সংগে লুৎফুন্নিসার মিলনকে তিনিই সম্ভব করে তুলেছেন। তিনি সন্ন্যাসী সর্বানন্দ ও অরুণসিংহের রোষ থেকে লুৎফুন্নিসাকে উদ্ধারের নিমিত্ত হয়ে উঠেছেন এবং তাঁর উপস্থিতির ফলেই উপন্যাসের বাঞ্ছিত পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

রুস্তম খাঁর অন্য পরিচয় তিনি প্রেমিক, উদয়সিংহের কন্যা দুর্গাবাঈয়ের সংগে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। উদয়সিংহও রুস্তম খাঁর সংগে দুর্গাবাঈয়ের বিয়ে দিতে সম্মত ছিলেন।[৩]

গুজরাটের সংগে যুদ্ধে আহত রুস্তম খাঁ দুর্গাবাঈয়ের নিকট থেকে সেবা পেয়েছেন, উদয়সিংহের বিধবা ভগ্নী হীরাবাঈও তাঁর প্রেম প্রার্থী হয়ে উঠেছেন। রাণী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, বেশীদিন রুস্তম খাঁকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রে রুস্তম খাঁর কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। 'রুস্তম খাঁ নিজের চেয়ে, প্রভুর চেয়ে প্রভুকন্যার কল্যাণের দিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন, উদয়সিংহের সেনাপতির চাকুরী করেও নুরউদ্দীন ও লুৎফুন্নিসার মিলন ঘটানোর চেষ্টা অনেক বেশী করেছেন। এর পুরস্কারও পেয়েছেন, তিনি নুরগড় রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রেম নয়, রাজ্যের দায়িত্ব পালনেই তিনি অনেক বেশী উপযুক্ত, এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে কোন অসংলগ্নতা নেই।

রাণা উদয়সিংহের আবির্ভাব স্বল্পপরিসরে হলেও উপন্যাসে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একাধারে স্নেহশীল পিতা এবং হিন্দু রাজ্য চিতোরের রক্ষক। চিতোরকে তিনি পুরোপুরি রক্ষা করতে পারেননি কিন্তু বিপুল শৌর্যবীর্য ও আত্মসম্মানের পরিচয় দিতে পেরেছেন। মোহাম্মদ বেগড়ার আহমদ বেজা খানের শাস্তি দেবার কারণেই তিনি গুজরাটের সংগে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন, কিন্তু বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত অপমানজনক শর্তে গুজরাটের নিকট আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হননি।[৪]

উদয়সিংহের মধ্যে রাজসিংহ উপন্যাসের প্রতাপাদিত্যের ছায়া পড়লেও তিনি প্রতাপাদিত্যের অনেক উর্ধে উঠে এসেছেন। শিরাজী চেয়েছিলেন উদয়সিংহকে প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী হিসাবে চিহ্নিত করতে এবং উপন্যাস কাহিনীর

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯০।
২। "ওসমান কহিলেন, "আমরা পাঠান-অনুঃকরণ প্রজ্জ্বলিত হইলে উচিতানুচিত বিবেচনা করি না, এই পৃথিবীর মধ্যে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থান হয় না, একজন এইখানে প্রাণত্যাগ করিব।" দুর্গেশনন্দিনী, ব-র, প্র, পৃঃ ১২৯।
৩। নুরউদ্দীন, শি-র, পৃঃ ৩৪৫-৪৬।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৭-৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে তাঁর পরাজয়কে চূড়ান্ত করে তুলতে। উদয়সিংহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন একথা সত্য, কিন্তু তা অতিক্রম করে গেছে তাঁর পিতৃস্নেহে আর্দ্র হৃদয়, যিনি কন্যার মুখের দিকে চেয়ে সিদ্ধান্তকে পুনর্বার পরিবর্তন করতেও সম্মত ছিলেন, এমন কি বিবাহিতা কন্যাকেও না দিয়ে জামাতা অসুগণি থেকে ফিরিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন পারেননি অনিচ্ছুক কন্যাকে জামাতার হাতে তুলে দিতে, তেমনি পারেননি কলঙ্ক ও অপমানের ভয়ে জামাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। ফলে আত্মদমন ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় ছিল না এবং সেজন্যই তিনি প্রস্তুত হয়েছিলেন। কন্যা রুক্মিণী স্বামীগৃহে যেতে সম্মত হয়ে এ পরিস্থিতি থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন।

গুজরাটের আহমদ শাহের সঙ্গে তিনি যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন, চিতোরের বিজিত অংশটুকু নুরগড় রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আহমদ শাহ নুরউদ্দীনকে দান করেছেন।[১] উপন্যাসের শেষে জামাতার নবরাজ্য প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উদয়সিংহকে উপঢৌকন দিতে হয়েছে।[২]

রাণা উদয়সিংহ অন্তরের ভিতরে ও বাইরে বিপুলভাবে পরাজিত হয়েছেন। এতবড় পরাজয় যেকারণে তা হল, উদয়সিংহ হিন্দু, তিনি চিতোর রাজ্যে মুসলমানের ধর্মপালনে বাধা দিয়ে প্রজার প্রতি ন্যায়বিচার ক্ষুন্ন করেছেন এবং নুরউদ্দীনকে কন্যাদান করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করেছেন। কিন্তু উদয়সিংহের এ পরাজয় বাহ্যিক, এসব কিছুকে অতিক্রম করে গেছে তার পিতৃহৃদয় যিনি মমতা ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শেষ পর্যন্ত স্নেহের নিকটেই পরাজিত হয়েছেন। এবং এ পরাজয়টুকুই সমস্ত উপন্যাসে অন্যান্য চরিত্রের তুলনায় উদয়সিংহকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। এখনও সংশয় উপস্থিত হতে পারে যে, উপন্যাসে লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্যসাধক কে ছিলেন, উদয়সিংহ না নুরউদ্দীন? উদয়সিংহের হৃতশুদ্ধ অবলম্বনে নুরউদ্দীনের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন, তাঁর পরাজয়ের অবলম্বনেই নুরউদ্দীনের নবরাজ্য নুরগড়ের সৌধ মালা নির্মিত। লেখকের সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং উপন্যাসে বহু মানুষের কোলাহলকে অতিক্রম করে, লেখকের সচেতন অভিপ্রায়কে পরাজিত করে নুরউদ্দীন উপন্যাসে অন্যতম যে একটি চরিত্র জীবনের উজ্জ্বলতায় চিহ্নিত তা হল উদয়সিংহ।

নুরউদ্দীন উপন্যাসের কাহিনী এসব চরিত্রের বিকাশের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছে এবং একটি আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি সৃষ্টি করতে পেরেছে মোটামুটিভাবে এখানেই এ উপন্যাসের সার্থকতা।

আট

শিরাজীর সমস্ত উপন্যাসের কাহিনী বিকশিত হয়েছে ন্যায় ও অন্যায়ের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। সামাজিক কল্যাণ চিন্তা যুক্ত থাকার ফলে ন্যায় পক্ষের সংঘাতে অন্যায়ের প্রতিষ্ঠা দান করা লেখকের পক্ষে সম্ভব ছিলনা।

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৩।

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৮।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু শিল্পসৃষ্টির ভালমন্দের সংগে সামাজিক ভালমন্দের সম্পর্ক সর্বত্র এক রকমের নয়। যদে শিরাজীর নিজের মধ্যেই স্রষ্টা ও প্রচারকের দ্বন্দ্ব[১] উপস্থিত হয়েছে, উপন্যাসের মধ্যে এ বিরোধটি সবচেয়ে স্পষ্ট, তাঁর দ্বিধাবিভক্ত স্বরূপটি এখানেই সবচেয়ে বেশী বর্ণাঢ্য। বাহ্যতঃ যেসব দৃশ্য কিংবা চরিত্র তিনি ফোটাতে চেয়েছেন, অন্তরে সেগুলো অনেকাংশে লেখকের ভক্তি ও ভালবাসাকে আকর্ষণ করেছে।

রায়নন্দিনী, তারাবাঈ উপন্যাস ছাড়া বাকী তিনটি উপন্যাসই মিলনান্তক। শিরাজী মিলনের মধ্য দিয়েই জীবনের সুর ও ছন্দকে অনুভব করেছেন, বিরহের দীর্ঘশ্বাসকে পরিহার করেছেন। এর মধ্যে শিল্পীচিত্তের প্রকৃতি পরিস্ফুট, কিন্তু তা সত্ত্বেও পারিপার্শ্বিকতা কম দায়ী নয়। কেবলমাত্র ফিরোজা বেগম উপন্যাস ছাড়া বাকী তিনটি উপন্যাসে নায়ক মুসলমান, নায়িকা হিন্দু। হিন্দু নায়িকা মুসলমান নায়কের জন্য ধর্মত্যাগ করে পরিণীতা হয়েছেন। সেকারণে বাঞ্ছিত মিলন হয়েছে।

ফিরোজা বেগম উপন্যাস ছাড়া বাকী সর্বত্রই লেখক প্রেমকে বড় করে দেখেছেন, জীবনকে রোমান্টিক ও আদর্শায়িত করে তুলেছেন। শিরাজীর সমগ্র সাহিত্যেই একারণে আদর্শভাব বেশী। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে মোটামুটিভাবে দুটো বৈশিষ্ট্য নিয়ে পৃথক করা যায়, এক-প্রণয় ও জীবন দুখার নিবারণ, দুই-সামাজিক রাজনৈতিক আদর্শস্মৃতি —যুদ্ধে বীর্যে, ধর্মে, রাজ্য পরিচালনায়, সমাজ সেবা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কর্মে। হিন্দু সম্প্রদায়ের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতাবোধও ছিল। লেখকের আত্যন্তিক অচেতনতার ফলে আদর্শগুলো প্রায় টাইপ আকারে পরিণত হয়েছে। আদর্শ মুসলমান রমনী চরিত্র অন্তরে নিষ্ক্রিয়, অন্যদিকে ভালবাসায়, আদর্শে, শৌর্যে আকর্ষণীয় নারীচরিত্রগুলো অনেক মুসলমান ও নয়।

শিরাজীর পুরুষ চরিত্রগুলো দুভাগে বিভক্ত—মুসলমান এবং হিন্দু। মুসলমান পুরুষ চরিত্র সাধারণভাবে অসামান্য বীর, অকুতোভয়, জাতীয়তাবোধে পরিপুষ্ট, ধর্মপ্রাণ, ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানের সম্মান রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কবি, প্রেমিক, প্রতিজ্ঞাপালনে উদ্যমশীল, প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন, অকারণ উদার এবং অভিজাত। কোন কোন ক্ষেত্রে একত্রে একটি চরিত্রের মধ্যেও এসব অধিকাংশ গুণের সমাবেশ ঘটেছে। হিন্দু চরিত্র এর প্রায় বিপরীত।

ঈসা খাঁ, আফজাল খাঁ, নজাবের মধ্যে পার্থক্য বেশী নেই। তবে প্রেমের ক্ষেত্রে তাঁদের আচরণ এক নয়। কারণও আছে, ঈসা খাঁ ও আফজাল খাঁর প্রেম সমাজ বহির্ভূত ও প্রাকবিবাহকালীন, কিন্তু নজাবের প্রণয় তাঁর বিবাহিতা স্ত্রীর সংগে এবং তাও সেনাপতির ব্রত সম্পন্ন হবার আগে তাঁদের বাঞ্ছিত মিলন হয়নি। ভূদেব-বঙ্কিমের উপন্যাসে মুসলমান রমনী হিন্দুর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হয়েছে, এদের বিপরীতে এ উপন্যাসে হিন্দু রমনী মুসলমানের নিকট প্রেম নিবেদন করেছে এবং পরিণামে ধর্মান্তরিত হয়েছে।

১। পূর্বে, দ্বিতীয় অধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের বিরোধটি মূলতঃ তিন্ন শিরাজীর সমকালের প্রচারক জীবনের চারপাশের হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। মুসলমানের হীনমন্যতা দূর করে তাঁদের বড় করে দেখাবার প্রয়োজন হয়েছিল। উপন্যাসে মুসলমানদের এ প্রাধান্য এসেছে হিন্দুর হীনতা প্রতিপাদনের ওপর। মুসলমান সমাজে শিরাজীর উপন্যাসের জনপ্রিয়তা দেখে মনে হয় লেখকের এ সচেতন উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল।

তারাবাঈ উপন্যাসে মুসলমানের নবরাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা নিয়ুতির হাতেই বিচূর্ণ হয়েছে।[১] নূরউদ্দীন উপন্যাসে নূরগড় রাজ্য স্থাপিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু এটা শিবাজীর মুরজ্যের মত কৌশলে ও বাহুবলে স্থাপিত নয়, বরং আহমদ শাহের কৃতজ্ঞতার দান এবং পিতা জোফন উদ্দীনের উপঢৌকন। এমন কি রানা উদয়সিংহের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া নয় বলে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠার রোমাঞ্চ এখানে অনুপস্থিত।

শিরাজী রাজ্য রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন রায়নন্দিনী উপন্যাসের ঈসা খাঁ এবং ফিরোজা বেগম উপন্যাসের নবাবউদ্দৌলার মধ্য দিয়ে। ঈসা খাঁর প্রতিষ্ঠা হয়েছে প্রেমে, তিনি পৈতৃক রাজ্য উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন এবং তা রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন মাত্র। এ প্রয়াসও কেবলমাত্র জমিদারদের বিশৃঙ্খলা দমনের মধ্যেই সামাবদ্ধ[২]। ফিরোজা বেগম উপন্যাসে শিরাজীর উত্তর পুরুষদের রূপে নবাবউদ্দৌলা কিরমেদ অবতীর্ণ হলেও লেখক বাস্তব অবস্থা ও ইতিহাসের নিকট প্রতারিত হয়েছেন। মুর্শিদাবাদের বিজয়ের পর দোররানী চলে গেছেন কিন্তু ইতিহাসেও বাস্তবে ভারতে ইংরেজের অধিকার অপরিবর্তিত থেকেছে। ইংরেজের কল্যাণ সুনাম চেষ্টিনে অপহৃত এবং ইংরেজ ও ভারতবাসীর ভিন্ন সম্পর্ক সামনে নিয়ে এ উপন্যাস লিখিত।

প্রতীয়মান হল, রাজ্যরক্ষার চেয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নই লেখকের নিকট বড় ছিল। কিন্তু ঈসা খাঁকে দিয়ে যা পারেননি, আফজাল খাঁ, মোহাম্মদ খাঁকে দিয়েও তা পারেননি, নজীব রাজ্য রক্ষা করেছেন কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি, এমন কি নূরউদ্দীন ও তুর্মী খাঁর নূরগড় রাজ্য স্থাপনের মধ্যে কোন চমৎকারিত্ব নেই। সুতরাং শিরাজীর মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা আকাঙ্খা শুধুই স্বপ্ন থেকে, তিনি অনবরত ইতিহাস ও উপন্যাসের দেয়ালে মাথা ঠুকে নিজেও রক্তাক্ত হয়েছেন। প্রতাপাদিত্য উৎসব, শিবাজী উৎসবের সামনে মুসলমানের ব্যর্থতাকে তিনি ঢাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইতিহাস তাঁকে বাস্তব সমস্যার সামনে এনে দিয়েছে।

উপন্যাসে চারটি হিন্দু পুরুষ চরিত্র পরস্পর তুলনীয়, রায়নন্দিনী উপন্যাসে প্রতাপাদিত্য, তারাবাঈ উপন্যাসে শিবাজী, ফিরোজা বেগম উপন্যাসে মহাশিব রাও এবং নূরউদ্দীন উপন্যাসে অরুণসিংহ। কেবলমাত্র অরুণসিংহ ছাড়া বাকী সকলেই নারীহরণকারী। অরুণসিংহ বিবাহিতা স্ত্রীকে দস্যুতা করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, একে ঠিক হরণ বলা যায় না। এ ছাড়া বাকী তিনজনই কুকর্মের জন্য শাস্তি পেয়েছেন যদিও এদের

১। পূর্ব, পৃঃ ১২৯-৩৪।

২। রায়নন্দিনী, পি-র, পৃঃ২২-২৩।

অগ্রসর হয়ে সামনে বাধা পেয়েছেন এবং বাধাকে স্বীকার করে আবার অগ্রসর হতে চেয়েছেন, হতাশা তাঁকে আচ্ছন্ন করেনি। যে কোন সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই তিনি আদর্শ গ্রহণ করেছেন, রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এসবের অন্যতম। তিনি সফল হননি, কিন্তু তারাবাঈ উপন্যাসে শিবাজীর অগ্রযাত্রা সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং এর বিরুদ্ধে মুক্তপক্ষ যাত্রা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছেন। উপন্যাসে এই লক্ষ্য ছিল বলে উপন্যাসের প্রতি যথাযথ মনোযোগ না করলেও তিনি চারটি উপন্যাস রচনা করেছেন, কিন্তু ঐ অন্যদিকে তাঁর জাতীয় আখ্যান কাব্যের সংখ্যা মাত্র দুটি।

উপন্যাসে তিনি ভূদেব-বঙ্কিম-রমেশ-রবীন্দ্রনাথ, বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রকে ব্যাপকভাবে অনুসরণ করেছেন। সিরাজীর চারটি উপন্যাসের মধ্যে প্রথম দুটি, অর্থাৎ রায়নন্দিনী ও তারাবাঈ উপন্যাস প্রতাপাদিত্য উৎসব ও শিবাজী উৎসব থেকে আত্মরক্ষামূলক, মুসলিম গৌরবের প্রায় সমকালীন ইতিহাস নিয়ে এ দুটো রচিত। এর সংগে সমকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সংযোগও রয়েছে। তৃতীয় উপন্যাস ফিরোজা বেগম, শিবাজীর উত্তর পুরুষদের সংগে প্রতিযোগিতা, আনন্দমঠ এবং খিলাফত আন্দোলনের পটভূমিতে মুসলমানদের মাধ্যমে এটা ছিল শক্তি ও রাজনীতির উৎস। নূরউদ্দীন চতুর্থ উপন্যাস, এর সাথে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাসের প্রতিদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার সংগে দূরূহ সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু নূরউদ্দীন ও জুলিয়ার প্রেমের উপাখ্যান যেভাবে অগ্রসর হয়েছে তাতে রাজসিংহের সংগে সম্পর্ক আর অবশিষ্ট নেই। তবে চারটি উপন্যাসেই বঙ্কিমের শিল্প-রূপের কৌশলটি ব্যাপকভাবে অনুসৃত, ফলে বঙ্কিমের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় বরং ঈর্ষা মিশ্রিত শ্রদ্ধা প্রতিফলিত

২৭৩ পাতা।

Dhaka University Institutional Repository

কেউ মোহনিকা চরিতার্থ করতে পারেননি। প্রতাপাদিত্য শেষ পর্যন্ত ছলনা করে সফল না হলেও ঈশা খাঁর নিকট শাস্তি পেয়েছেন, শিবাজী শাস্তি পেয়েছেন স্বয়ং তাজিনা বানুর কাছে, সদাশিব পেয়েছেন ফিরোজা বেগমের কাছে। এদের মধ্যে সদাশিবের শাস্তিটিই সবচেয়ে নির্মম, তাঁকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। অরুণসিংহ নিজের স্ত্রীকে বলভূমি আলোকিত করে অন্যের সংশোধে থেকে নিজের অন্তরেই যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছেন, পরে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শাস্তি পেয়েছেন।

কারো কারো বাবার অন্য পরিচয়ও আছে। যেমন প্রতাপাদিত্য, শিবাজী ও উদয়সিংহ পিতা, তাঁদের কন্যা মুসলমানের অনুরাগিনী হয়ে ধর্মচ্যুত। পিতা হিসাবে প্রতাপাদিত্যের বিশিষ্টতা নেই, শিবাজী পিতৃস্নেহ ও মুগল কুলের সংঘাতে বিচলিত, উদয়সিংহের পিতৃহৃদয়ের আর্তনাদ পরিবেশটিকে করুণ করে তোলে। এছাড়া চাঁপুরের কেদার রায় দুর্গাদাসের পিতা, আহমদ শাহ নুরুন্নেছার পিতা, মালবের সুলতান রোকনউদ্দিন নুরউদ্দিনের পিতা। কিন্তু শিবাজী এবং উদয়সিংহ এদের সকলকে অতিক্রম করে গেছেন, এমন কি শিবাজীকে এদের সকলের মধ্যে নানা কারণেই উজ্জ্বলতম বলে মনে হয়।

শিবাজী মুসলমানের ইতিহাস এবং স্মরণীয় মুসলমান চরিত্রগুলো নিয়ে এগোতে চেয়েছিলেন, তিনি

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় উনিশ শতকের শেষার্ধের সামাজিক রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়েছিল, এ শতকের প্রথম দিকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে তা বাস্তবায়নের একটি চেষ্টাও হয়েছিল। সমকালীন এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের মুসলমান সমাজ হিন্দুর মত করেই পারিবেশিক সমস্যাগুলো দেখতে চেয়েছিল, সে-কারণে শিরাজী মুসলমান সমাজের জন্য মাইকেল, হেম, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিম এবং এমন কি রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজনও মেটাতে চেয়েছিলেন। তাঁদের জনপ্রিয় আসন কামনা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব ছিল না, শিরাজীর ব্যর্থতাই এর প্রমাণ।

প্রথম উপন্যাস রচনার আগেও শিরাজী মুসলমানের জাগরণমূলক প্রবন্ধ ও অন্যান্য কবিতা রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি জাগরণের এ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি, উপন্যাসগুলোতে বাহ্যিকভাবে মুসলিম জাগরণের প্রতিকূল শক্তিগুলোর প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করেছেন। মুসলিম জাগরণের আদর্শবাদী শক্তি-সমূহ অবলম্বন করেও শিরাজী তাঁর সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বঙ্কিমের মৃত্যুর বাইশ বছর পর যে উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য বঙ্কিম নয় বরং শিরাজীর সমকালীন শিক্ষিত হিন্দু সমাজ যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রকেই শুধু সাম্প্রদায়িক স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। সেকারণে শিরাজীর গ্রন্থে বঙ্কিমের বিরুদ্ধে যতটুকু প্রতিবাদ, তার চেয়েও বেশী হল সমকালীন শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক সমাজের ও মানসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সমকালীন অশুভ রাজনীতি ও চিন্তার প্রতিবাদ, সামাজিক সঙ্কীর্ণতার প্রতিবাদ, এমন কি মুসলমান সমাজেরও আড়ষ্টতা ও অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। শিরাজীর উপন্যাসের ব্যাপক প্রচার দেখে মনে হয়, এক শ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমান হিন্দুর বৈরিতার জন্য অন্তত্র অনুসন্ধান করেছিলেন। জাতীয়তাবাদের আবেগ সৃষ্টির প্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির রোষ এড়িয়ে ইতিহাসের মুসলমানকে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু শিরাজীর সামনে ছিল অগ্রসর ও শক্তিমান হিন্দু এবং রাজশক্তির অধিকারী ইংরেজ। সেকারণে শিরাজীর পক্ষেও সমকালীন হিন্দুর সঙ্গে ঐতিহাসিক মুসলমানের তুলনা সহজ হয়েছিল। বঙ্কিমের রচনা জাতীয় চেতনাবোধকে নাড়া দিয়েছিল সেজন্য বঙ্কিমকে ব্যবহার করেই হিন্দু ও মুসলমান সমাজ দুরকমের ফল পেয়েছে। মুসলমান সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রকে অস্বীকার করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আরো বড় বিরাট হয়ে এসেছেন, বঙ্কিমের চর্চা বেড়ে গেছে। মুসলমানরা বঙ্কিমচন্দ্রকে ঘৃণা ও প্রতিরোধ করতে গিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রকে ভালবেসে, এশ্রেণী রচনাকে শিরাজী নিজেও উৎসাহ দিয়েছেন, তবে তুলনামূলকভাবে শিরাজীর রচনাই সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল বঙ্কিমের সৃষ্টির ঐশ্বর্য পায়নি, একথা স্বীকৃত হবে নিলেও শিরাজীর সামনে বঙ্কিমচন্দ্র যে কত বিরাট এবং মহান বড় তার প্রমাণ রয়েছে শব্দ ব্যবহার, বাক্যগঠন, ভাষাশৈলী, পরিবেশ সৃষ্টি, বর্ণনাকুশলতা, চরিত্র গঠন, ইতিহাসের কাঠামো দখল, এমনকি শিরাজীর সাহিত্যের প্রায় ক্ষেত্রেই। মুসলমান সমাজে শক্তিমান সাহিত্যিক আবির্ভাব ঘটেনি, বিত্ত, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার হয়নি বলে বঙ্কিমের অনুসরণ কিংবা অস্বীকার বাহ্যিক

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনা হয়েই রয়ে গেছে, নতুন সৃষ্টি সম্ভারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। সেকারণে মুসলমানদের বঙ্কিম চর্চা কোন কোন অংশে গ্রাম্য গালির মত শোনায়।

সুতরাং সিরাজীর উপন্যাসে প্রধানতঃ দুটো রূপ স্পষ্ট, একদিকে বঙ্কিমের ও বঙ্কিমের উপন্যাস-জাত সমকালীন হিন্দু মানসিকতার প্রতিক্রিয়াজ্ঞাপন, কিছুটা সাম্প্রদায়িক উষ্মাও বটে। কিন্তু এগুলো বাদ দিলে অন্যদিকে মোটামুটিভাবে নৈতিক রূপেও উপন্যাসের বিকাশ হয়েছে। প্রথমটি আপাত প্রত্যক্ষ হলেও, দ্বিতীয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এটা ছিল বলে সিরাজীর উপন্যাস নিছক মহিমাচ্ছেই জীবনশক্তি সম্পূর্ণ হারায়নি।

(ঙ) উপন্যাসের মূল্যায়ন

এক

সিরাজীর প্রথম উপন্যাস রায়নন্দিনীর প্রকাশকাল ১৯১৬ এবং শেষ উপন্যাস নূরউদ্দীন এর প্রকাশকাল ১৯১৯ সাল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর সঙ্গে সিরাজীর প্রথম ও শেষ উপন্যাসের প্রকাশকালের ব্যবধান প্রায় একান্ন ও চুয়ান্ন বছর এবং রবীন্দ্রনাথের গোরা(১৯০৯) উপন্যাসের সঙ্গে ব্যবধান প্রায় সাত এবং দশ বছর। ১৯১৬ থেকে ১৯১৯ সনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ (১৯১৬), ঘরে-বাইরে(১৯১৬), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) পল্লীসমাজ (১৯১৬), দেবদাস(১৯১৭), চরিত্রহীন(১৯১৭), দত্তা(১৯১৮), শ্রীকান্ত(১৯১৭, ১৯১৮, ১৯২৭, ১৯৩৩) উপন্যাসের অংশবিশেষ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে গেছে। সিরাজী তাঁর প্রথম উপন্যাস রায়নন্দিনী গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন "একই দেশের অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব থাকা সর্বদা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংগালা ভাষার কাল্পনিক সাহিত্যের গৌরবস্থানে বিভোর হইয়া কান্ডজ্ঞানহীন অবস্থায় লেখনী পরিচালনায় দারুণ অসদ্ভাবের বীজ রোপণ করিতেছেন। দেশমাতৃকার কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহাদের সাবধানতার জন্য এবং মুসলমানদের আত্ম-বোধ জন্মাইবার জন্যই উপন্যাসের ঘোর বিরোধী হইয়াও কর্তব্যের নিদারুণ তাড়নায় "রায়নন্দিনী" রচনা করিয়াছি।"[1] এতেও তাঁদের চৈতন্যোদয় না ঘটলে পুনরায় "বজ্রমুখ" লেখনী ধারণের কথা ঘোষণা করেছেন। মুসলমানদের সামাজিক অনগ্রসরতার পরিপ্রেক্ষিতে সিরাজীর এ আকাঙ্ক্ষা মুসলমান সমাজে জনপ্রিয় হয়েছিল। কেবল সিরাজী নন, তৎকালীন মুসলমান সাহিত্যিকদের অনেককেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাহিত্য সেবার জন্য এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে, এদের মধ্যে রয়েছেন নজিউদ্দীন আহমদ (মনোয়ারকুমারী ও প্রতাপনন্দিনী), শেখ মুহম্মদ ইদরিস আলী (বঙ্কিম দুহিতা), ডাক্তার আবুল হোসেন (জোনভানজান) প্রমুখ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের রচনা স্থূলরুচিপূর্ণ, এগুলো সাহিত্য পদবাচ্য নয়, তা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমানের আত্মরক্ষার

১। উপক্রমণিকা, রায়নন্দিনী, সি-৪, পৃঃ ৫, অন্যান্য বিবরণ, পূর্ব, পৃঃ ৭৪-৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রণা এখানে প্রচ্ছিন্ন। তাঁরা মনে করেছেন, "এই যে আমাদের নূতন ভাব, ইহা হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব নহে। ইহা আমাদের আত্মসম্মানের স্ফুরণ।"[১] অন্যদিকে হিন্দুর রচিত নাটক উপন্যাসে মুসলমান বিদ্বেষ এবং মুসলমানের রচনায় হিন্দু বিদ্বেষ লক্ষ্য করে মুসলমানদের মধ্যেই কেউ কেউ দেশের ভবিষ্যৎ ও সাহিত্যে প্রতিহিংসা সাধন সম্পর্কে শঙ্কিত হয়েছিলেন।[২] মুসলমানদের সমাজচিন্তার এ দুটো দিকই সিরাজীর উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সিরাজীর নিজের আত্মানুরাগ তাঁর উপন্যাসের মূল্যায়নের ব্যাপারে অন্তরায় হিসাবে কাজ করেছে। সিরাজীর এরূপ মনুষ্যের গুরুত্ব সাময়িক এবং উপরোক্ত লেখকদের তুলনায় সিরাজীর স্থান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

সিরাজী প্রকৃতই বঙ্কিম যুগের ঔপন্যাসিক, তাঁরা বঙ্কিমের চিন্তাধারার পরও বঙ্কিমের সাহিত্যিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভাবের মোহকে কাটিয়ে উঠতে পারেননি সিরাজী তাঁদেরই একজন। বঙ্কিমের রাজনৈতিক মতবাদের জন্যে সিরাজীর মানসলোকে বঙ্কিমের উপন্যাস ও অন্যান্য রচনা তাঁর নিকট সবচেয়ে বড় এবং প্রায় সমচিন্তাময় হয়ে উঠেছিল। এ কারণে বঙ্কিমকে অস্বীকার করতে যেয়ে তিনি বঙ্কিম সাহিত্যকে দেশভক্তি ও সম্প্রদায়-ভক্তির অন্যতম উৎস বলে গ্রহণ করেছেন, তাঁকে অনেক বেশী মাত্রায় অনুসরণ করেছেন, দোলা, চতুর্দশী ঘরেবাইরে, শ্রীকান্ত, পল্লীসমাজ, চরিত্রহীন ও ইত্যাদি উপন্যাসের যুগে বসে বঙ্কিমকে এভাবে আদর্শ মেনেছেন এটা তাঁর দুর্ভাগ্য। বাংলা উপন্যাস যখন ইতিহাসের পটভূমি ছেড়ে, কাহিনীতে ঘটনাবাহুল্য পরিত্যাগ করে মানব জীবনের আত্মানুসন্ধান সংকটের মধ্যে প্রবেশ করেছে, মনস্তত্ত্ব প্রধান হয়েছে, তখনো সিরাজী উপন্যাসে বহুঘটনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এদিক দিয়ে সমকালীন বাংলা উপন্যাস রচনার সঙ্গে তাঁর কোন যোগ নেই, তা সত্ত্বেও সমকালীন ভারতবর্ষে মুসলমানের সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যা তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে, তিনি মুক্তির সুর দেখেছেন, উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা লেখকের এসব দুঃখকে অনুসরণ করে দিয়েছে এখানেই তাঁর বিশেষত্ব। ইতিহাসের প্রচ্ছদে সমকালীন মানুষের অন্তর বেদনার প্রকাশ সিরাজীর উপন্যাসের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করেছে।

নবনূরপ্রতিষ্ঠার মধ্যমণি থেকেও উপন্যাসে বঙ্কিমী পদ্ধতিতে সিরাজী আত্ম বলে মনে করেছেন এবং মজুমদার ও আনিসুজ্জামান সিরাজীকে মুক্ত করেছিল। এর কারণও ছিল, প্রচারক মৌলভী মজুমদার ও আনিসুর পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের সাফল্য দেখেছিলেন বলে সাহিত্যের আদর্শে যে সমর্থন করেছিলেন, এবং এর প্রতি বরাবরই অনুরাগ প্রকাশ করেছেন।

১। এম, এম, আকবর উদ্দীন, বি-এ, –বর্তমান বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের স্থান, আল-এসলাম, অগ্রহায়ণ, ১৩২৩।

২।(ক) আহমদ আলী–হিন্দু মুসলমান প্রশ্ন, আল এসলাম, ফাল্গুন, ১৩২৪।

(খ) এম, আমবাস–সাহিত্যে বৈচিত্র্য, বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা, কার্তিক, ১৩২৮।

Dhaka University Institutional Repository

শিরাজীর উপন্যাস মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতাও প্রাসঙ্গিকভাবে বিবেচ্য। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল মুসলমান সমাজ, হিন্দু সমাজে বঙ্কিমের জনপ্রিয়তা দেখে তিনি মুসলমানদের নিকট ভিন্নভাবে পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন। সেকারণে মুসলমান সমাজের নিকটই শিরাজীর উপন্যাস স্বধর্মবোধক, এক শ্রেণীর পাঠকের নিকট এগুলো বঙ্কিমের উপন্যাসের জবাব, এটা শিরাজীর উপন্যাসের নেতিবাচক দিক। অন্য শ্রেণীর পাঠকের কাছে শিরাজীর উপন্যাস ছিল মুসলমান সমাজের জন্য এবং তাদের মত করেই বঙ্কিমের নব রূপায়ন।

সমকালীন শিক্ষিত হিন্দুর সামনে দাঁড়ানো ছাড়াও শিরাজীর উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ ছিল মুসলমান সমাজের মহত্বের, শ্রেষ্ঠত্বের, সুন্দরের নতুন রূপায়ন। এ কারণে শিরাজীর সাহিত্যের বিভিন্ন অংশে কেবলমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র নয়, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ডি-এল-রায়, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনবরত এসেছে, কিন্তু শিরাজী নিঃসংকোচে এদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে মুসলমান সমাজের জন্য আদর্শ নির্মাণ করতে চেষ্টা করেছেন। "আদর্শ"ই প্রকৃতপক্ষে শিরাজীর আদর্শ তা যেখান থেকেই আসুক না কেন, এবং তা রূপায়নের ক্ষেত্র হল মুসলমান সমাজ। শিরাজীর উপন্যাস তাঁর নিজের এবং সমকালীন মুসলমান সমাজের সে উদ্দেশ্যের যথেষ্ট পোষকতা করেছিল।

শিরাজীর উপন্যাস প্রকাশের আগে, সমকালে এবং অব্যবহিত পরে মুসলমানদের রচিত যে কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশিত হয় তার মধ্যে মীর মশাররফ হোসেনের(১৮৪৮-১৯১২) রত্নবতী (১৮৬৯), বিষাদ সিন্ধু, (১৮৮৫-৯১), মোজাম্মেল হকের(১৮৬০-১৯৩৩), জোহরা (১৯১৭), প্রথম প্রকাশ (১৯০৫), নজিবর রহমানের (১৮৬০?-১৯২৩) সাজনশী বাহমনি(১৩২৩) আনোয়ারা (১৯১৪?) প্রেমের সমাধি(?), গরীবের মেয়ে(১৯৯৩), দুনিয়া আর চাই না(১৯২৩), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের(১৮৮০-১৯৩২) পদ্মরাগ(?) কাজী ইমদাদুল হকের(১৮৮২-১৯২৬) আবদুল্লাহ (১৯৩৩), ইকরামুদ্দীনের (১৮৮২-১৯৩৫) কাঁচ ও মনি(?) মজনু ?(?) ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের (১৮৮৯-১৯৩৬) প্রীতি উপহার(১৯২৭), পথহারা(১৯১৯), বাসর উপহার(?) রায়হান(১৯১৯), শাহাদাৎ হোসেনের(১৮৯৩-১৯৫৩) রিক্তা(?) মুশেকআলো(?), পথের দেখা(?) কাঁটাফুল(?), হিরণরেখা(?), মোহাম্মদ কোরবান আলীর (১৮৯৫-?) মনোয়ারা (১৯২৫), গোলাম মোস্তফার(১৮৯৭-১৯৬৪) রূপের নেশা(১৩২৬) ও ভাঙ্গাবুক (১৩২৮)প্রভৃতি রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদসিন্ধু এবং নজিবর রহমানের আনোয়ারা। মোজাম্মেল হকের জোহরা উপন্যাস ১৯১৭ সালে রচিত হলেও প্রকাশকাল ১৯২৫ সাল। লেখক ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তও এ গ্রন্থের সংস্কার করতে পেরেছেন মনে করা যায়, সুতরাং শিরাজীর সংগে তুলনা অপ্রাসঙ্গিক। কাজী ইমদাদুল হকের "আবদুল্লাহ" সামাজিক উপন্যাস, লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।[১] আবুল কালাম মনে করেছেন আনোয়ারাকে কাজীর

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৫২৩।

Dhaka University Institutional Repository

নন, এ গ্রন্থের শেষাংশ সম্ভবতঃ শাহাদাৎ হোসেন রচনা করেন।[১] অবশ্য আবুল ফজলের এ বক্তব্য সম্পর্কেও নিঃসংশয় হওয়া যায়নি।[২] আবদুল্লাহ লেখকের শেষ দিককার রচনা বলেই তিনি এটা অসমাপ্ত রেখে মৃত্যু বরণ করেন। শিরাজীর সকল উপন্যাস স্বল্পদিনে প্রকাশিত হয়ে গেছে সুতরাং তুলনা অনাবশ্যক। নজিবর রহমানের আনোয়ারা গ্রন্থটির "ত্রয়োবিংশতি সংস্করণ" প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে এবং এ সময় পর্যন্ত প্রায় "দেড়লক্ষ কপি নিঃশেষিত" হয়।[৩] ১৩৭৫ সালে আনোয়ারা গ্রন্থের ২৯শ মুদ্রণ হয়, এমন কি ১৩৬২ সালে নজিবর রহমানের হাসন গংগা বাহমনি গ্রন্থেরও পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৪] এছাড়া বাকী সবাই অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের যথবা শিরাজীর তুলনায় প্রায় অনুল্লেখ্য। জনপ্রিয়তার বিচারেও বিষাদসিন্ধু এবং আনোয়ারা গ্রন্থের পরই শিরাজীর রায়নন্দিনী গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

রায়নন্দিনী গ্রন্থের রচনাকাল আনোয়ারা প্রকাশের আগে হলেও প্রকাশিত হয়েছে পরে। আনোয়ারা গ্রন্থ মুসলমান সমাজে জনপ্রিয় ছিল, তা সত্ত্বেও আনোয়ারার পরে প্রকাশিত রায়নন্দিনী গ্রন্থের জনপ্রিয়তা দেখে মনে হয় ঐতিহাসিক উপন্যাস গ্রহণের জন্য মুসলমান সমাজ তখনো প্রস্তুত ছিল। বাংলায় শিরাজীর পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো জাতীয়তাবাদের বাহন হয়েছিল, শিরাজী নিজেও এ কারণে জাতীয় ভাব প্রকাশের জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাসই উপযুক্ত মনে করেছেন।

শিরাজী উপন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন না একথা আংশিক সত্য, তিনি উপন্যাসকে ইতিহাসের অপ্রধান বিকল্প ধরে নিয়েছেন, এবং ইতিহাসের কাজ ঐতিহাসিক উপন্যাস দ্বারা চলতে পারে তা দেখেছেন। সম্ভবত এ কারণেও তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের বাইরে পা বাড়াতে চাননি, কেবল তাই নয়, রায়নন্দিনী গ্রন্থের পর আরো তিনটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন। উপন্যাস সম্পর্কে অনীহা এবং চিন্তামূলক সৎসাহিত্য-প্রবন্ধের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে মুসলমানদের দক্ষতার জন্য গৌরববোধ করেছেন।[৫] 'ফিরোজকুমারী' উপন্যাসের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন, এমন কি নূর পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন, "বঙ্গীয় মোসলেম সাহিত্যক্ষেত্রে নূরের" সাধনায় সাহিত্য ও কাব্যের অঙ্গে— ইতিহাস ও উপন্যাসের সৌগন্ধে, ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্যে সুলেসুন ও রোসুন হইয়া উঠুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।[৬] বাস্তবেও এটা হয়েছিল, মজনুমের মেহের নেগার", "ফুলের মোহে", "ফিরোজ বেগম", "শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের "মাটির মাটি" এবং অন্যান্য লেখকের ধারাবাহিক গল্প উপন্যাস নূর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১। আবুল ফজল—আবদুল্লাহ উপন্যাসের শেষাংশ কে লিখেছেন? দৈনিক ইত্তেফাক ১০ই মে, ১৯৭১।
২। মোহাম্মদ আবদুল মজিদ—আবদুল্লাহ উপন্যাসের শেষাংশ কে লিখেছেন, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ই জুলাই, ১৯৭১।
৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ২০৪।
৪। শামসুল হক—বাংলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ১৯৭৮, পৃঃ ৪৯, ও ৪১।
৫। "আনোয়ারা" এবং "রায়নন্দিনী" বাহির হইবার পর হইতে মুসলমান লেখকদিগের উপন্যাস রচনায় একটু প্রবল আগ্রহ সূচিত হয়।—অবশ্য এই সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে সবগুলি সারবান না হইলেও উপন্যাস রচনায় মুসলমানের কৃতিত্ব ও দক্ষতার যে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সর্বতোভাবে গৌরবজনক।"—দ্রঃ চিন্তার ধারা, উপন্যাসের আধিক্য, নূর, বৈশাখ, ১৩২৭।
৬। নিবেদন, নূর, মাঘ, ১৩২৬। নিম্নরেখ আমাদের।

Dhaka University Institutional Repository

দুই

এ ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে উপন্যাস চর্চার অভাব ছিল উপন্যাসকে তাঁরা বাঞ্ছিত মনে করেননি। যে শিক্ষা, সমৃদ্ধি, সামাজিক মূল্যবোধ ও রাজনীতির কারণে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় মুসলমানদের মধ্যে তা এসেছে অনেক পরে। সে কারণে কেবল সিরাজী নন, তাঁর অনেক পরবর্তীকালেও মুসলমান রচিত এমন একক উপন্যাসের নাম করা কঠিন যাকে দুর্গেশনন্দিনী থেকে গোরার মত যুগলক্ষণ ও সৃষ্টিলক্ষণ দিয়ে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বিষাদসিন্ধু ও আনোয়ারা কোন অবস্থাতেই দুর্গেশনন্দিনী এবং গোরার সঙ্গে তুলনায় হতে পারেনা। এসব কারণে মুসলমানদের রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস হিন্দুর প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু সামাজিক উপন্যাস প্রায় কেবলই বিশিষ্টতা বর্জিত। এর মধ্যেও মাত্র যে কয়েকজনের উপন্যাস মুসলমান সমাজের জীবনদৃষ্টি গঠনে সহায়তা করেছিল সিরাজী তাঁদের অন্যতম, যে কয়েকটি উপন্যাস মুসলমান সমাজের ওপর চের প্রভাব বিস্তার করেছিল সিরাজীর সকল উপন্যাস বিশেষতঃ রায়নন্দিনী তার অন্যতম। ঈসা খাঁ-স্বর্ণময়ীর প্রেমকে অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যে আরো দুটো উপন্যাস রচিত হয়েছিল, শশিভূষণ বিশ্বাস-এর সোনাবিবি[১], এবং ডাঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেমের ঈসা খাঁ ও স্বর্ণময়ী।[১] রূপপরিবেশনের দিক দিয়ে এ গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে সিরাজীর রচনা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। বিষাদসিন্ধুর পর রায়নন্দিনী উপন্যাসই সমকালীন মুসলমান সমাজ অবলম্বনের একটি মাধ্যম খুঁজে পেয়েছিল। আনোয়ারা তিনধর্মী সামাজিক উপন্যাস, সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে বিবেচ্য। বিষাদসিন্ধুর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র রস পরিবেশন, কিন্তু সিরাজীর উপন্যাসগুলোর মধ্যে রসপরিবেশনের সঙ্গে সামাজিক কল্যাণ সাধন এবং সামাজিক রাজনৈতিক আদর্শবোধের সৃষ্টি। হিন্দুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আত্মপ্রকাশ থাকেনি। সুতরাং বিষাদসিন্ধুর তুলনায়ও এগুলো পৃথকভাবে বিবেচিত হবার যোগ্য।

সিরাজী নিজে যদিও বঙ্কিমের বিরুদ্ধে ছিলেন কিন্তু বাং বি ভ রদের পর হতাশাচ্ছন্ন মুসলমান সমাজে, স্বদেশী যুগে রাজনীতিতে হিন্দু র্ম উজ্জীবনের কালে সিরাজীর এসব উপন্যাসের ব্যবহারিক মূল্য দেখা দিয়েছিল। কেননা, সচেতনভাবে এসব উপন্যাসের মাধ্যমে সিরাজী হিন্দুকে সংশোধন করে এবং মুসলমানের হীনমন্যতা দূর করে উভয়কে সমান করে তুলতে চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমমান অবস্থা বিপত্তি ও বৈনেস্যের মূল, সুতরাং সিরাজীর এ অভিপ্রায় সমন্বিত সম্প্রদায়গুলোর সামাজিক ও জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদিত কল্যাণবোধকে আংশিকভাবে সূচিত করেছে। মুসলমান সমাজের একাংশে সিরাজীর উপন্যাসগুলোকে অবলম্বন করে

১। (ক) শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস-সোনাবিবি-কলিকাতা, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩০৮।
(খ) বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১৯, কার্তিক, ১৩১৯ এবং বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃঃ ৩৩৬।
২। পূর্ব, পৃঃ ৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

হচেষ্টা . দেখেছিল, তাঁরা প্রতিবেশী হিন্দুর সমান হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন এখানেও এসব উপন্যাসের অন্যতম সার্থকতা, এবং অন্যান্য মুসলমান উপন্যাসিকের তুলনায় স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা। "মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র সিরাজী ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন বলা চলে। সেদিক দিয়ে তিনি স্মরণীয়।"[৯]

মুসলমান সমাজে এভাবে জাগরণের মধ্যে বিপদও ছিল। প্রধানতঃ ধর্মীয় অনুভূতি এবং সম্প্রদায়গতভাবে প্রাচীন গৌরব চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে জাগরণের প্রয়াস করার ফলে মুসলমান সমাজ বহির্ভূত অন্য সম্প্রদায়কে তাঁদের আপন বলে মনে হয়নি, বিশেষতঃ জাগরণের অন্যতম সূত্র ও যেখানে ছিল অগ্রসর হিন্দুর নিকট থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সুবিধাদির উৎসকে অধিকার করা। শিক্ষিত হিন্দুর সঙ্গে শিক্ষিত মুসলমানের বাস্তবে অধিকার আদায়ের প্রতিযোগিতা তখন ক্রমেই তীব্রতর হয়ে আসছিল, এ পর্যায়ে তাঁর উপন্যাসে সম্প্রদায়গতভাবে প্রতিযোগিতার আহবান সাম্প্রদায়িক পার্থক্যকেও সূচিত করেছে, যদিও রাজনৈতিকভাবে বরাবরই সিরাজী হিন্দু ও মুসলমানের মিলন গভীরভাবে কামনা করেছেন, মিলনের অন্তরায়কে দূর করতে চেয়েছেন, সামাজিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে একে সম্প্রসারিত করে দিতে চেয়েছেন। তা সত্ত্বেও উপন্যাসে দ্বন্দ্বমূলক সংঘর্ষের ফলে মুসলমানদের নিকট এগুলো বেশী জনপ্রিয় হয়েছিল, এভাবে তিনিও ক্রমেই "প্রতিক্রিয়ার জনক" হিসাবে মূল্যায়িত হয়েছেন। কিন্তু সিরাজীর উপন্যাসে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ জীবন রসপিপাসার ইঙ্গিত পরবর্তীকালে ঠিকমত অনুসৃত হয়নি বলে মুসলমানদের মধ্যে সিরাজীর স্থান হয়েছে তাঁদের কাছে যাঁরা পক্ষিমের প্রতিপক্ষ হিসাবে তাঁকে পেতে চেয়েছিলেন কিন্তু সিরাজী নিজেই যাঁদের প্রতি প্রসন্নচিত্ত ছিলেন না। এদের ভালবাসাই প্রকৃতপক্ষে সিরাজীর উপন্যাসের সাহিত্যিক মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ।

সিরাজীর অব্যবহিত পর নজরুলের আবির্ভাব কবিতা রচনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের সম্ভাবনাকে সচকিত করে দিয়ে গেছে, এমন কি অনলপ্রবাহ রচনায় সিরাজীর অবদান নজরুলের কৃতিত্বের সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হয়েছে। এ কারণে সিরাজীর উপন্যাসের সুদূর ইঙ্গিত অনুসরণ করার সময় ও সুযোগ তখন মুসলমানদের ছিলনা। নজরুলের আবির্ভাবকালীন আলোকচ্ছটা তাঁদের মুগ্ধ করেছিল, ফলে সিরাজীর উপন্যাসের সম্ভাবনাটুকু কবিতার বর্ণলেপনের মধ্যে প্রায় অপসৃত হয়ে গেছে। সাহিত্যে প্রকাশই মুখ্য, সিরাজীর উপন্যাসে প্রকাশ এবং ইঙ্গিত দুটোই রয়েছে, দুটোর মধ্যে যেহেতু ব্যবধান রয়েছে সুতরাং দুটোকেই সামনে রেখে উপন্যাসে এখানে তাঁর স্থান নির্ণয় করা আবশ্যক।

৯। মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৪০৯।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

কাব্য ও কবিতা

সিরাজীর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা সর্বমোট আটটি ,প্রকাশকালের ক্রমানুসারে এগুলো হল অনলপ্রবাহ(১৩০৬),উচ্ছ্বাস(১৩১৪),নবউদ্দীপনা(১৩১৪),উদ্বোধন(১৯০৮),স্পেনবিজয় কাব্য (১৯১৪),সঙ্গীত সঞ্জীবনী(১৯১৬,প্রেমাঞ্জলি(১৩২৩),মহাশিক্ষা কাব্য প্রথম খণ্ড(১৯৬৯),দ্বিতীয় খণ্ড(১৯৭১)। শেষোক্তটি তাঁর মৃত্যুর অনেককাল পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত। মহাশিক্ষা কাব্য এবং স্পেন বিজয় কাব্য আখ্যান কাব্য,বাকীগুলি গীতিধর্মী খণ্ড কবিতা, গীতি কবিতা ও গানের সংকলন। উচ্ছ্বাস কাব্য গীতিধর্মী খণ্ড কবিতা ও আখ্যানমূলক কাব্যের মিশ্রিত রূপ।

ক) অনল প্রবাহ

এক

অনলপ্রবাহ গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১৩০৬ সালে, ১৩০৭ সালে এটা বর্ধিত আকারে পুনর্মুদ্রিত হয় এবং ১৩১৫ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অনলপ্রবাহ কেবল গীতিকাব্য হিসাবেই প্রথম নয়, প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থও বটে।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ এবং মুন্সী জমীরুদ্দীন সাহেবদের সংগে বাহাস বিজয় উপলক্ষে সিরাজ-গঞ্জে গেলে যুবক ইসমাইল হোসেন তাঁদের সংগে দেখা করে অনলপ্রবাহ গ্রন্থটি ছাপিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করেন।[১] ১৩০৬ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৩০৭ সালে সম্ভবত আরো আটটি কবিতা সংযোজিত হয়ে অনলপ্রবাহ পুনঃপ্রকাশিত হয়,এটাই প্রথম সংস্করণ হিসাবে পরিচিত। ১৩০৬ সালের সংস্করণটিকে মুন্সী মেহেরুল্লাহ প্রকাশিত সংস্করণ বলা যায়।

১। "১৩০৭ সালে ১লা বৈশাখ শুক্রবার সিরাজগঞ্জে পৌঁছিলে তাহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ২রা বৈশাখ ওখাকার মুন্সী ইসমাইল হোসেন সাহেব তাহার অনল প্রবাহের কপি লইয়া আমাকে দেখান ও ছাপাইয়া দিতে বলেন।" দ্রষ্টব্য,,শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ-মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত। বর্ধমান,আশ্বিন,১৩২৭।এটা ১৩০৭ নয়,১৩০৬ সালে হওয়াই সম্ভব।১৩০৬ সালের ১লা বৈশাখ শুক্রবার ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

অনলপ্রবাহ তৃতীয় সংস্করণে সর্বমোট কবিতার সংখ্যা বারোটি, প্রথম কবিতা অনল প্রবাহ। মোহেম্মদুল্লাহ প্রকাশিত সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল উনচল্লিশ।[১] তৃতীয় সংস্করণে অনল প্রবাহ কবিতার পৃষ্ঠা সংখ্যা বত্রিশ, সুতরাং মোহেম্মদুল্লাহ প্রকাশিত সংস্করণে কেবলমাত্র অনলপ্রবাহ কবিতাটি ছিল ধরে নেয়া যায়। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৫ সালে। কবির জীবদ্দশায় মাত্র দুটো সংস্করণ, মুন্সী মোহেম্মদুল্লাহ প্রকাশিত সংস্করণ ধরলে তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৩৬০ সালে প্রকাশিত হয় তৃতীয় সংস্করণ। ১৩১৭ সাল থেকে ১৩৫৮ সাল পর্যন্ত এটা বাজেয়াপ্ত ছিল, ১৩৬০ সালে প্রকাশিত সংস্করণ বাজেয়াপ্ত কপিরই মুদ্রণ ধরে নেয়া যায়, কবির পুত্র সৈয়দ আসাদ-উদ্দৌলা সিরাজী সিরাজগঞ্জের বাণী-কুঞ্জ থেকে এটা প্রকাশ করেন। আমরা এর পূর্বেকার আর একটি সংস্করণ দেখেছি, নাম পৃষ্ঠা না থাকায় কত সালে প্রকাশিত এবং কোন সংস্করণ তা বোঝা গেল না। ১৩১৫ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ বাজেয়াপ্ত হয়, মোহেম্মদুল্লাহ প্রকাশিত সংস্করণ এবং উপরোক্ত দ্বিতীয় সংস্করণের মাঝামাঝি আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, সুতরাং নাম পৃষ্ঠাবিহীন এ সংস্করণটিকে সম্ভবতঃ প্রথম সংস্করণ কিংবা প্রথম সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ বলা যায়। ১৩৬০ সালে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণের সংগে এর পার্থক্য রয়েছে। যেমন এখানকার ৫-৭ সংখ্যক কবিতা, অর্থাৎ স্বাধীনতা কামনা, মিশরের অভ্যুত্থানে, উদ্বোধনা ও দেশের প্রতি কবিতা অনুদিত প্রথম সংস্করণে নেই। এ চারটি কবিতা উদ্বোধন (১৯০৮) কাব্যে রয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণে এ চারটি কবিতা কবির নিজেরই সংযোজন, সম্ভবতঃ এ চারটি কবিতায় কবি অনলপ্রবাহের আলোকধারা দেখতে পেয়েছিলেন এবং সেজন্য এগুলোকে অনলপ্রবাহের প্রচ্ছদে স্থান দিয়েছেন। 'অনলপ্রবাহ' সাধারণ মানুষের হৃদয়ে প্রেরণার অনলশিখা প্রজ্বলিত করেছিল, জাতীয় জাগরণমূলক কবিতা হিসাবে এগুলো গৃহীত হয়েছিল, সিরাজী জনসাধারণের মধ্যে কবিতার প্রয়োগমূল্য অনুভব করেছিলেন। সুতরাং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও রাজনীতির আবর্তে সিরাজী নিজের জীবনের মত কাব্যের বাণীমূর্তিকেও অগ্নি থেকে প্রসূত করে তুললেন, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত কবিতাগুচ্ছের সংগে উপরোক্ত চারটি কবিতাও সংযোজন করতে আগ্রহী হন।

কালপ্রবাহ ও রাজনীতি প্রবাহের সংগে এ গ্রন্থের সংস্করণের মধ্যে সিরাজীর মানসিক পরিবর্তনসমূহ লক্ষণীয়। সময়ের পরিবর্তনকে কবি স্বাগত জানিয়েছেন। কবিতার মধ্যেও পরিবর্তনের সেসব ইঙ্গিত ধরে রেখেছেন। অনল প্রবাহের মোহেম্মদুল্লাহ প্রকাশিত সংস্করণ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ পর্যন্ত কবির মনোজীবনের দুন্দুভি, বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয় কবিতার ছন্দে প্রকাশিত। বোঝা যায়, খাঁচায় বন্দী পাখির মত উন্মুক্ত আকাশ দেখে কবি অনবরত ডানা ঝাপটিয়েছেন এবং তাঁর সত্তায় অস্থিরতা ও মুক্তির আকাংক্ষা প্রকাশের বেদনায় ছটফট করেছে। কবির এ সময়কার অন্তর্দাহ প্রকাশই হল অনলপ্রবাহের বিভিন্ন সংস্করণ। দুঃখ কষ্টতা দিয়েও ব্যক্তিজীবন,

---

১। বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯০১, প্রথম ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ ও দেশের কি বিপুল বাধা তিনি অপসারণ করতে চেয়েছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় এ কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি চরণে।

অনল প্রবাহ প্রকাশের মুহূর্তে সিরাজীকে প্রচারক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখা যাচ্ছে। প্রচারক জীবনে যে বক্তব্য তিনি বাগ্মিতার দ্বারা প্রকাশ করেছেন, প্রকৃত অর্থে অনল প্রবাহ তার লিখিত রূপ। ফলে সিরাজীর বাগ্মিতা ও অনলপ্রবাহের খ্যাতি পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মেহেরুল্লাহর সামাজিক প্রভাব সিরাজীর খ্যাতির বিস্তার ঘটাতে সহায়তা করেছিল মনে হয়। তাছাড়া অনলপ্রবাহের প্রকাশক ছিলেন মেহেরুল্লাহ এবং প্রথম দিকে সিরাজীও মেহেরুল্লাহর সঙ্গে প্রচারে যেতেন।[১] মেহেরুল্লাহর তুলনায় সিরাজী অবশ্যই শক্তিশালী ছিলেন, এবং মেহেরুল্লাহর সহায়তা না পেলে সিরাজী খ্যাতিহীন থেকে যেতেন এমন মনে করার কোন কারণ নেই। স্থানীয়ভাবে সিরাজীর খ্যাতি ইতিমধ্যেই বিস্তৃত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু বক্তার সঙ্গে মেহেরুল্লাহর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে অত্যন্ত অল্প সময়েই মুসলিম সমাজে সিরাজী বাগ্মিতারও কবিখ্যাতির মধ্যগগনে চলে আসলেন। সিরাজী জীবদ্দশায় এ খ্যাতির বৃত্ত থেকে সরে যাননি এটাও তাঁর সৃষ্টিক্ষেত্রে অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ। বাগ্মিতা, প্রচার জগৎ ও রাজনীতির প্রভাব সিরাজীর কবিসত্তাকে ঘিরে রেখেছিল, তিনি রাজনীতি ও সামাজিক প্রয়োজনে এসব কবিতা ব্যবহার করতে চেয়েছেন, অনল প্রবাহ কাব্য তাঁকে সমকালীন মুসলিম নেতার আসনে এনে দিয়েছে। ফলে অনল প্রবাহ কাব্যগ্রন্থের বিচার প্রকৃত অর্থে কাব্যমূল্য দিয়ে হয়নি, বরং হয়েছে ব্যবহারিক মূল্য ও জনপ্রিয়তা দিয়ে। একদিকে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন, অন্যদিকে তাঁর ধর্মান্তর বিরোধী পক্ষ এ গ্রন্থ নিয়েই তাঁকে আক্রমণ শুরু করে। বিদ্রোহী কবিতা[২] যেমন নজরুলের কবি খ্যাতিকে আকস্মিকভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল তেমনি সিরাজীকে জনপ্রিয় ও প্রখ্যাত করেছিল অনল প্রবাহ।

ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় অনলপ্রবাহ কাব্য সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হয়,[৩] প্রায় একই সময়ে তিনি বেশ বিতর্কিত হয়ে ওঠেন।[৪] দুটো ক্ষেত্রেই, অর্থাৎ প্রশংসাকীর্তন কিংবা নিন্দা জ্ঞাপন উভয়ই তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাবের স্বীকৃতিস্বরূপ। তরুণ কবির প্রতি বিভিন্ন পত্র পত্রিকা উদাসীন থাকতে পারেনি। এতে সিরাজীর লাভ ও ক্ষতি দুটোই হয়েছে, সিরাজী তাঁর কাব্য সাধনায় পরিচিত ও সম্ভাবনাময় জগৎকে বিপুলভাবে আঁকড়ে ধরেছেন অন্যদিকে এ জগতের প্রতিই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেননি। প্রচারক জীবনে মুসলিম গৌরব কীর্তনের ফলে তা থেকে বেরিয়ে আসবার প্রয়োজনও বোধ আদৌ করেননি।

১। পূর্ব, পৃঃ ১৫,৬৭-৬৮।

২। কার্তিক ১৩২৮ 'মোসলেম ভারত'। নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫, পৃঃ ৭-১২।

৩। (ক) ইসলাম প্রচারক, ৩০শে বৈশাখ, ১৩০৭।
(খ) জ্ঞানেন্দ্রমোহন বসু, ইসলাম প্রচারক, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯।

৪। পূর্ব, পৃঃ ৫৫-৫৯, ৭৯-৯০।

Dhaka University Institutional Repository

কেউ কেউ হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত' কবিতার সঙ্গে[১] অনলপ্রবাহের সাদৃশ্য অনুভব করেন,[২] তুলনাটি যুক্তিসংগত। হেমচন্দ্রের রচনা থেকে সিরাজী অনুপ্রেরণা পেতে পারেন। হেমচন্দ্রের কবিতা শিল্পরূপে মণ্ডিত, সিরাজী কবিতায় আহবানের ওপর জোর দিয়েছিলেন। হেমচন্দ্রের কবিতা জাতীয়ভাবে উদ্দীপ্ত শিক্ষিত পাঠকের চিত্তে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু সিরাজীর কবিতা এ সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছিল। এর অবশ্য অন্যতম কারণ হল সিরাজীর প্রচারক জীবন, তাঁর কণ্ঠে ছিল আহবান, যাতে অনল প্রবাহ।

ঐতিহাসিক ইসলামের পুনরাবির্ভাব এবং ভারতের স্বাধীনতা কামনা একত্রে সিরাজীর মন ও কবি মানস পুষ্ট করেছিল তার প্রকাশ ঘটেছে অনলপ্রবাহ কাব্যে।[৩] এদিক দিয়ে সিরাজীর অনলপ্রবাহ কাব্য সমশ্রেণীর অন্যান্য কবি বা লেখকের রচনাসমূহের তুলনায় বিশিষ্ট বা ব্যতিক্রমী।

সিরাজীর 'অনলপ্রবাহ' বক্তৃতাধর্মী বা বক্তব্যপ্রধান কাব্য। সমাজের কাছে, দেশবাসীর কাছে তাঁর সুনির্ধারিত কিছু বক্তব্য কবিতায় বাণীবদ্ধ রূপ পেয়েছে এখানে। বক্তব্যটি বলতে পেরেছেন কিনা এবং বক্তব্যের ওজন ও শক্তিকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন প্রকাশের সুষমতাকে নয়। এ কারণে এসব কবিতা তাঁর কণ্ঠস্বরের মতোই দীপ্তিপূর্ণ, সাহিত্যবিচারে কোন কোন দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ। অনলপ্রবাহের কাব্যে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্তগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সে আলোকে নতুন সমাজ গঠনের জন্য তিনি তরুণ সমাজকে আহবান জানিয়েছেন। সিরাজীর এ আহবান ছিল আন্তরিক, সেকারণে তরুণ হৃদয়ের কাছে, যুবশক্তির সমাজের কাছে যেয়ে তা পৌঁছাতে পেরেছিল। "আমার দীপ নব্য যুবগণ" এর হাতে এ গ্রন্থ উৎসর্গ করে তিনি তাদের বিপুল দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন।

অনল প্রবাহ গ্রন্থে সংকলিত সর্বমোট কবিতার সংখ্যা বারোটি, এগুলো (ক) স্বদেশ সম্পর্কিত ও (খ) মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কিত। স্বদেশ সম্পর্কিত কবিতা অনলপ্রবাহ, তূর্যধ্বনি, মূর্ছনা, বীরপূজা, স্বাধীনতা বন্দনা, উন্মেষণা, অভিভাষণ, আর্যীর আগমনে, সাধনা, ও আর্যীর অর্চনা, মুসলিম বিশ্বসম্পর্কিত কবিতার মধ্যে রয়েছে মিশরের অভ্যুত্থানে, মোসলেমের প্রতি, ও মরক্কো সঙ্কটে। এগুলোর মধ্যে বক্তব্য প্রায় ক্ষেত্রেই পরস্পর মিশ্রিত এবং কবির মূল লক্ষ্য হল স্বজাতি ও স্বদেশ এবং শেষে বিশ্ব মুসলমান ভ্রাতৃত্ব। স্বজাতি ও স্বদেশকে অবলম্বন করে কেবল অনলপ্রবাহ নয়, সিরাজীর জাগরণমূলক অন্যান্য কবিতাও এভাবে শ্রেণী করণ করে নেয়া যায়।

১। ভারত সঙ্গীত, কবিতাবলী, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১৫-২১, [illegible],
[illegible]

২। আবদুল কাদির—সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, জীবন কথা ও সাহিত্যকীর্তি, সি—র, পৃঃ ৪১৪।

৩। মুজীবুর রহমান খাঁ—অনলপ্রবাহের কবি, মাসিক মোহাম্মদী, পৌষ, ১৩৬২।

Dhaka University Institutional Repository

দুই

গ্রন্থের সূচক কবিতা অনলপ্রবাহ, সিরাজীর কবিজীবনেরও এটা সূচক। মাত্র বিশ বছর বয়সে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে বাস্তব ধারণা থেকে তিনি এ কবিতা রচনার প্রেরণা অনুভব করেন তা নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। কবিতাটি যেভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল, কবিযশপ্রার্থী একজন তরুণের চিত্তকে তা সহজেই নাড়া দেয়।

অযোধ্যা, পাঞ্জাব এবং বোম্বাইয়ের মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর। কিন্তু বাঙালী মুসলমানদের নিদ্রা ভাঙল না।

কিভাবে মুসলমানদের এ পতনদশা থেকে উদ্ধার সম্ভব কবি সে সম্পর্কেও চিন্তা করেছেন। আলস্য ও বিলাস ব্যসন ত্যাগ করে বিদ্যা উপার্জন, বাণিজ্য ও সমর চর্চায় মগ্ন হতে হবে। উদ্দীপনাময়ী কবিতা রচনা করে অতীত গৌরব ঘোষণা করতে হবে। কোরআনের শিক্ষা প্রচার, জীবনী ও বীরগাথা রচনা, বাল্যবিবাহ বর্জন করে স্ত্রী শিক্ষা দান, বীর পরিচ্ছেদ পরিধান, মতহারী কলহ ও মতানৈক্য পরিহার, জাতীয় সমিতি স্থাপন করে জাতীয় সঙ্গীত ও ইসলামের মহিমা সম্পর্কে শিক্ষাদান, দেশান্তরে বাণিজ্য করে রজত কাঞ্চন সংগ্রহ, হাতে কর্মের কৃপাণ ধারণ এ সবই মুসলমানের নবজাগরণ সৃষ্টির উপায়।

জাগরণ মুহূর্তকে সংকেতরূপ হিসাবে চিহ্নিত করে কবি বলেছেন :

> "কোথা উল্কারাশি ! সুকর ছাড়িয়া
> দিক্‌দিগন্তরে পড়রে ছুটিয়া
> আলোকছটায় বিশ্ব উজলিয়া
> ভাঙ্গি মোস্লেমের ভাঙ্গিবে ঘুম।"[১]

কবি আজকের প্রভাতে দিনমণিকে নতুন প্রভায় সাজবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, দিগঙ্গনাকে লোহিত বসনে ভূষিত হয়ে উঠবার এবং ঋতুরাজকে কুসুম ছড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন, কেননা ভুবন-বিজয়ী মোস্লেম সন্তান আলস্য পরিত্যাগ করে এ প্রভাতে জেগে উঠবে। এ সময় আকাশ কম্পিত করে বিষাণ এবং নদীবক্ষে তরঙ্গ নাচিয়ে সিঙ্গা বাজবে, অবনী মধুর পরিপূর্ণ করে দুন্দভি, ভেরী, দামামা, ঢক্কা, তুরী, শঙ্খ, করতাল, ঝাঁঝর, বাঁশরী, বীণা, পাখোয়াজ, মৃদঙ্গ, বাঁকারী বাজবে, সে গভীর বিষাদ টুটে যাবে, সুপ্তিতে নিমগ্ন মুসলমান জেগে উঠবে। জাতীয় কলঙ্ক ক্ষালন করে তারা গৌরব কেতন উড়িয়ে দেবে। স্বপ্নদ্রষ্টা কবি মুসলমানের জাগরণ মুহূর্তের স্বপ্ন দেখার পর আবার বাস্তবে ফিরে এসে দেখেছেন মুসলমান তখনো নিদ্রিত। তিনি তাদের পুনরায় আহ্বান জানিয়েছেন, উষা সমাগত, আলস্য, জড়তা, নিদ্রা পরিহার করে ঐক্যবদ্ধভাবে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার সময় হয়েছে। কবির প্রথম আহবান যেমন জেগে উঠবার জন্য, শেষ আহ্বানও তেমনি একই প্রয়োজনে। কবি মুসলমানদের রমনীয় ভবিষ্যতের কথা শুনিয়েছেন। শক্তি দিয়ে তাকে জয় করে নিতে হবে, অনল প্রবাহ সেই সম্ভাব্য শক্তি-

---

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।

শক্তিসাধনার অংশ। কবিতাটি পাঠ করে মনে হতে পারে, আশিসবচনকেই তিনি এখানে ছন্দে গ্রথিত করে তুলেছেন, তা সত্ত্বেও প্রকাশের শিল্পরূপ উপেক্ষিত নয়। কবিতার উৎকর্ষ এখানেই।

তিন

তূর্য্য-ধ্বনি কবিতাতেও একই ভাব প্রতিধ্বনিত।[1] মুসলমানকে আহবান করে তিনি বলেছেন, আর কতকাল নিদ্রিত থাকবে, তোমার উদ্যানের চারু ফুলফল তস্কর কর্তৃক লুণ্ঠিত হচ্ছে। ইংরেজ ও ফরাসীরা এদেশে এসে তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছিল, সেই বণিক জাতির নিকটেই তুমি বাক্‌শক্তিহীন। এ প্রসঙ্গে প্রথম "মূর্চ্ছনা" কবিতায় কবির মূল লক্ষ্য বঙ্গীয় মুসলমান। তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

"ভারতেই দেখ নয়ন মেলিয়া,
অযোধ্যা বোম্বাই পাঞ্জাব মাদ্রাজে
যত মোসলমান সাজি বীর সাজ
মাভৈঃ মাভৈঃ উচ্চারি গভীরে
আরোহিছে সবে উন্নতি শিখরে।
তবে হে তোমরা কিসের কারণ
এখনো রহিবে নিদ্রায় মগন?[2]

'বীরপূজা' কবিতায় কবি বঙ্গবিজেতা বীর গাজী এখতেয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখতেয়ার খিলজীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজয় সম্পর্কে সংশয় পোষণ করেছেন,[3] শিরাজী বঙ্গ ও বিহার বিজয় প্রবন্ধ এবং বীরপূজা কবিতা রচনা করে প্রচলিত কাহিনীকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শিবাজী উৎসব[4] কবিতা সমকালে জনপ্রিয় হয়েছিল, এক ধর্ম রাজ্য পাশে খণ্ড, ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে বন্ধনের আকাঙ্ক্ষা শিরাজীর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। 'বীরপূজা' কবিতায় শিবাজী উৎসব কবিতার প্রভাব পড়েছে। কবি বিপুল আগ্রহ নিয়ে বঙ্গ বিজয়ের দৃশ্য দেখেছেন,

দূর অতীতের গর্ভে দেখিনু চাহিয়া
কি মহা পুরুষ!
বঙ্গে এক দীপ্ত জ্যোতি আসিছে ছুটিয়া
ঘোড়ায় সওয়ার।[5]

১। তূর্য্যধ্বনি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০।
২। মূর্চ্ছনা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫-৪৬।
৩। দুর্গে, পৃঃ ১৭।
৪। সঞ্চয়িতা, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬৪, পৃঃ ৪৭৫-৮১। কবিতাটি সখারাম গণেশ দেউস্করের 'শিবাজীর দীক্ষা' গ্রন্থের ভূমিকা রূপে লিখিত। পরবর্তীকালে কোন গ্রন্থে কবি এটা অন্তর্ভুক্ত করেননি। দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র জীবনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৪-১৫।
৫। বীরপূজা, অনল প্রবাহ, পৃঃ ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যাহ্ন বিভায় দীপ্ত সূর্যের মত সিরাজী এসেছিলেন, বাংলায় এ দুর্দিনে তাঁর বিজয়হেতু কবির হৃদয়াকাশে এখনো উজ্জ্বল, কবি বাংলা ও বিহারে সিরাজীর বিজয় উৎসব করার জন্য বলেছেন, এবং এতে শব-প্রায় মোসলেম জ্বলন্ত ও জীবন্ত পুনঃ হয়ে উঠবে। সমকালীন রাজনীতির প্রভাবে বাংলার ইতিহাসে সিরাজী যেমন সভ্যতার সীমা অতিক্রম করে আসেন, বখতিয়ার খিলজীও তাই। তাঁরা উভয়েই বাংলায় আক্রমণ-কারী, স্বাধীনতার রক্ষক নন। হিন্দুরা প্রতাপাদিত্য উৎসব প্রচলন করেন, সিরাজী ও এর বিপরীতে ঈশা খাঁকে স্থাপন করতে চেষ্টা করেন কিন্তু ঐতিহাসিক কারণেই তা ফলপ্রসূ হয়নি।[১]

স্বাধীনতা বন্দনা কবিতায় স্বাধীনতাকে তিনি প্রতিমারূপ করে তুলেছেন। মফনায়, বঙ্কিম ও স্বদেশী আন্দোলন কালে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষের প্রভাবে কালী প্রতিমা শক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে, স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগে কালী প্রতিমা সম্পর্কযুক্ত হয়। প্রতিমা বিরোধী সিরাজীর চিত্ত জয় করেছিল শক্তি উপাসনার রোমান্টিকতা, কবিতার মধ্যেই তার পরিচয় পরিস্ফুট। কবি বলেছেন,

> রক্ত বাস-পরিহিতা
> হীরক-কিরীট-বিভূষিতা
> সর্ব মংগল-বিধায়িনী এস এস অয়ি স্বাধীনতা।
> দক্ষিণ করে দীপ্ত কৃপাণ,
> বামে দোলিতেছে বিজয়-নিশান
> নয়নে খেলিছে বিদ্যুৎ-লহরী যেন অনলের জ্বালা
> রূপ লহরীর জ্যোতি-বিচ্ছুরিত বিদ্যুত্তম আলা।
> চরণ ভরে চূর্ণিত গিরি লুণ্ঠিত পদতলায়
> প্রলয়-শিঙ্গা ভৈরব নিনাদে গর্জিছে সাজ সাজ।[২]

হিন্দুর মত শক্তিরূপিনীকে স্বরূপে দেখতে বাঁধা ছিল বলে সিরাজী ভিন্ন পথে গেছেন, স্বাধীনতাকেই শক্তিরূপিনী হিসাবে সৃষ্টি করে তার বন্দনা করেছেন। উপন্যাসে হিন্দুর উপাস্য প্রতিমা চূর্ণ করে দেখিয়েছেন যে এতে কোন সামর্থ্য নেই। প্রচারক জীবনে অনুসারীদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য উপন্যাসে তিনি যা ভেঙেছেন, রাজনৈতিক শক্তির উৎস সৃষ্টির জন্য কবিতায় তা স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে নির্মাণ করেছেন।

১। পূর্বে, পৃঃ ২১, ও তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
২। স্বাধীনতা-বন্দনা, অনল প্রবাহ, পৃঃ ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার কৃপা কটাক্ষপাতে নব জীবনের শক্তি সঞ্চার করেছেন যার ফলে আঁধার দেশ হবে বিশ্বোজ্জ্বল কিরণে দৃপ্ত উঠবে। স্বাধীনতাকে তিনি 'অরাতি কম্পন-শঙ্কিনী' 'কল্যাণ-রূপিনী' রূপে সম্বোধন করেছেন।

সিরাজীর সাহিত্য ও জীবনের অন্যতম মূল সুর এই স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতার জন্য তিনি দুবার কারাবরণ করেন, প্রথম বার এই অনলপ্রবাহের জন্যই। যেহেতু [illegible] প্রকাশিত সংস্করণ এবং প্রথম সংস্করণে এ কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। উদ্বোধন কাব্যে এটা মুদ্রিত হয়। সম্ভবতঃ অনলপ্রবাহের জনপ্রিয়তা দেখে তিনি স্বাধীনতার বাণীরূপটি অনলপ্রবাহের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। অনলপ্রবাহ যে জন্য বাজেয়াপ্ত হয় এ কবিতাটিও তার অন্যতম কারণ হতে পারে। এ ছাড়া অনল প্রবাহের অন্য দুয়েকটি কবিতায় ইংরেজ সম্পর্কেও প্রকাশ্য কটূক্তিও ছিল, এগুলো সম্মিলিতভাবেই ইংরেজের কবিকুলে বিদ্বেষ ছড়ানোর কারণ হয়ে ওঠে।

'উন্মেষণা' কবিতায় কবি বাংলার মুসলমানকে বিপুল সম্ভাবনার কথা শুনিয়েছেন, বিপ্লবের তূর্য বাজলে, ভারতভূমিও জেগে উঠবে, বৈদেশিক প্রভুশক্তি "সমূলে হইবে উৎপাটিত।"[১] এ মুহূর্তে প্রস্তুত না হলে ভারতভূমিতেই স্পেনের অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটবে, মুসলমানদের গৌরবময় চিহ্ন সমূহ অবলুপ্ত হয়ে যাবে। কবি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন, একমাত্র শক্তিচিহ্ন আর কিছুতেই পরিত্রাণ নেই। 'অভিভাষণ' কবিতায় তিনি আশার তপন নব্য যুবকগণকে সাহিত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বিলাসব্যসন পরিহার করে একদল যুবককে দারপরিগ্রহণ না করে দেশোন্নতিতে এগিয়ে আসবার জন্য আহবান জানিয়েছেন।[২] বিবেকানন্দের সেবা-ধর্মের প্রভাব সিরাজী গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, এজন্য বিভিন্ন সময়ে অবিবাহিত মুসলিম যুবকদের দ্বারা দেশ সেবার কথা বলেছেন।[৩] এমন কি উপন্যাসেও সিরাজী নজীব ও ফিরোজার দাম্পত্য জীবন যাপনের সুযোগ দিলেন দেশোদ্ধার ব্রত সমাপনের পর।[৪] ~~এমন কি~~ দেশোদ্ধারব্রত যখন ধর্মের অঙ্গ, সেই মুহূর্তে ঘোষণা করেছেন,

শুধু রবে আর নামাজ রোজায়
হজ্জ ও জাকাত কোরবানী কি ক্রিয়ায়
হবেনা হবে না পুণ্যের সাধন
উদ্ধারের ব্রত না নিলে গ্রহণ
বিফল বিফল বিফল সে।[৫]

১। উন্মেষণা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।
২। অভিভাষণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১।
৩। পূর্বে, পৃঃ ৪২-৪৩।
৪। পূর্বে, পৃঃ ১৪১, ১৪৪।
৫। অভিভাষণ, অনল প্রবাহ, পৃঃ ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository.

প্রায় একই কথা কবি অন্যত্রও উচ্চারণ করেছেন।[১] দুঃখ রাত্রির অবসানের জন্য প্রয়োজন আত্মদান, কেবলমাত্র ধর্মীয় আচার পালন নয়। চাকুরীর ব্যাপারেও অনীহা প্রকাশ করেছেন,

ছুঁড়ে চাকুরীর প্রলোভনে পড়ি
কেন বা পরিব গোলামীর বেড়ী?
কেন রব ভক্ত হইয়া অধম ?
কেন বা রহিব অন্তর দুর্বল?[২]

চাকরী সম্পর্কে অনীহা শিরাজীর অন্তর থেকে উৎসারিত। সরকারী চাকুরীর মুসলমানদের প্রতিবন্ধক, এটা তিনি অন্তর দিয়েই অনুভব করতেন, সেকারণে ব্যক্তিগত জীবনেও দারুণ অর্থসংকটে পড়ে পুত্রের জন্য সরকারী চাকুরীর চেয়ে বেসরকারী চাকুরী ভাল মনে করেছেন।[৩] শিরাজীর পরবর্তীকালে নজরুলও চাকুরীর তকমার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।[৪]

'আমার প্রাণধনে' কবিতায় সোনার ভারত পরাধীনতার ফলে পড়ে কিভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। পরাধীন ভারতে মুসলমানের মত হিন্দুর লুপ্ত গৌরবকেও কবি স্মরণ করেছেন, হিন্দুর ভাগ্যহীনতার প্রতিও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছেন।[৫] 'আমার অভ্যর্থনা' কবিতায় বৃটিশ শাসনের পতন দেখে কবি চিত্ত উৎফুল্ল হয়েছে, 'দীপনা' কবিতায় মুসলিম সমাজের অধঃপতন সম্পর্কে বেদনাবোধ প্রকাশিত।[৭]

অনলপ্রবাহ কাব্যগ্রন্থে এ শ্রেণীর কবিতায় শিরাজী পরাধীন ভারতের দুর্দশা সম্পর্কে মর্মযাতনা প্রকাশ করেছেন। হিন্দুর পরাধীন অবস্থায়ও বেদনাবোধ করেছেন, কিন্তু একই সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, জীবন সংগ্রামে হিন্দু মুসলমানের তুলনায় অনেক অগ্রসর। পাশাপাশি দেখতে পেয়েছেন মুসলিম বিশ্বের অতীত গৌরব। পরাধীন ভারতেও অযোধ্যা পাঞ্জাব বোম্বাই, ইত্যাদি অঞ্চলের মুসলমানরা জীবনযুদ্ধে অগ্রসর, কেবল বাঙালী মুসলমানরাই গভীর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। তিনি কবিতার মাধ্যমে বাঙালী মুসলমানদের কানে ঘুম ভাঙানোর মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, নিদ্রা থেকে জাগরণের মহেন্দ্রক্ষণকে স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থেকেছেন। অনলপ্রবাহ অবশ্য শিরাজীর বিক্ষুব্ধ হৃদয় আশার বাণীতে মুখরিত। তিনি মুসলমানদের চৈতন্য-

---

১। (ক) মিলনের অভ্যুত্থানে, প্রাগুক্ত, পৃঃ৬৪।
(খ) মরক্কো সঙ্কটে, প্রাগুক্ত, পৃঃ৮৭-৮৮।
২। অভিভাষণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ৮৩।
৩। সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের নিকট পত্র, পরিশিষ্ট। ব্যক্তিগত এ পত্রে শিরাজীর নিজেকে মোটেই আড়াল করেননি।
৪। "গোলামীর চেয়ে শহীদি-দর্জা অনেক ঊর্ধে জেনো
চাপরাশির ঐ তকমার চেয়ে তলোয়ার বড় জেনো।"—নতুন চাঁদ, (১৯৪৫) নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃঃ ৪১। আমার নিবেদন, পৃ: ২৫-২৭।
৫। আমার প্রাণধনে, অনল প্রবাহ, পৃঃ ৯৪।
৬। আমার অভ্যর্থনা, অনল প্রবাহ, পৃঃ১০৪।
৭। দীপনা, অনল প্রবাহ, ১০৪।

-হীন অবস্থা দেখে আহত হয়েছেন, কিন্তু হতাশ হননি। তিনি গভীর আগ্রহ নিয়ে প্রত্যাশা করে আছেন, একদিন তাঁর কবিচিত্ত থেকে নির্গত অনলপ্রবাহ চতুর্দিক প্রজ্জ্বলিত করে নতুন দিনের সম্ভাবনাকেই নিশ্চিত করে তুলবে। এবং সেদিন দূরে নয়, তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, বাস্তবের সাধনাতে অগ্রগণ্য হয়েছেন, আবার স্বপ্ন রচনা করেছেন। তাঁর এ স্বপ্ন রচনা অনলপ্রবাহের অন্যতম সুর, বাঙালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ নির্মাণই তাঁর লক্ষ্য। বিশ্বমুসলমানের গৌরবকে তিনি নিয়েছেন বাঙালী মুসলমানের সৌভাগ্যসৃষ্টির উপকরণ হিসাবে কিন্তু লক্ষ্য হিসাবে নয়। সেই সঙ্গে বাঙালী মুসলমানদের পুরুষকারকে, তাঁদের শক্তিময় সত্তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। ভাগ্য সৃষ্টি হয় না, শক্তি দিয়ে সাহস দিয়ে, ক্ষমতা দিয়ে, তা অর্জন করে নিতে হয়, সেজন্য সিরাজী অনবরত আঘাত দিয়ে মুসলমানদের সেই শক্তিকেই জাগাতে চেয়েছেন, নিয়তিকে জয় করতে চেয়েছেন। তাঁর সেই জয়ের অভিপ্রায় ও আবেগ অনলপ্রবাহ কবিতাসমষ্টির মর্মবাণী। প্রচারক জীবনেও তিনি কর্মে এ বাণীই নিদ্রিত ও অবনতচিত্ত মুসলমান সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার সাধনা করেছেন, কবিতাকে সে অভিলষিত বাণীরূপের ধ্বনিতে অভ্যস্ত করে তুলেছেন। সে কারণে এসব কবিতায় বক্তব্য মুখ্য হয়েছে, তুলনামূলকভাবে শিল্পকর্ম গৌণ। মুসলমান সমাজের জাগরণ মুহূর্তে সিরাজীর কবিতা ও বাগ্মিতার প্রয়োজন ছিল বাস্তব, তাঁদের আত্মপ্রতিষ্ঠা কিংবা আত্মরক্ষার মুহূর্তে বক্তব্যের প্রয়োজন ছিল সমধিক, সেজন্য অনল প্রবাহ কেবল কবিতা নয়, শক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রকাশও বটে। অগ্রসর হিন্দু সমাজের সামনে মুসলমান যখন দ্বিধা ও সংকোচে আন্দোলিত সে সময় সিরাজীর অনলপ্রবাহ কাব্য মুসলমান সমাজকে নাড়া দিয়েছিল। অনলপ্রবাহ বাজেয়াপ্ত হবার অন্যতম কারণ হল স্বাধীনতা ও বিদেশী [illegible] শক্তি সম্পর্কে উদ্ঘোষণ এবং সম্ভবতঃ এ কাব্যের জনপ্রিয়তা। বাজেয়াপ্ত অবস্থায় না থাকলে বাস্তব প্রয়োজন ও জন-প্রিয়তার কারণে কবির হাতেই এর সংশোধন সংযোজন, কিংবা আরো কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হত অনুমান করে নেয়া যায়। এক্ষেত্রে জনপ্রিয়তার কারণ অবশ্য প্রকাশিত বক্তব্যের সমকালীন মূল্য, কবিও এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কেবল অনলপ্রবাহ কাব্য নয়, পরবর্তীকালেও বহু কবিতায় নানাভাবে এগুলো উচ্চারণ করেছেন।[১]

হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের ব্যাপারে স্পষ্টোক্তিও স্মরণীয়। সিরাজী হিন্দুর পূর্বগৌরব ও বর্তমান হীনাবস্থা সম্পর্কে যেমন দুঃখ করেছেন, তেমনি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও হিন্দুর প্রতি আপাতঃ বিদ্বিষ্ট ও হয়েছেন। মুসলমানের মত হিন্দুর প্রাচীন গৌরব কীর্তন এবং বর্তমান পরাধীনতার গ্লানি বর্ণনা করার পর অগ্রসর হিন্দু সম্পর্কে এসব মন্তব্য পুরোপুরি বিদ্বেষ বলা বোধ হয় সংগত নয়। লক্ষণীয় হল

১। "দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ব্যাপী সাহিত্য সাধনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে মোটামুটিভাবে অনলপ্রবাহের বাণীরই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যাবে প্রায় সর্বত্র।" ড: মুহম্মদ নুরুল ইসলাম-মুসলিম বাংলা সাহিত্য পাঠ পরিক্রমা, পৃ ১১১। [illegible]

বাঙালী মুসলমানের সৌভাগ্য নির্ধারণের জন্য শিরাজী কেবলমাত্র হিন্দুর তুলনা দেননি, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অগ্রসর মুসলমানদের তুলনাও দিয়েছেন। কিন্তু বাঙালী মুসলমানদের অব্যবহিত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ছিল অগ্রসর হিন্দু সমাজ, সুতরাং প্রতিযোগিতামূলক সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে প্রতিবেশী শিক্ষিত হিন্দুর সঙ্গেই। শিরাজী বাঙালী মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের সংগে সংঘাতে আসেননি তা নয়, কিন্তু দৈনন্দিন মুহূর্তে তা সর্বত্র বড় হয়ে দেখা দেয়নি অবস্থানগত দূরত্বের কারণেই। প্রকৃতপক্ষে তিনি বাংলায় মুসলমানদের দুর্দৈব প্রশ্নে শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু ও মুষ্ট অবাঙালী মুসলমানদের মধ্যে দোদুল্যমান চিত্ত হয়েছেন।[১]

শিরাজীর লক্ষ্য ছিল ইংরেজের অধীনতা থেকে সম্মিলিতভাবে হিন্দু ও মুসলমানের মুক্তি অর্জন, এবং হিন্দুর চেয়ে মুসলমানদের বড় কিংবা তাদের সমান করে তোলা। তিনি একই [illegible] ইংরেজের নিকট থেকে জ্ঞানবিদ্যা [illegible] আহরণের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি দেখাননি, কিন্তু তাঁদের রাষ্ট্রনৈতিক আধিপত্য মানতে চাননি। হিন্দু যেহেতু আপন অধিকারেই শিক্ষা ও সম্পদে মুসলমানের চেয়ে এগিয়ে ছিল, শিরাজী হিন্দুকে নামাতে চাননি বরং মুসলমানকেই তাদের সমান করতে চেয়েছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিরাজী তুচ্ছ চাকুরীর প্রলোভন ছেড়ে জাতিগত নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য আহ্বান জানিয়েছেন বাঙালী মুসলমানকে, হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত বাঙালীকে, জাতিধর্ম ভাষা নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে। অনলপ্রবাহের এ শ্রেণীর কবিতাগুচ্ছ এ আহ্বানে মুখরিত, এ আহবান মোটামুটিভাবে কালানুক্রমী।

চার

অনলপ্রবাহ কাব্যে অন্য শ্রেণীর কবিতা বিশ্বমুসলমান সম্পর্কিত, এখানেও শিরাজীর প্রধান লক্ষ্য ছিল বিশ্বমুসলমানের নজীর সামনে রেখে বাঙালী মুসলমানের অধীনতা মোচন। বাঙালী মুসলমানের ভাগ্য সন্ধান করতে যেয়েই তিনি ভারতের সীমা অতিক্রম করে গেছেন ও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের গৌরব এবং অগৌরব দুটোই দেখেছেন। মুসলমানদের অতীত ছিল গৌরবোজ্জ্বল, কিন্তু বর্তমানে দুর্দশা দেখে শিরাজী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন এবং তারও কারণ হিসাবে দেখতে পেয়েছেন মুসলমানদের অনৈক্য। ঐক্যবদ্ধ মুসলমানদের সম্ভাব্য শক্তির মাহাত্ম্য তিনি অনুমান করে নিয়েছেন। কিন্তু সকল অঞ্চলের মুসলমানের ঐক্য কামনা করলেও সে কারণে রাষ্ট্রীয় সীমা মুছে দিতে চাননি। মুসলমানদের পারস্পরিক উন্নতির সহায়ক হিসাবে সহমর্মিতা চেয়েছেন, আধিপত্য নয়। এজন্য ফিরোজা বেগম উপন্যাসে শিরাজীর আকাঙ্ক্ষিত পাত্র পাত্রীরা আফগান পাত্রীকে দেশে নিয়ে এসেছেন, আবার লেখক তাঁর ফিরে যাবার ব্যবস্থাও করেছেন। ভারতীয়

১। পূর্বে, পৃঃ ১৩, ৬৩-৬৪, ৭১-৭২।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের লুপ্ত সাম্রাজ্য পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সাহায্য চেয়েছিলেন মাত্র। বিশ্বমুসলমানের সঙ্গে বাংলার সংযোগকে শিরাজী এভাবেই দেখেছিলেন।

নবপ্রবাহ কাব্যগ্রন্থের 'রিফের অভ্যুত্থানে' কবিতায় কবি রোমাঞ্চিত হয়ে দেখেছেন, সুদীর্ঘ সুপ্তি নিদ্রাটে ছেড়ে মুসলমান আবার জেগে উঠেছে। অন্যত্র, খৃস্টানদের লুণ্ঠন করে তোলার পর যে জাতি নিদ্রিত হয়ে পড়েছিল তাদের জাগরণ মুহূর্ত প্রায় সমাগত। আফ্রিকাবাসী মুসলমানদের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন,

সমগ্র আফ্রিকা হতে শ্বেত দস্যুগণে
দেহ খেদাইয়া ফিরা বলহ জীবনে।
চৈত্রমাসে পূর্ণবায়ু
উড়ায় যথা তুলায়
কিম্বা যেমনরে যথা বৈশাখ-পবনে,
তথা তুচ্ছ কেন দূর শ্বেত দস্যুগণে।[1]

আফ্রিকায় শ্বেত দস্যুগণের সঙ্গে স্বদেশে ইংরেজের উপস্থিতিও তিনি এক করে দেখেছেন। এক অঞ্চলের মুসলমানেরা শ্বেত দস্যুদের বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়েছে বলে শিরাজী হৃদয়ের আবেগ চেপে রাখতে পারেননি, সম্ভবত প্রকৃতি জানিয়ে আফ্রিকাবাসীদের বলেছেন, তাদের বিতাড়ন কিংবা প্রাণ সংহার করা হোক। নিজ বাসভূমে শ্বেতকায়দের হাতে পরাধীন হয়েও তিনি আফ্রিকাবাসী মুসলমানদের সাহসী ও বিদ্রোহী হবার জন্য বিপুল উৎসাহ দিয়েছেন। স্বাধীনতার জন্য শিরাজীর তীব্র আকাঙ্ক্ষা এসবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত।

'স্পেনের প্রতি' কবিতায় তিনি মুসলমান অধিকৃত স্পেনের পূর্ব গৌরব স্মরণ করেছেন এবং বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে দুঃখবোধ করেছেন। কালপ্রবাহে সে গৌরব এখন বিলীন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কবি নিরাশ হননি, অনাগত সুপ্রভাতের জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করে আছেন। 'শ্বেতাঙ্গ ফরাসী দস্যু মরক্কো গ্রাস করতে উদ্যত হলে কবিচিত্ত যেভাবে বিচলিত হয়েছে তার পরিচয় রয়েছে 'মরক্কো সঙ্কটে' কবিতায়। মুসলমানদের তিনি এভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, 'শ্বেতাঙ্গ-দানবগণে এখনো তারা চিনতে পারেনি, এবং

'সুখময় স্বর্ণধাম লুটিতে তাহারা
তরবারি ভিন্ন কিছু নাহিক উপায় আর।[3]

১। রিফের অভ্যুত্থানে, নবপ্রবাহ, পৃঃ৬২-৬৩।
২। স্পেনের প্রতি, প্রাগুক্ত, পৃঃ৭৯।
৩। মরক্কো সঙ্কটে, প্রাগুক্ত, পৃঃ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) উচ্ছ্বাস

এক

অব্যবহিত প্রকাশকালের দিক দিয়ে অনলপ্রবাহের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'উচ্ছ্বাস'। গ্রন্থটি ৪৩ পৃষ্ঠায় আট সর্গে বিভক্ত, সর্গবিভাগ দেখে একে জাতীয় আখ্যান কাব্য বা মহাকাব্য বলে মনে হয়, কবির ইচ্ছাও সে রকম থাকতে পারে। "হয়ত তখনকার সাহিত্যরীতি অনুসরণ করতে গিয়েই তিনি এই গীতিকাব্যটিকে তথাকথিত মহাকাব্যের পোষাক পরাতে চেয়েছেন।"[1] কাব্যে কাহিনী অংশ ক্ষীণ এবং দুর্বল, কাহিনীর কোন সূচনা বা পরিণতি নেই, সুতরাং প্রচলিত অর্থে একে আখ্যান কাব্য বলা সংগত নয়। প্রথম দিকে কাহিনীর ইঙ্গিত থাকলেও পরে তেমন নেই। আরবের মরুভূমিতে মহানবীর আবির্ভাবের ফলে আরবভূমির অন্ধ তম বিমোচনের বর্ণনা দিয়ে কাব্যারম্ভ, ইসলামের স্পর্শে আরবদের জাগরণও বিধৃত হয়েছে। বিশ্ববাসী ইসলামের সে গৌরবময় আলোকোজ্জ্বল দিন আর নেই, কিন্তু কবি তবু আশা ছাড়েননি, মোটামুটিভাবে এটাই উচ্ছ্বাস কাব্যের বিষয়বস্তু। কেউ কেউ উচ্ছ্বাস কাব্যকে "মুসাদ্দাসে হালী" ধরণে রচিত জাতীয় কাব্য"[2] বলে মনে করেছেন।

অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন আরবের প্রাক যুগে তাদের অবস্থাও কবি বর্ণনা করেছেন যে বেদীমূলের পৌত্তলিক প্রতিমার তলে লুপ্ত হয়ে যায়।[3] এ পরিস্থিতিতেই উজ্জ্বল আলোকের সন্ধান দিয়ে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আরবের মরুভূমিতে অবতীর্ণ হন। এরপর পৃথিবীতে সত্যধর্ম প্রচারিত হয়, মুসলমানরা বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়।

কবি প্রাচীন ইতিহাসকে অবলম্বন করেছেন, সমুদ্রবেষ্টিত বিশাল বঙ্গভূমি দুঃসাহসী সপ্তদশ মুসলমান কর্তৃক বিজিত হয়েছিল, কিন্তু তাদের উত্তরপুরুষেরা এখন অবনতশির। মুসলমানের নিকট যে সব বিদেশী ভিক্ষুকের বেশে পররাজ্যগ্রাসে দাঁড়িয়েছিল তাদের কাছে এ ভারতভূমি এখন হতমান।

মুসলমানদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাদের অর্থ আছে, কিন্তু সুজাতির জন্য তাদের মাথা-ব্যথা নেই। কেউ কেউ সুজাতির অর্থ শোষণ করে বিজাতিকে, উকিল মোক্তারকে প্রদান করছে। মাতাপিতার প্রতি তাদের ভক্তি নেই, বন্ধুতে বিশ্বাস নেই, সন্তানের প্রতি স্নেহ নেই, প্রতিবেশীদের প্রতি সহানুভূতি নেই।

১। কাজী আব্দুল মান্নান—আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, পরিবর্ধিত দ্বি সং ১৯৬৯, পৃঃ ৫০০।

২। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী জীবন কথা ও সাহিত্য কীর্তি, পি-র, পৃঃ ৪২০।

৩। উচ্ছ্বাস, পৃঃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসা বাণিজ্যে তাদের রুচি নেই, দাসত্ব ও মজুরিতেই তারা সন্তুষ্ট। কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মুসলমানদের অতীত ইতিহাস এরকম ছিল না,

অশ্ব পৃষ্ঠে শয্যা যার সঙ্গী ছিল তরবার,
কিবা স্থলে কিবা জলে, জয়পতাকা ছিল যার।[১]

ইসলামের প্রতি বিশ্বাসের শৈথিল্যই মুসলমানের এ অধঃপতনের কারণ, সাক্ষাৎ প্রভুর বাণী পবিত্র কোরাণ যারা মেনে চলেন না কিভাবে তাদের দুঃখের যন্ত্রণার অবসান হবে? তুরস্ক এখনো রুমনি-সাগরে বসে বিপুল বিক্রমে যুরোপ শাসন করছে, পাঠানরা এখনো আফগানিস্থানের শাসক, কিন্তু ভারতের মুসলমানগণ নিদ্রিত। মূর্খতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন, জ্ঞানের বন্যা প্রবাহিত হলে সে মোহ কেটে যাবে, শত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অভিনব তত্ত্ব, বিদ্যা, জ্ঞান ও সত্য প্রচার করবে। শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার, জ্ঞান আহরণ, ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান, রুষ, তুর্কী, ইটালী, জাপানী, সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী, ফার্সী, স্পেনিশ, চীনা ইত্যাদি ভাষা শিক্ষা মুসলমানের জন্য উন্নতির সহায়ক। মুসলমানদের সমস্যা সমাধানের উপায়ও কবি দেখিয়েছেন,

বিজ্ঞানকোরাণ সমভাবে যবে,
আবার মোস্লেম গ্রহণ করিবে
নিশ্চয় তখন পোহাবে রাতি।[২]

জ্ঞানকেই শক্তি, ধর্ম, বিশ্বাস, মর্ম, ভক্তি মুক্তি স্বর্গ ও মূলমন্ত্র করে তোলার কথা বলেছেন। স্বজাতিকে শিক্ষাদানের জন্য আহবান জানিয়েছেন, যার ফলে তারা জ্ঞানের সমুজ্জ্বল বাতি জ্বেলে অন্ধকার রজনীর অবসান করে দিতে পারে। জাতীয় উত্থানের জন্য আহবান জানিয়ে কবি এ কাব্য শেষ করেছেন, আহবানটিই মূল কথা। উচ্ছ্বাস কাব্যের প্রতি সর্গ প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্ন এক একটি কবিতা এবং উদ্দেশ্য জাগরণ সৃষ্টি। সর্গ চিহ্ন দিয়ে শিরাজী প্রতি কবিতাংশের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করেছেন, বিচ্ছিন্ন কবিতার চেয়ে সর্গবদ্ধ কবিতা সমষ্টি পাঠকচিত্ত অধিকতর আন্দোলিত করতে পারে এরকম ধারণা থেকেও কাব্যটি এভাবে বিন্যস্ত করতে পারেন। কারণ যাই হোক প্রত্যেক সর্গের আহবানের মধ্যে সম্পর্ক আছে, আটটি সর্গের কাব্যপাঠ শেষ হলে একটি ব্যাকুল কণ্ঠের আহবান পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হয়। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এ আহ্বান এসেছে এমন একজনের নিকট থেকে যিনি বাংলার মুসলমান সমাজের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, তাদের সুখ দুঃখ বেদনা ও আনন্দ অত্যন্ত নিকট থেকে দেখেছেন গভীরভাবে হৃদয়ে অনুভব করেছেন, তা সমাধানের চিন্তা করেছেন, সমাজের অন্যান্য মানুষকে চিন্তা করতে আহবান জানিয়েছেন ও চিন্তার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ২৩।
২. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

উচ্ছ্বাস কাব্য অনলপ্রবাহের সম্প্রসারিত রূপ নয়, বরং পুনরাবৃত্তি বলা যায়। অনলপ্রবাহ কাব্যে বক্তব্য যত অনাবৃতভাবে এসেছে এখানে তা তুলনামূলকভাবে অলঙ্কৃত। বক্তব্যের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। তা সত্ত্বেও অনলপ্রবাহ কাব্যে বিভিন্ন বিষয়ক কবিতা থাকার ফলে যে বৈচিত্র্য আছে, উচ্ছ্বাস কাব্যে একই ধরণের কবিতা কেবলমাত্র সংখ্যাক্রম দ্বারা চিহ্নিত করার ফলে বিষয়ের আপাতঃ বৈচিত্র্য অনুপস্থিত।

(গ) নবউদ্দীপনা

এক

প্রকাশকালের দিক থেকে শিরাজীর তৃতীয় কাব্য নব উদ্দীপনা, দুটি খণ্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থের সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮। প্রথম খণ্ডে 'নবউদ্দীপনা' শিরোনামে ২৭ পৃষ্ঠার একটি মাত্র কবিতা, দ্বিতীয় খণ্ডে জাতীয় সঙ্গীত এবং অন্যান্য কবিতা।

নবউদ্দীপনা কবিতাটি নব্যভারত পত্রিকায় অগ্রহায়ণ, ১৩১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং ১৩১৪ সনে অন্যান্য কবিতা ও গানের সঙ্গে 'নবউদ্দীপনা' গ্রন্থ নামে প্রকাশিত হয়। 'নবউদ্দীপনা' কবিতায় শিরাজী হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত সাধনার ওপর জোর দিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিতে যে পর্যায়ে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক পারস্পরিক সন্দেহের ভারে পীড়িত, শিরাজী তখন 'ভারত মাতার যুগল সন্তান' উভয় সম্প্রদায়কে বিদ্বেষ দূর, অভিমান ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে জাগ্রত হয়ে উঠবার জন্য আহবান জানিয়েছেন। যুগপটভূমিতে শিরাজীর এ দৃষ্টিভঙ্গী সাধুবাদ পেয়েছিল। প্রবাসী পত্রিকায় 'গ্রন্থসমালোচক' মন্তব্য করেন, "উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় হিন্দু মুসলমানের মিলন কামনায় অনেক কবিতা লিখিত হইয়াছে।"[১] বলা বাহুল্য, এ মন্তব্যটি কেবলমাত্র একটি কবিতা নয় সমগ্র গ্রন্থ সম্পর্কে, গ্রন্থটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বোঝা যায়। সাম্প্রতিক কালেও এ গ্রন্থে কবির উদার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি প্রশংসা নিবেদন করে একজন সমালোচক বলেন, "সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এমন বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করতে সে সময়ে আর কোন মুসলমান কবিকে দেখা যায়নি।"[২]

ভারতের রাজনীতি এবং কবিতায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের এ প্রকাশ কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতার উৎস থেকে সৃষ্ট। মুসলমান সমাজ ও ভারতের সমকালীন রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থেকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতের জন্য এটা ঘোর দুর্দিন, একদিকে পরাধীনতা, অন্যদিকে হিন্দু মুসলমানের তিক্ত সম্পর্কের কারণে স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রতিবন্ধকতা, এর মধ্যে শিরাজী তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠ দিয়ে এ বাধা অপসারণ করতে

১। প্রবাসী, কার্তিক, ১৩১০।

২। সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় - স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য। কলিকাতা, বসুধারা প্রকাশনী, ১৩৬৭,

Dhaka University Institutional Repository

চেয়েছেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের তিক্ততা দূর করে তাঁদের স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করে দিতে চেয়েছেন।

বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক কখনো যে আন্তরিক মধুর ছিল তা নয়।[১] কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব স্বার্থ কলহ তখনো ঠিক রাজনৈতিক রূপ নেয়নি। হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ সংঘাত ইংরেজের উপস্থিতিও কূটকৌশলে রাজনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং হিন্দু মুসলমান দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করেছে।[২] বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দুটো সম্প্রদায় বিপরীতমুখী যাত্রা করেছে, সিরাজী উপলব্ধি করেছেন এটার বর্তমান মূল্য যাই হোক না কেন, মূল লক্ষ্য স্বাধীনতার অনুরায়। ঘন মেঘে ভারত-গগন আচ্ছন্ন, ঘরে আগুন লেগেছে, হিন্দু মুসলমান দুই ভাই একত্রে মিলে এ আগুন না নেভালে সকলকেই তাতে পুড়ে মরতে হবে। তারা একত্রিত হলে দাসত্ব শৃংখল ভেঙে পড়বে, ঐক্যবদ্ধ হলে আকাশ এবং সমস্ত উৎপাটন করা সম্ভব। 'আর্য-বংশধর হিন্দুর সন্তান' এবং 'তুরুক বিজয়ী বীর মুসলমান' সবকেই 'হতমান' হয়ে 'পরের পাদুকা খাওয়া হবে'। ইংরেজরা এদেশ থেকে রজত কাঞ্চন সব নিয়ে গেল, এমন কি 'সরলা সুজলা শ্যামলা'ও তাদের সর্বস্ব হারান। হিন্দু দাসত্বে নাম কিনে 'হরিষিত' চিত্ত মুসলমান চেতনাবিহীন। পরের কথায় তাঁরা বলতে চলতে এবং বাঁচতে শিখেছে, সকল বাঙালী হিন্দু মুসলমানকে একত্রে কলঙ্কের কালি মুছে ফেলতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে। তাদের উচিত দেশান্তরে বাণিজ্যে যাওয়া এবং বণিকের চরণ লেহন ও বিদেশী দ্রব্য, বিলাস ব্যসন বর্জন করা। কবি বলেছেন,

হিন্দু মুসলমান হলে এক প্রাণ,
ফুৎকারে উড়িবে পর্বত পাষাণ
নিশ্বাসে ছুটিবে প্রলয় পবন
হুংকারে ছুটিবে কালাগ্নি ভীষণ।[৩]

তিনি দেখেছেন, জাপান এখন মহাপ্রাণ, চীন আফগান সকলেই জাগ্রত। ভারতের পুরাকীর্তি স্মরণ করে নতুন ভারত গড়ে তুলতে হবে। মাতা বসুন্ধরাকে বলেছেন, জগদ্বাসী জাগবে না যদি জ্ঞান

১। (ক) দুরূপের সন্ধানে, পৃঃ ৩৫-৩৮।

(খ) "মুসলমান আমলে Religious কারণে হিন্দুদের উপর অত্যাচার খাড়ুন হত না, হত শুধু political কারণে। আজকাল কোনও কোনও ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান নিজেদের যেরূপ ঘোর fanatic বলে প্রচার করছেন, নবাবী আমলে তাদের জাতভাইরা যে তদ্রূপ ঘোর fanatic ছিলেন, তার প্রমাণ মুসলমান যুগের বঙ্গ সাহিত্যে পাওয়া যায় না।" — শ্রী প্রমথ চৌধুরী-বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান, মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন, ১৩৩০।

২। পূর্বে, প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩। নবউদ্দীপনা, পৃঃ ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে এই মুহূর্তেই 'বিয়োগ বন্ধনে' ভারতকে একেবারে ধ্বংস করে দাও, তাদের নাম অবলুপ্তির সঙ্গে কলঙ্কভারও মুছে যাবে।

দুই

নব উদ্দীপনা গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়টি জাতীয় জাগরণমূলক কবিতাও গানের সমষ্টি, প্রধানতঃ হেমচন্দ্র এবং ডি-এল-রায়ের অনুসরণে এগুলো রচিত। তা সত্ত্বেও ব্যাকুল আহ্বান এবং গানের প্রাণ, সেকারণে হেমচন্দ্র, ডি-এল-রায় প্রমুখের কোন কোন রচনার সঙ্গে বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও মুক্তি পিপাসু সিরাজী চিত্তের প্রকাশ এবং গানে বিশিষ্টতা দান করেছে। কবির স্বচ্ছ চৈতন্যে মুক্তির অনুভূতি গানের বাণীরূপ নির্ধান করে দিয়েছে।

জাতীয় সংগীতের মধ্যে কবি কামনা করেছেন,

"মোসলেম-হিন্দু বিপদ-সিন্ধু
ঐক্য-তরীতে হোক উত্তীর্ণ।"[১]

আকাঙ্ক্ষা কবিতাটি চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর ভুলবশতঃ তাঁর নামে ছাপা হয়েছিল।[২] সিরাজী ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে এ কবিতায় সম্পূর্ণ নিঃসংশয়।

"ভারতবর্ষ ভারতবাসীর
পর অধিকার নেই।"[৩]

স্বজাতির প্রতি যিনি কর্তব্য সাধন করেননি, মহাজ্ঞানী মহা ধনবান অথবা ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও কবি তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন,

জানাও সে নরাধমে জানাও সত্বর
অভাব নগন্য সেই ঘৃণিত বর্বর।[৪]

"কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া" মাইকেল শেষ প্রত্যুত্তরের জন্য যে কবিতা রচনা করেন[৫] তার প্রভাব এখানে পড়তে পারে।

কোন কোন কবিতা ও গানে শিরোনাম দেয়া হয়নি, কেবলমাত্র সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের একটি গানের চরণের প্রভাব রয়েছে ৬ নং গানে । সিরাজী লিখেছেন,

১। জাতীয় সংগীত, প্রাগুক্ত, পৃঃ৩৩।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩। সুরাজ, ৩রা চৈত্র, ১৩১০ সংখ্যায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়।
৩(ক) সিরাজী-চরিত, পৃঃ ১৫৫-৫৭।
৩। [illegible], প্রাগুক্ত, পৃঃ৩২।
৪। মধুসূদন রচনাবলী, পৃঃ ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

শোনরে সকলে পাতিয়া কাণ,
বিধাতার বাণী, -রাখিতে মান।[১]

রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক গান,

আমি আকাশে পাতিয়া কান
শুনেছি শুনেছি তোমারি গান।[২]

৮ নং গানে 'নিজ বাহুবলে চির আকাঙ্খিত ফল' লাভ করার জন্য কবি আহবান জানিয়েছেন।[৩]

১০ নং গানে,

"ধন্য সেই নরকুলে
জীবন যার যায় চলে
জাতীয় উন্নতি হেতু করিবারে উদ্যম"[৪]--

এ অংশে মাইকেলের প্রভাব লক্ষনীয়, যেমন,

সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন।[৫]

১১ নং গানের মর্মবানী হল যে মরতে জানে সে বাঁচতেও জানে, সুতরাং জন্মভূমির হিতের জন্য মৃত্যুবরণ করতে তার ভীতি কোথায়?[৬] ১৪ নং গানটি আরতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৭] এ গানে বঙ্কিমের বন্দে-মাতরম সঙ্গীতের[৮] প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে।

অন্য একটি গানে,

ঐ বাজে রণভেরী কে যাবি ভাই আয়রে।
ধরা ধরে প্রাণ সমরে কে বাঁচিতে চায়রে।[৯]

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যের "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?"[১০] ইত্যাদি অংশের অনুসরণ এখানে থাকতে পারে। তা সত্ত্বেও শিরাজীর কবিতাংশ নজরুলের রণভেরী

১। নব উদ্দীপনা, পৃঃ ৩৩।
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-গীত বিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬৪, পৃঃ৩০৬।
৩। নব উদ্দীপনা, পৃঃ৩৪-৩৫।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ৩৭।
৫। বঙ্গভূমির প্রতি, মধুসূদন রচনাবলী, পৃঃ১৮৭।
৬। নব উদ্দীপনা, পৃঃ৩৭।
৭। আরতি, কার্তিক, ১৩১২।
৮। ব-র, গ্র, পৃঃ৭২৬।
৯। নব উদ্দীপনা, পৃঃ৪০।
১০। পদ্মিনী উপাখ্যান, রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃঃ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতায় ,

ওরে আয়,
ঐ মহাসিন্ধুর পার হতে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়।[১]

এর পূর্বসুরী মনে হয়। প্রার্থনা কবিতায়,

জ্বল্ জ্বল্ জ্বল প্রাণে জ্বল্ মহা দাবানল,
ধমনীতে রক্তস্রোতে বহু করে চঞ্চল।[২]

প্রসংগতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সরোজিনী নাটকে[৩] রবীন্দ্রনাথের[৪] গান,

জ্বল জ্বল চিতা, দ্বিগুন ,দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।

ইত্যাদি স্মরণযোগ্য। সিরাজীর রচনায় এ-গানের প্রভাব পড়েছে।

কেবলমাত্র কোরবানী দ্বারা কোন লাভ নেই, এ প্রসংগে সিরাজী আক্ষেপে দৈবোক্তি করেছেন, এখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

পাঁঠা বা মহিষ বলি কিম্বা গরু কোরবানী
কিছুতে হবে না কিছু শুন এই দৈববাণী--
হৃদয়ের রক্তদানে ভারত জুড়িতে হবে
সুরপের পুন্যরাজ্য হবে প্রতিষ্ঠিত তবে।[৫]--

সিরাজী অতঃপর হিন্দুর নিকট আবেদন করেছেন, একাকী জেগে থেকে সমস্যার সমাধান হবে না, জ্ঞানের অঞ্জন দিয়ে মুসলমানদের জেগে উঠতে সহায়তা করা আবশ্যক। মুসলমানদের ম্লেচ্ছ, যবন বলা কিংবা অধম মনে করা অনুচিত। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা প্রেম সাধনায় আপন হয় না।[৬] মুসলমানদের উদ্দেশ্য করেও বলেছেন ভারতভূমিতে হিন্দুর সংগেই তার ভাগ্য জড়িত।[৭] ২৪,২৫,২৬,২৭,২৮, ২৮,২৯ ও ৩০ নং গানে ডি-এল-রায়ের প্রভাব স্পষ্ট।

নবউদ্দীপনা গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে কবিতা ও গানের সর্বমোট সংখ্যা পঁয়ত্রিশটি, এখানে কবি হিন্দু ও মুসলমানকে বিভেদ ভুলে সম্মিলিত সংগ্রামের জন্য আহবান জানিয়েছেন। এগুলোর সুর সুর প্রায় অভিন্ন, গানে পূর্বসুরীদের প্রভাব থাকলেও কেবল জাগরণ নয়, কোন কোন অংশে দেশাত্মবোধও স্থান পেয়েছে।

১। অগ্নিবীণা, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খন্ড, পৃ:৩৮।
২। নবউদ্দীপনা, পৃ: ৪৩।
৩। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খন্ড, পৃ:২৮৫-৮৭।
৪। রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক, পৃ:৪৭,৫০।
৫। প্রার্থনা, নবউদ্দীপনা, পৃ:৪৪।
৬। হিন্দুর প্রতি, প্রাগুক্ত, পৃ:৪৫।
৭। মুসলমানের প্রতি, প্রাগুক্ত, পৃ:৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) উদ্বোধন

এক

প্রকাশকালের দিক থেকে তৃতীয় গ্রন্থ 'উদ্বোধন' কাব্যের চেয়ে নব উদ্দীপনা গ্রন্থে কবিচিত্ত অনেকখানি অগ্রসর। উদ্বোধন কাব্য প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে, গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা সর্বমোট ১০৮। গ্রন্থটি কবি মাতা নূরজাহান খানমকে উৎসর্গ করেন।[১] এ কাব্যের চারটি কবিতা অনলপ্রবাহ দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত হয়[২]। অনলপ্রবাহের মত এ গ্রন্থের কবিতাগুলিকে দুভাগে শ্রেণীকরণ করা যায়, (ক) স্বদেশ ও (খ) মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কিত।

ক। প্রথম কবিতা 'বোধন-গীতি', সর্বগুণ অনুরাগী বিলাসুদের বাংলা অধিকার করেছিল, তাদের বংশধর এখন অলস ও নিদ্রাগত। দুঃখ শোক সহ্য করেই জাতীয় উন্নতি সম্ভব, যে মুসলমান তাতে বিমুখ নরকই তার আশ্রয়। কবির মতে বাংলার নিদ্রিত মুসলমান।[৩] 'এই কি সে দেশ' কবিতাতেও একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। পার্থক্য সংগে ভারতের প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাসের কথা স্মরণ করেছেন, গঙ্গা, গোদাবরী, সিন্ধু নর্মদা, কৃষ্ণা, কাবেরী "যামলেম সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হেরি" নিরন্তর করুণসুরে ক্রন্দনরত। সৃষ্টি কর্তার কাছে কবি ভারতের নতুন উদ্ভাসিত করে দেবার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন, জ্ঞান অর্জনই স্বাধীনতার প্রসূতি।[৪] অতীত ও বর্তমানের তুলনার মাধ্যমে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং পতিত অবস্থা দূরীকরণ "কল্য ও অদ্য" কবিতার লক্ষ্য।[৫] 'অতীত কাহিনী' কবিতায় একই ভাব পুনরাবৃত্ত।[৬] "বিলাপ" কবিতায় অতীতের সংগে বর্তমানের তুলনা করে কবি মহাপুরুষ মোহাম্মদের (দঃ) পুনরাবির্ভাব কামনা করেছেন। ইসলাম রানীকে মোহাম্মদের (দঃ) কন্যা হিসাবে কবি কল্পনা করেছেন, সন্তান কুলের দুর্দশা দেখে শোকে রানীর চোখে অশ্রু নির্গত হচ্ছে, এবং সে "উচ্ছ্বাসে সিন্ধু করে নিযুক্ত রোদন।"[৭] 'চাঁদ সুলতানা' কবিতায় চাঁদ সুলতানার বীরত্বের মহিমা কীর্তন করেছেন।[৮] বজ্রধ্বনি কবিতাটি দীর্ঘ, সুদূর বঙ্গের নিদ্রিত মুসলমানদের সুপ্তি থেকে জাগরণের জন্য আহবান জানানো। মুসলিম বিশ্ব, এমন কি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানও অর্ধে অগ্রসর,

"ধিক রে বাঙালি! আজি কাঁদায়
(কুলের বধূর কলঙ্কের ডালি)
এখনও তোরা ঘুম ঘোরে রলি,—"[৯]

১। পূর্বে, পৃঃ ৬৩।
২। পূর্বে, পৃঃ ১৭২।
৩। বোধন গীতি, উদ্বোধন, পৃঃ৪।
৪। এই কি সে দেশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ১৪।
৫। কল্য ও অদ্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ১৫-২০। কবিতাটি অক্টোবর, ১৯০৪ সংখ্যা ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।
৬। অতীত কাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃঃ৩৮।
৭। বিলাপ, প্রাগুক্ত, পৃঃ৩৯-৪০।
৮। চাঁদ সুলতানা, প্রাগুক্ত, পৃঃ৫৭।
৯। বজ্রধ্বনি, প্রাগুক্ত, পৃঃ৮৫। এবং পূর্বে পৃঃ৬০-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানের উত্থানের সম্ভাবনায় মুগ্ধ দেখেই কবি এ কবিতা শেষ করেছেন। উদ্বোধন কাব্যের শেষ কবিতা 'আরব'[১]। মরুভূমি সভ্যতার অন্ধকারাচ্ছন্নতার, পৌত্তলিকতা বিচূর্ণ করে এখানেই সত্য ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল, এবং পৃথিবীকে তা আলোকমালায় বিভূষিত করেছিল। মুসলমানদের বর্তমান সুপ্তিমগ্নতা সাময়িক ব্যাপার, এর অবসান হবেই। কবি মুসলমানদের শ্রেয় বোধটিকে জাগাতে চেয়েছেন, রাজশক্তির নব উত্থানের সংগে ধর্মবোধের মিলনের ফলে এটা সম্ভব বলে মনে করেছেন।

প্রকাশকালের দিক থেকে উদ্বোধন কাব্য তৃতীয় হলেও এ গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা আগেই পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নব উদ্দীপনা কাব্যের তুলনায় অনলপ্রবাহ কাব্যের বিভিন্ন কবিতার সংগে এর সাদৃশ্য বেশী। নবউদ্দীপনা কাব্যের কবিতা ও গানে রাজনৈতিক সামাজিক বক্তব্য অগ্রসর, এমন কি শিল্পরূপও উজ্জ্বলতর। প্রায় সমধর্মী বক্তব্যের মধ্যে অনবরত পরিভ্রমণ করলেও নব উদ্দীপনা কাব্যের মধ্যে অনলপ্রবাহ ও উদ্বোধন কাব্যের, এমন কি উচ্ছ্বাস কাব্যেরও পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন ও নানা প্রকার সামাজিক সংঘাতের ফলে কবি নিজের মধ্যেই আন্দোলিত হয়েছেন, এসব কবিতার মধ্যে তার চিহ্ন পরিস্ফুট।

(৩) সঙ্গীত সঞ্জীবনী
===============

এক

অনলপ্রবাহ, উচ্ছ্বাস, নবউদ্দীপনা এবং উদ্বোধন কাব্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সুস্নিগ্ধ ধরণের রচনা হল সঙ্গীত সঞ্জীবনী ও প্রেমাঞ্জলি। কবি এখানে কোলাহল মুখরিত বহির্বিশ্ব পরিত্যাগ করে নিভৃত অন্তরের মাধুর্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন, দেশানুভূতি, প্রেম, প্রকৃতি ইত্যাদি একত্রে মিশ্রিত করে কবিতা ও সঙ্গীতের সুরে ভাষা দিয়েছেন।

বিভিন্ন ধরণের ৫১টি গান এখানে সংকলিত, 'আভাষ' অংশে সঙ্গীতের মহিমা সম্পর্কে আলোচনা করে সিরাজী বলেছেন, "পতিত জাতির নব জীবন সঞ্চারে, সঙ্গীতের আবশ্যকতা অপরিহার্য। জাতীয় সঙ্গীতের অমৃতনিস্যন্দিনী চিত্তোন্মাদিনী রাগিনী লহরী ব্যতীত, অলস অবসন্ন হতাশ প্রাণে কিছুতেই নবীন আশা ও নবভাবের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত হয় না।"[২] কবি দেখিয়েছেন, সঙ্গীতের 'রাগ-রাগিনী' এবং 'বাদ্যযন্ত্র' অধিকাংশই মুসলমানদিগের আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত। সঙ্গীতের প্রভাব সম্পর্কেও

১। আরব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫।

২। আভাষ, সঙ্গীত-সঞ্জীবনী, পৃঃ ২/১

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সচেতন ছিলেন, এজন্য সঙ্গীত সঞ্জীবনী গ্রন্থটি "জাতীয় জীবনের ভাবী আশার আলোক সুযুপ্ত নব্য-যুবক সম্প্রদায়, ছাত্র ও ছাত্রীমণ্ডলীর করকমলে সাদরে সমর্পিত" করেন। তিনি আশা করেছেন, "দেশের সর্বত্র এই সঙ্গীতগুলি কীর্তন করিয়া সকল নর নারীর হৃদয় ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত এবং নব জাগরণের নব-উৎসাহ-উদ্যমে উদ্বোধিত করিয়া তুলুক ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা।"[১]

এ গ্রন্থের সঙ্গীত গুলোতে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য পরিস্ফুট, হৃদয়ে ধর্মভাবের প্রেরণা দান, এবং জাগরণের উৎসাহ সৃষ্টি।

প্রথম গানটি ব্রহ্ম সঙ্গীত, কবি দিকভ্রান্ত হয়ে অন্ধকারে ঘুরে শ্রান্ত হয়েছেন, সৃষ্টি কর্তার কাছে আলোক প্রার্থনা করেছেন।

২ নং গানে,

হৃদয়ে সদনে জলধির জলে
নভো-নীলাম্বরে চন্দ্র তপনে।[২]

৩ নং গানে,

তুমি পুণ্য কিরণে
এ পাপ মলিনে
উজ্জ্বল করহে।—[৩]

রজনীকান্ত সেনের গানে

তুমি নির্মল কর মংগল করে
মলিন মর্ম মুছায়ে।[৪] ইত্যাদি অংশের প্রভাব পড়েছে। এ সত্ত্বেও কবির আত্মনিবেদনের সুর এখানে অনুপস্থিত নয়।

'চিত্তকুসুমে প্রেম বারিদানে' প্রস্ফুটিত করে তোমার জন্য কবি প্রেম প্রার্থনা করেছেন।[৫] ৫ নং গানটি আল এসলাম[৬] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম[৭] গানের প্রভাব এখানে পড়তে পারে।[৮] রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'[৯] অনুসরণে ৬ নং গানটি[১০] রচিত।

১। প্রাগুক্ত, পৃ:৪।
২। প্রাগুক্ত, পৃ:২।
৩। প্রাগুক্ত, পৃ:৩।
৪। রজনীকান্ত সেন- কান্ত কবি-রচনাসম্ভার, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৯, পৃ:১০।
৫। সঙ্গীত-সঞ্জীবনী, পৃ:৪।
৬। মাসিক, আল এসলাম, মাঘ, ১৩২২।
৭। ব-র, ৩, পৃ:৭২৬।
৮। সঙ্গীত-সঞ্জীবনী, পৃ:৫।
৯। গীতবিতান, পৃ:২৪৩।
১০। সঙ্গীত সঞ্জীবনী, পৃ:৮।

Dhaka University Institutional Repository

৬,৮,১০,১১,১৩, নং গানগুলি অধ্যাত্মরসে সিক্ত প্রকৃতির মধ্যে স্রষ্টার অপার সৌন্দর্যের প্রকাশ কবি অনুভব করেছেন। ৯ এবং ১৯ নং যুক্ত গান দুটোর রচয়িতা নবিনোয়াজ খাঁ, ২ নং গানের রচয়িতা নবদ্বীপ চন্দ্র, ৩১,৩২,৩৩,৩৪,৩৫,৩৬,৩৭ নং গানের রচয়িতা মোহাম্মদ ইয়াছিন। মোহাম্মদ ইয়াছিনকে তিনি বন্ধু হিসাবে পরিচয় দান করে বলেছেন, "তাহার রচিত গানগুলি তাঁর নামাঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া "সঙ্গীত সঞ্জীবনী"তে মুদ্রিত হইল।"[১] নবিনোয়াজ খাঁ এবং নবদ্বীপচন্দ্রের গান সঙ্গীত সঞ্জীবনী গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে একই প্রকার কারণ ঘটতে পারে মনে হয়।

১৩ নং গানে বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব পড়েছে।[২] রায়নন্দিনী উপন্যাসে ঈসা খাঁর বোন মাহেমা বেগম অধ্যাত্ম ভাব প্রকাশের জন্য এ গানটি গেয়েছেন এবং মরমী ভাবে অশ্রুসজল হয়ে উঠেছেন।[৩] ১৪,১৫,১৬, ২৫,২৬,২৭,৩০, ও ৪০ নং ইত্যাদি গান অধ্যাত্ম সম্পর্কিত। এখানে স্রষ্টার ওপর নির্ভরশীলতা, হৃদয়ের গভীরে প্রভুর মহিমা উপলব্ধি, স্রষ্টার সঙ্গে মিলন লাভের আনন্দময় সম্ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। ১৬ নং গানের শেষে কবি প্রার্থনা করেছেন, "জীবনে মরণে যাতে দেখ এই রাঙা পায়।"[৪] তুলনীয়, উপন্যাসে ফিরোজা বেগমকে সৌন্দর্যের প্রতীক সৃষ্টি করেও মুরলার মাধ্যমে তাঁর চরণে রক্তোৎপল দিতে চেয়েছেন।[৫]

কবির বিভিন্ন রচনায় মাতৃভূমি, স্বাধীনতা এবং এমন কি ইসলাম ধর্ম পর্যন্ত প্রতীকী হয়ে উঠেছে। যে কারণে মনে হয় সিরাজীর অলক্ষ্যেই সম্ভবতঃ মুসলমানের ধর্মও প্রায় হিন্দুর প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রচারক জীবনে সিরাজী ইসলামের সকল অনুশাসনকে অপরিবর্তনীয় এবং আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেননি, জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন[৬], ফলে কবিতা ও উপন্যাসে সৌন্দর্যের এমন প্রতীকও সৃষ্টি করেছেন যা হিন্দুর সংগে কোন কোন দিক দিয়ে প্রায় অভিন্ন।

১৭,১৮,১৯,২০ নং গান দেশাত্মবোধক, এসবের মধ্যে ডি-এল-রায় ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে ১৯ নং গানে,

অম্লান ধন-ধান্য-জল পূরিত
পুষ্প-ফুল-ফলে চারু শোভিত,
বিহগ কূজনে নিত্য মুখরিত
আমার জন্মভূমিরে।[৭]

১। প্রাগুক্ত, মূল পাদটীকা, পৃঃ৩৫।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ১৫।
৩। রায়নন্দিনী, দ্বি-স, পৃঃ ৪৬।
৪। সঙ্গীত সঞ্জীবনী, পৃঃ১৯।
৫। পূর্বে, পৃঃ ১৪৬।
৬। পূর্বে, দ্বিতীয় অধ্যায়।
৭। সঙ্গীত সঞ্জীবনী, পৃঃ২১।

Dhaka University Institutional Repository

ডি-এল-রায়ের ধনধান্য পুষ্প ভরা[১] গানটি প্রসংগত স্মর্তব্য। ২২ নং গানে ইসলামকে 'পুন্যময়ী' এবং মাতৃসম্বোধন করেছেন।[২] ৪১ নং কবিতায় ইসলাম ধর্মকে মাতৃরূপে বন্দনা করেছেন।[৩] ৩৯ নং গানটি একটু বিচিত্র ও ব্যতিক্রমী, এখানে ইংরেজের জন্য কবি সৃষ্টিকর্তার নিকট সতত সাহায্য প্রার্থনা করেছেন,

দেহ দেহ জয় ওহে দয়াময়
দেহ ব্রিটিশেরে অতুল সাহায্য[৪]---ইত্যাদি।

কোন পরিস্থিতিতে এবং কোন ইংরেজকে এভাবে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানিয়েছেন কবি কোথাও তা ব্যাখ্যা করেননি। অনুমান করে নেয়া যায়, ইংরেজ যাদের সংগে যুদ্ধরত তাদের তুলনায় ইংরেজকে তিনি মিত্রপক্ষ বলে মনে করেছেন। কারো কারো মতে কবি প্রথম মহাযুদ্ধে ইংরেজের বিজয় কামনা করে এ কবিতা রচনা করেন।[৫]

(চ) প্রেমাঞ্জলি

এক

'প্রেমাঞ্জলি' সর্বমোট ২২৩টি গানের সংকলন, প্রথম অংশে ১২৮ টি এবং দ্বিতীয় ভাগে ৭৫টি। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি এবং অন্যান্য গানের মত এ গ্রন্থের বেশ কিছু রচনার সংগে স্থান ও কালের উল্লেখ আছে। রচনা তারিখ দেখে মনে হয় প্রেমাঞ্জলি এবং পুষ্পাঞ্জলি প্রায় সমকালে রচিত। ১৩২০ সালে 'গীতাঞ্জলি' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ, উত্তরকালে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা ও সম্বর্ধনার পটভূমিতে শিরাজী এসব গান রচনা করেন। গীতিকবিকে 'বসন্তের ফুলের ন্যায়' বললেও এবং রবীন্দ্রনাথ একটিও মহাকাব্য লেখেননি বলে মন্তব্য করলেও[৬] শিরাজী রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে গান রচনা শুরু করেন। 'বঙ্গমুখী মেঘনা পারাপার' প্রভৃতি সুরে গান রচনা করায় কেউ কেউ এভাবে কটাক্ষ করেন যে, এখন কবি কাওয়ালীর সুরে

১। দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৪, পৃঃ৬৭৫-৭৬।
২। সংগীত সঞ্জীবনী, পৃঃ২৬।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ৪৪।
৪। প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯।
৫। মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ৪০৬।
৬। "যে রবীন্দ্রনাথের গৌরবে আজ বাংলাদেশ আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে, তিনিও মহাকবি নহেন। তিনি শুধু গীতি কবি(Lyric poet)। তিনি বহুসংখ্যক সংগীত, গাথা ও কবিতা রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু একখানিও মহাকাব্য লেখেন নাই। সংগীত, গাথা ও কবিতা বসন্তের ফুলের ন্যায় উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। অনেকগুলিই কবির মৃত্যুর সংগে সংগেই ঝরিয়া পড়ে। তবে বিশেষ বিশেষ কবিতা অবশ্য দীর্ঘকালও স্থায়ী হয়।"
মহাকবি কায়কোবাদ, মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

বাসীকুঞ্জ রচনা করে কুসুমাহরণ করেছেন ।[১]

গ্রন্থের নিবেদন অংশে প্রকাশক বলেছেন, "বাঙ্গালার বিশ্ববিশ্রুতযশা গীতকবি রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য এবং গীতাঞ্জলিও প্রেমাঞ্জলির কোমলতা স্বচ্ছতা এবং ভাবসম্পদের নিকট মলিন বলিয়া প্রতিভাত হবে।-- রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই অবোধ্য এবং দুর্বোধ্য । কিন্তু প্রেমাঞ্জলিতে একটিও অবোধ্য বা দুর্বোধ্য কবিতা নাই । সিন্ধু-সলিলের ন্যায় সবগুলিই স্বচ্ছ শারদীয় নৈশ আকাশের তারকামালার ন্যায় সবগুলিই উজ্জ্বল এবং প্রভাত প্রফুল্ল কমলের ন্যায় সবগুলিই মনোহর।"[২]

প্রকাশক কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনাটি লক্ষণীয়, কায়কোবাদের[৩] মত শিরাজীও সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের খ্যাতিকে ঈর্ষা করতেন, কিন্তু মধ্যাহ্ন সূর্যের মত সর্বব্যাপী রবীন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করার কিংবা অতিক্রম করে যাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না ।

অন্য একটি দিক থেকে, প্রেমাঞ্জলি বাংলা/অনগ্রসর মুসলমান সমাজ ও গীতাঞ্জলি-এর মধ্যেকার সেতু হিসাবে অবস্থান করছে, প্রেমাঞ্জলির সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নয়, এর সামাজিক প্রয়োজনের বিচার্য।

প্রেমাঞ্জলি গ্রন্থের গানগুলি প্রকৃতি ও প্রেম বিষয়ক, এ প্রেম অধ্যাত্ম সম্পর্কিত । কবি জীবনের সূচনাতে 'অনলপ্রবাহ' তাঁর কবি সত্তাকে বেঁধে দিয়েছিল, তিনি জাতীয় ভাব এবং জাগরণমূলক রচনা নিয়েই বিভোর ছিলেন, কিন্তু এ কাব্য রচনাকালে কবি প্রথমে নিজেকে নিভৃতে নিয়ে বসেছেন এবং নিজের কাছেই আত্মজিজ্ঞাসা করেছেন । জাতীয় ভাবের প্রকাশও সম্ভবতঃ এ কাব্য সৃষ্টির প্রেরণার মূলে ছিল । রবীন্দ্রনাথের সমান হবার, মুসলমান সমাজে রবীন্দ্রনাথের অভাব পূরণ করার সচেতন ইচ্ছা থাকলেও রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে তিনি আপন হৃদয়ের আনন্দলোকের সন্ধান পেয়েছিলেন । এর প্রমাণও অন্যত্র পাওয়া যাবে, শিরাজী সঙ্গীতের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, মুসলমান সমাজের অনেক প্রতিকূলতা সহ্য করে নিজের মেয়েদের দিয়ে সভাসমিতিতে গান গাইয়েছেন,[৪] অথচ তিনি কেবলমাত্র অনলপ্রবাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেন, এটা স্বাভাবিক নয় । আসলে

১। "তরুণবয়াই দেশের যত অকালপক্কের মূল। এদেশের বালক বালিকাদের Physical development না হইতেই Metaphysical Development আরম্ভ হয়, ইহারা তখন হইতেই চোখের ভিতর দিয়া প্রাণকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। মুসলমান সমাজে সর্বদর্শন লেখক যে একেবারেই ছিল না এমন নহে। অল্প সাত বৎসর হইল একজন মুসলমান কবির "বসন্ত-লেখনী" হইতে কামাখ্যা ভাষার মধু সেগাম হইতে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ সে লেখনীর অকালমৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছে । এখন কবি কালিন্দীর কূলে বাসীকুঞ্জ রচনা করিয়া কুসুমাহরণে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু কাব্য সুন্দরীর নিকট যামিনী যামীর যৌবনের বার্ধক্য অপেক্ষা পুরুষের তরুণ মধু যৌবন-প্রাণ যে অধিক প্রিয় একথা কবির মনে রাখা উচিৎ ছিল।"
-এম আনওয়ারা-সাহিত্য বৈচিত্র্য, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, কার্তিক, ১৩২৮।

২। প্রেমাঞ্জলি, প্রকাশকের নিবেদন, পৃঃ ।/

৩। মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ২৬১।

৪। পূর্ব, পৃঃ ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি নিজের অন্তরের মধ্যে সুরের অনুসন্ধান করেছিলেন, নববউদ্দীপনা গ্রন্থে সে সুরের স্পর্শ অনুভব করেছেন। গীতাঞ্জলি গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পাবার পর রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি শিরাজীর মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাঁর হৃদয়ের দ্বার উন্মোচিত হয়, প্রেমাঞ্জলি কাব্য সুরের মধ্য দিয়ে শিরাজীর আত্ম-জাগরণের ফসল। এ কাব্যের বানীরূপ প্রায় সবই রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু তার মধ্যেও শিরাজীর অনুভূতির আন্তরিকতা একেবারে অপ্রকাশ্য নয়।[1] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করে কেউ কেউ "গীতিকবিতা হিসাবে সেগুলি বিশেষ সফল হয়নি।"[2] বলেছেন। সমকালীয়, উত্তরকালের শক্তিমান কবিদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে যারা ঠেকাতে চেয়েছেন "তাদের পক্ষে অনিবার্য ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ এবং অসম্ভব ছিলো রবীন্দ্র-নাথের অনুকরণ।"[3] সুতরাং শিরাজীর ক্ষেত্রে সে প্রশ্নও ওঠেনা। তা সত্ত্বেও এসব গান ও গীতিময় কবিতার বৈশিষ্ট্য এখানে যে, শিরাজী তাঁর প্রচারক জীবনের সীমাবদ্ধতাকে এখানে অনেকাংশে অতিক্রম করে এসেছেন, এমন কি প্রচারক জীবনের বিপরীত সুরের আদর্শ ও এসব গানে স্থান করে দিয়েছেন। পূর্বসূরীদের প্রভাব থাকলেও এ গান তাঁর নিজস্ব, এ গানের মধ্যে শিরাজীর আন্তরিক প্রকাশ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও বৈষ্ণব পদাবলী, মরমীবাদ, এমন কি বাউল গানের প্রভাব পড়েছে। জীবনের বহুপ্রকার কোলাহলের ফাঁকে এই একটি সময় যখন শিরাজী প্রেমের মধ্য দিয়ে নিজেকে দেখতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রকৃতির মধ্যে যে প্রেমের ছায়া দেখেছেন, কাল্পনিক বিরহের জন্য মর্মবেদনা বোধ করেছেন, অনুরাগের এসব উপলব্ধির জাগরণই হল প্রেমাঞ্জলি কাব্য। শিরাজীর জীবনে সুস্থিরভাবে আত্মপ্রণয় কিংবা আত্মরতি উপভোগের সুযোগ ছিল না, পূর্বসূরীদের দর্শনেই তিনি নিজের সুরাবয়ব দর্শনের চেষ্টা করেছেন, তাঁদের প্রভাবকে সচেতন ভাবেই মেনে নিয়েছেন।

এ ধরণের গান রচনার সময়কাল মোটামুটিভাবে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর থেকে ১৯৩০ সনে দ্বিতীয়বার কারাবরণ পর্যন্ত। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, দেশাত্মবোধ দিয়ে শিরাজীর গান রচনার সূচনা, আত্মভাবের মধ্যে পরিণতি। ডি-এল-রায়, রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গান দেশকেই বিভিন্ন অনুভূতির বর্ণে রঞ্জিত করে তুলেছিল, শিরাজী এতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর যে মুগ্ধতাবোধ তাকে হৃদয়ের উত্তাপের স্পর্শ পেয়েছে এবং দেশ থেকে নিজ অন্তর, নিজ অন্তর থেকে দেশ, এর মধ্যেই শিরাজী নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। অধ্যাত্মচিন্তা প্রকৃতি মিশ্রিত হয়ে উঠেছে, তাঁর অন্তর হয়েছে একটি প্রবহমান স্রোতস্বিনী, যার মোহনায় বিভিন্ন কবি ও শিল্পীর উপলব্ধি মিশ্রিত হয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ সুর সৃষ্টি করে তুলেছে। এসব গান যখন রচিত হচ্ছে, তাঁর দেহ রাজনৈতিক আন্দোলনে চঞ্চল মন মেতেছিল, অন্যদিকে আন্দোলনের অন্তরালে বসে তিনি

১। অধ্যাপক কে. গোলাম মাকসুদ—শিরাজী যুগ ও সে, মাহে-নও, মাঘ, ১৩৬০।
২। ~~আবদুল কাদির~~—সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, জীবন কথা ও সাহিত্য কীর্তি, শি-র, পৃঃ৪২৬।
৩। বুদ্ধদেব বসু—সাহিত্য চর্চা, কলিকাতা, দেজ পাবলিশিং, দেজ পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৬, পৃঃ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

আপন হৃদয়ের বাঁশীর সুর শুনেছেন। সেকারণে শীতাক্রান্তির বানানরূপ এসে গেলেও তার নিজস্ব জীবন ভাবনাও এখানে উপস্থিত, তাঁর নিজের সঙ্গীত পিপাসাও চরিতার্থ হয়েছে। ব্যক্তি মনিরুজ্জামানের কবিচিত্ত জনমবাদী ও জাগরণমূলক কবিতার মত গানের সুরেও ধরা পড়েছে, এ গানের সাহিত্যমূল্য এখানে।

<u>দুই</u>

প্রেমাঞ্জলি গ্রন্থের মূল ভাব হল প্রেম, কবি নিজেকে কখনো রাধা ভাবে কখনো কৃষ্ণভাবে, মরমীভাবে অবলোকন করেছেন, আবার নির্বস্তুক আধ্যাত্মভাবেও মগ্ন হয়েছেন। ৪ নং গানে বলেছেন, মোহের গঞ্জনা, মর্যাদালাঞ্ছনা এড়িয়ে প্রিয় মিলনের জন্য এসেছেন। ৬ নং গানে,

খোলে মিঠি সুখ
রব কুহু কুহু
পিয়ুষ অমিয়া
বহু মধুরাবেশ।[১]

মদনের বেদনা বিরহ যাতনা অনুভব করেছেন। পাপিয়া কোকিল ও ভ্রমরের গুঞ্জন বিরহ যাতনা বৃদ্ধি করছে, তাঁর কোমল প্রাণ আর্তনাদ করে উঠেছে।[২] লোকলজ্জা পরিত্যাগ করে তার প্রেম উচ্ছ্বসিত, জ্যোতির্ময়মান তাঁর নিকট প্রায় অর্থহীন।[৩] এভাবেই মিলন কামনা করেছেন,[৪] এবং তার রঞ্জিত পদে আশ্রয় চেয়েছেন।[৫] কবি নিজেকে রাধা ভাবে স্থাপিত করেছেন, প্রিয়ের বাঁশীর সুর শুনে তিনি জলের ঘাটে গেছেন, আকাঙ্ক্ষা হল বাঁশীর সুর শোনা, জল নিয়ে যাওয়া ছিল ছল।[৬] প্রেম এখানে আর প্রতীক মাত্র নেই, সংসারের নিত্য সুখ দুঃখের মধ্যে পরকীয়া হয়ে উঠেছে। এ মিলন কোথাও কোথাও বিদ্যাসুন্দরের বিহার দৃশ্যের মতও মনে হয়।[৭]

কবি প্রিয়জনের ভালবাসার প্রতিদান দিতে চেয়েছেন,[৮] প্রেমের পরিণতি হিসাবে দেহ মিলনকেই কামনা করেছেন, প্রেমিকা রক্ত মাংসের উত্তাপ নিয়ে মানবীয় রূপে আবির্ভূত। মিলন মুহূর্তে তিনি কোন বিধি নিষেধ মানতে চাননি,[৯] বিশুদ্ধচিত্তের অনুরাগ থেকে যে আনন্দধারা নিরন্তর নির্গত, প্রকৃতির সকল রূপে কবি সে

১। প্রেমাঞ্জলি, পৃঃ৭।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ৮।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ১২।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ৩১।
৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ৫৩।
৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ১০৭।
৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ১১৬।
৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ১৬।
৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ২১।

Dhaka University Institutional Repository

আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন, সে আনন্দের ধারাতেই

নরনারী দোঁহে করে

আনন্দ যৌবন দান।[১]

কেবল মাধব ও কৃষ্ণ নয়, কবির সমকালীন মুহূর্তের সাধারণ নরনারীর মিলন বিরহের দৃশ্যও পরিস্ফুট। বিরহ মিলনের যেন সৌন্দর্যের মধ্যে কবি তাঁর হৃদয়ের আবেগ মিশ্রিত করেছেন, চিরকালীন প্রেম ও বিরহের পটভূমিতেই তিনি নিজেকে স্থাপন করেছেন। প্রকৃতির বিভিন্ন অভিব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে এ প্রেম ও বিরহ বেদনার প্রকাশ ঘটেছে।

বিশ্বসৌন্দর্যের অনুরাগ বহির্লোকে কবি রূপলোকে কল্পনা করেছেন। তাঁর প্রেমের ধারায় এ বিশ্ব সৌন্দর্যে মন্ডিত, পৃথিবী জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। কবি কামনা করেছেন যে রূপসী তার প্রাণে আত্ম গ্রহণ করলে মনুষ্যের অন্তরতর বিধৃরিত হবে।[২] শান্ত, পুণ্য, বর্ণ, যশ, স্বর্গ, সুখ, আনন্দ, রূপ, রস, গন্ধ কিছুই তিনি চাননি, যে রূপময়ী তাঁর প্রাণ আলোকিত করবে তিনিই কেবল কাম্য।[৩] তিনি বলেছেন,

এস তুমি আধি অধি

মিশি দুজনে

আমি এ দুজ মানবে।[৪]

এ অংশ রবীন্দ্রসঙ্গীতের[৫] দ্বারা প্রভাবিত। শিল্পী লিখেছেন,

ধুঁকের বাজো নিভে গেল

আঁধার এল ঘনায়ে।[৬]

অথবা

প্রদীপের আলো নিভে গেল

আঁধার এল ফিরে।—[৭]

অথবা

মেঘের পর মেঘ জুটেছে

হাওয়া দিয়েছে জোর।[৮]

রবীন্দ্রনাথের একটি গানের নিম্নরূপ চরণ প্রাসঙ্গিক স্মর্তব্য।

মেঘের পরে মেঘ জমেছে,

আঁধার করে আসে।[৯]

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ১২।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ১০৮—১১।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ১২।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ২০।
৫। গীতবিতান, পৃঃ৩৪৬।
৬। প্রেমাঞ্জলি, পৃঃ ৯।
৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ১০০।
৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১১।
৯। গীতবিতান, পৃঃ৪৪১।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া শিরাজীর

ভুবন ভুলানো
পরাণ মাতানো
নয়ন জুড়ানো
রূপের আলো —[১]

অথবা

তোমারি দরশনে
জাগিয়াছি আজি ওগো
ভুলিতে ভুল। —[২]

অথবা,

আমি চাই শুধু
দিবস রজনী
তব পানে চেয়ে থাকি।[৩]

অথবা,

তোমারি তরে বাঁধিনু দেহ
তোমারি তরে বাঁধিনু প্রাণ[৪]।

অথবা,

আমি দেখেছি তোমায় মাধবী রাতে
আমি দেখেছি তো মারে শারদ প্রভাতে
আমি রেখেছি হৃদয় মাঝারে।[৫]

অথবা,

এস এস ওহে বরণে গন্ধে
এসগো চারু-মন্দিত ছন্দে।[৬]

অথবা,

হৃদয় দুয়ারের কপাট খানি
দিয়াছে আজি খুলিয়া।[৭]

১। প্রেমাঞ্জলি, পৃঃ৪০।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ৫৭।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ৬৫।
৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ১০০।
৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ১৫১।
৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ১৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি অংশগুলি সুস্পষ্টভাবে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত মনে না করার কোন কারণ নেই। তিনি মরমী কবির মত প্রেম যাত্রা করেছেন,[২] বাউল গানের প্রভাবও পড়েছে।[৩]

প্রেমাঞ্জলি কাব্যে রবীন্দ্রনাথের এরকম প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়া পরোক্ষ প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রেম ও বিরহ কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতা নয়। এখানে রয়েছে আলো আঁধারের সম্মিলন[৪] প্রাণের মন্দিরে কবি অভিরাম মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন[৫], বৈষ্ণব প্রেমকে মর্ত পৃথিবীতে টেনে এনে রমনীর প্রেমে রূপান্তরিত করে নিয়েছেন।[৬] চন্দ্রবদনে তিনি তার জন্য ছুটে যান।[৭] পূজার পবিত্রতা দিয়ে দেহকে তিনি দেবালয় করে তুলেছেন।[৮] অসীমকে সীমার মাঝে টেনে এনে কবির আত্মগ্লানি হয়েছে, এটা থেকে তিনি চিত্ত শুদ্ধ করতে চেয়েছেন,[৯] প্রকৃতির বিভিন্ন বিকাশও কবি চিত্তকে স্পর্শ করেছে, মানস মানসে চিত্তে বসন্তের সমাগম প্রার্থনা করেছেন[১০], প্রভাতের কোমল আলোকে অন্তরে পুষ্পের পাপড়িগুলি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে[১১], এবং কবির হৃদয়ে আনন্দের সমারোহ সৃষ্টি হয়েছে।[১২]

প্রেমাঞ্জলি কাব্যে প্রেম ও জীবন নিরন্তর সীমা ও অসীমের মধ্যে আন্দোলিত। কবি অসীমকে সীমার মধ্যে নামিয়ে এনেছেন, অধরাকে ধরেছেন শরীরীরূপে, আবার অনুতপ্ত হয়ে অসীমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। কবি অন্তরের দেবতা ও প্রিয়কে মিশ্রিত করেছেন, কিন্তু দেবতা ও প্রিয় উভয়কে আটপৌরে করে তুলেছেন, একে ঘিরে কবি মনের প্রকাশের ক্ষেত্রে সর্বত্র স্থূলতা পরিহার করতে পারেননি, সৌন্দর্য উপলব্ধির এমন ভূষণ দিতে পারেননি রূপকে যা অরূপ কিংবা অপরূপ করে তুলতে পারে। প্রার্থিত প্রিয়জন কোন কোন দিক দিয়ে লৌকিক, রক্ত মাংসে জারিত হয়ে উঠেছে। সিরাজীর সামনে বিরাট হয়ে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার প্রশ্ন সুদূরপরাহত, তিনি দুজনের মধ্যে কোন কোন দিক দিয়ে দূরত্ব ও সৃষ্টি করতে পারেননি। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এবং প্রতিকূলতা দুটোই সেরকম প্রবল হয়েছিল, প্রেমাঞ্জলি কাব্য তারই অংশমাত্র। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানে সীমা ও অসীমের সম্পর্ক,

---

১। গীতবিতান, পৃঃ ৪৮৪, মানসিকা, মহুয়া, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬৪, পৃঃ ৪৭, মায়ার খেলা, গীতবিতান, পৃঃ ৩৯০, ৬৬৮, শ্যামা, গীতবিতান, পৃঃ ২৮৮, ৭৪১, গীতবিতান, পৃঃ ৩০৩, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬, প্রভাত উৎসব, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬০, পৃঃ ৬২।

২। প্রেমাঞ্জলি, পৃঃ ৩৪।

৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৬।

৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।

৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।

৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।

৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬।

৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১, ১২১।

৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪।

১০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬১।

১১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৪।

১২। প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদীয়ের মাজিঈন শিরাজী থাকতে পারেননি, তাই দেহকে আশ্রয় করে দেহাতীত হবার বাসনা থাকলেও তা দেহকেই প্রকৃতপক্ষে ঘিরে রেখেছে। তবে প্রকৃতি সম্পর্কে শিরাজীর উপলব্ধি অকৃত্রিম। প্রচারক ও রাজনৈতিক জীবনের কোলাহলের অবসরে কবি গান রচনার মধ্য দিয়ে অন্তরাত্মার সহজ ও অনাবৃত প্রকাশ করতে পেরেছেন, এসব গান ও গীতিময় কবিতার বৈশিষ্ট্য এখানেই।

(ঘ) মহাশিক্ষা কাব্য
================

এক

শিরাজী মহাকাব্য রচনা করেছেন দুটো, (ক) মহাশিক্ষা কাব্য ও (খ) স্পেন বিজয় কাব্য। সমকালীন কাহিনী নির্ভর কাব্যদ্বয়টিকে কেউ কেউ জাতীয় আখ্যান কাব্য বলেছেন।[১] প্রকৃত অর্থে ক্লাসিক মহাকাব্য এবং জাত মহাকাব্য কোনটিরই অবশ্য শিল্পরীতি এখানে অনুসৃত হয়নি, সুতরাং এগুলোকে জাতীয় আখ্যান কাব্য বলাই সংগত।

রচনাকালের দিক দিয়ে প্রথমে মহাশিক্ষা কাব্য এবং শেষে স্পেনবিজয় কাব্য। বারো বছর ধরে[২] তিনি মহাশিক্ষা কাব্য রচনা করেন। দ্বিতীয় খন্ডের শেষাংশ চন্দননগরে আত্মগোপন করে থাকা অবস্থায় লিখিত হয়।[৩] সমগ্র কাব্যের কিছু কিছু অংশ পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে কাব্য প্রকাশিত হয় শিরাজীর মৃত্যুর অনেক পরে, ঢাকা, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ১৯৬৯ সালে প্রথম খন্ড এবং ১৯৭১ সালে দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ করেন। দুই খন্ডের মিলিত পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮৩। পৃষ্ঠাসংখ্যার বিশালতার দিক দিয়ে কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা। কর্মজীবন ও প্রচারক জীবনের সূচনায় যেসব কথা তিনি বাগ্মিতায় বলছিলেন সাংকেতিকভাবে মহাশিক্ষা কাব্য তার লিখিত রূপ। অনুমান করে নেয়া যায়, রাজনীতির সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘুচিয়ে রেখে এ কাব্য তাঁর প্রচারক ও কর্মজীবনের বিকাশকেই সহায়তা করেছিল। এজন্য এ কাব্যে রাজনীতির পাশাপাশি ধর্মগৌরব, ইতিহাস, ইতিহাস বহির্ভূত কাহিনীও প্রাধান্য পেয়েছিল।

চন্দন নগরে আত্মগোপন করে থাকাকালে তিনি রায়নন্দিনী উপন্যাসও রচনা করেন। রায়নন্দিনী উপন্যাসে তিনি বাহ্যতঃ হিন্দু ঔপন্যাসিকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করতে চেষ্টা করলেও তাঁর অনুরক্ত পাঠক ছিল উপন্যাসের পিপাসা, সেকারণে নর নারীর মিলন মাধুর্যকে তিনি মোটেই উপেক্ষা করতে পারেননি।

১। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃঃ৩৬১।
২। মহাশিক্ষা কাব্য, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৬৮০।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ৬৮৩। পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় একই সময়ে রচিত মহাশিক্ষা কাব্যেও উপন্যাসের প্রভাব পরিস্ফুট, বিশেষ করে দ্বিতীয় খণ্ডে দুর্গেশ-নন্দিনী উপন্যাসের প্রভাব দৃষ্টি এড়ায় না। সচেতনভাবে রায়নন্দিনী উপন্যাস এবং মহাশিক্ষা কাব্য একই লক্ষ্যের ভিন্ন প্রকাশমাধ্যম, দুর্গেশনন্দিনীর সমাধারণ জনপ্রিয়তার ফলে এটা সহজভাবে তাঁর নিকট ধরা দিয়েছিল।[১] তবে রায়নন্দিনী এবং মহাশিক্ষা কাব্যের মধ্যে পার্থক্য হল, রায়নন্দিনীতে মুসলমানের প্রতিপক্ষ হিন্দু, মহাশিক্ষা কাব্যে প্রতিপক্ষ হল অবিশ্বাসী, পাপিষ্ঠ চন্দ্র এভিদ। এ ছাড়া কাহিনী অংশে মীর মোশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু এবং বিন্যাসের ক্ষেত্রে মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের ছায়া পড়েছে। স্বাধীনতা পিপাসা রূপায়নের ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নয়।

মহাশিক্ষা কাব্য রচনার পূর্বে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখের মহাকাব্যের সঙ্গে শিরাজীর গভীর ভাবে পরিচয় ছিল রচনার মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বসূরীদের রচনাকে সামনে নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু তাদের শিল্পকর্ম নির্মাণের সঙ্গে অনুসরণের ব্যাপারে শিরাজীর উদাসীন্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁর অন্বেষণ লক্ষ্য ছিল কাহিনী নির্মাণের দিকে, এ কারণে কারবালা কাহিনী অবলম্বনে অন্যান্য মুসলিম সাহিত্যিকের তুলনায় শিরাজী বেশ ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছেন।

কাব্যাকারে বিষাদ সিন্ধুর বিকল্প সৃষ্টির জন্যও মহাশিক্ষা কাব্য রচিত হতে পারে। কেননা তিনি "বিষাদ সিন্ধুর কাহিনীকে প্রায় হুবহু অনুসরণ করেছেন।"[২] তবে কাব্যে কারবালা যুদ্ধের শিরাজীর নিজস্ব, এর সঙ্গে বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থের পার্থক্য মৌলিক। সাহিত্যিক জীবনের প্রথমে স্বগোত্রীয় পূর্বসূরীদের ইঙ্গিত অনুসরণ করতে তিনি আগ্রহী ছিলেন। শিরাজীর সময়কালে গদ্যের চর্চা যদিও ব্যাপক হয়েছে তবু সামাজিক প্রয়োজনের ফলে মাইকেলের জনপ্রিয়তা কমেনি। শিরাজী নিজেও মাইকেলের অনুসারীদের একজন, সমকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনকে সামনে রেখে তিনি একটু ভিন্ন পথে গেছেন। তবে এ স্বাতন্ত্র্য নির্মাণ কাঠামো কিংবা শিল্পরূপে নয়, বরং উপলব্ধিতে।

মাইকেল মধুসূদন কোন কোন চিঠিপত্রে নাটক ও মহাকাব্য রচনার ব্যাপারে সুলতানা রিজিয়া এবং কারবালা কাহিনীর সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন।[৩] কারবালা কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য রচনার ব্যাপারে এটা

১। পূর্বে, চতুর্থ অধ্যায়, রায়নন্দিনী উপন্যাসের আলোচনা দ্রষ্টব্য।
২। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃঃ ৬৯৫।
৩।(ক) "We have just got over the noise of a Mohurrum I tell you what:- If a great poet were to rise among the Musulmans of India, he could ~~writ~~ write a magnificient Epic on the death of Hossin and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject. Would you believe it?"
রাজনারায়ন বসুকে লিখিত। দ্রঃ নগেন্দ্রনাথ সোম-মধুস্মৃতি, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১০৩৯ পৃঃ ৬১১।
(খ) "After this, we must look to "Rigia" -I hope that will be a drama after your own heart. The projudice against Moslem names must be given up."
কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ৬০৪।

শিরাজীকে অনুপ্রাণিত করে থাকতে পারে, প্রচারক জীবনে মুসলমানের ঐতিহ্যপূর্ণ বিভিন্ন কাহিনীর দিকে তাঁকে দৃষ্টিপাত করতে হয়েছে। এ কারণে মহাকাব্য রচনায় মাইকেলের খ্যাতি, কারবালা কাহিনীর জনপ্রিয়তা সম্মিলিত ভাবেই তাঁর মহাকাব্য রচনার উৎস হিসাবে দাঁড়িয়েছে, এভাবেই মুসলিম লোকপ্রিয় একটি কাহিনীর কাব্যময় বর্ণনার মধ্য দিয়ে 'মহাশিক্ষা কাব্যে'র রচনা সম্পূর্ণ হয়েছে। শিরাজী মহাকাব্যের জনপ্রিয়তা এবং গৌরব চেয়েছিলেন, মিল্টনের সংগে শিল্পরূপ অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন কিনা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ মহাশিক্ষা কাব্য রচনার সময় মহাকাব্যের বিশালত্ব সম্পর্কে শিরাজীর স্পষ্ট বোধ ছিল, সেকারণে কাহিনী সংক্ষেপ করার চেষ্টা করেননি, বিষাদ সিন্ধু এবং পুথির জগত থেকে যেভাবে এসেছে প্রায় সেভাবেই তিনি গ্রহণ করেছেন। মহাশিক্ষা কাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডের মধ্যে কালগত ব্যবধান ছাড়া অন্যান্য পার্থক্যও বিস্তর। প্রথম খন্ডের কাহিনী ইতিহাস ও লোকশ্রুতি দ্বারা মিশ্রিত, দ্বিতীয় খন্ডে কবি এর সংগে নিজের কল্পনারও বিস্তার ঘটিয়েছেন। প্রথম খন্ডে সর্গ সংখ্যা চব্বিশ, এবং দ্বিতীয় খন্ডে তের, উপন্যাসের পরিচ্ছেদের মত সর্গগুলি বৃহৎ। কবিতায় রচনা করার ফলেই পরিচ্ছেদের পরিবর্তে সর্গ বিভাগ করা হয়েছে।

দুই

মুসলিম লোকপ্রিয় কাহিনীর অবিকল তাৎপর্য মুসলমানদের হাতে পৌঁছে দেয়া তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু যুগ ধর্মকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি, উনিশ শতকের শেষ দুই দশকের জাতীয় রাজনীতি, স্বাধীনতার স্পৃহা তাঁর কাব্যে নানারূপ লাভ করেছে। মেঘনাদবধ কাব্যে যেমন উনিশ শতকের প্রথম বিদ্রোহী মানসিকতা প্রতিষ্ঠায় বিজয়মাল্যে ভূষিত, শিরাজীর মহাশিক্ষা কাব্যও তেমনি স্বাধীনতা কামী বাঙালীর ও বাঙালী মুসলমানদের যুগ মানসের প্রতিচ্ছবি। শিরাজী হোসেন পরিবারের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামটিকেই বড় করে দেখেছিলেন এবং তাকে সমকালীন বাংলায় স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগে যুক্ত করে দিয়েছিলেন, মহাশিক্ষা কাব্যের বিশেষ গুরুত্ব এখানেই।

শিরাজী বাংলার মুসলমানদের জীবনযুদ্ধে অনেক পশ্চাৎপদ অবস্থায় পেয়েছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন হিন্দুর সংগে তাদের সমান করে তুলতে। এ কারণে তাদের সামনে এমন এক কাহিনীর অবতারণা করলেন যেখানে তাদের আদর্শ নরনারী ইমাম পরিবারের সদস্যবৃন্দ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবনপণ যুদ্ধে রত। তারা একে একে প্রাণ বিসর্জন করলেন কিন্তু স্বাধীনতা পিপাসার সংগে কোন আপোষ করেননি। শিরাজী নিজেও বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন রচনায় বারংবার আহবান জানিয়েছেন, মহাশিক্ষা কাব্য সে সবের অন্যতম। হোসেনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) কন্যা ফাতেমাকে স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গিত হোসেনের মৃত্যুশোক ভুলে যাবার জন্য উপদেশ দান করেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

-----বৃথা শোকোচ্ছ্বাস ।
আজি এ আনন্দ-দিনে কোন মোহ-বশে
বিষাদ সলিলে মগ্ন তব মনঃপদ্ম?---
---কোন জন তব পুত্র সম
রক্ষিবারে স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্র প্রথা,
মনুষ্যের হিত-হেতু হেন বীর দর্পে
এহেন কঠোর ভীম বিপদ-ঝঞ্ঝায়
অকাতরে নিজ প্রাণ করেছে উৎসর্গ ?
অনাহারে পিপাসায় ক্লিষ্ট ক্লান্ত হয়ে
কে যুঝেছে ধর্মহেতু কবে কোন্ যুগে ?
"স্বাধীনতা মানবের জন্মগত স্বত্ব"-
এ সমরে পুত্র তব এই মহা সত্য
রক্ষিবারে, সমর্পিয়া নিজ দেহ-প্রাণ
দিয়েছে, মা ! মহাশিক্ষা সকল মানবে।[১]

প্রজাতন্ত্র এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্বস্ব প্রদানই এ মহাশিক্ষা কাব্যের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়, কারবালার হত্যাকান্ডের জন্য করুণ রস এর আনুষঙ্গিক অংশ মাত্র। কেউ কেউ কাব্যটিকে শিক্ষামূলক বলে মন্তব্য করেছেন।[২]

বিষাদসিন্ধু গ্রন্থের কাহিনী অনুসরণ করলেও দেখা যাবে মীর মোশাররফ হোসেন ও শিরাজীর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মীর মোশাররফ হোসেন করুণ রসাশ্রিত একটি উপন্যাস রচনা করতে চেয়েছিলেন। কারবালা কাহিনীর অন্যতম কারণ হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছেন এজিদের রূপতৃষ্ণা। শিরাজী একে উপেক্ষা করেননি, কিন্তু রাজনীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এজিদকে শিরাজী ধরে নিয়েছেন, হোসেনের এবং বিশ্বাসী মুসলমানদের স্বাধীনতা অপহারী, সেজন্য সংঘর্ষ অনিবার্য হয়েছে। এজিদ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরাতে চেয়েছেন, কারবালা যুদ্ধের উৎস এ থেকেই। মীর মোশাররফ হোসেনের তুলনায় শিরাজী এখানে সমকালীন বাংলার জাতীয় সমস্যার অনেক কাছাকাছি, তিনি নিজেও জীবনের সূচনাপর্বে দুঃখিনী জন্মভূমিকে শত্রুর কবল থেকে স্বাধীনতা

১। মহাশিক্ষা কাব্য, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৩১৬-১৭।

২। আবদুল কাদির-সম্পাদকের নিবেদন, মহাশিক্ষা কাব্য, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ।০

অর্জনের জন্য সংগ্রামরত থেকেছেন, সেজন্য হোসেন পক্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম তাঁর দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল। বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থ থেকে কাহিনীর উপাদান গ্রহণ করলেও এ কাহিনীর ব্যবহার তাঁর নিজস্ব, তবে এজিদ কর্তৃক জয়নবের রূপতৃষ্ণার পরিবর্তে স্বাধীনতা সংগ্রামকেই তিনি আলোকিত করে তুলেছেন। শিরাজীর রচনা অপেক্ষাকৃত বাস্তবানুগ। হোসেন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রামরত, এজিদ আগ্রাসনকামী কিংবা জবরদখল-কারী, কারবালার যুদ্ধ সম্পর্কে ইতিহাসের ব্যাখ্যাও মোটামুটি ভাবে এটা থেকে বেশী দূরে নয়।[১] মহাশিক্ষা কাব্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের এ আগ্রহ নিয়েই কবি অগ্রসর হয়েছেন, তাঁর বাঞ্ছিত পাত্র-পাত্রীরা রক্তাক্ত হয়েছেন, একে একে প্রাণ বিসর্জনও দিয়েছেন, কিন্তু যুদ্ধ মধ্য স্বাধীনতা থেকে বিচ্যুত হননি। এ কারণে মহাশিক্ষা কাব্যে বীর রস ও যুদ্ধ বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে, কারবালা কাহিনীর অন্যান্য কবি ও লেখকের তুলনায় শিরাজী এখানে শোকসন্তপ্ত ক্রন্দনী তা থেকে দূরে সরে এসে বীররসের অবতারণা করেছেন। সেখানেই তিনি প্রশংসা পেয়েছেন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। প্রায় সকলেই যেখানে গতানুগতিক করুণ রসের স্রোতে/ধু. প্রধান বীর যোদ্ধার শৌর্য-বীর্য পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ করেছেন। এজন্য এ কাব্যে যুদ্ধ বর্ণনার বাড়াবাড়িও লক্ষ্য করা যাবে, অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনে ক্লান্তিকর দীর্ঘ যুদ্ধ বর্ণনা দেখা যাবে, এগুলো মূল কাব্যের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত নয়, প্রায় আর বিশদবেশী রয়ে গেছে। বাস্তব পটের কথা মনে রাখলে এর প্রয়োজন উপলব্ধি করা যায়। সম্ভবতঃ, যে বছর তিনি মহাশিক্ষা কাব্য রচনা শুরু করেন, তার পরের বছর অনলপ্রবাহ কাব্য প্রকাশিত হয়। মহাশিক্ষা কাব্য রচনার সময় অনলপ্রবাহ কাব্যও রচনা করেন অনুমান করা যায়, অনলপ্রবাহের প্রত্যক্ষ কবিতার মধ্যে স্বাধীনতার যে মন্ত্র তিনি উচ্চারণ করেন মহাশিক্ষা কাব্যেও সে মন্ত্র লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু পার্থক্য হল মহাশিক্ষা কাব্যে তিনি কাহিনীর একটি মাধ্যম নিয়েছেন, এবং কাহিনীর কাঠামোতেই দীর্ঘায়তন কাব্য রচনা করেছেন। কারবালার প্রতীকধর্মী কাহিনীতেও মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল স্বাধীনতার মহাশিক্ষা, দুঃসাহস, রক্তক্ষয়, দীর্ঘশ্বাস, ত্যাগ ও সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াস। কারবালা বিষয়ক একটি ধর্ম ঐতিহাসিক ও লোকশ্রুতিনির্ভর কাহিনীর প্রচ্ছদে শিরাজীর সমকাল এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে, এবং এ কালপরিবেশটিই ভারতের অবলুপ্ত স্বাধীনতা পুনরাবিষ্কারের জন্য সংগ্রামরত। অনলপ্রবাহের মত শিরাজীর মহাশিক্ষা কাব্যও সমকালীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম একটি অংশমাত্র, কিন্তু মুসলিম ধর্মনির্ভর কাহিনীর প্রতীক থাকার ফলে সমকালীন সকল পাঠকের নিকট, বিশেষতঃ হিন্দু পাঠকের নিকট তা আশানুরূপ সাড়া জাগায়নি। অন্যবিধ কারণও সম্ভবতঃ ছিল, মহাশিক্ষা কাব্যের যেসব অংশ শিরাজীর জীবদ্দশায় পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে স্বাধীনতার আহবান প্রত্যক্ষ ছিল না। একটি সামগ্রিক কাহিনী কাব্যের অংশবিশেষের মধ্যে সেভাবে থাকা সম্ভবও নয়,

---

১।(ক) Philip K. Hitti-History of the Arabs, London, Macmillan, Ninth Edition, 1968, pp. 175-97.

(খ) Syed Ameer Ali- A short History of the Saracens, London Macmillan & co Ltd., 1961, pp.46-89.

Dhaka University Institutional Repository

সেকারণে এ কাব্য সমকালীন জনসাধারণের প্রায় অন্তরালে চলে গেছে। মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে এ পর্যন্ত মাইকেলের বিকল্প মাইকেল নিজেই, শিরাজী কোন অবস্থাতেই তুলনীয় নন, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বাধীনতার জন্য অদম্য স্পৃহা মহাশিক্ষা কাব্যের আপাতঃ কাব্যমূল্যকে অতিক্রম করে গেছে, এখানে এ কাব্যটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তিন

প্রচলিত পুথির কাহিনীতে জয়নবের প্রতি এজিদের রূপতৃষ্ণাই কারবালার বিরোধের অন্যতম কারণ। শিরাজী এর ইঙ্গিত প্রদান করেও কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ করেননি, তিনি স্বাধীনতা ও ঐতিহ্য রক্ষা এবং তা বিনাশ প্রচেষ্টার ফলে সৃষ্ট সংঘাতের ওপর জোর দিয়েছেন।

মহাশিক্ষা কাব্যের কাহিনী এখান থেকেই শুরু। এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, "কুটিল চক্রান্তে" হাসানের মৃত্যু ঘটানো হয়েছে।[১] এজিদ কর্তৃক কৌশলে হাসানের নিধন কর্ম ঐতিহাসিক ঘটনা কিন্তু এ নিধনের কারণ জয়নবের প্রতি রূপতৃষ্ণা নয়। বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থে প্রচলিত পুথি কাহিনীর মত রূপতৃষ্ণার প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। মহাশিক্ষা কাব্যেও এজিদ জয়নবের রূপে মুগ্ধ কিন্তু রাজ্যলাভ নিষ্কণ্টক করার আকাঙ্ক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে। দামেস্কের সিংহাসনে এজিদের আরোহণকে হোসেনের নিকট মনে হয়েছে আশঙ্কার কালো মেঘ, মদিনার স্বাধীনতা এ কালো মেঘের দ্বারা বিপন্ন।

----------সেই কালো মেঘ
দামেস্কের নীলাম্বরে হয়েছে উদিত,
ধীরে ধীরে বাড়ি তাহা বজ্র-বহ্নি-সহ
আসিতেছে আবরিতে ডুবাতে বিপুলে
মদিনার চিরশুচি স্বাধীনতা-রবি।[৩]

হোসেন মদিনার যুদ্ধক্ষেত্রে এজিদ সৈন্যের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন এবং এর পর এজিদ কৌশল করে হোসেনকে কুফায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। হোসেন মোসলেমকে দূতরূপে কুফায় প্রেরণ করেন, কুফার শাসনকর্তা ওবেদুল্লা মোসলেমের প্রতি শত্রুতাভাবাপন্ন হয়ে তাঁকে হত্যা করেন। হোসেন এজিদকে শাস্তিদানের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হন।

-------- -- ----------------------

১। মহাশিক্ষা কাব্য, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৬-১৮।

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ৩১-৫৯।

৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২-৮২ ।

সিংহাসনের জন্য যোগ্যতার দাবীকে কবি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন,

প্রজাতন্ত্র-প্রথা তবে পাইবে বিজয়,
স্বেচ্ছাতন্ত্রে এ জগতে ঘটিবে প্রলয়।[১]

এবং যদিও জীবনপণে
ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে
সক্ষম না হই, তাহে নাহি কিছু ক্ষতি,
আপসুখ রবে, কিন্তু মম মহামতি।[২]

এবং ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে অর্ধপথে
বিফল হইবে কভু ভাবিও না মনে।[৩]

এবং জীবের যাপন কিম্বা মৃত্যু জানিবেন
যুদ্ধেশে বা ধর্মরাজ্যে উদ্ধার কেমনে—[৪]

এবং মহান বা মোস্তফার প্রজাতন্ত্র-প্রথা
আরবের স্বাধীনতা মঙ্গলার হিত
সাধিতে প্রতিজ্ঞা মম চির অবিচল।—[৫] ইত্যাদি।

আদর্শ শাসকের চিত্রও কবি দিয়েছেন,

কিন্তু প্রজামতা-নির্বাচিত নেতা
প্রজার অধীন রহিবে সর্বথা
ধন-ভান্ডারে না রবে অধিকার
নির্দিষ্ট বেতন প্রাপ্য যার তার
রাজ্যের মঙ্গল শুধু তার ব্রত।—[৬]

পরাধীন ভারতে শিরাজীর এসব মন্তব্য, ইতিহাসের কিংবা লোকশ্রুতির নতুন ব্যাখ্যা দানের আপেক্ষিক মূল্য অবশ্যই ছিল। একারণে কারবালা প্রান্তরে ফোরাত নদীর তীরে অবরুদ্ধ হোসেন পরিবারের তাপ্য ভয় প্রচেষ্টা কিংবা ত্যাগ, পরাধীন সংগ্রামে বাঙালী পাঠকও আপন অন্তরের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত হয়ে উঠতে পারেন, কবির বর্ণনা নৈপুণ্য ফোরাত তটের সংগে বাংলায় পাঠক চিত্তের নৈকট্য সৃষ্টি করে দেয়। অবরুদ্ধ হোসেন শিবিরে নিদারুণ তৃষ্ণা এর বিপরীতে ফোরাতের নির্মল জলপ্রবাহ, কেবল স্বাধীনতা নয়, জীবন রক্ষাকারী বিন্দু বিন্দু

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৭।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৮।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৯।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৯।
৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৯।
৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

পানির জন্য মরণপণ যুদ্ধ, রৌদ্রদগ্ধ কারবালা প্রান্তরে উত্তপ্ত বালুকারাশির ওপর বিপুল রক্তস্রোত, হোসেন শিবিরের তৃষ্ণা ও স্বজন হারানোর আর্ত কোলাহল, তার অনতিদূরে প্রবাহিত ফোরাতের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন কবি,

সোনালী জোছনা শরীরে মাখিয়া
চলেছে ফোরাত গাহিয়া নাচিয়া
ছোট ছোট ঢেউ তুলিয়ে।২-

হোসেনের জবানীতে কবি বলেছেন, তাঁদের এ আত্মবিসর্জন একদা ঘরে ঘরে কীর্তিত হবে, স্বাধীনতার শক্তি যোগাবে। ষোড়শ সর্গ থেকে ত্রয়োবিংশ সর্গ পর্যন্ত সবটাই যুদ্ধ বর্ণনা, এর মধ্যে বিংশ সর্গে কাসেমের সংগে সখিনার বিবাহ দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে। হোসেনের কন্যা সখিনা ঐতিহাসিক চরিত্র।১ কিন্তু কাসেমের কোন অস্তিত্বের পরিচয় ইতিহাসে নেই। তা সত্ত্বেও জনপ্রিয়তার কারণে এর প্রতি শিরাজী প্রলুব্ধ হয়েছেন, নজরুল ও মুহররম একটি কবিতায় সখিনা ও কাসেমের আত্মোৎসর্গকে মহিমান্বিত করে তোলেন।৩ ত্রয়োবিংশ সর্গে ইমাম হোসেনের সাহাদাৎ বরণ, এবং চতুর্বিংশ সর্গে হোসেনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পর প্রথম খণ্ডের পরিসমাপ্তি। প্রথম খণ্ডে প্রায় নয়টি সর্গব্যাপী যুদ্ধ বর্ণনা, মনে হয় যুদ্ধ বর্ণনা অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য, বাকী সবগুলি এরই সহায়ক পটভূমি মাত্র। হোসেন স্বাধীনতার প্রতীক, কিন্তু তার মৃত্যুর পর স্বাধীনতার প্রদীপ জ্বেলে রাখবার মত একজনই মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন, তিনি হলেন হোসেন পুত্র জয়নাল, কিন্তু কারবালার যুদ্ধে হোসেন পক্ষের পরাজয়ের পর জয়নাল সহ ইমাম পরিবারের জীবিত বাকী সকলেই এজিদের কারাগারে নীত হন। প্রকৃতপক্ষে হোসেনের মৃত্যুর পরই কবির বাঞ্ছিত প্রজাতন্ত্র সৃষ্টির সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু কবি সে আকাঙ্ক্ষাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন বীরত্ব এবং শৌর্যের মহিমা দিয়ে, হোসেন পক্ষ যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন সর্ব-কালের মুসলমানদের জন্য তা গৌরবময় ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা প্রায় বিলুপ্ত হলেও বীরত্বের প্রকাশ চিরঞ্জীব। মুসলমানের বাহুবল শিরাজীর অন্যতম লক্ষ্য ছিল বোঝা যায়, স্বাধীনতার সংগে বাহুবলের প্রকাশকে তিনি সম্পর্কিত করে তুলেছেন। বাহুবল ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না, রক্ষাও করা যায়না, শিরাজী কাব্যের এ প্রতিপাদ্যকে পরোক্ষে তাঁর সমকালীন পরিবেশের মধ্যে প্রয়োগ করেছেন। ঠিক ধর্মীয় অনুভূতি নয়, স্বাধীনতার জন্য বিরাট আত্মোৎসর্গ এবং সমুন্নত বীরত্বের প্রকাশ শিরাজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, বাংলায় মহরম উৎসবকে পুনর্জীবিত করে নির্জীব মুসলমানের মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টির আগ্রহ তিনি

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬১।
১। (ক) History of the Arabs, pp.237-39.
(খ) A short History of the Saracens, pp.201-02.

৩। মোহররম, অগ্নিবীণা, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৪৮-৫০।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বিভিন্ন সময়েই প্রকাশ করেছেন। বিশাল ভারতভূমি মুসলিম গৌরবের আবাসক্ষেত্র হলেও অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোক দ্বারাও অধ্যুষিত। সেকারণে হোসেনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে সর্বধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। প্রথম খণ্ডের চতুর্বিংশ সর্গে[১] হোসেনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আদম-হাওয়া থেকে শুরু করে মুসা, হারুণ, ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, দাউদ, জর্জিস, ইদরিস, ইয়াকুব, এহিয়া, আয়ুব, জাকেরিয়া, শামাউন, হুদ, ইউনুস, কেদার, জরদস্তু, লোকমান, [illegible], সোলেমান, নুহ, [illegible] সহ রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব, অমিতাভ বুদ্ধ, কংফুজ, ঈসা, প্রহ্লাদ, বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার, ভার্জিল, [illegible] জোবাদ, ফরিদুন, কায়কাউস, দারার, রুস্তম, নওশেরওয়া, আদিলের, শার্দুলিদ, তাজ, সুবন্ধু, অর্জুন, রোস্তম, সেকেন্দার, খালেদ, হামজা, উমর, হাজ্জাজ, জেরার, কনস্টান্টাইন, আরমু, হাতেম তাই, দাতা কর্ণ, খাদিজা, মরিয়ম, মৈত্রেয়ী, গার্গী, রহিমা, সাবিত্রী, সেমিরামিস, সারা বিবি, হাজেরা, আসিয়া, জায়েদা, শিরী, জোলেখা, তহমিনা, হাওয়া, সফিয়া, আমেনা প্রমুখ এসেছেন। মহানবী মোহাম্মদ(দঃ) নিজে বোরাকবাহী সুবিশাল রথে আরোহণ করে এসেছেন। তিনি "জ্যোতির্ময় মরকতাসনে" বসলেন এবং তাঁর চারপাশে "পরিষদগণ" বসলেন। "মকায়েল জাদুমান মারাকুল — নু" "সুকোমলাং কাচেমা"র রথে চড়ে আগমনের পর,

> শোকাবেগে জগন্মাতা ছাড়িতে নিঃশ্বাস
> বাহির ভীষণ ঝড়, ভিন্ন ভিন্ন হয়ে
> দন্ড ভাঙ্গি কেতুরাজি উড়িছে গগনে।[২]

সকলের উপস্থিতিতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হল, কারবালা কাহিনী নির্ভর পূর্বসূরী আর কারো কবিতা বা গদ্য রচনায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিবরণ এভাবে আসেনি।

চার

মহাশিলা কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডটি এজিদ বধ সম্পর্কিত, এজিদের মৃত্যুর ফলেই হোসেন পরিবারের সর্বশেষ প্রদীপ জয়নাল সুলতান প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। কেবল রাজ্য নয়, এজিদ তনয়া নসিনার[৩] সঙ্গেও জয়নাল পরিণয়পাশে আবদ্ধ হয়েছেন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হোসেন কারবালার মরুপ্রান্তরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা নামক বৃক্ষটিকে পুনঃস্থাপন করিয়াছেন জয়নালের মাধ্যমে, যদিও জয়নাল রাজা-

---

১। মহাশিলা কাব্য, প্রথম খণ্ড, পৃঃ৩৯৬-৪০০।

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৫।

৩। ইতিহাসে মাবিয়ার পৌত্রীর নাম আতিকা। দ্রঃ History of the Arabs, p.229 . এর সঙ্গে কাব্যোক্ত নসিনার কোন সম্পর্ক নেই।

Dhaka University Institutional Repository

রচনা কিংবা শাসনের ব্যাপারে উপযুক্ততা প্রমাণে সক্ষম হননি। জয়নালের বিকাশ ঘটেছে প্রেমে, হানিফা এজিদের বিনাশ সাধন ও রাজ্য জয় করে জয়নালের ওপর রাজ্যের দায়িত্ব আরোপ করেছেন।

দ্বিতীয় খণ্ডে এজিদের শাস্তিপ্রদান এবং জয়নাল-নগিনার প্রণয়কাহিনী পাশাপাশি প্রবাহিত, আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় এজিদের শাস্তিপ্রদানকে আরো ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যেই ওঁর কন্যার সঙ্গে জয়নালের প্রণয়পুষ্প পরিকল্পিত।

মহাশিক্ষা কাব্যটিই এক অর্থে ছন্দে রচিত উপন্যাস। এখানে দুটো প্রণয় কাহিনী স্থান পেয়েছে, একটি এজিদ ও জয়নবের এবং অন্যটি নগিনার সঙ্গে হোসেন পুত্র জয়নালের। দ্বিতীয় খণ্ডে এসে মনে হয় নগিনা-জয়নালের প্রেম কাহিনীই মুখ্য, এজিদ-জয়নবের কাহিনী গৌণ হয়ে পড়েছে। এখানে xxxxxxx নগিনা-জয়নালের প্রেম কাহিনী অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে, কবি নিজেও এর সঙ্গে মানসিক দূরত্ব বজায় রাখতে পারেননি, তিনি এজিদকে নয় তাঁর কন্যাকে ভালোবেসেছেন এবং এজিদের থেকে তাঁর কন্যাকে পৃথক করে নিয়েছেন।[1]

মহাশিক্ষা কাব্যে একদিকে পুঁথির জগতের প্রতি মোহ, অন্যদিকে মাইকেলের মত মহাকাব্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কবি আন্দোলিত হয়েছেন। কাহিনী পুঁথির জগৎ থেকে গৃহীত হয়েছে বলে কবি পুঁথির সঙ্গেই নিরাপদ নৈকট্য বোধ করেছেন বেশী।

পুঁথির সঙ্গে কোন কোন অংশে ব্যতিক্রমও করেছেন এর মধ্যে শিরাজীর মানসিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। গোলাম সাকলায়েন কারবালা কাহিনী নির্ভর রচনাসমূহে কাহিনীর ব্যবহার এবং এদের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে বিস্তৃত তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।[2] এর সঙ্গে মহাশিক্ষা কাব্যের তুলনা করলে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য দুটোই চোখে পড়ে। সাধারণভাবে পুঁথির কাহিনীতে কোরেশ বংশের বর্ণনাও এসে গেছে, কিন্তু শিরাজী কাহিনী শুরু করেছেন যখন হাসান মৃত এবং হোসেনকে ধ্বংস করার জন্য এজিদ প্রস্তুতি নিয়েছেন। পুঁথিতে অনেক সময়েই অবাস্তব ঘটনা আছে, যেমন মোসলেমের পুত্র হন্তা হারেসের মৃতদেহ নদী বা মাটি কেউ গ্রহণ করেনি, তাকে অগ্নিতে ভস্ম করা হয়। মোসলেমের পুত্রদ্বয়ের খণ্ডিত শির ফোরাত নদীতে ফেললে দেহের সঙ্গে তা যুক্ত হয়, এবং মৃতদেহ দাফন করা হয়। জোয়ান পরীর সর্দার জাফর জ্বেনী, পাতালপুরের লোক সদলে হোসেনকে সহায়তা করার জন্য আসেন, কিন্তু পরিত্যক্তাভিলাষী বলে হোসেন তা গ্রহণ করেননি। হোসেনের একজন নোকর বর্দার হোসেনের শির বিহীন মৃতদেহের নিকট এসে ইজারবন্দ ও অঙ্গুরী সংগ্রহ করতে গেলে হোসেনের দুই হাত তাকে ধরে রেখে, নিজেকে মুক্ত করার জন্য তাঁর তরবারির

১। তুলনীয় প্রভাবাধিক্য ও অনুসারবর্তী প্রসঙ্গ, পূর্বে, চতুর্থ অধ্যায়।
২। ড় গোলাম সাকলায়েন ঃ- বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য, ঢাকা, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ডিসেং, ১৯৬৯ পৃঃ ২০৩-৭০।

Dhaka University Institutional Repository

আঘাতে হোসেনের দুই হাত ছিন্ন হন। যুদ্ধশেষে হানিফার নিকট থেকে রক্ষা পাবার জন্য কুয়ার মধ্যে এজিদ লাফিয়ে পড়েন, এবং পর মুহূর্তেই কুয়া থেকে ধুম্র নির্গত হতে থাকে। দৈববাণীর ফলে হানিফা পাহাড়ে ঘেরা অবস্থায় বন্দী হলেন এবং হুরপরীরা তাঁর সেবায় নিরত হন। সাধারণভাবে এগুলো সবই পুথির কাহিনী, বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থের মধ্যে এর কোন কোনটি আছে, কিন্তু মহাশিক্ষা কাব্যে এগুলো অনুপস্থিত। মহাশিক্ষা কাব্যে এজিদ হানিফার হাতে মৃত্যু বরণ করেছেন।[১] পুথির কাহিনীতে জয়নাল মক্কা, মদীনা ও কুফার বাদশাহ হয়ে সুখে রাজত্ব করেছেন, মহাশিক্ষা কাব্যে এজিদ তনয়া নগিনার সংগে জয়নাল বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন এবং দামেস্কের সিংহাসন লাভ করেছেন।[২] এটা সিরাজীর নিজস্ব পরিকল্পনা, প্রচলিত পুথি কাহিনীতে এটা নেই। বস্তুতঃ, সিরাজীর মহাশিক্ষা কাব্যের উৎস পুথি হলেও, এখানে অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ কম, সিরাজী অনেক ক্ষেত্রেই পুথিকারদের তুলনায় কাব্য কাহিনীর যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যেমন হোসেনের মৃত্যু প্রসংগ, সোলেমানের পুত্রদ্বয়ের হত্যা প্রসংগ। এমন কি সে যুগের অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ বিষাদ সিন্ধুর তুলনায়ও সিরাজী কাহিনীর অলৌকিক বিষয় যথাসম্ভব পরিহার করেছেন।

সখিনা কাসেমের বিয়ে এবং বিয়ের পর মুহূর্তেই বিচ্ছেদ ও মৃত্যুর করুণ শোক কবিদের মুগ্ধ করেছিল। কারবালা প্রসংগের সকল পুথিতেই এ ঘটনাটি মনের উত্তাপ দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। সখিনা ও কাসেমের মিলন বিচ্ছেদের মর্মস্পর্শী বর্ণনা ছাড়া রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে মনে করে কবিরা এটা বর্জন করেননি, এমনকি আত্যন্তিক গুরুত্বও আরোপ করেছেন। কারবালার ধূসর প্রান্তরে নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে রক্তচেলী পরিহিতা সখিনার সংগে কাসেমের বিবাহ পুথিকাররা মুসলমান সমাজে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন, প্রসংগটি কোন কোন রচনায় অতিরিক্ত সৌন্দর্যের সঞ্চার করে দিয়েছিল। সমকালীন পাঠক শ্রোতারা একে গ্রহণ করেছিলেন, দুঃখময় এ কাহিনীকে তাঁরা ভালোবেসেছিলেন বলে প্রায় সকল কাহিনীতে এটা পুনরাবৃত্ত হয়েছে। সিরাজী নিজেও একদিকে প্রণয় এবং অন্যদিকে স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এরই পাশাপাশি নগিনা জয়নালের জন্য একটি প্রেমকাহিনী সৃষ্টি করে সিরাজী তাদের মিলনের মধ্যে পূর্ণতা আনয়ন করেছেন। সম্ভবতঃ সখিনা-কাসেমের ট্রাজিক পরিসমাপ্তি কবির নিকট আকাঙ্ক্ষিত ছিল না, অন্যদিকে এজিদ-জয়নবের মিলনও অসম্ভব ছিল সেজন্য এদের বিকল্পে নগিনা-জয়নালের মিলন বর্ণনাও মোটামুটিভাবে মার্জিত। সিরাজী ট্রাজেডীর মাধুর্য ও তার মাধ্যমে আত্মোপলব্ধির পক্ষপাতী ছিলেন না বলে মিলনের পটভূমিকাও এখানে সযতনে রেখেছেন। মূলতঃ তিনি আশার বাণী শোনাতে চেয়েছিলেন, ট্রাজেডীর মর্মমূল তার সহায়ক হবে না মনে করেই হয়ত এভাবে কাহিনীকে পল্লবিত করে তুলেছেন।

১। মহাশিক্ষা কাব্য, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৬৭৯।

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮২-৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুতঃ, শিরাজীর আখ্যান শ্রেণীর প্রায় সকল রচনাই মিলনান্তক, এমন কি কারবালার বিপুল ট্রাজেডীর ভিতরেও শিরাজী মিলনদৃশ্য পরিহার করতে পারেননি। তারাবাঈ উপন্যাস মিলনান্তক না হবার কারণ ইতিহাস প্রতিকূল ছিল।[1] মহাশিক্ষা কাব্যেও ট্রাজেডীর সম্ভাবনা শিরাজীর মনোজীবনকে আন্দোলিত করতে পারেনি, তিনি কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার পর পরই সখিনা এবং জয়নালকে নিয়ে রোমান্টিক প্রণয় কাহিনীর সৃষ্টি করেছেন।

পাঁচ

মাইকেলের পরবর্তীকালে মহাকাব্য কিংবা আখ্যান কাব্যের রচয়িতা প্রায় সকল কবির মত শিরাজীও মাইকেলকে অনুসরণ করেছেন। শিরাজীর স্পেন বিজয় কাব্যে মাইকেলের অনুসরণ যত স্পষ্টতর, মহাশিক্ষা কাব্যে তেমন নয়। তা সত্ত্বেও মাইকেলের বিপুল প্রভাব পড়েছে, এটা ভাষা ও চরিত্র সৃষ্টিতে যতখানি, কাব্যের গাঁথুনি বা শিল্প রূপের ক্ষেত্রে ততখানি নয়। সর্গ নাম তিনি মাইকেলকে অনুসরণ করে দিয়েছেন। ভাষাশৈলী মাইকেল এবং হেমচন্দ্রের মিশ্রিত রূপ। কোন কোন ক্ষেত্রে মাইকেলের অনুসরণ স্পষ্ট, যেমন,

ক) রণ বিশারদিনী বামা ওহাব কন্যা
সমরে পাড়িয়া দেহ স্বর্গে গেলা যবে।[2]

খ) প্রাক্তনের বিধি
খণ্ডিবার বিধি কিছু নাহি এ জগতে।[3]

গ) সুবিশাল বট যথা
ভাঙ্গিল ঝড়ের বায়ু[4]

ঘ) মারিব এখনি কিম্বা মরিব আপনি।[5]

তুলনীয়,

ক) সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি
বীরবাহু চলি গেলা যবে যমপুরে,[6]

১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য পূর্বে, তৃতীয় অধ্যায়।
২। মহাশিক্ষা কাব্য, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮৩।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৬।
৪। প্রাগুক্ত, ৪র্থ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪১৪।
৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৮।
৬। মেঘনাদবধ কাব্য, মধুসূদন রচনাবলী, পৃঃ ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

খ) প্রাক্তনের বিধি হায় কার সাধ্য খণ্ডে ?[১]

গ) ফুল দল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?[২]

ঘ) মারি অরি পারি যে কৌশলে।[৩] -ইত্যাদি।

চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ প্রভাব পড়েছে, এজিদ পুত্র বহ্রুজাদ ও তাঁর পত্নী জোবেদা মেঘনাদ ও প্রমীলার আদর্শে গঠিত।[৪] কিন্তু এজিদের সঙ্গে রাবণের পার্থক্য মৌলিক, প্রকৃত অর্থে মহাশ্মশান কাব্যের বহিরঙ্গে মেঘনাদবধের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও মহাশ্মশান কাব্য পৃথক একটি সৃষ্টি, এখানে মহাকাব্যের তুলনায় উপন্যাসের লক্ষণ পরিস্ফুট। গীতিকাব্যের সম্ভাবনাও বিপুল, যেমন,

ভুবনের রূপচ্ছটা মরমের পটে, হায়।
তখনো নাচিয়া ছিল সোনালী মেঘের প্রায়।[৫]

অথবা,
এজিদ বিস্ময়-ভরে করিলেক বিলোকন,
কারায় ফুটেছে যেন কনকের পদ্মবন।[৬]

হাস্যকর বর্ণনাও আছে, যেমন,

সিংহাসনে পদাঘাত করিলেক বীর
ফাটিল সে সিংহাসন হইয়া চৌচির।[৭]

অথবা,
বসন্তে যথা শাণিত কর্তরী
তালীবনে তালপুঞ্জ বৈশাখের ঝড়ে
তাল শাস সে কালেতে মত্ত যবে মবে।[৮] ইত্যাদি।

এ সবের ফলে মহাকাব্যের বিশালতা ও গাম্ভীর্য নষ্ট হয়েছে, এটা রক্ষা করা সম্ভবও ছিল না। কেননা শিরাজী যখন মহাকাব্য লিখছেন ততদিনে বাংলা সাহিত্যে সামাজিক উপন্যাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে এসেছে। ফলে মহাকাব্যের ছদ্মবেশে সৃষ্ট মহাশ্মশান কাব্য প্রকৃত অর্থে কবিতায় রচিত একটি উপন্যাস, যদিও পূর্বাপর বিচারে উপন্যাসের শিল্পরূপও এখনো সম্পূর্ণ উপস্থিত নয়।

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭।
৪। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃঃ ৪৯৭।
৫। মহাশ্মশান কাব্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৬৪।
৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬৮।
৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৫।
৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০০।

Dhaka University Institutional Repository

ছয়

শিরাজী মহাশিক্ষা কাব্য রচনার সমকালে ঐতিহাসিক উপন্যাস রায়নন্দিনী লিখেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং আখ্যান কাব্য সমূহের মধ্যে মোটামুটি ভাবে অভিন্ন, অর্থাৎ জাতীয় উন্নতির জন্য প্রেরণা সৃষ্টি, এবং এর পরিণতি হল মুক্তি কিংবা স্বাধীনতা। শিরাজী বারবারই ইতিহাস ও জাতীয় সত্তাকে সম্পর্কিত করে তুলেছেন, সেকারণে ঐতিহাসিক উপন্যাস ও জাতীয় আখ্যান কাব্যকে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপূরক করেছেন।

মহাশিক্ষা কাব্যে একদিকে হোসেন পক্ষ অন্যদিকে এজিদ পক্ষ। কবি এজিদ ও হোসেনের সংগ্রামকে পাপ ও পুণ্যের বিরোধ, স্বাধীনতা ও স্বৈরতন্ত্র প্রথা হরণ এবং তা পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম হিসাবে চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। শিরাজী নিজে পুণ্য ও স্বাধীনতার প্রচারক বলে প্রতি মুহূর্তে হায়ার মত হোসেন পক্ষের সংগে থেকেছেন। এমন কি এজিদের স্ত্রী মেরিনা ও কন্যা নশিমা এজিদের প্রতি এমন বিরূপ যে তাঁদের হোসেন পন্থীয় বলে মনে হতে পারে। কাব্যে এজিদ যেন একাই সমস্ত পুণ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত, কবিও তাঁর প্রতি বিরূপ সুতরাং যুদ্ধশেষে বিজয়মাল্য অর্জন তাঁর পক্ষে কি সম্ভব? কবি পাপ পুণ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেই মনে রেখেছেন, আংশিকভাবে রায়নন্দিনী উপন্যাসে প্রতাপাদিত্য, নূরউদ্দান উপন্যাসে উদয়সিংহের মত এজিদের দুষ্কৃত অপরাধের ফলে পরাজয় দেখিয়েছেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছেন, স্ত্রী ও কন্যা তাঁর প্রতি বিরূপ হয়েছেন, কন্যা শত্রু তনয়ের সংগে প্রেমে নিমগ্ন এবং শেষে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এরপর পরাজয়ের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না, তা সত্ত্বেও হানিফার হাতে এজিদকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

অন্যদিকে হোসেনকে সর্বপ্রকারে সহায়তা করেও বাঁচাতে পারেননি, কেবল মানুষ নয়, ফেরেশতা, পিতা, মাতা, মাতামহ সকলের আশীর্বাদ নিয়েও তাঁর পরাজয় এবং মৃত্যু এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে কবির একটি উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তা হল মুসলমানের বাহুবলের প্রকাশ এবং এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। এত কিছুর পরও যুদ্ধে হোসেন পক্ষের বিজয় হয়নি। এতদসত্ত্বেও কবির দুর্ভাগ্য হল, মুসলমানদের ভাগ্য অর্জনের জন্য যখন বৃহত্তর যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে,[১] তাদের শেষ আশা তরবারির শক্তি জয়নাল সে মুহূর্তে শত্রু কন্যা নশিমার সংগে প্রেমে নিমগ্ন। ঘটনাটি কারবালার সংগে সম্পর্কিত না হয়ে সাধারণ একটি কাহিনী হলে জয়নালের ভূমিকা পাঠকের মনে কোন জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করত না। কেন প্রেম নয়, চূড়ান্ত যুদ্ধ বিজয়ের পরবর্তী মুহূর্তে তাঁদের বিয়েও হয়েছে। নশিমা হোসেন বিহীন ইমাম পরিবারের অন্যতম একজন সদস্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। অনেকটা মনে হয়, হোসেনকে হারানোর ফলেই তিনি ইমাম [illegible] পরাজয় এবং হোসেনের অনুপস্থিতির বিকল্প হিসাবে নশিমা

১। চতুর্থ অধ্যায়, তারাবাঈ উপন্যাসে আফজাল খাঁ, আংশিক তুলনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

জন পরিবারে গৃহীত হয়েছেন। সেকারণে একদিকে লালবালার দুঃখময় ঘটনা অন্যদিকে কিশোর প্রণয়ের জন্য, কবি এখানে উপন্যাসের মোহ ত্যাগ করতে পারেননি। বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে যেভাবে তাঁর কন্যা আয়েষা কারা জগৎ সিংহের প্রেমমুগ্ধ হয়েছেন, মৃণাল এবং নলিনার প্রেমের আচরণ কোন দিক দিয়ে [illegible] সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে দুর্গেশনন্দিনীর মত এখানে দুজনের প্রেমের মাঝখানে প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে রাজ-[illegible] ফিরে এসেছেন, মহাশিক্ষা কাব্যে অপরিমিত মৃত্যুভারাক্রান্ত পরিবেশ ভারাক্রান্ত করেছে ঠিকই, কিন্তু সেই একই [illegible] নলিনা ও মৃণালের মিলন ও বিবাহ ভালবাসায় মৃত্যুর বেদনাকে অপনোদন করে দেয়। মনে হয়, হোসেনের মৃত্যুতে ক্ষতি হয়েছে বিপুল, কিন্তু প্রাপ্তও নগণ্য নয়।

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম কবির অন্যতম প্রধান উপজীব্য তা প্রথম খণ্ডে হোসেনের মৃত্যুর [illegible] শেষ হয়েছে। এর পরও দ্বিতীয় খণ্ড পর্যন্ত কাহিনী প্রলম্বিত হয়েছে সম্ভবতঃ দুটি কারণে, প্রথমত, [illegible] সিংহাসনে জয়নালের পুনর্বাসন, ও এজিদ কন্যার সঙ্গে বিবাহ, দ্বিতীয়ত, এজিদের কুকর্মের জন্য দণ্ডদান ও নিধন। প্রথম খণ্ডে এজিদ বিজয়ী হলে দ্বিতীয় খণ্ডটি এজিদের পরাজয় সৃষ্টির জন্য নিবেদিত।

মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন মানুষ রাবণের রূপ ধরে পাঠকের নিকট বর্ণিত। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এ নতুন মানুষের চিত্তে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পিপাসা জাগ্রত করেছেন। পূর্বসূরীদের [illegible] শিল্পীর ব্যতিক্রম এখানেও যে, তিনি মুসলিম ইতিহাসের মাধ্যমে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে স্থাপন করেছেন। বাহুল্য নয়, কাহিনীটি বহির্ভারতীয় এবং মুসলমানের ধর্মীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত, তা সত্ত্বেও সমকালীন ভারতে ইংরেজের শাসন শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এখানে অস্পষ্ট থাকেনি।

গ

যে কয়েকটি প্রধান চরিত্র অবলম্বন করে মহাশিক্ষা কাব্যের ঘটনাপ্রবাহ গড়ে উঠেছে তার মধ্যে হোসেন, জয়নাল, মৃণাল, নলিনা প্রমুখ অন্যতম। হোসেন চরিত্রের বিশিষ্টতা প্রকাশিত হয়েছে স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষায় ও [illegible]। অভিযান করে তিনি কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং প্রাণ বিসর্জন দিয়েই স্বাধীনতার [illegible] কে বলবতী করে তুলতে চেয়েছেন। হোসেন চরিত্র একেবারে অনুজ্জ্বল নয়, তবে পাশাপাশি এজিদ চরিত্রের বৈচিত্র্য পরিস্ফুট।

এজিদ রক্তমাংসে গঠিত পরিপূর্ণ মানুষ, সিংহাসন এবং রূপজ মোহ দুটোকেই তিনি চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন। ইমাম পরিবারের সঙ্গে তাঁর বিরোধের কারণ সাময়িক সিংহাসনের ওপর দাবী প্রতিষ্ঠা এবং জয়নবকে জয় করে এনে বাসনাতে দগ্ধ দেহের উপশম ঘটানো। দুটোই তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে যুদ্ধক্ষেত্রে,

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন পরিবারে গৃহীত হয়েছেন । সেকারণে একদিকে সারবালার দুঃখময় ঘটনা অন্যদিকে কিশোর প্রণয়ের চাঞ্চল্য, কবি এখানে উপন্যাসের মোহ ত্যাগ করতে পারেননি । বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে যেভাবে কতলু খাঁর কন্যা আয়েষা কারা জগৎ সিংহের প্রেমমুগ্ধ হয়েছেন, জয়নাল এবং নফিসার প্রেমের আচরণ কোন কোন দিক দিয়ে তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ । তবে দুর্গেশনন্দিনীর মত এখানে দুজনের প্রেমের মাঝখানে প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ নেই। মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তহৃদয় নিয়ে রাজ-পুরীতে ফিরে এসেছেন, মহাশিক্ষা কাব্যে অগণিত মৃত্যুভারা পরিবেশ ভারাক্রান্ত করেছে ঠিকই, কিন্তু সেই একই সঙ্গে নফিসা ও জয়নালের মিলন ও বিবাহ সারবালায় মৃত্যুর বেদনাকে অপনোদন করে দেয়। মনে হয়, হোসেনের মৃত্যুতে ক্ষতি হয়েছে বিপুল, কিন্তু প্রাপ্যও নগণ্য নয়।

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম কবির অন্যতম প্রধান উপজীব্য তা প্রথম খণ্ডে হোসেনের মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হয়েছে। এর পরও দ্বিতীয় খণ্ড পর্যন্ত কাহিনী প্রলম্বিত হয়েছে সম্ভবতঃ দুটি কারণে, প্রথমত, দামেস্কের সিংহাসনে জয়নালের পুনর্বাসন, ও এজিদ তনয়ার সঙ্গে বিবাহ, দ্বিতীয়ত, এজিদের দুষ্কর্মের জন্য শাস্তিপ্রদান ও নিধন। প্রথম খণ্ডে এজিদ বিজয়ী হলে দ্বিতীয় খণ্ডটি এজিদের পরাজয় দৃষ্টির জন্য নিবেদিত।

মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন মানুষ রাবণের রূপ ধরে পাঠকের নিকট আবির্ভূত। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এ নতুন মানুষের চিত্তে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পিপাসা জাগ্রত করেছেন। পূর্বসূরীদের তুলনায় শিরাজীর ব্যতিক্রম এখানেও যে, তিনি মুসলিম ইতিহাসের যোদ্ধাকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে স্থাপন করেছেন। লক্ষনীয় হল, কাহিনীটি বহির্ভারতীয় এবং মুসলমানের ধর্মীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত, তা সত্ত্বেও সমকালীন ভারতে ইংরেজের অধীনতাপাশ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এখানে অস্পষ্ট থাকেনি।

সাত

যে কয়েকটি প্রধান চরিত্র অবলম্বন করে মহাশিক্ষা কাব্যের ঘটনাপ্রবাহ গড়ে উঠেছে তার মধ্যে হোসেন, এজিদ, জয়নাল, নফিসা প্রমুখ অন্যতম। হোসেন চরিত্রের বিশিষ্টতা প্রকাশিত হয়েছে স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষায় ও যুদ্ধক্ষেত্রে। অসি ধারণ করে তিনি কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং প্রাণ বিসর্জন দিয়েই স্বাধীনতার সুমহান ইচ্ছাকে ফলবতী করে তুলতে চেয়েছেন। হোসেন চরিত্র একেবারে অনুজ্জ্বল নয়, তবে পাশাপাশি এজিদ চরিত্রের বিরাটত্ব পরিস্ফুট।

এজিদ রক্ত মাংসে গঠিত পরিপূর্ণ মানুষ, সিংহাসন এবং রূপজ মোহ দুটোকেই তিনি চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন। ইমাম পরিবারের সঙ্গে তাঁর বিরোধের কারণ দামেস্ক সিংহাসনের ওপর দাবী প্রতিষ্ঠা এবং জয়নবকে জয় করে এনে বাসনাজাত অন্তর্দাহের উপশম ঘটানো। দুটোই তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে যুদ্ধক্ষেত্রে,

Dhaka University Institutional Repository

ষড়যন্ত্র, হিংসা ও অধর্মের চক্রান্তজালায়। এজিদ সকল বাধা অপসারণ করে অগ্রসর হয়েছেন কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি, তাঁকে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

এজিদকে হেয় করার জন্য কবির সচেতন প্রয়াস এ চরিত্রটির বিকাশ ব্যাহত করেছে। মেঘনাদবধ কাব্যে বিশাল মহীরুহের মত রাবণ চরিত্রের পতন যেমন পাঠককে বিচলিত করে দেয়, এজিদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। এজিদের বিরাটত্বের পাশাপাশি কবি নিজে আবির্ভূত হয়ে যেন এজিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এখানেই মাইকেলের রাবণ চরিত্রের সঙ্গে এজিদের মৌলিক পার্থক্য, এজিদের মধ্যে কবির নিজেরও পাপপুণ্যবোধের মিলন ঘটেছে, রাবণের ক্ষেত্রে যেটা অনুপস্থিত। ফলে রাবণের ক্ষেত্রে যা পুরুষকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, এজিদের ক্ষেত্রে তা হয়েছে নেহাৎ পাপের পরাজয়। তবে মাইকেলের সৃষ্ট নতুন মানুষ প্রায় সর্বশক্তিশালী পর হোসেনের মাধ্যমে স্বরূপ এজিদের মধ্যে দুর্দান্ত দাপটে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হোসেনের শক্তির উৎস কেবলমাত্র তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও অসীম পেশীর বল নয়, তিনি ঐশীশক্তির ওপরও নির্ভর করেছিলেন।

ছয়

জয়নাল ও নদিনার কিশোর প্রণয়ের রূপ নূরউদ্দীন উপন্যাসে নূরউদ্দীন এবং মুনিনার প্রায় অনুরূপ। সরোবরতীরে প্রেমমুগ্ধ জয়নাল ও নদিনা,

সেই বাগ-তীরে মৃদু সমীরে
জয়নাল নদিনা মিলিয়া দুজনে
তুলি নানা ফুল হরষে অতুল
সুচারু মালিকা গাঁথে যতনে।
দোঁহে দোঁহ গলে অনুরাগ ভরে
দিল পরাইয়া কুসুম-হারে,
কবরী গলায় কি শোভা খেলায়
দুলিয়া দুলিয়া চন্দন ভরে।[১]--

কবি তাদের মিলন দৃশ্যের সঙ্গে "বালার্কের সনে উষামনোহর" শরৎ ও উষা মোহন বেশে" তুলনা করেছেন, কারবালার করুণ ঘটনার পর শত্রুকন্যার মধ্যে জয়নাল প্রেমে আকণ্ঠ নিমগ্ন। এজিদের নিকট জানা-জানি হবে জয়নাল সম্ভাব্য বিরহের আশঙ্কায় বিচলিত হয়েছেন,

---

১। মহাশ্মশান কাব্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

হারাবে তোমায় এ জীবনে হায়।
হইবে ভীষণ দগ্ধ মরু
এই মধু স্মৃতি এই প্রেম-প্রীতি
ভস্ময়ে পুড়বে জীবন-তরু।[১]

নলিনাক্ষকেও কবি রেণুকার প্রেমের প্রতিদানের উপযোগী করে তুলেছেন,

তোমার চরণ করিয়া সেবন
ঘুচিব মনের কলঙ্ক কালী[২]—

মিলন লগ্নে তাঁরা পরস্পরকে চুম্বন বিবশ করেছেন[৩], তাঁদের প্রেম বিহ্বলতাকে কবি শিরী ফরহাদ, লায়লী মজনু এবং ইউসুফ জোলায়খার মধ্যে তুলনা করেছেন, মর্ত্যভূমি ছেড়ে তাঁরা দগ্ধ বায়ু প্রকৃতির প্রাণ শক্তি রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। উপন্যাসগুলোতে প্রিয় মিলনের মুহূর্তে চুম্বন অবশ্যম্ভাবী হয়েছে, এখানে চুম্বন ছাড়াও প্রেমকে কাটি নানাভাবে আদর্শায়িত করে তুলেছেন। কবির এখনও মনে হয়েছে,

কিম্বা বংশীধারী গোকুল-বিহারী
প্রেমের নাগর শ্রীকৃষ্ণ যেন,
লয়ে রাধিকায় মিলেছে হেথায়
প্রেম সুধাধারা বহায়ে হেন।[৪]

তারা 'ঘন' মৃদু আলিঙ্গন' করেছেন, এবং বাতাস সহসা,

কুমারী অঞ্চল করিয়া চঞ্চল
অধারে বহু সহসা করে
অলক উড়ায়ে নিচোল দোলায়ে
যেন প্রবাহিয়া রসের ভরে।[৫]—

প্রায় সমস্ত দৃশ্যটিই নুরউদ্দীন উপন্যাসে পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

কারবালার যুদ্ধে বিষাদময় ঘটনার পর কারাপ্রাচীরের অন্তরালে এ মিলন মধুর বর্ণনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদিকে বাসুলা-রাধির ওপর রসুলের দান, অন্যদিকে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দীত্বের বেদনা, এরই ফাঁক দিয়ে কিশোর প্রণয়ের রঙিন পুষ্পকে তিনি ধীরে ধীরে বিকশিত করে তুলেছেন, এ'

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪৫।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪৬।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪৬।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫২
৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫২।

পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়েছে এজিদের মৃত্যুর পর তাঁরই সিংহাসনকে ঘিরে। দ্বিতীয় খণ্ডে দুজনের এ মিলনকেই কবি মুখ্য করেছেন, যুদ্ধ শেষের শোক নয়। সে কারণে মহাশিশু কাব্যের ঘটনাপ্রবাহ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে জয়নাল নসিমা উপন্যাসের নায়ক নায়িকায় পরিণত হয়েছেন। দামেস্কের সিংহাসনে জয়নালের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এটা আলীজাদা হানিফার অবদান, জয়নালের নিজের কোন কৃতিত্ব নয়। ইমাম পরিবারের শেষ নির্ভরস্থল জয়নালকে দিয়েই এ প্রেমদৃশ্য অভিনীত, জয়নাল এ স্থলে সাধারণ উপন্যাসের নায়ক, এবং কবির পারিপার্শ্বিক সমাজের পরিবেষ্টনী থেকেই গ্রন্থে স্থান পেয়েছেন। কবির উপজীব্য ছিল মানব জীবন, এবং সত্য ছিল জীবন বিকাশের জন্য স্বাধীনতা, কারবালা কাহিনী তার উপলক্ষ্য কিংবা আশ্রয় মাত্র।

জয়নাল চরিত্রের বিকাশ হয়েছে প্রেমে, কিন্তু ইমাম পরিবারের নির্ভরস্থল বলে আত্মসম্মানের কথাও উচ্চারণ করতে হয়েছে। অনুরূপভাবে নসিমার পূর্ণতা হল আত্মসমর্পণের মধ্যে, মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের সংগে এ মতের সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে।

আট

মহরমের, কারবালা কাহিনী বাংলার মুসলমানদের সাহিত্য রচনার একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। ফারসী গ্রন্থ মকতুল হোসেন প্রভৃতি শ্রেণীর গ্রন্থ বাংলায় রূপান্তরণের মাধ্যমে এর সূচনা। মধ্যযুগে এ শ্রেণীর রচনার সূত্রপাত হয়েছে, বিংশ শতাব্দীতেও বিভিন্ন কবি ও লেখককে কারবালা কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করতে দেখা যাচ্ছে।[১]

১৮০০ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে মুসলমানদের গদ্যে রচিত কারবালা বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা তিনটি, মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু, ফজলুর রহমান চৌধুরীর মহরম চিত্র (১৯১৭) এবং ডাঃ লুৎফর রহমানের জেবেদের কারবালা।

বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থের 'মহরম পর্ব' ১২৯১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১২৯৪ সালে উদ্ধার পর্ব এবং ১২৯৭ সালে এজিদ বধ পর্ব প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সংগে সংগেই এ গ্রন্থ মুসলমান সমাজে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, মুসলমানদের সাহিত্য সাধনার সম্ভাবনা প্রশস্ত হয়। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গদ্য রচনা হিসেবেও গ্রন্থটি সমকালে আদৃত হয়েছিল। সাহিত্য সাধনার শুরুতে লিখিত বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থের অসাধারণ

১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য, পৃঃ ১৭৫-৪০০।

Dhaka University Institutional Repository

জনপ্রিয়তার মাপনে উৎসাহিত হন, সুতরাং কবিতার জন্যে বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের আত্মদানমূলক ও লোকপ্রিয় বিষয়টিকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। জনমপ্রবাহ কাব্যের বক্তব্য এখানেও প্রতিফলিত করে তুলেছেন। এভাবেই দীর্ঘ বারো বছরের সাধনার ফল হল 'মহাশিক্ষা কাব্য'।

বিষাদ সিন্ধুর মহরম পর্বে মীর মোশাররফ হোসেন পুথির প্রভাব কাটিয়ে এসেছেন, এ অংশটি প্রায় মহাকাব্যের মত। এজিদের রাজ্যলিপ্সা ও রূপতৃষ্ণা অপ্রতিরোধ্য নিয়তির মত তাঁর জীবনকে ট্র্যাজিক অবসানের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। কিন্তু গ্রন্থের শেষাংশে লেখক নির্লিপ্ত থাকতে পারেননি, পুথির প্রভাবে হোক, কিংবা সমকালীন সমাজ পরিবেশের কারণে হোক, তিনি তাঁর সাহিত্যিক লক্ষ্য থেকে আংশিকভাবে বিচ্যুত হয়েছেন। বিষাদ সিন্ধুর গ্রন্থের মধ্যে অলৌকিকতার প্রাচুর্য রয়েছে প্রচুর, অনেক ঘটনা এবং চরিত্র অনৈতিহাসিক কিন্তু তা সত্ত্বেও রচনানৈপুণ্যের ফলে এটা মর্মস্পর্শী হয়েছে, পূর্বেকার সকল রচনার তুলনায় পাঠকের নিকট অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছে। ঐতিহাসিক চরিত্র লেখকের কল্পনা ও অনুভবের উত্তাপে রঞ্জিত, অনেক সময়েই তাঁরা ইতিহাসের আশ্রয় ছেড়ে এমন কি আরবের মরুভূমি ছেড়ে লেখকের সমকালের পরিবেষ্টনী ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে চলে এসেছেন। রূপতৃষ্ণা প্রকাশের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রভাবও পড়তে পারে। সমকালীন পরিবেশের কারণে শিরাজীর রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র অপ্রতিরোধ্য সাহিত্যিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছেন, সুতরাং শিরাজীর রচনায় বঙ্কিমের প্রভাব আরো বেশী।

মজিবুর রহমান খানের (১৮৭২–১৯৩৭) এজিদ বধ কাব্যের সর্গসংখ্যা একটি, মিহির ও সুধাকর পত্রিকায় (১৯শে আগষ্ট, ১৮৯১) এটা প্রকাশিত হয়েছিল। মোসলেম বধ কাব্য প্রচারক পত্রিকায় (বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮) প্রকাশিত হয়। এগুলো পয়ারানুগতিক পুথি নির্ভর রচনা।

কারবালা বিষয়ক কাব্যের মধ্যে আবুল মা'আলী মুহম্মদ হামিদ আলীর (১৮৬৫–১৯৫৪) কাসেম বধ কাব্য (১৯০৫) এবং জয়নালোদ্ধার কাব্যের (১৯০৭) মধ্যে প্রথমটিই বেশী জনপ্রিয় হয়েছিল। কবির উদ্দেশ্য ছিল সমকালীন মুসলমান সমাজের প্রয়োজনসাধন। 'শিরাজীর জীবদ্দশায় মহাশিক্ষা কাব' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, সুতরাং সমকালীন পাঠকের কাছে এ দুটো কাব্যের তুলনীয় সমাদর জানা সম্ভব নয়।

মহাশিক্ষা কাব্যের তুলনায় ক্ষুদ্র কলেবর হলেও কাসেম বধ কাব্যের গাঁথুনি নিটোল, কবি ভাষা, সর্গপরিকল্পনা ইত্যাদি দেখে মাইকেলের প্রভাব স্পষ্ট। হোসেনের মধ্য দিয়ে নির্মম নিয়তির নির্দেশ প্রতিফলিত।

১। প্রথম সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। আবু–মা–আলী মহাম্মদ হামিদ আলী — কাসেম বধ কাব্য, ঢাকা, শ্রী শরচ্চন্দ্র দত্ত এন্ড সন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩২০, পৃঃ / — ১ ।

Dhaka University Institutional Repository

বিশাল বটবৃক্ষের মত মহাশক্তিধর হোসেন আপন আগ্রহেই নিক্ষিপ্ত করে তুলেছেন, নিজের ধ্বংসবিলাসী হয়ে যাত্রা অবলোকন করেছেন, কিন্তু প্রতিরোধ করতে পারেননি। শিরাজীর লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের জন্য জাতীয় ভাবের সৃষ্টি, হামিদ আলী কারবালার বিষাদসিন্ধু দিকের প্রতিই প্রধানতঃ ইঙ্গিত করেছেন। হামিদ আলী কাব্যের উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছেন, শিরাজী কাব্যের উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে গেছেন এবং জাতীয় সম্ভাবনার সংগে কাব্যকে যুক্ত করে দিয়েছেন। হামিদ আলীর রচনা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী, কিন্তু শিরাজীর রচনা সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন মেটায়। হামিদ আলীর জয়নালোদ্ধার কাব্য পাঁচটি সর্গে ৭৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, কাসেম বধ কাব্যের তুলনায় এটা জনপ্রিয় হয়নি, কাব্য মূল্যের দিক থেকেও নিকৃষ্ট।

আব্দুল বারি রচিত 'কারবালা (১৩১৯) গ্রন্থে কাহিনী কাব্যের চেয়ে এখানে নীতি কবিত্বের আয়োজন বেশী, কিন্তু রচনা হিসাবে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

মফিজের আলী তালুকদারের 'হাসান বধ কাব্য' প্রকাশিত হয় ১৩২৫ সালে, শিরাজীর রচনা সমাপ্ত হবার অনেক পরে। কাব্যটির সর্গ সংখ্যা ৯ এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৪। হাসানকে হত্যা কাহিনীর মধ্যেই কবি তাঁর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

শিরাজীর অনেক পরে লিখিত হলেও কারবালা কাহিনী বিষয়ক সম্যক উল্লেখযোগ্য কাহিনী কাব্য মীর কায়কোবাদের মহরম শরীফ কাব্য। ১৯০২ সালে এটা রচিত হয় এবং ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। এসবই শিরাজীর মৃত্যুর পরেকার ঘটনা। মহরম শরীফ -এর তিনটি খণ্ড, সর্গ সংখ্যা ২৯, এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৭০। কায়কোবাদের রচনার উৎস পূর্বসূরীদের কাব্য নয় ইতিহাস, বরং পূর্বসূরীদের ইতিহাসবিচ্যুতির সমালোচনা করে তিনি এ কাব্য রচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন।[১] তবে ইতিহাস বর্ণনার সংগে কাব্যোৎকর্ষের সম্পর্ক ক্ষীণ, কায়কোবাদের রচনার মধ্যেও তা পরিস্ফুট। মহরম শরীফ কাব্যের উপজীব্য করুণ রস এবং নীতিশিক্ষা দান, সমকালীন (বস্তিমুখী) কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কবি বহুলাংশে নির্লিপ্ত।

কেবল পুথি বা শালীন সাহিত্যে নয়, পল্লীগানের মধ্যেও কারবালা কাহিনী বিষয়ক গানের বিশিষ্ট মর্যাদা রয়েছে। করুণ রস এসব গানের সম্বল, হোসেন পক্ষের মনস্তাপের জন্য লোক কবিরা তাহার মহা- [illegible]

১। কায়কোবাদ-ইকবিমুৎ, মহরম শরিফ বা আত্ম-বিসর্জন কাব্য, ঢাকা, কায়কোবাদ কর্তৃক প্রকাশিত, দ্বি-সং ১৩৫৬, পৃঃ ১-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

রচনায় সাধারণভাবে মহররম পর্ব কিছুটা ভারসাম্য রয়েছে। পুথিতে যেমন নেই, তেমনি হাসান হত্যাকে পল্লবিত ও করুণরসযুক্ত করে প্রকাশ করেছেন। কারবালা কাহিনী নির্ভর সকল রচনার মধ্যেই মহাশ্মশান কাব্যের একটি বিশিষ্টতা রয়েছে। দ্বিতীয় অংশে, অর্থাৎ আজিদ বধ ও জয়নাল উদ্ধার পর্বে শিরাজী তার পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী প্রায় সকলের তুলনায় ব্যতিক্রমী। অতিলৌকিকতা যতদূর সম্ভব পরিহার করে প্রথম অংশে যেভাবে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন, শেষাংশে তা একেবারে বিনষ্ট হয়নি। কারবালা কাহিনী নির্ভর অন্যান্য সাহিত্য রচয়িতার তুলনায় শিরাজী তার কালপরিবেশ, সামাজিক, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে মোটেই উদাসীন ছিলেন না। বাংলার মুসলমান সমাজ, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত বাঙালী সমাজ, এমন কি বহু-জাতি অধ্যুষিত ও ইংরেজের নিকট পরাধীন বিশাল ভারতবর্ষের মুক্তি পিপাসাকেও তিনি বহির্ভারতীয় একটি মুসলিম উপাখ্যানের মধ্যে যুক্ত করে প্রকাশ করেছেন এখানেও এ কাব্যের অন্যতম বিশিষ্টতা। কারবালা কাহিনী নির্ভর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে এক্ষেত্রে শিরাজী তুলনাহীন, শিরাজীর আগে ও পরে সকল রচনার তুলনায় শিরাজী অগ্রসর। বাংলা ও ভারতে স্বাধীনতার যে সম্ভাব্য পরোক্ষায় তিনি কারবালায় তাজা রক্তের চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন, বিপুল আত্মদানের মাধ্যমে স্বাধীনতাকে রক্ষা এবং বসুন্ধরাকে বীরভোগ্যা করে তুলেছেন।

(ঘ) স্পেন বিজয় কাব্য

এক

শিরাজীর স্পেন বিজয় কাব্য মুসলিমবীর, তুলনামূলকভাবে মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। কাব্যটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। জীবদ্দশাতে প্রকাশিত এ দ্বিতীয় সংস্করণে কবি কেবলমাত্র তিনটি শব্দ ও একটি চরণ পরিবর্তন করেছেন, এ ছাড়া প্রথম সংস্করণের তুলনায় দ্বিতীয় সংস্করণে পাদটীকা বেশী।[১] কেবলমাত্র ছন্দ সৌকর্য বৃদ্ধির প্রয়োজনেই পরিবর্তনটুকু ঘটেছে, এর সঙ্গে কবির অন্য কোন মানসিক আবেগের সংযোগ আছে বলে মনে হয় না।

১।

প্রথম সং	দ্বিতীয় সং
পৃঃ ৭২ ৬ষ্ঠ চরণঃ "বধু অন্বেষণ করি তন্ন তন্ন করি"	পৃঃ ৭৩, ১ম চরণঃ "তন্ন তন্ন করি বধু অন্বেষণ পর"
,, ৯৩, ১২ নং চরণঃ "পলায়"	পৃঃ ৯৪, ১০ নং চরণঃ "নির্যাতন"
,, ,, ১৪ নং চরণঃ "সংবাদ জ্ঞাপনে"	,, ,, ১২ নং চরণঃ "এখন-তখন"
,, ১০১, ১৪ নং চরণঃ "আজির আরক্ষণ"	,, ১০৩, ১৭ নং চরণঃ "তাজির সকাশে"
পাদটীকা - ১৪ টি	পাদটীকা-১০ টি।

Dhaka University Institutional Repository

স্পেনবিজয় কাব্য ছাড়াও স্পেন সম্পর্কে গদ্য ও কবিতায় শিরাজীর হাতে কিছু রচনা আছে। 'মোরক্কো স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা (১৯০৭) স্পেনের প্রতি[১] কবিতা এ পর্বের অন্যতম। বলকান যুদ্ধে যোগদানের আগে পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের সংগে শিরাজীর বাস্তব কোন সংযোগ ছিল না। [struck-through text] তুরস্কে বলকান রণক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রভূমিতে স্বয়ং শিরাজী দেখেছেন, তুরস্ক তখনো স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রামরত। মিশরবাসদের পরাধীনতার বেদনা যেমন অনুভব করেছেন, তেমনি স্পেনে কখনো না গেলেও মুসলমানের বেদনাময় ইতিহাস, ও মুসলমান শাসন-সভ্যতা অবসানের স্মৃতি মানে রেখে একজনের বিজয় গৌরবকেই বড়ো করে তুলেছেন। স্পেনে মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির চিহ্ন সমূহ কিভাবে প্রতিহিংসায় দূরে অবলুপ্ত বিলীন হয়েছে তা অনুভব করতে চেষ্টা করেছেন। স্পেনের সংগে তুলনা করে শিরাজী সমকালীন ভারতে ভয় করেছেন, মুসলমান শাসনের অবসানের পর এভাবে দীর্ঘকাল পরাধীনতা বরণ করে থাকলে স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতার মত ভারতীয় মুসলমানদের গৌরব সূর্যও চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়ে যাবে। এজন্য শিরাজী বিশ্ব মুসলিম, বিশেষতঃ স্পেনের কথা বিভিন্ন রচনায় মধ্যে অনবরত স্মরণ করেছেন। মুসলিম অধ্যুষিত স্পেন একদা ইটালীয় মাধ্যমে ইউরোপের রেনেসাঁর উৎস হিসাবে ভূমিকা পালন করেছিল কিন্তু সে গৌরবাবশেষ এখন আর নেই। ভারতীয় মুসলমানদের অতীত গৌরবে মুগ্ধ শিরাজীও এভাবে ইংরেজের অধীনে গৌরবের বিনাশ আশংকা করছিলেন। স্পেন বিজয় কাব্যটি মুসলমানদের সে গৌরব কথার উচ্চারণে মুখর। কিন্তু প্রবন্ধে বা গদ্য কবিতায় যেখানে গৌরব বর্ণনা করা সহজ হয়েছিল, কাহিনী কাব্যের কাঠামোতে সেটা বে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

কবির মানসিকতা বিশ্লেষণের জন্য প্রধানতঃ মহাশিক্ষা কাব্য ও স্পেনবিজয় কাব্য তুলনীয় হতে পারে। মহাশিক্ষা কাব্য মুসলমানের গৌরব হারানোর কাহিনী, কিন্তু স্পেন বিজয় কাব্য মুসলমানের গৌরব অর্জনের কাহিনী, সেজন্য দুটো গ্রন্থে শিরাজীকে দুটো পৃথক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। ফলে দুটো কাব্যে কবির উদ্দেশ্যের মধ্যে ভেদ পড়েছে। মেঘনাদবধ কাব্যে ঊনিশ শতকের মধুর মানুষ চিত্রিত, তেমনি দেশাত্মবোধ প্রকাশের ক্ষেত্রেও এ কাব্য প্রতীকধর্মী। পরবর্তীকালে মহাকাব্য শ্রেণীর অধিক রচনাতেই দেশাত্মবোধের এ মূল ভাবটি কমবেশী প্রকাশিত কিংবা অনুসৃত হয়েছে। আধুনিক কাব্য রচনায় পশ্চাতে শিরাজীরও উদ্দেশ্য তাই ছিল, কিন্তু মহাশিক্ষা কাব্যে যেটা সহজে সম্ভব হয়েছিল, স্পেন বিজয় কাব্যে তেমন হয়নি।

মহাশিক্ষা কাব্যে মোসেন প্রজাতন্ত্রের রক্ষাকারী। এজিদ অন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আক্রমণ করেছেন, সাধু রাজা ও প্রজার সুবিধার জন্য হোসেন পরিবার ও অন্যান্য বিশ্বাসী মুসলমান আত্মাহুতি দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু স্পেনবিজয় কাব্যে মুসলমান পক্ষই আক্রমণকারী, রডরিক আর রাজায় বাধ্য, রডরিকের ভূমিকা

---

১. নবনূর, ভাদ্র(?) ১৩১২ সংখ্যায় 'স্পেন—অমূল্য' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। উদ্ধৃত, পৃ/ দৈনিক প্রবাহ, পৃ—৩২, পৃ ১৭০-৭১ প্রথমে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

সম্পর্কে কবি দ্বিধাগ্রস্ত। রডারিক মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন সেটা লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি এবং মুসা তারেকের স্পেন আক্রমণ যুক্তিসংগত করে তোলার জন্য রডারিকের চরিত্র কালিমালিপ্ত করা হলেও তাঁর জীবনে বিপুল ট্রাজেডী সংঘটিত হয়েছে। মেঘনাদবধ কাব্যের রূপগত অনুসরণ চেষ্টা থাকলেও শিরাজীর এ ব্যতিক্রম, খ্রীষ্টান আপন অন্তরের মধ্যেই রডারিকের ভাগ্য নিয়ে সংগ্রাম পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারে। কবি বলেছেন যুদ্ধে মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে সংঘাত প্রত্যক্ষ করেছিলেন, কেউ কেউ মনে করেছেন, এ কাব্যে যেভাবে "খ্রীষ্টান রডারিকের সঙ্গে মুসলমান মুসা তারেকের যুদ্ধ" বর্ণিত হয়েছে।[১] পরিণামে মুসলমান পক্ষ বিজয়ী হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এটা স্পেন বিজয় কাব্যের সাধারণ একটি দিক মাত্র।

দুই

কাব্যে মুসলমানদের স্পেন আক্রমণের কারণ দেখান হয়েছে প্রধানতঃ দুটি, প্রথমত মুসলমানদের বাণিজ্য পোত স্পেনীয় সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, এবং দ্বিতীয়তঃ রডারিক কাউন্ট জুলিয়ানের কন্যা ফ্লোরিন্ডার সতীত্ব নাশ করেন, ফলে রডারিককে শিক্ষা দেবার জন্য জুলিয়ান কর্তৃক মুসলমান সেনাপতি মুসার নিকট সহায়তা প্রার্থনা। মুসা এ প্রার্থনা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমান পক্ষ আক্রমণকারী, শিরাজী নিজের মনে তা অস্বীকার করতে পারেননি বলে আক্রমণের অনুকূলে যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন। কাব্য কাহিনীতে রডারিক নারীধর্ষণলোলুপ, মদ্যপায়ী, কাপুরুষ, তাঁর কাপুরুষতাকে নিন্দা করলেও রণক্ষেত্রে তাঁর বীরত্বকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখেছেন। জুলিয়ানকে একস্থলে রডারিক বলেছেন,

--------" ওরে নরাধম!
বিশ্বাসঘাতক হীন মাতৃভূমি দ্রোহী
কাউন্ট-কুল কলঙ্ক হীন নীচাশয়!
আমারে সম্মুখে মম দেখি রণ-সাধ
কত তোর? নরাধম! তোরে সর্বদাই
মনে হলে তোর কথা, জাকু পাবি
এখনু বিদিত তোর, ওরে দুর্মতি!
এই কি কর্তব্য তোর? খ্রীষ্টান-নাশিরে
যেখানে আনিলি তুই এ খ্রীষ্টান দেশে?[২]

১। মুসলিম বাংলা সাহিত্য পাঠ পরিক্রমা, পৃঃ ১১৪।
২। স্পেন বিজয় কাব্য, [illegible] ৫, পৃঃ ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

মাতৃভূমি রক্ষার জন্য সংগ্রাম রত্তাব্বিকের অন্যান্য চারিত্রিক লক্ষণ সব মুছে দেয়, পুত্র মহীন্দ্রকের পতন রত্তাব্বিকের দীর্ঘশ্বাসকেই প্রধান করে তোলে। মেঘনাদবধ কাব্যে পুত্র মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণের দীর্ঘশ্বাস সমস্ত কাব্যের পরিবেশটিকেই সিক্ত করেছিল। কিন্তু রাবণ যুদ্ধে প্রাণ দেননি, রত্তাব্বিক দিয়েছেন। রত্তাব্বিকের পুত্রশোক সমারোহহীন, একজন সাধারণ মানুষের মত। শোক নিবারণ পাপ নিবারণ এবং রাজ্য রক্ষার শেষ উপায় হিসাবে রত্তাব্বিককে যুদ্ধে যেতে হয়েছে, কেবল তাই নয়, বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করে তিনি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। মুসলমান পক্ষ বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু বিজয়ের গৌরব রত্তাব্বিকেরও রয়েছে, অন্ততঃ পক্ষে পরাজয়ের গ্লানি নেই। কেননা, মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থেই রত্তাব্বিক আত্মদান করলেন। শিরাজী বিভিন্ন রচনাতে মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের ও রক্ষার জন্য রক্ত দানের আহবান জানিয়েছেন। এ কাব্যে রত্তাব্বিকও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কবির বাঞ্ছিত আত্মদানের গৌরবের অধিকারী হয়েছেন, কিন্তু শিরাজী সচেতনভাবে রত্তাব্বিককে সেভাবে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত ছিলেন। যে কারণে শিরাজী এ কাব্য রচনায় নিজের মনের মধ্যেই অনবরত আন্দোলিত হয়েছেন, কাব্যে রত্তাব্বিকের ভূমিকা সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হতে

পারেননি। রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক জীবনে কবি যেসব বর্ণময় আদর্শ সন্ধান কিংবা প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহী ছিলেন তার কোন কোনটি রডারিকের মধ্যে উপস্থিত ছিল। ব্যক্তিগত চরিত্র স্খলন অবশ্য তিনি কোন অবস্থাতেই অনুমোদন করেননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও রডারিকের প্রতিপক্ষ মুসলমান না হলে, কিংবা রডারিক নিজে খৃষ্টান না হয়ে মুসলমান হলে কবির প্রমত্ত বিজয় মাল্য রডারিকই পেতেন, ঘৃণা কিংবা তাচ্ছিল্য নয়। এতদসত্ত্বেও স্পেনবিজয় কাব্যে দুরাচারপ্রেমিক রডারিককে কবি একটু সহৃদয়ের দৃষ্টিতে দেখেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যুতে হৃদয়ে বেদনাবোধও করতে পারেন।

স্পেন বিজয় কাব্যের চরিত্র মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণের আদর্শে গঠিত হলেও শেষ পর্যন্ত রাবণ যেখান থেকে সরে এসেছেন, রডারিক আর রাবণের পোশাকে সজ্জিত নন, রডারিকের দেশপ্রেম এবং দেশের জন্য তাঁর আত্মোৎসর্গ কবি ভালোবেসেছেন, তাঁকে হত্যা করতে যেয়ে কবি মন্থর অশ্রুসিক্ত হয়ে থাকতে পারেন। পুত্র শোকাতের রাবণের মনুষ্যত্বের ঐশ্বর্য মলিন হয়নি, কিন্তু রডারিক অন্তরে ও বাইরে দেউলিয়া হয়ে পড়েছেন। একদা কিংবদন্তী কিংবদন্তীর মত বিশাল লঙ্কা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর স্ত্রীর ভর্ৎসনা পেয়েছেন, সাম্রাজ্য হারিয়েছেন, পুত্র মেঘনাদকে হারিয়েছেন। কিন্তু বিনা যুদ্ধে বহিঃশত্রুর নিকট সাম্রাজ্যের অধিকার পরিত্যাগ করেননি, এবং সাম্রাজ্য হারিয়ে ও পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে জীবন ধারণ করেননি। সমকালীন রাজনীতির প্রেক্ষিতে রডারিকের মাধ্যমে রাবণ আরো কাছের মানুষ হয়ে এসেছেন। রঘুকুলের মত এ কাব্যে মুসলমান পক্ষও দেবতাদের সহায়তা বা আশীর্বাদ পাননি, তাঁরা নিজেদের বাহুবলকে আশ্রয় করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তিন

স্পেন বিজয় কাব্যের কাহিনী প্রচলিত ইতিহাস নির্ভর। কোন কোন সমালোচকের মতে লেইন পুল এর The Moors in spain — গ্রন্থের সঙ্গে স্পেন বিজয় কাব্যের আনুষঙ্গিক সাদৃশ্য রয়েছে। পঞ্চম ও সপ্তম সর্গে ইতিহাস বহির্ভূত কল্পনার আশ্রয় গৃহীত এবং চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম সর্গ লেইনপুল অনুসৃত। সংলাপমূলক নাটকীয় কথোপকথন কবির নিজস্ব সৃষ্টি। পঞ্চম সর্গে কুমার আবদুল্লার চরিত্র এবং সপ্তম সর্গে যশীলকের পতন কাহিনী ও নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির প্রেরণা থেকে এসেছে। "শাস্ত্র নির্দেশিত সংজ্ঞানুযায়ী মহাকাব্যের প্রায় প্রতিটি লক্ষণই স্পেন বিজয় কাব্যে লক্ষ্য করা যাবে।"[১]

স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা গ্রন্থের ২য় সংস্করণে প্রমাণ পঞ্জী হিসাবে ঐতিহাসিক ডোজীর গ্রন্থের নাম উল্লিখিত আছে, সুতরাং অনুমান করে নেওয়া যায়, ডোজীর গ্রন্থের স্পেন বিজয়ের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। স্পেন বিজয় গ্রন্থের সমালোচনায় প্রবাসী পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়, "বিখ্যাত ডচ ঐতিহাসিক রেনহার্ট ডোজী (১৮২০-৮৪) বহুদিন হইল তাহার Histoire des Mussulmans Espagne - নামক মুসলমান অধিকারে স্পেনের ইতিহাসগ্রন্থে নিঃসন্দেহে প্রমাণ প্রয়োগে প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন যে, মুসলমানগণের স্পেন বিজয়ের এই বিবরণ উপন্যাসমাত্র। আধুনিক কালের আরো কয়েকজন ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ পাইয়াছে যে, রমনীর প্রতি অত্যাচারের গল্প ঘটনার দুয়শত বৎসর পরে একজন ইটালীর সন্যাসী প্রথম রচনা করেন, জুলিয়ান বলিয়া কেহ ছিল না, স্পেন দেশীয় যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মুসলমানের পক্ষ লন তার নাম আর্বান, ইত্যাদি। এই বিবরণ 'প্রবাসীর' গত বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের "ইতিহাস চর্চার প্রণালী" প্রবন্ধটিতে বর্ণিত হইয়াছে, সিরাজী সাহেবকে তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"[২]

বলা বাহুল্য, এ সমালোচনাটি স্পেনবিজয় কাব্যের প্রথম সংস্করণ(১৯১৪) সম্পর্কিত, প্রথম সংস্করণের প্রায় ছয় বছর পর এবং এ সমালোচনা প্রকাশের প্রায় পাঁচ বছর পর প্রকাশিত কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯২০) কবি ইতিহাসের কোন ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন/বোধ করেননি, এবং কাব্যদেহেও তেমন মৌলিক কোন পরিবর্তন করেননি। তিনি কাব্য লিখেছেন, কিন্তু ইতিহাস নয়, ডোজীর ঐতিহাসিক বিবরণ তাঁর কাব্যের উদ্দেশ্যের অনুকূল নয় বলেই তিনি ইতিহাস সম্পর্কে পূর্বেকার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রেখেছেন।

১। মুসলিম বাংলা সাহিত্য পাঠ পরিক্রমা, পৃঃ ১১৯-২৪।
২। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।

Dhaka University Institutional Repository

কবির মূল লক্ষ্য ছিল, ইতিহাসের পটভূমিতে মুসলমানদের বাহুবল ও বীরত্বের অন্বেষণ বর্ণনা। সেকারণে স্পেন বিজয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন ঘটনাও নানা কৌশলে কবি এখানে উপস্থিত করেছেন। যেমন কাউন্ট জুলিয়ানের নিকট এশিয়া আফ্রিকা বিজয়ী সেনাপতি ওকবার মূর্তির পরিচয় এভাবে দিয়েছেন,

—আফ্রিকার পশ্চিমান্তে আটলান্টিক গর্ভে
অশ্ব সহ অবতরি হেরিলা সম্মুখে
গর্জিছে বিশাল সিন্ধু ঊর্মি বাহু তুলি
দুলিয়া দুলিয়া রঙ্গে, নাহিকূল তার।
আক্ষেপে কহিলা তবে বীরেন্দ্র শার্দূল
"হে আল্লাহ! তোমার নাম জগতে প্রচার
নাহি আর স্থলভাগ, —তব ধর্মকেতু
উড়াইতে নাহি স্থান — মানব সমাজ।
বৃথা কোষ হতে আজি অসি মুক্ত ধারণ।"[১]

সৈয়দ আমীর আলী প্রদত্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

"Disappointed at the sight of the vast expanse of water which chacked any further advance, he spurred his horse chest deep into the waves & raising his hands towards heaven exclained "Almighty lord ! but for this sea I would have gone into still remoter regions, spreading the glory of thy name and smitting thine enemies.."[২]

অথবা,

রাখিলা জনক যেথা বিদ্যা অধ্যয়নে
রাজনীতি নীতি জ্ঞান শিখিতে যতনে
আদব কায়দা আর চরিত্র গঠনে
বাল্যকাল হতে।
কিন্তু নাহি জানি হায়! রাজার অনুজে
কিরূপে পশিয়া পাপ মোহমুগ্ধ করে

১। স্পেন বিজয় কাব্য, পৃঃ ৩৭-৩৮।
২। ~~Syed Ameer Ali~~-A short History of the saracens, pp. 79-80.

নাশিল ধরম মম দিবা ছল করে
কিবা ফাঁদ পেতে।—[১]

কবি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন, আদব-কায়দা শিক্ষার জন্য রাজপরিবারে অভিজাত ব্যক্তিদের সন্তান পাঠাবার রীতি ছিল। প্রথম সংস্করণে এখানে কোন পাদটীকা নেই। Moors in spain - গ্রন্থের বর্ণনার সঙ্গে এর যোগ সুদূর নয়, যেমন,

....."It was then the custom among the princes of the state to send their children to the court, to be trained in whatever appertained to good breeding and polite conduct. Among others, Count Julian the governor of Ceuta sent his daughter Florinda to ~~Radarick~~ Roderick's court at Toledo to be educated among the queen's waiting women. The maiden was very beautiful and the king, forgetful of his honour, which bound him to protect her as he would his own daughter, put her to shame..."[২]

অথবা,

অন্বেষি প্রাসাদ হতে কাটিয়া লোকন,
অপূর্ব বেদিকা পরে সুবর্ণ পেটিকা,
শোভিত রয়েছে তাহে এই বিবরণ
পেটিকায় বদ্ধ আছে ভূর্জ প্রহেলিকা।
কিন্তু রাজা ভিন্ন এই সুবর্ণ পেটিকা
খুলিতে নারিবে কেহ, কোনও ভূপতি,
যদি কভু খোলে ইহা, যথা লিখিত
দেখিবে চক্ষুপটে চমৎকার অতি।
কিন্তু অচিরেই তারে শত্রুর কবলে
পড়িয়া থাকিতে হবে এ কথা সংসারে।[৩]

১। স্পেন বিজয় কাব্য, পৃঃ ১৯৬।

২। Stanley Lane-Poole, The Moors in spain, London, T.Fisher unwin, 1888, p.II.

৩। স্পেন বিজয় কাব্য, পৃঃ ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

তুলনীয়.

"....in its [chamber] midst was a table set there by Hercules, and on it a casket with the inscription,"In this coffer is the mystry of the Tower.The hand of none but a king can open it, but let him beware, for wonderful things will be disclosed to him which must happen before his death."[3]

এরূপ অংশ অনেক আছে।

চার

স্পেনবিজয় কাব্যকে 'মহাকাব্য' হিসাবে কবি কোথাও উল্লেখ না করলেও মেঘনাদবধ কাব্যের আদর্শে এ কাব্যটিকে কবি রচনা করেছেন তার প্রমাণ রয়েছে। এ অনুসরণ যেমন কাহিনী পরিকল্পনায়, তেমনি ঘটনাবিন্যাস এবং ভাষার ক্ষেত্রেও স্পষ্ট। কিন্তু কাহিনী অংশ দুর্ধর্ষ পাঠান পরিব্যাপী নয়, ইতিহাস ও মানব জীবনকে নির্ভর করে গড়ে উঠেছে বলে যুগজীবন সাধারণ মানুষের হাসি কান্না এখানে প্রতিফলিত। কাব্যটি আলোচনা প্রসঙ্গে আবদুল কাদির বলেছেন, "এই 'স্পেনবিজয়' কাব্যখানি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের অনুসরণে রচিত, একথা বললে ভুল বলা হয় না। স্পেন-রাজ রডারিকের অন্তঃপুরে ধর্ষিতা ফ্লোরিন্ডার বন্দিনী-দশা, সমুদ্র পার হয়ে তারেকের স্পেন অভিযান, জুলিয়ানের যুদ্ধ-দলে যোগদান, যুদ্ধে যুবরাজ মহাজেবের পতন, রাজসভায় মামাজোর ধিক্কার ও ভর্ৎসনা, পুত্রশোকে রডারিকের বিলাপ, সুন্দরী সোফিয়ার স্বদেশপ্রীতি, মহীজেবের সমাধি, পুত্রশোকোন্মত্ত রডারিকের রণযাত্রা, এ-সমস্ত ঘটনা যথাক্রমে অপহৃতা সীতার লঙ্কায় অবস্থান, সমুদ্র পার হয়ে শ্রীরামের সিংহল আক্রমণ, বিভীষণের কপি-দলে যোগদান, যুদ্ধে বীরবাহুর পতন, রানী মন্দোদরীর গঞ্জন, পুত্রশোকে রাবণের বিলাপ, প্রমীলার খেদ, মেঘনাদের চিতারোহন, পুত্রশোকাতুর রাবণের যুদ্ধযাত্রা। প্রভৃতি প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৪]

১। তৃতীয় কানন হতে পংক্তিটি সংকলিত।

২। The Moors in spain,p. 18.

৩। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—মুসলিম বাংলা সাহিত্য পাঠ পরিক্রমা, পৃঃ ১১৯–২৫২।

৪। ইসমাইল হোসেন সিরাজী: জীবন-কথা ও সাহিত্য-কীর্তি, দি-র, পৃঃ ৪২৪।

Dhaka University Institutional Repository

রক্তাম্বিকের পুত্র মহীনকে—মেঘনাদবধ কাব্যের রূপানুরিত মেঘনাদ। রাবণ ও রক্তাম্বিক এক নন, এমন কি বিভীষণ এবং কাউন্ট জুলিয়ানও এক নন। আত্মজকে অবমাননার প্রতিশোধ নেবার যে মন্ত্রণা জুলিয়ানকে শত্রুপক্ষে যেতে বাধ্য করেছিল বিভীষণের ক্ষেত্রে[১] তা অনুপস্থিত। জুলিয়ান মুসলমান পক্ষকে আদর্শ মনে করে তাদের সঙ্গে যোগদান করেননি, সুতরাং রক্তাম্বিকের চরিত্রে সংশয় থাকলেও তার স্বজাতি প্রেম কিংবা স্বদেশপ্রীতি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেননি। এখানেই বিভীষণের সঙ্গে জুলিয়ানের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, এবং এ পার্থক্য রাবণের সঙ্গে রক্তাম্বিকের সাদৃশ্যও কমিয়ে দেয়। তাছাড়া মাইকেলের কাব্যোপলব্ধির ভুবন থেকে শিরাজী নানা অর্থেই অনেক দূরত্বে অবস্থান করেছেন, তা সত্ত্বেও শিরাজীর আকাঙ্ক্ষা ছিল মাইকেলের সৃষ্ট রাবণের মত মুসলমান গৌরবের বিজয় যান-কে টেনে নিয়ে যাওয়া। এ কারণে তাঁর মাইকেলের অনুসরণের পরিমাণ অনেক বেশী, এবং প্রধানতঃ ভাষা ও বহিরঙ্গে খুঁটিনাটি চরিত্র অনুসরণের সূত্রেই শিরাজীর সমকালীন এবং এমন কি সাম্প্রতিক কালের সমালোচকদের কাছেও স্পেন বিজয় কাব্যটিকে বৈশিষ্ট্যহীন বলে মনে হয়েছে। স্পেন বিজয় কাব্য বিজয়টিও অপ্রধান নয়, অন্যদিকে অনুরে বাইরে মহীরুহ রাবণের বিরাট পতন এবং হাহাকার মেঘনাদ বধ কাব্যের উপজীব্য। প্রবাসী পত্রিকা মেঘনাদবধ কাব্যের সঙ্গে তুলনা দিয়ে স্পেন বিজয় কাব্যের এভাবে মূল্যায়ন করেছে যে, "ছন্দের উপর লেখকের মোটামুটি বেশ অধিকার আছে। কিন্তু অভিধান বাছিয়া কঠিন শব্দ ব্যবহার করাতে অনেক স্থানেই তাহা অযথা কর্কশ, ও শ্রুতিকটু হইয়াছে। কবিত্বের পরিচয় পুস্তকের কোথাও পাইলাম না। মামুলি বর্ণনা ও মামুলি উপমা সমস্ত কাব্যখানি জুড়িয়া রহিয়াছে। মৌলিকতার বিন্দুমাত্র আভাষ কোথাও নাই। সপ্তম সর্গটি তো মেঘনাদবধ কাব্যের হুবহু অনুকরণ— এ সর্গটি মাইকেল বর্ণিত রাবণের সভা, রাবণের পুত্র শোক ও চিত্রাঙ্গদার বিলাপের নিতান্ত ব্যর্থ অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।"[২]

বলা বাহুল্য ভাষার ক্ষেত্রে, চরিত্র ও ঘটনা বিন্যাসের বাহ্যিক সাদৃশ্যের জন্যে সমালোচক এ কাব্যটিকে কোন গুরুত্ব দিতে চাননি। ভাষার ক্ষেত্রে এ সাদৃশ্য প্রকৃতই খুব কাছাকাছি। যেমন,

ক। গাইব মা বীর রসে ভাসি
মহাগীত,—[৩]

খ। সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
মন্দুরা হইতে আনে অশ্বিকের কাছে
আনন্দে।[৪]

১। মধুসূদন রচনাবলী, পৃঃ ৬০—৬১।
২। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।
৩। মধুসূদন রচনাবলী, পৃঃ ৩৫।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬।

বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পাতনে—[৫]

ঙ। শোকের ঝড় বহিল সভাতে[৬]

চ। বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুল রাজা
রাবণ—[৭]

ছ। ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে।[৮]—ইত্যাদি।

শিকদার রচনাংশের মধ্যে এগুলো নিয়মরূপে চলনায়। যেমন,

ক। পুণ্যবলে বীরভাবে থাকুক সিরাজী
হৃদয়ের বীণা বাজি হোক ঝংকারিত,—[৯]

খ। মন্দুরা হইতে আনি তাজা বাজী রাজি
সাজাইল মন্দুরাতে—[১০]

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ৩৭।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ৩৭।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ৩৭।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ৯২।
৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ৩৬-৩৭।
৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ৩৯।
৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ১১৫।
৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ১১৬।
৯। এ সোন বিদ্যে কাব্য, পৃঃ২।
১০। প্রাগুক্ত, পৃঃ৫৫।

গ। মদকল করী যথা পশে নলবনে[1]--

ঘ। উড়িল কলম্বকুল অম্বরপ্রদেশে
শনশনে।[2]

ঙ। হৃদয়ে সন্দেশ
কহ, কহ, শুনি স্বামি--[3]

চ। -----পড়িলা ভূপতি
সভায়। সচিববৃন্দ, হাহাকার রবে,
বেড়িল চৌদিকে শূর, কেহ বা আনিল
সুশীতল বারিপত্রে, বিউনিল কেহ।[4]

ছ। অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গ। পশিল প্রমত্তগজ যেন নলবনে--[১]

ঘ। উড়িল কলম্বকুল অম্বর আচ্ছাদি--[২]

ঙ। কহ রে সন্দেশ-বহ ! কহ কোন্ হেতু
নির্বাক রসনা তব?[৩]

চ। ------------ভূপ সভাস্থিত
পড়িল মূর্ছিত হয়ে সিংহাসন তলে
উথলিল সভাতলে হাহাকার ধ্বনি।
শাখে স্থির মহাবক্ষে আকুল পরাণে
সিঞ্চিয়া শীতল বারি ব্যজনি পবন
চেতাইল নরনাথে---[৪]

ছ। কি ভয় হে নৃপবর ? এক গিরি চূড়া
হইয়াছে চূর্ণ যদি শতেক শিখর
এখনও রহিয়াছে অটুট ।--[৫]

জ। শোকের বিপুল বাত্যা ! রাজ অন্তঃপুর
রহিল বিষম ক্ষুব্ধ।[৬]

ঝ। পদব্রজে চলিয়াছে ভূপ সভাস্থিত[৭]

ঞ। ছিল আশা সিংহাসনে বসাইয়া তোমা
জুড়াব এ পোড়া আঁখি ----[৮]

শিবাজীর রচনায় এভাবে মেঘনাদবধ কাব্যের রূপগত অনুসরণ প্রচুর।[৯]

পাঁচ

মনে হয় যে, মেঘনাদ বধ কাব্যের দৃশ্যে কোন কোন স্থানে অবিকল রচনানৈপুণ্য দেখা দিলেও শিবাজী বিব্রত বোধ করেননি। প্রেমাজেন্দ্রি কাব্যের বাণীভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের সন্নিহিত ছিল, এ-ত যে মাইকেলের [illegible] শিবাজীকে মুগ্ধ করেছিল। উপন্যাসে শিবাজীর উপজীব্য হল বাংলা ও ভারতবর্ষ, কিন্তু মহাকাব্য-

---

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ১০৪।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ১০৩।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ১০২।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ১০৭।
৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ১১৪।
৬।/৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ১১৭।
৮। [illegible]
৯। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য-মুসলিম বাংলা সাহিত্য পাঠ পরিক্রমা, পৃঃ১২৯-৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

বা কাহিনী কাব্যের বিষয়বস্তু বাংলার সংগে সম্পর্কহীন। তা সত্ত্বেও ফ্লোরিন্দা, রোমন্ড ও শেরী রজারিকের রাজভবন থেকে পলায়ন করে অরণ্যে আশ্রয় নেন, সেখানে হিংস্র বন্য প্রাণী হত্যা করে তাঁরা নিশান সরোবরের তীরে উপনীত হয়েছেন এবং বন্য ফল আহরণ করে জঠরজ্বালা নিবারণ করেছেন,[১] কবি বর্ণিত প্রায় ঐ পরিবেশটিই রায়নন্দিনী, নূরউদ্দীন উপন্যাসে পাওয়া যায়।[২] অরণ্যে দস্যুর হাতে রজ্জুবদ্ধ ফ্লোরিন্দা ফিরোজা বেগম উপন্যাসে বন্দী নসীরকে আংশিকভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়[৩]। ফ্লোরিন্দাকে বন্দী করতে এসে রেডিজ কুপমুগ্ধ হয়ে পড়েন ও ফ্লোরিন্দার নিকট প্রেমভিক্ষা করেন।[৪] রায়নন্দিনী উপন্যাসে যাহতাব খাঁ যেভাবে হেমদাকান্ত ও অভিলাষ স্বামীর হাত থেকে স্বর্ণময়ীকে উদ্ধার করেন, তারেকের পুত্র আবদুল্লাও রেডিজের নিকট থেকে রমনাকে প্রায় সেভাবে উদ্ধার করেন।[৫] ফ্লোরিন্দা কাব্য মধ্যে কোন কোন দিকে সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

সিরাজী স্পেন বিজয় কাহিনী কাব্যের এমন কি মহাকাব্যের প্রচ্ছদে ইতিহাস পুনঃসৃষ্টির সুযোগ নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু নিজ হৃদয়ের আবেগানুভূতিন সঙ্কট থেকে মুক্ত হতে পারেননি। এই সঙ্কটটুকুই কোন বিজয় কাব্যের অন্যতম প্রাণশক্তি, আর এটা ছিল বলেই এ কাব্যের মূল্যায়ন বিভিন্ন সময়েই করার চেষ্টা হয়েছে এবং পাঠক কিংবা সমালোচক এর মর্মবাণী সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারেননি।

খ) বিচ্ছিন্ন কবিতা

এক

সংকলিত কাব্যগ্রন্থসমূহের অধিকাংশ কবিতা বিভিন্ন সময়ে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাবলী এখানে আলোচ্য। এ সব কবিতা কবি জীবনের প্রত্যুষ কাল থেকে প্রায় নির্বাপন মুহূর্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং কাব্য গ্রন্থ সমূহে প্রকাশিত বক্তব্য স্বাভাবিকভাবেই এখানে পুনরাবৃত্ত।

প্রারম্ভ জীবনের সংগে সাহিত্যিক জীবনের সংযোগ যে অংশে ঘটেছিল সেখানে সিরাজী জাগরণের মন্ত্রটিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং এ জাগরণ চিন্তা ছিল ধার্মিক, ধর্মনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক,

---

১। স্পেন বিজয় কাব্য, পৃঃ ৭০-৭৪-৭৬।
২। পূর্বে, ...।
৩। ... ..., পৃঃ২৬৯।
৪। স্পেন বিজয়, পৃঃ৭৭।
৫। স্পেন বিজয়, পৃঃ৭৮-৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত। তিনি মনে করতেন, নানা কারণেই হিন্দুর তুলনায় মুসলমান পশ্চাৎপদ, কিন্তু জাতীয় শক্তির উৎস অক্ষয় থাকলে সব অর্জন সম্ভব হয়ে পড়ে। এজন্য মুসলমানকে তিনি হিন্দুর মত অগ্রসর করে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রচারক জীবনে মুসলমানদের সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য সিরাজী যেভাবে প্রতিশ্রুত ছিলেন এতে তাও সফল হয়। অনলপ্রবাহ প্রকাশকালে তিনি মুসলমানের অতীত গৌরবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, জীবনের শেষ মুহূর্তেও তা থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি প্রকৃত অর্থে সমাধান নিয়ে যাননি, অতীত গৌরবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ সমাধানের সূচনামাত্র, ঠিক সমাধান নয়। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর থেমে যায়নি কখনো।

'সিংহের সন্তান হয়ে শৃগালের ন্যায়' মুসলমানরা আপন অস্তিত্ব সম্পর্কে আত্মবিস্মৃত। নববর্ষে উদ্বোধন কবিতায় কবি তাদের আপন সত্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[1] 'আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত অবধি' বিজয় গৌরবে দীপ্ত মুসলমান ভারতেও 'হিমালয় থেকে কুমারী অবধি' একদা সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল, কবি তাদের জিজ্ঞাসা করেছেন, তারা অমূল্য মানিক হয়েও কাচ মূল্যে কেন বিকিয়ে যাচ্ছে?[2] বাসন্তী পূর্ণিমা নিশীথে প্রকৃতির দুঃখলেশহীন মুহূর্তে পাপিয়ার ডাকে কবির মনে হয়েছে, মুসলমানের অবনতির বেদনা এর মধ্যে প্রকাশিত।[3] খালেদ কবিতায়, সিরাজী বলেছেন,

---আবার হবে তোমার সমান
জন্মিবে পুনঃ সিংহ অরাতির কাল,
আবার কবে সে বহ্নি জাগি মম প্রাণ
জ্বালাইবে এ মনের কাফের জঞ্জাল।
ইসলামের মুকুল কবে উঠিবে ফুটি
মাহমুদ কবে হবে সৌভাগ্যের শশি ।[4]---

নজরুল বলেছেন,

খালেদ! খালেদ! ছড়িয়াছে সে আরবের পথঘাট
পলিশ হইল, খুলেছে এখন য়ুরোপ পাশের ভাটী। ----

১। নববর্ষে উদ্বোধন, প্রচারক, মাঘ, ১৩০৬।
২। উপহার, ইসলাম-প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল, ১৯০০।
৩। চোখ গেল, প্রচারক, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭।
৪। খালেদ, ইসলাম প্রচারক, ৫ম বর্ষ, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা, ১৯০৩।

Dhaka University Institutional Repository

খোদার হবিব বলিয়া গেছেন আসিবেন উনি ফের
চাইনা মেহদী, তুমি এস বীর হাতে নিয়ে শমশের।[১]

সিরাজী এবং নজরুল উভয়েই খালেদের পুনরাবির্ভাব কামনার মধ্যে ইসলামের গৌরবকে চিত্রিত করেছেন।

মুসলমানদের সামাজিক কল্যাণের জন্য মোল্লাদের প্রভাব খর্ব করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সেজন্য তিনি মোল্লাদের ব্যঙ্গ চিত্র অংকন করেছেন।[২] তটিনী দেখেও কবি মনে করেছেন, মৃতপ্রায় মুসলমান কবে তটিনীর মত জেগে উঠবে, কবে সে প্লাবিত বর্ষা নামবে, তটিনীর মত প্লাবনের সময় কবি যে গান গাইবেন তা এখন অন্তরের মধ্যেই অতি যত্নে লুকানো।[৩]

মোসলেমের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াস তাঁর মহাপ্রয়াণের বেদনাকে অতিক্রম করে গেছে[৪], হযরত ওমরের (রাঃ) বিজয় গৌরব ও কৃতিত্ব স্মরণ করে কবি সখেদে বলেছেন,

প্রভাতে ইসলাম-রবি তোমারি সাধনে
পশ্চিম সমস্ত ধরা আলোক প্রভায়
ইসলামের জয়ধ্বনি উঠিল গগনে,
আজিও গৌরব রবি অনন্ত প্রভায়।
সে গৌরব রবি হায়! এবে অস্তমিত
হে ফারুক! পুনঃ কবে হইবে উদিত?[৫]

নজরুল ওমর ফারুককে এভাবে আহবান জানিয়েছেন,

ওমর! ফারুক! আখেরী নবীর ওগো দক্ষিণ বাহু!
আহবান নয়—রূপ ধরে এস! গ্রাসে অন্ধতা রাহু
ইসলাম-রবি, জ্যোতি তার আজ দিনে দিনে বিমলিন,
সত্যের আলো নিভিয়া—জ্বলিছে জোনাকির আলো ক্ষীণ।[৬]

নতুন সমাজ ও জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে হযরত ওমরের (রাঃ) প্রতি সিরাজী এবং নজরুল উভয়েরই আহবান আন্তরিক। "খালেদ ও ওমর ফারুকের মধ্যে সিরাজী সন্ধান করেছেন ইসলামের জীবনময়

১। 'খালেদ', জিঞ্জীর, নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৭, পৃঃ ১৫০।
২। মোল্লাচরিত্র, ইসলাম প্রচারক, মেহেরপুর—যশোহর, ১৩০০।
৩। তটিনী, ইসলাম-প্রচারক, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২।
৪। আশুরা, প্রচারক, আষাঢ়, ১৩০৫।
৫। হযরত ওমর, বাগ-এসলাম, জামালপুর, ১৩২২।
৬। উমর ফারুক, জিঞ্জীর, নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৮০।

Dhaka University Institutional Repository

অধঃপতনে, আর মজুর তাদের মধ্যে অবস্থান করেছেন, সর্বকালের মানুষের মহিমাকে—যে মহিমা মজদুরের আর্তবেদনাকে বিধুরিত করে।"[১]

হিজরী নববর্ষে ফিরাতো ইসলামের উজ্জ্বলতম পরিবেশ প্রার্থনা করেছেন।[২] তুরস্ক সোলতানের রৌপ্য জুবিলী উপলক্ষে কবি এজন্য খুশী প্রকাশ করেছেন যে, তিনি খৃষ্টান বিশ্বকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পেরেছেন, রুশীয় ভল্লুক বিস্ময় চকিত, গর্বিত যুনান পরাজিত, হয়ুত্ব অবনতশির।[৩] আরবের বর্তমান অবস্থাকে ঘুমন্ত মনে করেছেন। মেহেদীর আগমনে একদা এ সম্বিতহারা অবস্থার অবসান ঘটবে, ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে এবং অন্ধকার শেষ হলে পৃথিবী আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে।[৪] জগৎজননী ফাতেমাকে দেবী বলে সম্বোধন করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন।[৫] আপন হৃদয়কেও কবি খুলে মেলেছেন, মনের অন্ধকার দূর করে শক্তি কামনার জন্য "নাথ" -এর "শ্রীচরণে" অনিমেষ আশ্রয় প্রার্থনা করছেন।[৬] রমজানের উপবাসে কবিচিত্ত শুদ্ধ হবে, রমজানের নিকট পুণ্য আলোকরাশি[৭] ও পবিত্রতা[৮] কবির কাম্য। ভবের কান্ডারী হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর "চরণতরী" কবির নির্ভরস্থল।[৯] প্রকৃতির সৌন্দর্যে দ্রবীভূত কবিচিত্ত[১০] জীবন মরণ ব্যাপী পরম সুন্দরের সান্নিধ্য প্রার্থনা[১১] করেছেন, কবি সেই সুন্দরের উদ্দেশ্যেই তাঁর গান সমর্পন করেছেন।[১২] শারদা মায়ের 'পূজাভার' নিয়ে কাঙালিনী বাংলার কণ্ঠহার প্রস্তুত করতে চেয়েছেন,[১৩] আল এসলাম পত্রিকার প্রকাশ মুহূর্তে বর্ষে কর্মের মেরী ও 'ধর্মের তুরী' রূপে উঠবার জন্য[১৪] এবং প্রায় একই সুরে সোলতান পত্রিকাকেও[১৫] আহবান জানিয়েছেন।

জাগরণমূলক কবিতার মাঝে আত্মসাক্ষাৎকার নিয়ে বসেছেন, আবার জাগরণের কোলাহলের মধ্যে ফিরে এসেছেন। আহবান[১৬] জাতীয় জাগরণ[১৭], সম্ভাষণ[১৮], জাগরণ গীতি[১৯], প্রার্থনা[২০], আহবান[২১]

১। কাজী আবদুল মান্নান—সৈ. ম ইসমাইল হোসেন শিরাজী, পৃঃ ২০।
২। হিজরী নববর্ষ, আল-এসলাম, ফাল্গুন, ১০২৩।
৩। রৌপ্য জুবিলী, প্রচারক, কার্তিক, ১৩০৭।
৪। আরব, প্রচারক, পৌষ, ১৩০৭।
৫। ফাতেমা জোহরা, ইসলাম প্রচারক(?)১৩১২।
৬। প্রার্থনা, ইসলাম প্রচারক, শ্রাবণ-ভাদ্র, ও প্রার্থনা, ঐ, অগ্রহায়ণ, ১৩১১।
৭। রমজান, ইসলাম প্রচারক, বৈশাখ, ১৩১২।
৮। পবিত্রতা, ইসলাম প্রচারক, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২।
৯। আলাপনী-সঙ্গীত, ইসলাম প্রচারক, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২।
১০। [illegible], আল এসলাম, ভাদ্র, ১৩২৫।
১১। কেন তবে ভাব, আল এসলাম, পৌষ, ১৩২৫।
১২। আশা, সাধনা, ফাল্গুন, ১৩২৭।
১৩। শারদা, ইসলাম প্রচারক, অগ্রহায়ণ, ১৩১১।
১৪। অভিনন্দন, আল এসলাম, বৈশাখ, ১৩২২।
১৫। সোলতান আবাহন, সোলতান, ১১ই আশ্বিন, ১৩৩০।
১৬। নূর অল ইমান, ভাদ্র-১৩১৭।
১৭। আল এসলাম, ফাল্গুন, ১৩২৪।
১৮। আল এসলাম, পৌষ, ১৩২৪।
১৯। [illegible] আল এসলাম, কার্তিক, ১৩২৪।
২০। সোলতান, ২৮শে বৈশাখ, ১৩৩০।
২১। সোলতান, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।

খেলাফৎ সঙ্গীত[১], মাভৈঃ[২], উদ্দীপনা[৩], কোথায় এমন জাতি?[৪], জাগরণ[৫], মহাবীর গাজী আবদুল করিমের প্রতি[৬], পরিচয়[৭], অভিভাষণ[৮], আশার বাণী[৯], প্রভৃতি কবিতায় একই বক্তব্য পুনরাবৃত্ত। কোথাও কোথাও বক্তব্য উপস্থাপনের ভঙ্গীটি মনোহর। যেমন, প্রার্থনা কবিতায় বলেছেন, মুসলমানের গৃহ থেকে যারা সন্ধ্যাবাতি নিভিয়ে দিয়েছে, তারা অনেকেই এখন আলোকপ্রাপ্ত, কিন্তু "উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম" মুসলমানের গৃহই এখন অন্ধকার।[১০] অথবা, মুসলমানের গৌরব কেবল সংখ্যা দ্বারা নয় তাদের অতীত কীর্তিই এর প্রমাণ। কবি প্রশ্ন করেছেন, যেদিন তাঁরা ধনময় দুর্গে বিজয়ের পতাকা নিয়ে বিশ্বে বেরিয়ে এলেন, সেদিন তাঁরা কতজন ছিলেন? সুতরাং বর্তমানের অবস্থা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা সুদূর নয়, কিন্তু প্রয়োজন হল মৃত্যু ভীতিকে অতিক্রম করে যাওয়া।[১১]

ইংরেজের অধীন দাসত্ব থেকে মুক্তি অর্জন সিরাজীর সাহিত্যের অন্যতম মূল সুর। ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারের জন্য সিরাজী কারাবরণ করেন, জীবনের শেষ পর্যায়ে এসেও তিনি কারাবরণ করেন, কিন্তু স্বাধীনতা প্রশ্নে আপোষ করেননি। এ সত্ত্বেও সিরাজীকে কয়েকবার ইংরেজের প্রশস্তি করতে দেখা যাচ্ছে। ইংরেজের চাকুরীজীবি বঙ্কিমচন্দ্র, এমন কি হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, যেমন ইংরেজের শুভবুদ্ধির ওপর নির্ভর করেছেন, [illegible] এসে সিরাজীকে তা করতে হয়নি। কিন্তু কয়েকটি উপলক্ষে সিরাজী ইংরেজের প্রশংসা-সূচক কবিতা রচনা করেছেন, এর কারণও সমকালীন প্রেক্ষিতের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে।

"শোক লহরী"[১২] কবিতাটি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোকগমন উপলক্ষে রচিত। সিরাজগঞ্জে ভিক্টোরিয়ার শোকসভায় তিনি এটা পাঠ করেন। মহারাণীর প্রতি কবি এভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন,

ভীষণ সিপাহী-দ্রোহ হইলে প্রশান্ত
তোমার ঘোষণাপত্র করিয়া শ্রবণ,
ভারত সৌভাগ্য শশি, হয়েছিল মান,
তব পুন্যমূর্তি করি হৃদয়ে ধারণ

১। মোসলেম হিতৈষী, ২১শে আষাঢ়, ১৩৩০।
২। মোসলেম হিতৈষী, ৩১শে আষাঢ়, ১৩৩০।
৩। মোসলেম হিতৈষী, ৪ঠা আশ্বিন, ১৩৩০।
৪। মোসলেম হিতৈষী, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩০।
৫। মোসলেম হিতৈষী, ১৮ই মাঘ, ১৩৩০।
৬। মোসলেম হিতৈষী, ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৩০।
৭। মোসলেম হিতৈষী, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩০।
৮। কাসেদ, ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৩১।
৯। মোসলেম হিতৈষী, ১লা চৈত্র, ১৩৩০।
১০। প্রার্থনা, মোসলেম হিতৈষী, ২৮শে বৈশাখ, ১৩৩০।
১১। উদ্দীপনা, মোসলেম হিতৈষী, ৪ঠা আশ্বিন, ১৩৩০।
১২। ইসলাম প্রচারক, মে ও জুন, ১৯০০।

Dhaka University Institutional Repository

দুঃসহ যাতনা দুঃখ হয়ে বিস্মরণ

করেছিল তোমার মা ! আত্মসমর্পণ ।"

লক্ষণীয় হল, মুসলমানদের বীরত্ব গৌরব কীর্তন করতে গিয়ে কবি সিপাহী বিদ্রোহে মুসলমানদের ভূমিকাকে স্মরণ করেননি । সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে পূর্ববর্তী বুদ্ধিজীবি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীকেই[1] সিরাজী হুবহু অনুসরণ করেছেন, এ ব্যাপারে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রই সম্ভবতঃ সিরাজীর আদর্শ । সমকালীন অন্য সমাজ মানসের মত সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের থেকে মহারানী ভিক্টোরিয়ার কল্যাণ হস্তকে তিনি পৃথক করে নিয়েছেন। অনস্বীকার্য যে, নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর পিপাসা মোচনের জন্য ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা অনেকখানি আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল, তাঁর মৃত্যুতে ভারতবাসীর শোকোচ্ছ্বাস অনুভূতি অপ্রকাশ্য থাকেনি । কবিতাটি আনুষ্ঠানিক পাঠের প্রয়োজনে লিখিত বলে এর প্রয়োগমূল্য আপেক্ষিক ।

ইংরেজের গুণকীর্তনমূলক দ্বিতীয় কবিতা[2] সঙ্গীত সঞ্জীবনী গ্রন্থে প্রকাশিত। এ সব কবিতায় ইংরেজের কল্যাণ কামনার মধ্য দিয়ে কবি যুগজীবনকে বরং নিবিড়ভাবে গ্রহণ করেছেন ।

(ক) অপ্রকাশিত কাব্য ও কবিতা

এক

সিরাজীর অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ আমরা তিনটি পেয়েছি, মুখাঞ্জলি, (খ) পুষ্পাঞ্জলি এবং (গ) (গ) গ্রন্থনামবিহীন কবিতাবলী। এর মধ্যে মুখাঞ্জলি শিরোনামে চারটি কবিতা নূর পত্রিকায়[3] এবং পুষ্পাঞ্জলি শিরোনামে তিনটি কবিতা মোসলেম পত্রিকায়[4] প্রকাশিত হয়েছিল। নূর পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা চারটির পৃথক কোন নাম দেয়া হয়নি, কেবলমাত্র ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলোর তৃতীয় এবং চতুর্থ সংখ্যক কবিতা যথাক্রমে পান্ডুলিপির প্রথম এবং দ্বিতীয় কবিতা, রচনাকাল, বানীকুঞ্জ, ২১শে ফাল্গুন, ১৩২৩ । প্রকাশিত চারটি কবিতা প্রেমমূলক, কই পৃথিবীর সঙ্গে অপার্থিব প্রেমের মিলন হয়েছে এখানে, তিনি সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন ঘটিয়েছেন। প্রেমিকের বাঁশীর সুর শুনে তাঁর কাছে যাবার জন্য মন ব্যাকুল হয়েছে, কুল মান রক্ষা করা দায় হল।[5] প্রেমের আকর্ষণে ওপারের রূপসী এপারের সব শোভার মহামাধুরী হয়েছে।[6] এ প্রেম মানবীর আঁধারে স্থাপিত । প্রেমের আসনে সিন্ধু গর্জন গর্জন

১। পূর্ব, পৃঃ ৮-৯ , এ ছাড়া দ্রষ্টব্য , ভারত চিন্তা, কবিতাবলী, হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী প্রথম খন্ড, পৃঃ৩৭ ইত্যাদি ।
২। পূর্ব, পৃঃ ১৯৪।
৩। নূর, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।
৪। মোসলেম, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ৭ই ও ১৪ই আষাঢ়, ১৩৩৩।
৫। ১ নং গান নূর জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।
৬। ৪ নং গান, প্রাগুক্ত, ৪

Dhaka University Institutional Repository

কবির মহাঠাকুর অনন্ত আকাশের কাছে,

কোটি রবি শশী করে
ঝলকে! অনন্ত দামিনী দ্যুতি[১] ------ইত্যাদি।

পুষ্পাঞ্জলি কাব্যে সর্বমোট ১১৮টি কবিতা আছে, পুষ্পাঞ্জলি কাব্যের মধ্যেই প্রেমাস্পদকে পাওয়া না পাওয়ার বেদনা একান্ত রচনায় প্রতিভাত। কবি মানুষের প্রেমাস্পদ কিংবা প্রেমময় স্রষ্টাকে আশ্রয় করে চির সুন্দরকে পেতে চেয়েছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সর্বসীমা অতিক্রম করে যেতে পারেননি, তাঁর কবিতা-সমষ্টি সীমার মধ্যেই সৃজন করেছে। কবির অন্তরতম প্রিয় প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু বিশ্ব বাণীরূপে উপলব্ধি ছাড়া সৌন্দর্যের সে পূর্ণ পথ বিস্তার কি সম্ভব? এখানে কবি পরম সুন্দরকে পাবার আগ্রহ দেখিয়েছেন, ব্যাকুল প্রাণে তাকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। তাকে পাবার এবং স্পর্শ করার পর কবি হতাশ হয়ে পড়েছেন, যাকে তিনি অসীম সুন্দর বলে ধরতে চেয়েছেন, সে সুন্দর হতে পারে কিন্তু অসীম নয়।

পুষ্পাঞ্জলি কাব্যের যে দুটি কবিতা সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সেখানে আধ্যাত্মচিন্তার মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধির প্রয়াস আছে।

আমার মনের ভিতর ফুটেছে মানিক
কে দেখবি রে ছুটে আয়
এই মানিকের আলোক পেয়ে
বিশ্ব জগৎ লুটায় পায়।[২]

আসলে, পাওয়ার অধিকার যে, সর্বত্র তাঁর প্রেম ও করুণা সত্য।[৩]

দেশের সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষিতে তরুণ সম্প্রদায়কে আত্মসমর্পণের জন্য কবি উৎসাহ দিয়েছেন অপ্রকাশিত কোন কোন কবিতায়। নিজ দেশে হিন্দু মুসলমান সকলকেই আঘাত দিয়ে জানাতে চেয়েছেন,

(তোদের) মাথা পরের জুতোর নীচে
(তোদের) বিদ্যা বুদ্ধি সবই মিছে
নানান সমস্যা সবই সমস্যা
কোথায় জাতির খোঁজই নাই।[৪]

১। ৩২ নং, প্রাগুক্ত
২। পুষ্পাঞ্জলি, সওগাত, ১৮ই চৈত্র, ১৩৩০।
৩। পুষ্পাঞ্জলি, সওগাত, ৭ই শ্রাবণ, ১৩৩০।
৪। অপ্রকাশিত কবিতা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩০ সালে শিল্পীর তিন মাসের জন্য কারাবাস হয়। প্রথমে পাবনা জেলে এবং পরে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়। এ সময়কার রচনাও আমরা অপ্রকাশিত আকারে পেয়েছি। এখানেও দেশাত্মবোধের প্রকাশ ঘটেছে, তবে বিস্ময়কর ব্যাপার হল, বৈষ্ণব পদাবলীর সমতুল্য কিছু কবিতা এ সময়ে কবি রচনা করেন। যেমন,

আমি বাজাইয়া বেনু চরাইব ধেনু
  সুখে শ্যামরায় সনে
শ্যামপদ ধূলি চন্দন করি
  তিলক আঁটিব অঙ্গে।
রাধে, ধন্য তব প্রেম, জিনি মুক্তা হেম
  দুর্লভ এই ভবে,
তোমার পিরীতি কি মধুর স্মৃতি
  যুগে যুগে কবি গাবে।[1]

আঁখিরে, কে বলে শ্যাম দেখতে কালো,
সোনার চেয়ে উজ্জ্বল সে যে, চাঁদের চেয়েও দেখতে ভালো।
শ্যামের রূপে জগৎ আলো
শ্যাম সে ফোটা ফুলের ডালা
শ্যামের রূপে উষা হাসে
  মেঘে ভেসে বিজলী আসে।[2]

আঁখিরে বলরে তোরা
হয়ে আঁখি শ্যাম হারা
রাখিব জীবনে কেমন সে সাধনে
(আমি) শ্যাম ছাড়া কারো নই।[3]

১। ২রা অক্টোবর, ১৯৩০। পাবনা জেল।
২। ৫ই অক্টোবর, ১৯৩০। পাবনা জেল।
৩। ১৮-১২-৩০, আলীপুর সেন্ট্রাল জেল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমাঞ্জলি, সুধাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি কাব্যে বৈষ্ণব কবিতার রসধারা সংযোজক এসেছিল, এখানে শিরাজী এটা প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন অন্যায় করেননি।

(ট) কবিতার মূল্যায়ন

এক

স্কুলে অধ্যয়ন কালে তিনি কবিতা রচনায় হাতে খড়ি হয়েছেন, ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসেও তাঁকে কবিতা রচনা করতে দেখা যাচ্ছে। ১৯৩১ সালের ১৭ই জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন, মৃত্যুর ছয় মাস আগেও তিনি জাগরণমূলক ও প্রেমমূলক কবিতা রচনা করেছেন। লক্ষণীয় হল প্রথম তারুণ্যে তাঁর তেমন কোন প্রেমের কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছেনা। মোটামুটিভাবে প্রেমাঞ্জলি রচনার সময়কাল থেকে তিনি আত্মভাবমূলক ও প্রেমের কবিতা রচনা করেছেন। ইতিমধ্যে নায়ক নায়িকার প্রণয়কে কেন্দ্র করে রায়নন্দিনী উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, প্রেমাঞ্জলি প্রকাশের একই বছরে সম্ভবতঃ তারাবাঈ উপন্যাসও প্রকাশিত হয়। উপন্যাস রচনা করলেও সাধারণতঃ দৃষ্টিতে তিনি নরনারীর প্রেমকে প্রকাশ্যে তেমন গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত হননি। প্রেম আত্মবিস্মৃতি আনে, নরনারীকে কর্তব্য দায়িত্ব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, সেকারণে উপন্যাসের মধ্যে প্রেমকে এমন কি দাম্পত্য অনুরাগকেও সীমাবদ্ধ প্রহরায় রাখতে চেয়েছেন। তা সত্ত্বেও কবির জীবনে যেমন প্রেম এসেছে, সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি যে প্রেমকে কেবলমাত্র দেশপ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন, জীবনরসপিপাসা তাকে মানবীয় প্রেমের অনুরাগ ভুবনে টেনে নিয়ে এসেছে।

শিরাজীর কবিতার সবচেয়ে বড় দিক হল জাতীয় জাগরণ, কিন্তু তিনি যখন জাগরণমূলক কবিতা রচনায় নিমগ্ন, গীতিকবিতা তখন আর উদ্দেশ্য প্রচারের বাহন নয়, তা কবির অন্তর্লীন উপলব্ধির সুরের প্রকাশ। সত্য যে, জাতীয় জাগরণের সংগে শিরাজীর কবিত্ব-চেতনা মিশ্রিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও কেবলমাত্র অতীত বর্ণনা ও জাগরণের আহবান যখন জীবনের সূচনালগ্ন থেকে অন্তকাল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তখন তাকে পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কোন সৃষ্টিশীল কবি সত্তা এভাবে কোলাহলময় জগতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। বিশেষ করে বাংলা কবিতায় বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর বর্ণগন্ধময় ভুবনের সম্ভাবনা সৃষ্টিশীল কবির নিকট অনাবিষ্কৃত থাকার কথা নয়। প্রতিভাবান কবি নব নব সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজেকেও নতুনভাবে সৃষ্টি করে তোলেন, এ সৃষ্টি কবির অন্তরলোকের স্পর্শে আলোকিত, বর্ণাঢ্য ও তাৎপর্যময় হয়। শিরাজী সেদিক দিয়ে আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। জাগরণমূলক কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে তোলার ফলে গীতিকবিতার রম্য ভুবনে তিনি প্রায় অনুপস্থিত থেকেছেন। অবশ্য শিরাজীর কাব্য

জীবনকালে ডি-এল-রায়, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ জাগরণমূলক কবিতাও রচনা করেছেন। তাঁদের কবিতায় আহ্বান গৌণ নয়, সে আহ্বান শিল্পমণ্ডিত, বিপুল আয়োজনে সমৃদ্ধ, কিন্তু শিরাজীর কণ্ঠস্বর সেভাবে মার্জিত নয়। এজন্য তাঁর প্রথম কাব্য যেভাবে চমক সৃষ্টি করেছিল, বাকী জীবনে সন্নিহিত বক্তব্য উচ্চারিত হলেও তা পাঠকের মনোজগতকে সেভাবে আন্দোলিত করতে পারেনি। শিরাজীর কবি জীবনের সূচনালগ্ন যত সম্ভাবনাময়, পরিণাম তেমন নয়, এমন কি যে মুসলমান সমাজের জাগরণের জন্য তাঁর এ ব্যাকুল আহ্বান, তাঁরা তখন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শিখা গোষ্ঠী, এমন কি কল্লোলযুগের সূচনাকালীন সম্ভাবনাতেই মুগ্ধ, শিরাজী তাঁদের নিকট থেকে দূরে সরে গেছেন। প্রচারক জীবনের সঙ্গে অব্যাহত সম্পর্ক এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। শিল্পরূপের কথা ছেড়ে দিলেও তাঁর বক্তব্য তখন অনবরত উচ্চারণের ভারে পীড়িত, তরুণ শিক্ষিত মুসলমানের মনোজগতের আকাঙ্ক্ষা থেকে কিছুটা দূরে। সেকারণে দেখা যায়, মুসলমান সমাজেও শিখা গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই, এমন কি আগে সুধাকর গোষ্ঠীর সঙ্গেও সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। বরং কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল লেখক শিরাজীকে সামনে রেখে হিন্দুর রচনায় মুসলিম বিদ্বেষের প্রত্যুত্তর দানের জন্য প্রচেষ্টারত, এটা বিশেষত ঘটেছে উপন্যাসের ক্ষেত্রে।

১৯৩০ সাল পর্যন্ত বাংলায় যে সমস্ত দেশাত্মবোধক কবিতা ও গান রচিত হয়েছে শিরাজীর জাগরণমূলক কবিতা থেকে অনেকাংশে পৃথক। জাগরণমূলক কবিতার প্রয়োজন তখনো শেষ হয়ে যায়নি, তার প্রমাণ, ১৯৩০ সালে দশকব্যাপী ইংরেজের বিরুদ্ধে শুরু হলে বাংলার বিদ্রোহী মুসলমান যুবকেরা বিজয়লাল চাটার্জীর বিদ্রোহী, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের প্রমুখ বিখ্যাত কবিতার মত শিরাজীর অনলপ্রবাহ কবিতাকেও অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।[১]

দেশাত্মবোধক কবিতায় দেশ ও মাতৃভূমি যেভাবে ভালোবাসার প্রতীক হয়ে উঠেছিল কবির অন্তরতম অনুভূতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল শিরাজীর কবিতায় তা নেই। রবীন্দ্রনাথ, ডি-এল-রায় প্রমুখের কবিতা ও গানের মধ্যে প্রায় দেশাত্মবোধের চিত্রটিই বা তো কবিতা ও গানে দেশপ্রেম বা দেশ পূজার প্রতীক, জাগরণমূলক প্রয়াস প্রকৃত অর্থে নবীনচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পরই নিঃশেষিত। শিরাজীও দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন, কিন্তু উপলব্ধি অকৃত্রিম হলেও তা প্রকাশের ভঙ্গিটি ডি-এল-রায়-রবীন্দ্রনাথের এত কাছাকাছি যে সামান্য কারণেই তা মৌলিকত্ব দাবী করতে পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব গানে তাঁর অনুরাগী(?) অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে, অকৃত্রিম দেশপ্রীতি থেকে এবং দুঃখিনী ও পরাধীন মাতৃভূমির স্বাধীনতাকে অনুরাগে স্থাপন করেই এসব কিছু কিছু অভিজ্ঞতার জন্ম। কিন্তু প্রকাশের দুর্বলতা(?) নিজের মত করে নিতে পারেননি, ফলে এসব গান ডি-এল-রায় ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে।

১। এম, সেরাজুল হক—আমার বন্দীজীবন, অভিযান, ৭ম বার্ষিক সংখ্যা, ১৯৬০-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

জাগরণমূলক কবিতার ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের অবস্থা প্রসংগত স্মর্তব্য। শিক্ষা ও সম্পদে পুষ্ট হিন্দুর তুলনায় অনগ্রসর মুসলমান সমাজে জাগরণের প্রয়োজন তখনো শেষ হয়নি। বিশেষতঃ তাদের অব্যবহিত পূর্বে ছিল স্বাধীনতার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য হিন্দুর মত উপযুক্ত হয়ে ওঠবার। স্বাভাবিকভাবেই অগ্রসর হিন্দুর সংগে মনস্তাত্ত্বিক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে। তবে হিন্দুকে অনুসরণ করে জাগরণ প্রক্রিয়া সামাজিক ক্ষেত্রে লালন করার জন্য মুসলমান সমাজ তখনো প্রস্তুত ছিল, শিরাজী জাগরণের সেই দীপশিখাকেই সযত্নে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, ফলে আধুনিক দেশাত্মবোধ প্রকাশের শিল্প শৈলী গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁর কোন উদ্বেগ ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে আলো: মংগল-এর কবি মোজাম্মেল হক এবং আলো: ফোয়ারা এর রচয়িতা 'শান্তিপুরের কবি' মোজাম্মেল হক শিরাজীর মত জাগরণ প্রয়াসকে দেশপ্রেমের সংগে মিশ্রিত করেছেন। শিরাজীর চের বয়োজ্যেষ্ঠ কায়কোবাদের কবিতা শিরাজীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্তিমিততর, কিন্তু তিনিও জাগরণ ও দেশাত্মবোধের মধ্যে ব্যবধান দেখেননি। তিনি চাকুরী জীবনে নগরের কোলাহল থেকে দূরে অবস্থান করে এবং সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যার ব্যাপারে কিছুটা নির্লিপ্ত থেকে কাব্য সাধনা করেছিলেন। শিরাজীর মত সমকালীন সমস্যা তাঁকে এত বিচলিত করেনি। তা সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের শীতলতার ব্যাপারে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে মুসলমানকে জাগরণের জন্য আহবানও করেছিলেন। তবে এ ব্যাপারে শিরাজীর চেষ্টা অনেক বেশী প্রখর, এবং ফলতঃ তাঁর আহবানও উচ্চকণ্ঠ। শিরাজীর তুলনায় বয়োকনিষ্ঠ কাজী নজরুল ইসলাম একই সংগে জাগরণ ও দেশাত্মবোধকে মিশ্রিত করেছিলেন, তাঁর হাতে জাগরণের ভাষাও উদ্দামতার শিল্পগুণে মন্ডিত ও কবিত্বে পরিণত হয়ে ওঠে, বাংলা কাব্যে এক্ষেত্রে নতুনত্বের চমৎকারিত্ব বোঝা যায়। শিরাজীর মত নজরুলের কবিতায়ও মুসলিম ঐতিহ্য ব্যবহারের নিদর্শন অনেকানু, কিন্তু নজরুল তাঁকে যেমন আত্মস্থ করে নিতেন, বাস্তব ঘটনাপ্রবাহের সংগে সংযুক্ত করে দেন, শিরাজী তেমন পারেননি। কিন্তু শিরাজী নজরুলের সম্ভাবনাকে আশীর্বাদ করেন, নজরুলও সে শুভেচ্ছা অনুরাগের উষ্ণতা দিয়ে গ্রহণ করেন।[১] নজরুল কোন কোন অর্থে যেমন শিরাজীর উত্তরসূরী তেমনি শিরাজী নজরুলের মধ্যে নিঃশেষিত নন। শিরাজীর অন্যতম কৃতিত্ব এখানেও যে আধুনিক সমালোচকদের কাছেও শিরাজীর ভাবপ্রবাহের সংগে নজরুলের বিদ্রোহী ও জাগরণমূলক কবিতাগুচ্ছের সাযুজ্য ধরা পড়েছে। নজরুলের কবিতা যুগোত্তীর্ণ, শিরাজী ঐতিহ্যের চৈতন্যলোক সৃষ্টি করে নজরুলের আবির্ভাবের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করেছেন, এখানেও শিরাজীর কবিতায় কেবল সমকাল নয়, যুগ সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করা যায়না। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, "নজরুল ইসলাম শিরাজীর দূরতর ও বৃহত্তর প্রতিধ্বনি। তবে তাঁরা উভয়েই একই আগুনের স্ফুলিংগ হয়ে এসেছেন-

---

১। পূর্বে, পৃঃ ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

এরা উভয়েই একই আগুনের ফুল।"[১] অথবা, "পরবর্তী যুগের কবি নজরুল তাঁহারই মানস-সন্তান।"[২] অথবা, "তার আবেগ ও আনুরক্তিতায়, ইসলামের পুনরুজ্জীবন কামনায় ও আভরণে, বহুমুখী সাহিত্য চর্চায় ও সামাজিক, রাজনৈতিক চেতনায় সিরাজীকে মনে হয় নজরুল ইসলামের সাক্ষাৎ পূর্ব পুরুষ।--- হয়তো দুজন আলাদা হয়ে যান তাঁদের প্রতিভায়, শক্তিতে, হিন্দু মুসলমানের ধারণায় বিশ বছর আগে যা ছিলো "অনলপ্রবাহ" বিশ বছর পরে তা রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো "অগ্নিবীণায়।"[৩] অথবা, "নিঃসন্দেহে সিরাজী বিশ শতকের প্রথম দিকের যুগ প্রতিনিধি, আর নজরুল যুদ্ধোত্তর যুগের। দুজনেই চারণ কবি, জাতীয় কবি। একজন আগ্নেয়গিরি, অন্যজন আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত্রজনিত লাভা। অনল প্রবাহের কবি বস্তুপন্থা (Realism) ও স্বপ্ন:পন্থার (Indealism) অন্যতম প্রধান দিশারী, যা পরবর্তীকালে নজরুল-বেনজীর-ফররুখ-প্রভৃতির ভাস্করে পথ রেখেছে।"[৪]

বলা বাহুল্য সিরাজী ও নজরুল সমালোচনার এ ধারাটিও মুসলমান সমাজের স্বাতন্ত্র্যের পটভূমিতে প্রসারিত। সিরাজী এবং নজরুল দুজনেই জাগরণ প্রয়াস ভূমিতে মুসলিম বিশ্বের নজীর, মুসলমানদের অতীত ইতিহাসকে গ্রহণ করেছিলেন বলেই মুসলমান সমাজের বহুলাংশে তাঁদের জনপ্রিয়তা চমৎকারভাবে হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা দুজনেই ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানকে পৃথক করে দেখেননি, এটা সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি ।

জাগরণমূলক কবিতায় সিরাজীর অন্য বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। আধুনিক চেতনায় স্বোপলব্ধি কবির অন্তরে, কবিতায় তার বাহ্যিক প্রকাশ। কিন্তু জাগরণমূলক কবিতার উপলক্ষ প্রায় ক্ষেত্রেই বহির্জগতের ঘটনা-নির্ভর। সিরাজী প্রচারক জীবনে যে ভাবে উপলক্ষ সৃষ্টি করে বক্তৃতা দিয়েছেন, সিরাজীর এ শ্রেণীর কবিতা বহুলাংশে প্রচারক জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গেই সংগতিপূর্ণ। বাগ্মিতার পাশাপাশি কিংবা সহযোগী হিসাবে কবিতার বিকাশ হয়েছিল, ফলে সিরাজীর মরণোত্তরকালে বাগ্মিতা মুক্ত হবার পর কবিতার সফলতা বহুলাংশে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। তিরিশের দশকের প্রায় সূচনাকাল পর্যন্ত সিরাজী এসব কবিতার মধ্য দিয়ে জনপ্রিয় মুসলমানদের জাগরণের সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমি দান করেছিলেন, ধর্মের ও অন্ধ সংস্কারের দক্ষতা সঞ্চার করেছিলেন। নজরুলের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের সঙ্গে সিরাজীর কবিতা কনির্বাপনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং আংশিকভাবে নজরুলের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

১। মুজিবুর রহমান ---অনলপ্রবাহের কবি, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন-১৩৭১।
২। মুহম্মদ এনামুল হক - মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, পাকিস্তান পাবলিকেশানস, ১৯৬৫, পৃ:৩১৬।
৩। আবদুল মান্নান সৈয়দ- জবাবী উপন্যাস, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী স্মরণিকা, পৃ:৩১।
৪। সিরাজুল হক -অনল প্রবাহের কবি, দিলরুবা, আশ্বিন, ১৩৬৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

শিরাজীর জাগরণমূলক কবিতার সম্প্রসারিত ভিন্ন শ্রেণীর অংশ আখ্যান কাব্য। আধুনিক সাহিত্যিক মহাকাব্য সম্পর্কে তারাপদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "কালের বিবর্তনে মানব-শক্তির একটা নূতনতর মহিমা আবিষ্কৃত হইল, মানুষের শৌর্য্য-বীর্য্যও অফুরন্ত প্রাণশক্তিকে কেবলমাত্র শূন্য সাধুবাদ ও ক্ষণস্থায়ী অভিনন্দনের দ্বারা অভ্যর্থনা না করিয়া এই শক্তির একটা বাস্তব তাৎপর্য্য ও কল্যাণকর রূপানুসন্ধানের দিকে মানুষের সচেতনতা দেখা গেল। সাহিত্যিক মহাকাব্যগুলিতে এই নূতনতর মহিমা ও তাৎপর্যোর স্ফুরণ দেখা গিয়েছে। প্রাচীন যুগের বীর নায়কদের শৌর্য্য বীর্য্য ও আত্মত্যাগের অম্লান গৌরব-দীপ্তি সাহিত্যিক মহাকাব্যের মধ্যে দেশাত্ম-চেতনার সহিত যুক্ত হইয়া অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে। যে শক্তি-চর্চার মূল উদ্দেশ্য ছিল নায়ক-গৌরব সেই সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিক উদ্দেশ্য দেশ ও জাতির মংগলকর ব্যাপক উদ্দেশ্যে লীন হইয়া অধিকতর গৌরব-দীপ্ত হইয়াছে। তাই সাহিত্যিক মহাকাব্যগুলি কেবলমাত্র বীরকাব্য নয়, ইহা জাতীয় কাব্য। ইহার নায়কও সাধারণ বীর নয়, জাতীয় বীর। --সাহিত্যিক মহাকাব্যের মধ্যে একটি জাতির একটি বিশেষ যুগের আশা আকাঙ্খা -সুখ-দুঃখের কাহিনী বাণীরূপ প্রকাশ পায়।"[১]

মহাকাব্য সম্পর্কে শিরাজীর ধারণা অনুযায়ী, তিনি আখ্যান কাব্যের সংগে মহাকাব্যের কোন পার্থক্য করেননি, এবং মহাকাব্য সম্পর্কে বলেছেন, "কোন জাতি যখন মরণ সাগরের তলে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে, তখন কবির স্বর্গীয় বীণাধ্বনিই জাতিকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া জীবন ছেটে উপস্থাপিত করিয়া থাকে। --মহাকাব্য হিমাচলের মত জিনিস, যতদিন মানব সমাজ থাকিবে, ততদিন উহাও থাকিবে।"[২]

উদ্ধৃত অংশগুলোর তুলনায় আলোকেই শিরাজীর রচনা বিচার্য। তাঁর আখ্যান মূলক কাব্য রচনা দুটি, মহাশিক্ষা কাব্য, ১ম ও ২য় খন্ড, এবং স্পেন বিজয় কাব্য। বলা বাহুল্য শিরাজীর কাব্যে জাতীয় ভাবের প্রকাশ ঘটেছে, এবং এটাই তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রাণশক্তি।

মহাশিক্ষা কাব্যের রচনাকাল কবি জীবনের পূর্বোক্ত হলেও কবির মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে এটা প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশের (১৯১০) ছয় বছর পর স্পেন বিজয় কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। স্বল্পকালের মধ্যে দুটো সংস্করণ প্রকাশের ফলে মনে হয়, সে সময় মুসলমান সমাজে এ কাব্যের প্রয়োজন একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। শিরাজী নিজেও বলেছেন, হিন্দুরা মুসলমানদের রচিত সাহিত্য

১। শ্রী তারাপদ মুখোপাধ্যায়- আধুনিক বাংলা কাব্য, প্রথম পর্ব, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ চতুর্থ মুদ্রণ, পৃঃ ১৮-১৯।
২। মহাকবি কায়কোবাদ, মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ করেননা। মুসলমানদের মধ্যেও সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য এবং ধনীদের অনাগ্রহের ফলে কাব্য পাঠকের সংখ্যা অত্যন্ত কম।[১] তা সত্ত্বেও ভঙ্গ বঙ্গের মধ্যে এবং সামাজিক উপন্যাসের যুগে বাংলার জীবন-কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কহীন আখ্যান কাব্যের দুটো সংস্করণ প্রকাশ মেঘনাদবধ কাব্যের জনপ্রিয়তার দ্যোতক।

মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনী সাধারণ পাঠকের নিকট আগ্রহের না হলেও স্পেনের অতীত ইতিহাস ততদিনে পাঠকের নিকট অনেকাংশে পরিচিত হয়ে উঠেছে। মিরাজী প্রমুখ মনীষী ইসলামের গৌরবময় দিনের স্মৃতি তুলে ধরতে গিয়ে কবিতা প্রবন্ধ ও বাগ্মিতার মাধ্যমে স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতার সঙ্গে সাধারণ বাঙালী মুসলমান পাঠকের সম্পর্ক সৃষ্টি করে তুলেছেন। এ কাব্য প্রকাশের পূর্বেই বলকান যুদ্ধে অংশগ্রহণ, অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মের ফলে মিরাজীও মুসলমান সমাজের নিকট বিদ্রোহ কিংবা যুদ্ধের বাণী নিয়ে উপস্থিত। মিরাজী নিজের মত তাঁর কাব্যকেও মুসলমান সমাজের নিকট গ্রহণীয় করে তুলেছিলেন। এ সব কাব্যে অনেক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক জাতীয় ভাব উদ্দীপক ইতিহাস রচিত হয়েছিল এবং এগুলো মুসলমান সমাজকে সামনে অগ্রসর হবার জন্য প্রেরণা দিয়েছিল।

মহাশিক্ষা কাব্য কবির জীবদ্দশায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। কারবালা কাহিনীর জনপ্রিয়তা মুসলমান সমাজে বরাবরই ছিল, এ কারণে মিরাজীর পূর্বে, এবং পরেও প্রচুর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থের পর শিক্ষিত মুসলমানের নিকট, এমন কি পুঁথির পাঠকের নিকটও এ গ্রন্থটি কাব্যাকারে পুঁথির অনুরূপ বিকল্প। এ কাব্যের অন্যতম আকর্ষণের সম্ভাবনা ছিল মুসদ্দস ছন্দে কাব্যরূপের মাধ্যমে কাহিনী নির্মাণ ও জাতীয় চেতনাপুষ্ট শিক্ষিত পাঠকের জন্য প্রজাতন্ত্র প্রথায় স্বাধীন খেলাফতের বিপুল চর্চা। সমকালের পরাধীন ভারতে কবির এ আকাঙ্ক্ষা বর্ণনায় চমৎকারিত্ব সৃষ্টির উপযোগী।

ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং জাতীয় আখ্যান কাব্য সৃষ্টির প্রেরণা প্রায় একই উৎস থেকে, তা হল নরনারীর হৃদয়ে জাতীয় গৌরব সৃষ্টি। ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে আখ্যান কাব্যের অন্যতম একটি পার্থক্য হল, একটি গদ্যে রচিত, অন্যটি কবিতায়। মাইকেলের পরবর্তীকালে মহাকাব্য প্রায় এভাবেই ক্রমে ক্রমে জাতীয় আখ্যান কাব্যে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং সাধারণভাবে জাতীয় আখ্যান কাব্য ও ঐতিহাসিক উপন্যাস একই উদ্দেশ্যের সিদ্ধি করেছিল।

এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর, কবিতা এবং উপন্যাস সবই প্রয়োজনের জগৎ ছেড়ে, অর্থাৎ কেবলমাত্র জাতীয় ভাব সৃষ্টির দায়িত্ব থেকে সরে এসে মানুষের চিত্ত বিকাশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রপূর্ব সাহিত্যে এটা নতুন না হলেও রবীন্দ্রনাথই প্রথম সাহিত্যে প্রয়োজনের

১। পরে দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

জগত থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে নিলামোকে, আত্মার সংগমলোকে স্থাপন করল, মহাকাব্য এসে কবির পায়ের কাছে চূর্ণ হয়ে পড়ল।[১] উপন্যাসে যেমন সমকালীন সমাজ জীবন প্রাধান্য পেল, তেমনি মহাকাব্যের উৎস শুকিয়ে গেল এবং গীতিকবিতা ব্যক্তি সচেতন মানুষের হৃদয়ের বর্ণাঢ্য অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠল। এর পরও পুরাতন ধারার অনুবর্তনে আখ্যান কাব্য যেমন রচিত হল তেমনি ঐতিহাসিক উপন্যাসও রচিত হল। কোন কোন ক্ষেত্রে সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য সাপেক্ষিক প্রয়োজনের সংগে যুক্ত হয়ে দুয়েকটি রচনা জনপ্রিয়তা পেলেও মোটামুটিভাবে সে যুগের উত্তর ছিল মহাকাব্য কিংবা ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিপরীতে। কোন কোনটির শিল্পগুণ এবং উৎকর্ষতা পেলেও মেঘনাদবধ কাব্যের মত বিতর্কিত কিংবা জনপ্রিয় হতে পারেনি। কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনই এমন সৃষ্টিকে মূল্যায়নের জন্য বাঁচিয়ে রেখেছিল। এ পটভূমিতেই শিবাজীর ঐতিহাসিক উপন্যাস ও জাতীয় আখ্যান কাব্যের মূল্যায়ন করা যেতে পারে। শিবাজীর উপন্যাসের সাহিত্যিক মূল্য বিদ্যমান[২] তা সত্ত্বেও মনস্তাত্ত্বিক যে কারণে হিন্দুর সংগে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস সমূহ এবং জাতীয় আখ্যান কাব্যগুলি অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর মুসলমান সমাজেই সমাদরে গৃহীত হয়েছিল।

লক্ষণীয় হল শিবাজীর কোন বিজয় কাব্য প্রথম স ক্ষেত্রণ (১৯১৪) প্রকাশের আগে এবং পরে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিই মহাকাব্য বা আখ্যান কাব্য রচনা করেন, এগুলো যথাক্রমে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের(১৮২৭-১৮৮৭) পদ্মিনী উপাখ্যান(১৮৮৫), মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) মেঘনাদবধ কাব্য(১৮৬১), দীনবন্ধু মিত্রের (১৮২৯-১৮৭৩) সুরধুনী কাব্য(?), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৮৩৮-১৯০৩) বীরবাহু কাব্য(১৮৬৪), বৃত্রসংহার(১৮৭৫-৭৮), নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) পলাশীর যুদ্ধ(১৮৭৫), রৈবতক(১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র(১৮৯৩), প্রভাস(১৮৯৬), যোগীন্দ্রনাথ বসুর (১৮৫৭-১৯২৭) পৃথ্বীরাজ(১ম সং ১৩২২, দ্বি-সং, ১৩২৭), শিবাজী(১ম সং ১৩২৫) দ্বি-সং, ১৩২৭), কায়কোবাদের (১৮৫৮-১৯৫২) মহাশ্মশান(১৩১১/১৯০৪, ৫ম সং ১৯৬৭)

১। (ক) তাথি নাবব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে-
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন
কিংকিনীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়

পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।--- কড়িপুরণ, কণিকা। রবীন্দ্র রচনাবলী সপ্তম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬৯, পৃঃ ঃঃঃ

২। (খ) ঐ লেখক, প্রাগুক্ত, পৃঃ২৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

শিবমন্দির বা জীবনু সমাধি কাব্য(১৯১৭),মহরম শরীফ (১৯৩০),প্রসন্নকুমার দাস-এর রাজপুতানী (১৮৮২-৮৩),সজীব চৌধুরীর(?) পাঠান বৈরিব (ডা-বি)আবুল মা'আলী মুহম্মদ হামিদ আলীর (১৮৬৫-১৯৫৩) কাসেম বধ কাব্য(১৯০৫),জয়নালোদ্ধার কাব্য (১৯০৭),মজিবুর রহমান খান-এর (১৮৭২-১৯৩৭) এজিদ বধ কাব্য (১৮৯৯),মোসলেম বধ কাব্য (১৩০৮),শেখ ফজলল করিমের (১৮৮২-১৯৩৬) পরিত্রাণ কাব্য(১৩১০),ওসমান আলীর দেবলা(১৯০১) ,আবদুল বারি-এর কারবালা (১৯১২) ,দফসের আলী তালুকদার এর হাসন বধ কাব্য(১৩২৫),আবু জেহাদিয়া মোহাম্মদ ইব্রাহিম আলীর প্রাণের বিজয় কাব্য ,শেখ হবিবর রহমানের কোহিনুর কাব্য(১৩২৫) প্রভৃতি মোটামুটি ভাবে উল্লেখযোগ্য ।

রঙ্গলালের কাব্যে সংকীর্ণ দেশপ্রেমের প্রচার মুখ্য হয়ে উঠেছে। টডের রাজস্থান গ্রন্থ থেকে কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করে কবি ভারতের প্রাচীন কীর্তি ও শৌর্যবীর্যের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যে বারবার প্রকৃতপক্ষে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঘটনার বস্তু প্রবাহের সংগে মিশ্রিত নয়। এ সত্ত্বেও রঙ্গলালের কাব্যে দেশপ্রেমের মহিমা পরবর্তীকালের আখ্যান কাব্যসমূহে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল।

রঙ্গলালের পর মাইকেল বাংলা মহাকাব্যের ক্ষেত্রে অদ্ভুত প্রতিভার মত, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাতজাত বাংলায় পুরাণোক্ত নিন্দিত রাবণকে তিনি নতুন ব্যক্তি মহিমা, সামাজিক রাজনৈতিক নতুন আদর্শ সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্থাপন করেন, রাবণ কোন কোন দিক দিয়ে নতুন বাংলার এমন কি নতুন ভারতের প্রতীক প্রায় হয়ে ওঠেন। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ভারত ও বাংলায় নবোদিত মানব মহিমা ও জীবনবোধ মাইকেল পরবর্তীকালে যথার্থভাবে অনুসৃত হয়নি, কিংবা এর উপযুক্ত উত্তরাধিকার দেখা যায়নি। তার কারণ মাইকেলের যথার্থ উত্তরসূরী হবার মত মানসিক কিম্বা প্রতিভাসম্পন্ন কবির আবির্ভাব ঘটেনি । তাছাড়া সামাজিক প্রেক্ষিতটিও দ্রুত বদলে যাচ্ছিল।

মাইকেলের শিল্পরূপ সকলকেই মুগ্ধ করেছিল, কিন্তু তাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রায়ই তাঁদের ছিলনা। ফলে মাইকেল পরবর্তী সকল মহাকাব্য রচয়িতা, এমন কি হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রও রঙ্গলালের দেশপ্রেমের [illegible] প্রকাশেও মাইকেলের শিল্পরীতিকে মিশ্রিত করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। দেশপ্রেম কারো কারো কাব্যে মনোহারিত্ব এনেছে, উদাহরণ হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র । তাঁদের মধ্যে "প্রথম প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসকে অবলম্বন করে জাতীয় আবেগ প্রকাশের কৃতিত্ব নবীন সেনেরই।"[১]

১। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান -আধুনিক কাহিনী কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,১৯৬২, পৃঃ ৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৩১ সালে ঈশ্বরগুপ্তের (১৮১২-৫৯) সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা থেকে ১৮৯৬ সালে নবীনচন্দ্র সেনের প্রভাস কাব্য প্রকাশকাল পর্যন্ত বাংলা কাব্যে জাতীয় আন্দোলনের আদর্শপ্রচার প্রাধান্য পেয়েছে। "এই পর্বের পর হইতে কাব্য এবং জাতীয় আন্দোলন যেন দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় পৃথক হইয়া আপন আপন পথে বহিয়া যাইতে লাগিল।"[১] কিন্তু মুসলমানের সাহিত্য সাধনার অবস্থা পৃথক ছিল[২] সেকারণে সাহিত্যে হিন্দুর এককালীন জাতীয় আন্দোলন মুসলমান রচিত কাব্যধারার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়ে পড়েনি। সিরাজী তাঁর আখ্যান কাব্যে মাইকেলের শিল্পরূপ এবং রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের দেশপ্রেম কোন কোন দিক দিয়ে মিশ্রিত করেছেন, পূর্বসূরীদের মত স্বাভাবিকভাবেই শিল্পরীতিতে মাইকেলের অনুসরণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত। কিন্তু দেশপ্রেম সিরাজীর নিজস্ব ব্যক্তিচেতনা সঞ্জাত, এ কারণে পূর্বসূরীদের মধ্যে অন্ততঃ এই একটি ক্ষেত্রে তিনি বিলীন হয়ে যাননি। তাছাড়া দুটো কাব্যেই তিনি পূর্বসূরীদের তুলনায় পৃথক বিষয়বস্তু নিয়েছেন বলে দেশপ্রেমের প্রকাশটিও পৃথক মনে হয়।

মাইকেলের পরবর্তীকালে রচিত সকল আখ্যান কাব্যই পূর্বানুবৃত্তি, কিন্তু সমকালীন সামাজিক প্রয়োজনের জন্য সেগুলো বেঁচে ছিল। তবে এগুলোর বৈশিষ্ট্য এখানেও যে, আখ্যানকাব্য হলেও সামাজিক প্রেক্ষিত পরিবর্তনের ফলে তা গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত, অর্থাৎ একই সঙ্গে কাহিনী কাব্য ও গীতিকাব্যের প্রয়োজন মিটিয়েছে। কিন্তু গীতিকবিতার শিল্পরীতি তখনো স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছে, কাহিনী সম্পর্কহীন সাধারণ অনুভূতির উজ্জ্বলতা কিংবা কবির হৃদয় অন্তর্লোকের অনুরণন ভাবনা নিয়েই বেঁচে থাকার শক্তি সঞ্চয় করেছিল। ফলে কালক্রমে গীতিকবিতা রচনায় ক্ষেত্রে কাহিনীর প্রয়োজন হলে হল গৌণ, মুখ্য হল, সুতরাং গীতিকবিতা কাহিনীনিরপেক্ষ অনুভূতি প্রকাশের দিকেই অগ্রসর হল। নতুন দেশাত্মবোধের প্রেরণায় ধীরে ধীরে জাতীয় ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রেও কাহিনীর ওপর নির্ভরতা আর আবশ্যিক থাকলনা। এভাবেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর স্বাভাবিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় কাহিনীকাব্যের স্থান একদিকে সামাজিক উপন্যাস পেল, অন্যদিকে পেল বহুবর্ণ গীতিকাব্য। সিরাজীর কোন আখ্যান কাব্যই চূড়ান্ত বিচারে মহাকাব্য তো নয়ই, বরং কাহিনীর আশ্রয়ে রচিত আবেগ-মূলক কয়েকগুচ্ছ গীতিকবিতার সমষ্টি। গীতিকবিতায় এমন লক্ষণ ছিল বলেই সম্ভবতঃ সিরাজীর কাব্যগুলো পাঠকের নিকট গৃহীত হয়েছিল, সিরাজী নিজের গীতরসময় হৃদয়ের অজান পুলককে সেভাবে কাহিনী কাব্যের প্রচ্ছদে প্রস্ফুটিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

১। আধুনিক বাংলা কাব্য, পৃঃ ৫।

২। পূর্ব, প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং শিরাজীর আখ্যান কাব্যগুচ্ছ যুগধর্ম হয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পলাশির যুদ্ধ, বৃত্রসংহার, শিবাজী ইত্যাদি গ্রন্থের মধ্যে বিবেচ্য। পূর্বোক্ত সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান দেয়া হলে শিরাজীর রচনা অনুল্লেখ্য থাকতে পারে না, সচেতন সমাজ মানস যদিও আখ্যান কাব্যের রূপপরিক্রমকে অতিক্রম করে এসেছিল।

এতৎসত্ত্বেও "আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্যপ্রেরণা দ্বিতীয়বার অনুভূত হয়েছিল মুসলিম মধ্যবিত্তের জাগরণের ফলে।"[১] মুসলিম মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ প্রথম প্রকাশিত হয় কায়কোবাদের মহাশ্মশান কাব্যে, এর পূর্বতর বিকশিত রূপ শিরাজীর রচনায়। আবুল মা'আলী মোহাম্মদ হামিদ আলীর কাসেম বধ কাব্যে শিল্পগুণের উৎকর্ষ থাকলেও বিষয় রূপপরিবেশনের ঊর্ধ্বে তা কোন উদ্দেশ্যের পোষকতা করেনি। কায়কোবাদ হেম নবীনের যুগপরিচিত কাব্যাদর্শ গ্রহণ করেন, শিরাজীও এর ব্যতিক্রম নন। কায়কোবাদ ও শিরাজী দুজনেই জাতিকবিতার অবিরাম প্রয়োগ করেছিলেন, সে কারণে বারবারই মহাকাব্যের সংযম অতিক্রম করে জাতিকবিতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তৎকালের মুসলমান সমাজের প্রেক্ষিতে বিচার করলে শিরাজীর ভূমিকা হেম নবীনের মধ্যে বিচার্য, এবং কায়কোবাদের তুলনায় শিরাজী অধিকতর কর্মমুখর। শিরাজী মুসলমান সমাজে হেম নবীনের জনপ্রিয়তার আদর্শ ও আসন চেয়েছিলেন ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রায় বলাকা(১৯১৬) কাব্যের যুগেও হেম নবীনের বিধায়কের মোহ ত্যাগ করেননি। জীবদ্দশাতেই মুসলমান সমাজে তাঁর পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন এভাবে হয়েছে, "শিরাজী সাহেবের অধিকাংশ কবিতা হেমচন্দ্রের হুবহু অনুকরণ। স্থানে স্থানে ভাব, ভাষা ও ছন্দের সামঞ্জস্য দেখিয়ে উহা হেমচন্দ্রের রচনা বলিয়া ভ্রমে পতিত হইতে হয়। তাহার 'প্রবাসেনি' যদিও ঐ দোষ হইতে মুক্ত, কিন্তু ভাষার দৈন্য এবং ছন্দের লালিত্যহীনতার জন্য ভাবের গম্ভীরতা থাকা সত্ত্বেও উহা তেমন উপাদেয় হইতে পারে নাই। তাহার কাব্য কবিতার নানা দোষ ত্রুটি থাকিলেও উদ্দীপনাময়ী ভাবের অভাব নাই। ফলতঃ তাঁহার রচনা যে জাতীয় জীবন গঠনের সহায়ক তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব তিনি যে বাঙ্গালার অন্যতম জাতীয় কবি তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।"[২] অথবা, "শিরাজী, আবুল-মা-আলী-মোহাম্মদ হামিদ আলী, মোজাম্মেল হক প্রভৃতি কয়েকজন মুসলমান কবিও মাইকেল প্রতিভার অনুগামী শক্তিশালী কবি। কিন্তু ইহারা জাতীয় হিতৈষণা ও ভাষার দিক দিয়া যতটা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, কবিত্বের দিক দিয়া ততটা ক্ষমতা দেখাইতে পারেন নাই। মহাশিক্ষা কাব্য, স্পেন বিজয় কাব্য প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে শিরাজী সাহেবের যে আন্তরিক জাতি হিতৈষণা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে

১। আধুনিক কাহিনী কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র, পৃঃ ৮।

২। আবু নূর – বঙ্গীয় মোসলেম সাহিত্য ও সাহিত্যিক, ইসলাম দর্শন, ফাল্গুন, ১৩৩২।

Dhaka University Institutional Repository

এবং মাইকেলী ভাষার উপর যে আশ্চর্য দখলের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা যতই প্রশংসার যোগ্য হউক কাব্যের যা প্রাণ সেই কবিত্ব শক্তির পরিচয় তাহাতে বেশী না থাকায় কাব্য হিসাবে তাঁহার গ্রন্থগুলি সাহিত্য রসিকের নিকট সমাদরণীয় হইতে পারে নাই।"[১] সমালোচকদের এ সব মন্তব্য থেকে মনে হয়, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য চিন্তায় মুসলমান সমাজ সিরাজীর জীবনের প্রায় অপরাহ্নেই তাঁকে অতিক্রম করে এসেছে।

<u>দুই</u>

বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি, প্রেম, প্রার্থনা সম্পর্কিত গীতিকবিতা নতুন নয়। বিহারীলাল প্রথম এ ধরণের কবিতার সূত্রপাত করেন, কবি হৃদয়ের অনুরাগ আনন্দ বেদনা মিশ্রিত করে কেবল কবিতার শরীর নির্মাণ নয় এর উপলব্ধির সেতুটিকেই পরিবর্তন করে দেন। বিহারীলালের হাতেই বাংলা কবিতা প্রথম বহির্জগত ছেড়ে কবির অন্তর্মুখী হয়েছে এবং পাঠকের সঙ্গে কবির সুনিবিড় সংযোগও স্থাপিত হয়েছে। এসব কবিতা পাঠ করে পাঠক নিজেও কবির মত কিংবা কবির সঙ্গেই উপলব্ধির যেন জ্যোৎস্নালোকিত জগতে এসে উপনীত হন। বিহারীলাল যখন বলেন,

সর্বদাই হু হু করে মন
বিশ্ব যেন মরুর মতন।

মহাকাব্যে নায়কের দুর্ধর্ষ বিক্রম কিংবা ভুবন বিজয়ের আনন্দ কবির এ নৈরাশ্য ক্ষুব্ধ হৃদয় বেদনার নিকট ম্লান হয়ে যায়। পাঠক এক্ষেত্রে মহাকাব্যের নায়কের চেয়ে কবি হৃদয়ের অনুরণন বেদনার সঙ্গে অধিকতর একাত্মতাবোধ করেন। এমন কি এ শ্রেণীর প্রকৃতি কবিতায় সৌন্দর্যবোধ যখন বর্ণিত হয়, সে তখন কেবল ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে নয়, বরং একটি অপরূপ উজ্জ্বল অনুভূতি হিসাবে মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়।

"আত্মভাবের উদ্বোধন (awakening of the self) বিহারীলালের কবিতার একটা সুস্পষ্ট যুগ-নির্দেশক বৈশিষ্ট্য।"[২] বিহারীলালের (১৮৩৫-৯৪)এর বাংলা গীতিকবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। বিহারীলালের পরবর্তী সব কবিই রবীন্দ্রনাথের

১। আবুল কালাম শামসুদ্দীন - কাব্য সাহিত্যে বাঙালী মুসলমান, ঢাকা, ১৩০০।

২। আধুনিক বাংলা কাব্য, পৃঃ ১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার পরিচয় অনেকখানি পাইয়াছিলেন। সুতরাং বিহারীলালের পরেই রবীন্দ্রনাথের কথা আসে।"[১] তা সত্ত্বেও বিহারীলালের সমকালে, বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তীকালে অনেক গীতিকবি নিজেদের রচনায় বৈশিষ্ট্য কিংবা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সমর্থ হন, এদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার(১৮৩৮-৭৮) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮৪০-১৯২৬), দেবেন্দ্রনাথ সেন(১৮৫৫-১৯২০), গোবিন্দ চন্দ্র দাস(১৮৫৫-১৯১৮), গিরীন্দ্রমোহিনী (দত্ত) দাসী (১৮৫৫-১৯২৪), অক্ষয়কুমার বড়াল(১৮৬০-১৯১৯), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), প্রিয়নাথ সেন(১৮৫৪-১৯১৬), দেবেন্দ্রনাথ সেন(১৮৫৫-১৯১০), বিজয়চন্দ্র মজুমদার(১৮৬১-১৯৪২), প্রিয়ম্বদা দেবী(১৮৭১-১৯৩৫) প্রমুখ রয়েছেন।

এরা বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিলীন হয়ে যাননি, যদিও বিহারীলাল কিংবা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত নন। এদের মধ্যে কারো কারো কবিতা ও গানে নিজস্ব হৃদয়ানুভূতির বর্ণাঢ্যময় সংযোগ ঘটেছে, যেমন ডি- এল- রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ সেনের গানে দেশপ্রেম, অধ্যাত্মপিপাসা ও আত্মদর্শন রূপায়িত, অক্ষয় বড়ালের কবিতায় শোকানুভূতি, কামিনী রায়ের কবিতায় রমণী হৃদয়ের মমতাময় স্পর্শ সঞ্চারিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার সকল বন্ধন মোচন করে তা মানুষের হৃদয় সাগরে মধ্যে বিস্তৃত করে দেন। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা রয়েছে বহুমুখী। "১৮৭০-১৯০০ এই যুগটিকে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান যুগ বলা হইয়া থাকে, আবার এইটিকে সমন্বয় যুগও বলা যায়। কাব্যের ক্ষেত্রে এই সমন্বয় যুগের প্রতিনিধি নবীনচন্দ্র, উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র, নাটকে গিরীশচন্দ্র। কাব্য-নাটক-উপন্যাস-সাহিত্যের ক্রিয়ায় এই সমন্বয় যুগ বিশেষভাবে প্রতিফলিত। এই সমন্বয়ের পূর্ণতা - রবীন্দ্রনাথে।"[২] রবীন্দ্রনাথের অন্যতম কৃতিত্ব এখানে যে অতীত ভারতের সৌন্দর্য দিয়ে বর্তমান মুহূর্তগুলোকে তিনি পুনঃসৃষ্টি করে তোলেন এবং ভবিষ্যতের সংগেও অপরূপ সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে দেন, এ কারণে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই বাংলা ও ভারতের সর্বকালের রূপ অনবদ্যভাবে প্রতিফলিত। রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতায় মানুষের অস্তিত্বের সমস্যাবলীকে প্রাধান্য দিয়েছেন, করেন, পাশাপাশি উপন্যাস, ছোটগল্প, গান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নবরূপলোক অধিকার করেন। রবীন্দ্রনাথের হাতেই সাহিত্যে ভারত আবিষ্কারের সবচেয়ে সূচনা, স্বামী বিবেকানন্দ এটা হিন্দু ধর্মের মাধ্যমে করতে চেয়েছিলেন।[৩] রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার অর্জনের দ্বারা আবহমান বাংলা ও বাংলা সাহিত্যকে সম্মানের শিরোভূষণ পরিয়ে দেন।

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৭৪।
২। আধুনিক বাংলা কাব্য, পৃঃ ২০৩।
৩। পূর্ব, পৃঃ ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্র প্রতিভার পূর্ণ বিকাশকালেই "সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদার – এই চারজন কবি যে আধুনিকদের প্রথম আকর্ষণ করেছিলেন সে তাদের নতুন সুরের জন্য।"[1] তা সত্ত্বেও এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ বসন্ত (১৩২৯) নাটিকা নজরুলের নামে উৎসর্গ করে তাঁকে আশীর্বাদও করেছিলেন।[2] এদের অব্যবহিত উত্তরসূরী কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণতর সাহিত্যিকবৃন্দ। তাঁরা অবিরাম প্রচেষ্টায় এবং রবীন্দ্র চর্চার মাধ্যমেও রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে আসতে চেষ্টা করলেন।[3] কবিতায় আধুনিকতার লক্ষণ এভাবে কেউ কেউ বর্ণনা দিতে চেষ্টা করেছেন, "কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত, অন্তত: মুক্তিপ্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।"[4] প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ভারতেও দ্রুত সামাজিক রাজনৈতিক পটবিবর্তন ঘটেছে, জীবনের বহুবিধ জটিলতার সুর ধরে কবিতার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন তাদের সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্র প্রতিভার প্রায় মধ্যাহ্নে অবস্থান করেও তাঁরা বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কিছু একটা অভাব বোধ করছিলেন, এখানেই রবীন্দ্রনাথকে চূর্ণ করে নতুন পথে আসতে চেয়েছিলেন। "রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও শিল্পে উনবিংশ শতাব্দীর মূল্যবোধগুলি একটি অপূর্ব পূর্ণতা লাভ করেছিল। স্বভাবত: অনেকেই তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করতে চাইলেন, কিন্তু প্রায় সংগে সংগেই উপলব্ধি করলেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনময় ইতিহাসের ও তাদের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে দুস্তর সমুদ্রের ব্যবধান।"[5] ঈশ্বরগুপ্ত মাইকেল বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের পর এটাই বাংলা কাব্যে নবযুগ, বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগের সূচনা রবীন্দ্র জীবনের শেষ পর্বেই।

শিরাজীর মৃত্যু এবং কল্লোল যুগের সূচনাকাল অত্যন্ত নিকটবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া প্রাক্-কল্লোল যুগ এবং বঙ্কিম উত্তর সকল সাহিত্যিক ঘটনা শিরাজীর সমকালেই ঘটেছিল বলা চলে। যারা মনে রবীন্দ্রনাথ, প্রায় সমকালে এবং সামান্য পরবর্তীকালে ডি-এল-রায়, রজনীকান্ত সেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, প্রমুখ রয়েছেন। শিরাজী জাগরণমূলক কবিতা

১। দীপ্তি ত্রিপাঠী–আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, কলিকাতা, নাভানা, দ্বি-সং, ১৯৫৯, পৃ:৫৬।
২। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক, পৃ: ১০৬।
৩। (ক) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত–কল্লোল যুগ, কলিকাতা, ডি, এম, লাইব্রেরী, তৃতীয় ছাপা, ১৩৬০, পৃ:১৪০-৪৮।
(খ) সাহিত্য চর্চা, পৃ: ১১৬-৩০।
৪। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়--আধুনিক বাংলা কাব্য, ১ম সং, ভূমিকা, পৃ: ॥
৫। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, পৃ: ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

ও আখ্যান কাব্য রচনায় অনুসরণ করেছেন প্রধানত রঙ্গলাল, মাইকেল হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রকে, গীতিকবিতায় রবীন্দ্রনাথকে, দেশাত্মবোধক কবিতা ও গানে প্রধানত হেমচন্দ্র, ডি-এল-রায়কে, সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ, ডি-এল-রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ সেনকে, প্রেমে বৈষ্ণব কবিতা, ইরানী গজল, এমন কি বাউলের আত্মজিজ্ঞাসাকে, বিদ্রোহে সমকালের হিন্দুর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে। নজরুলের রচনায় বিদ্রোহের বাণী ও মুসলিম ঐতিহ্যের ব্যবহার কোন কোন দিক দিয়ে শিরাজীর রচনা থেকে আহৃত। এ ক্ষেত্রে তাঁর কবিতায় শিরাজীর নিকট নজরুলের কৃতজ্ঞতা অনুল্লেখ্য নয়।

তিন

পাশাপাশি অন্য একটি চিত্রও দেখা যেতে পারে। মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা তখনো শৈশবে, শিরাজী মুসলমানদের সে শৈশব কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করেছেন। নজরুল ছাড়া আর কেউ "উন্নতশির" হতে পারেননি, এবং তাঁকে শির উন্নত করে তুলতে শিরাজীর সহায়তা কম নয়।

শিরাজীর আগে মুসলমানদের মধ্যে কবি হিসাবে কায়কোবাদ ছাড়া বাকী সবাই প্রায় অনুল্লেখ্য। মীর মশাররফ হোসেনের প্রধান পরিচয় হল গদ্যে, ঠিক কবিতায় নয়। শিরাজীর চেয়ে কায়কোবাদের কবিতা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, বিশেষ করে অশ্রুমালা (১৮৯৫) অমিয়ধারা (১৯২৩) কাব্যে কবি হৃদয়ের নিভৃত কূজন ও ভালোবাসা ভাব পারম্পর্যটিকেই রূপায়িত করে তোলে। কিন্তু জাগরণমূলক কবিতায় কায়কোবাদ শিরাজীর সঙ্গে তুলনারহিত। কায়কোবাদ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম দীর্ঘজীবি কবি। বিশের দশক থেকে, আরো নির্দিষ্ট ভাবে বললে তিরিশ গোষ্ঠী, কল্লোল যুগের সাহিত্যিকদের আবির্ভাবের পর কায়কোবাদ তাঁর কাব্য রচনায় নিজের অতীতকেই ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং আধুনিক কবিতার স্রোতপ্রবাহে বিজয়ের দীর্ঘ কবি জীবনকে ক্রমবিলীন হতে দেখেছেন। শিরাজীর প্রায় সমকালে কিছু শক্তিমান মুসলমান কবির আবির্ভাব ঘটেছিল কিন্তু তাঁদের ভূমিকা শিরাজীর তুলনায় ব্যাপক নয়। এদের মধ্যে রয়েছেন সোনা ও শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক, সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), শেখ ফজলল করিম (১৮৮২-১৯৩৬), মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬) শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) প্রমুখ, সামাজিক বিচারে এদের কারো ভূমিকা পথিকৃতের নয়। এদের সকলের তুলনায় শিরাজীর আবির্ভাব নাটকীয় প্রতিশ্রুতিবহও বটে। শিরাজী তাঁর প্রাথমিক ঔজ্জ্বল্য শেষ অবধি বজায় রাখতে পারেননি, নিমগ্ন হয়ে গেছে প্রচারক জীবন, রাজনীতি ও অন্যান্য সমাজকর্মের প্রয়োজনে। শিরাজীর সমকালে আবির্ভূত অধিকাংশ মুসলমান কবি-প্রতিভার তুলনায়

প্রতি ঈর্ষা, ব্যর্থ অনুকরণ শিরাজীর দুর্ভাগ্য। মুসলমান সমাজে শিরাজীর অবস্থান পৃথক করে নিলেই তাঁর প্রকৃত ভূমিকা চিহ্নিত করা যায়। বিশের দশকের কবিকুলের পশ্চাতে থাকলেও, বিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশক অবশ্যই কায়কোবাদ ও শিরাজীর সাধনার ফলে সমৃদ্ধ এবং এদের দুজনের ভূমিকা পরস্পরের পরিপূরক নয়। প্রথম দুই দশকের মুসলমান পাঠকেরা শিরাজীর কবিতায় নতুনত্বের উপলব্ধিতে জাগ্রত হয়েছে, সমন্বিত হয়েছে, এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে তাঁদের জন্য হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত সাধনার ক্ষেত্র এর মধ্য দিয়ে প্রস্তুত হয়েছে। এদেরই অন্যতম কবি কাজী নজরুল ইসলাম। শিরাজী রবীন্দ্রনাথকে পরোক্ষে মুসলমানদের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হবার পর শিরাজীর স্থান সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। ফলে বিশের দশক থেকে প্রায় নিজেরই সৃষ্ট মুসলমান সমাজের কিছুটা তিনি পশ্চাৎপদ হয়ে গেলেন, এবং নতুন যুগে তাঁকে খুঁজে নিয়ে জানবার প্রয়োজনীয়তা বোধ কেউ করেননি। অবশ্য শিরাজীর কবিতা ও সাহিত্যের অন্যান্য অংশে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের সম্ভাবনা নিয়ে যেসব সাহিত্যিক ও সমালোচক তাঁকে দেখতে গেছেন, স্বাভাবিক-ভাবেই তাঁরা শিরাজীকে স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছেন।

১। পরে, পঞ্চম অধ্যায়ের শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর সামাজিক রাজনৈতিক দায়িত্ব ছিল অনেক বেশী, সেসব পালন করতে গিয়ে কাব্যলক্ষ্মী তাঁর প্রতি বিমুখ হয়ে পড়েছে। তিনি একগুচ্ছ মলধান কবি সাহিত্যিক সৃষ্টি করেছেন, 'নবযুগ' পর্বকে জাতীয় দায়িত্বের উপযোগী করে তুলতে চেয়েছেন, আর এসব করতে গিয়ে কাব্যরচনার মূল চিহ্ন থেকে পশ্চাদপসারণ করেছেন। তা সত্ত্বেও নিসর্গ কাব্য জীবন সম্পন্ন কায়কোবাদের তুলনায় তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন অনেক বেশী, কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে মোটেই পশ্চাৎপদ নন। বিশেষতঃ মহাকাব্য রচনায় শিরাজীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, মহাশ্মশান (১৯০৪) কাব্যের চেয়ে স্পেনবিজয় কাব্য (১৯১৪) নিকৃষ্ট নয়, এবং মহরমশরীফ (১৯৩৩) কাব্যের তুলনায় মহাশিরা কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। অবশ্য কায়কোবাদের মত শিরাজীর কবিতায় আপন অন্তরাত্মার সংযোগ নিভৃত সংলাপ কমই আছে। অন্যদিকে শিরাজীর সমগ্র জীবনই প্রকৃতপক্ষে "অনলপ্রবাহ"। জাগরণমূলক কাব্যায় তিনি নিজের জীবনেরই নিপুণ রূপকার, নিজেকেই তিনি গদ্য ছন্দে করে এসব কবিতায় বিমূর্ত করে তুলেছেন। শিক্ষা গোষ্ঠীর লেখকদের অবদানের গুরুত্ব বর্তমান ক্ষেত্রে এবং এগুলো প্রধানত প্রবন্ধের অধ্যায়ে প্রকাশিত। কবিতার ক্ষেত্রেও তাঁরা অনুল্লেখ্য নন। শিরাজীর কবিতা বক্তব্য নির্ভর বলে প্রধানতঃ তাঁদের মধ্যে তুলনায়। শিক্ষাগোষ্ঠী নানা দিক দিয়ে শিরাজীকে অতিক্রম করে গেছে।[১]

কবিতার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে শিরাজী পশ্চাৎপদ, রবীন্দ্র মধ্যাহ্নে উপস্থিত থেকে রবীন্দ্রনাথের

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্য রচনা

সিরাজীর গদ্যগ্রন্থগুলি হল, স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা (১৯০৭), (২) স্ত্রীশিক্ষা (১৩১৭), (৩) তুরস্ক ভ্রমণ (১৯১৩), (৪) তুর্কী নারী জীবন (১৩২০), (৫) আদব কায়দা শিক্ষা (১৯১৪) ও (৬) সুচিন্তা (১৯১৬) (৭) নিখিল বঙ্গীয় কর্মী সম্মিলন সভাপতির অভিভাষণ (১৯২৮) (৮) ইসলামের ডাকে সিরাজী সাহেবের বাণী (১৯৩৮) (৯) স্বজাতিপ্রেম (১৯৪৬) ও ইসলামের জেহাদ বা যুদ্ধের বাণী (১৩৪২)। এছাড়া পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধও রয়েছে। এগুলোকে মোটামুটিভাবে (ক) চিন্তামূলক, (খ) আত্মজীবনীমূলক রচনা ও ভ্রমণ কাহিনী এবং (গ) বিবিধ রচনা হিসাবে শ্রেণীকরণ করা যায়।

ক) চিন্তামূলক রচনা

চিন্তামূলক প্রবন্ধগুলোর বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

ভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি।

ভাষা ও সাহিত্য

এক

ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সিরাজীর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট, আত্মচৈতন্য থেকেই তিনি ভাষা ও সাহিত্যে লক্ষ্য স্থির করেছেন। বাংলা ভাষার ওপর বাঙালী হিন্দুর যেমন অধিকার, তেমনি বাঙালী মুসলমানেরও ন্যায্য অধিকার দাবী করেছেন। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানের অধিকার বেশী বলেই মনে করেছেন কেননা, এককালের উপেক্ষিত বাংলা ভাষাকে মুসলমান 'নরপতিরাই' তুলসীতলা থেকে 'শাহী দরবারে' তুলে নিয়ে এসেছিলেন।[1] "ভাষা মানবজাতির উন্নতির সর্বপ্রধান কারণ"[2] এবং চর্চার মাধ্যমে ভাষার প্রতি

১। বাঙ্গালা ভাষার পরিচর্য্যা, আল এসলাম, মাঘ, ১৩২৪।

২। মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি, ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯০২।

অধিকারবোধ জন্মায়। এ ব্যাপারে হিন্দু অনেক অগ্রসর, কিন্তু তুলনামূলকভাবে মুসলমান অনেক পশ্চাৎপদ। হিন্দুরা মাতৃভাষার মাধ্যমেই সংস্কৃত ও ইংরেজীর প্রাচীন ও নতুন ভাব নিজেদের মধ্যে প্রবাহিত করতে পেরেছে এবং "বাঙ্গালা ভাষায় সেই বিদ্যুতের ও দীপ্তির প্রভা বাঙ্গালার বাহিরে ভারতবর্ষে এবং ভারত-বর্ষের বাহিরে সুদূর দেশ সমূহেও যাইয়া পৌঁছিয়াছে।"[১] কিন্তু ঔদাসীন্যের ফলে মুসলমানেরা প্রতি-যোগিতায় পিছিয়ে পড়েছে। কারণও আছে, হিন্দু ছাত্রের পক্ষে দ্বিতীয় ভাষা কেবলমাত্র সংস্কৃত, কিন্তু মুসলমান ছাত্রকে আরবী, ফার্সী এবং উর্দু ভাষার বোঝা বহন করতে হয়। হিন্দু সতীর্থের তুলনায় মুসলমান ছাত্রের সমস্যা বোধগম্য, লেখকের প্রশ্ন, "ইহা অপেক্ষা মুসলমান বালকের প্রতি অত্যাচার ও জুলুম আর কি হইতে পারে?"[২]

যে কোন দেশের জলবায়ু, খাদ্য ইত্যাদির মত ভাষা প্রকৃতি দত্ত, সুতরাং এ ভাষাকে যারা অস্বীকার করতে চায় নিজেদেরকেই তারা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। মাতৃভাষার প্রতি অধিকার সকলের, "ভাষা ও সাহিত্য সম্প্রদায়গত মতবাদের দুর্গে বন্দী হইয়া থাকবার বস্তু নয়।"[৩] ভাষা আত্মসম্মান ও জাতীয়তাবোধের অন্যতম উৎস। আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে একদল মুসলমান বাংলার পরিবর্তে উর্দুর প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন, শিরাজী মনে করেছেন, এতে মুসলমানদের সর্বনাশ হবে।[৪] মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানের সঙ্গে নৈকট্য কামনা করলেও বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালী মুসলমানের অধিকারবোধ তিনি বিস্মৃত হননি। কলিকাতা টাউন হলের খেলাফৎ সভায় জাতুর কিছু সংখ হিন্দুস্থানী মুসলমানরা উর্দুতে ছাড়া ইংরেজী ভাষাতেও বক্তৃতা করতে সম্মত হননি। হিন্দুস্থানীদের মনোরঞ্জনের জন্য কোন কোন বাঙালী মুসলমান উর্দুতে বক্তৃতা করলে তাঁদের আত্মসম্মানবোধ সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। এমন কি উর্দু ভাষাকেই বাংলার মাটি থেকে নির্বাসন দেবার কথা বলেছেন।[৫] অন্য একটি প্রসঙ্গে বাঙালী মুসলমানদের

১। বাঙ্গালা ভাষার পরিচর্য্যা, আল এসলাম, মাঘ, ১৩২৪।
২। মুসলমান ছাত্রের শিক্ষা সমস্যা, কাটিং বই, ৫৫৩-ক।
৩। মাতৃভাষা, ইসলাম-প্রচারক, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩০৬।
৪। "সুতরাং আঙ্গুরের চাষ চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার মাটিতে আম কাঁঠালের চাষ করাই যেমন বুদ্ধিমানের কার্য্য, তেমনি উর্দুওয়ালা, উর্দু হিতৈষী দিগের কর্তব্য যে উর্দুর চর্চা চেষ্টা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার চর্চায়ই বদ্ধপরিকর হন। তাহারা বাঙ্গালার চর্চা করিলেই দেখিবেন যে, বাঙ্গালার আম যেমন আঙ্গুর লোলুপদিগের নিকটেও উপাদেয় ও সরস বলিয়া বোধ হয় তেমনি বাঙলা ভাষাও সুরস, সুতার সুখদ ও ভাব সম্পদে সমুজ্জ্বল বলিয়া বোধ হইবে। দেশের জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনুসারে যদি ভাষা গঠিত হয় তাহা হইলে নিরস হিন্দুস্থানের উর্দু অপেক্ষা সরস শ্যামা বঙ্গভূমির ভাষা কঠিনো না হউক ক্রমে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ হইবে।"— বাঙ্গালা ভাষার পরিচর্য্যা, আল এসলাম, মাঘ, ১৩২৪।
৫। বাঙ্গালা ভাষার সমাদর, চিন্তার ধারা, নূর, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

সভায় মওলানা মুহম্মদ আক্রাম খাঁর প্রাধান্য অর্জনের প্রয়াসকে তিনি প্রতিরোধ করেছিলেন।[১] আরবী ভাষায় খোতবা পাঠ অধিকাংশ মানুষ বুঝতে পারে না। এর বিকল্প হিসেবে বাংলাভাষায় খোতবা পাঠ করা হলে খিলাফতের জন্য আন্দোলন করতে হত না কিংবা খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হত না বলে তিনি মনে করেছেন।[২]

বাঙালী মুসলমানদের ভাষা কি তা নিয়ে বিতর্ক আগেও ছিল,[৩] এ সময়ে এটা অপেক্ষাকৃত রাজনৈতিক রূপ পেয়েছে। তিনি বাঙালী মুসলমানদের আত্মপরিচয় এবং এবং জাতীয়তাবোধের অন্যতম উৎস হিসেবে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করেছেন, এ কারণে তাঁর কাছে বাঙালী মুসলমানদের জন্য বাংলা ভাষার অন্য কোন নিকটতম বিকল্পও নেই। আভিজাত্য অর্জনের জন্য আরবী পারসী মুসলমানদের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করলেও মাতৃভাষা বাংলার দাবী ছেড়ে দিতে তিনি সম্মত হননি। এমন কি হিন্দুর তুলনায় পৃথক করে এর মাঝখানে কোন দেয়াল তুলে দেননি।

সরোজকুমারী দেবীর ভূমিকায় সিরাজী বাংলা বিভক্তির ভাষার সমালোচনা করেছেন।[৪] অন্যত্র ভাষার আদর্শরূপ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন।[৫] সিরাজী এখানে মুসলমানের ভাষাকে পৃথক করে দেখেননি, বরং রাবীন্দ্রিক ভাষার চেয়ে বঙ্কিমী ভাষাকে মুসলমানের জাতিগঠনের জন্য অনুকূল মনে করেছেন। অবশ্য বঙ্কিমী ভাষার সংগে নৈকট্যবোধ করার অন্যতম কারণ হল সিরাজীর প্রচারক জীবন এবং নতুন রাজনীতিতে বঙ্কিমের পুনর্জন্ম। ভাষায় গুরুগম্ভীর শব্দের ঝংকার এবং অনিবার্য সিরাজীকে মুগ্ধ করেছিল, এর প্রয়োগিক সাফল্য সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন বলে এ নৈপুণ্যকে বর্জন করেননি।

দেশ ও জাতির জন্য কোন কল্যাণকর কিছু করার উদ্দেশ্য নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য চর্চার জন্য আহবান জানিয়েছেন।[৬] সিরাজীও সাহিত্যের সংগে স্বদেশ চিন্তা যুক্ত করেন। তাঁর মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য হবে দেশ, জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্র, বৃহত্তর অর্থে সমগ্র মানব জাতির মংগল সাধন। সাহিত্যকে এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম মনে করেছেন, নিজে সাহিত্যকে সেভাবে ব্যবহার করেছেন, অন্যকেও সেভাবে [illegible] তা করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে হিন্দুর মত মুসলমানেরও অখণ্ড উত্তরাধিকার কামনা করেছেন। অনগ্রসর মুসলিম সমাজকে অনবরত চর্চার মাধ্যমে হিন্দুর সমান করে তুলতে চেয়েছেন। মুসলমান রচিত সাহিত্যের সংগে।

১। পূর্ব, পৃঃ ৮৩।
২। খোতবা পাঠ, চিন্তার ধারা, নুর, বৈশাখ, ১৩২৭।
৩। পূর্ব, পৃঃ ৮৪।
৪। সরোজকুমারী, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৫। "আমরা বিশুদ্ধ বিশেষ সরল ও সহজ ভাষার পক্ষপাতী। কিন্তু মেরুদণ্ডহীন হালকা ভাষার পক্ষে নহি।—রবীন্দ্রপন্থীরা ভাষাকে যেমন কোমল করিতে যাইয়া কমজোর ও রুগ্ন করিয়া দিয়াছেন, মোছলমানের জন্য তাহা অনুকরণযোগ্য নহে।"—সাহিত্যের প্রভাব ও প্রেরণা, ছোলতান, ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৩০।
৬। বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, ব-র, দ্বি-পৃঃ ২৭২।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্গতির তুলনা দিয়েছেন "নহরের কাছে --বর্ষাকালের খরস্রোত পদ্মা বা বিশালাকায় যমুনা," এর অন্যতম কারণ হিসাবে দেখেছেন, "ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের কৃপণতা, শিক্ষিত লোকদিগের দুর্ভাগ্য লেখকদের গ্রন্থের প্রতি অনুরাগহীনতা, উপযুক্ত পাবলিশারের অভাব"। শিরাজী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও দেখেছেন বিত্তবান মুসলমান ও শিক্ষিতদের এসব ব্যাপারে কিছুটা ঔদাসীন্য রয়েছে। কিন্তু হিন্দু গ্রন্থকারের ক্ষেত্রে এ সমস্যা নেই, তাঁদের রচিত গ্রন্থ সমূহের ঢের হিন্দু পাঠক আছে, তাঁরা মুসলমান রচিত বই পড়েন না। হিন্দু সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই পুস্তক বিক্রী থেকে জীবিকা নির্বাহ হয়ে যায়, কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। কেননা, "মুসলমানের পুস্তক ও কাগজের গ্রাহক-কৃষক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর অল্পশিক্ষিত দরিদ্র ব্যক্তিগণ। সর্ববিষয়ে ইহারাই, শুধু ইহারাই ইসলাম ও মুসলমানের আশা ভরসাস্থল। সুতরাং পুস্তক বেচিয়া মুসলমান গ্রন্থকারের পক্ষে দুপয়সা অর্জন করা কঠিন ব্যাপার।" উৎসাহদানের অভাবেই মুসলমান সমাজে অনেক প্রতিভার বিকাশ হতে পারেনি। কিন্তু হিন্দুর নিকট থেকে এ ব্যাপারে সহায়তা পাবার কোন সম্ভাবনা নেই, প্রবাসী, ভারতবর্ষ পত্রিকা সম্পর্কে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা তিনি বর্ণনা করেছেন। মুসলমান গৌরব সম্পর্কিত কোন রচনা এসব পত্রিকায় ছাপা হয় না," তবে নব্যভারত, সুপ্রভাত প্রভৃতি ব্রাহ্ম পত্রিকা অবশ্য এ দোষ হইতে মুক্ত। হিন্দু মাসিকগুলি প্রবন্ধ গৌরবে যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিনা।" এ সত্ত্বেও মনে করেছেন, "মাসিকের মধ্যে এ অধমের মতে প্রবাসীই শ্রেষ্ঠ।--প্রবাসীর সম্পাদকীয় নোট খুবই মূল্যবান এবং বাংলা মাসিকে এক নূতন আমদানী বিশেষ।" মুসলমানদের মধ্যে এ ধরণের মাসিক পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছেন, অর্থ থাকলে তা প্রকাশ করাও সম্ভব কিন্তু ধনাঢ্য মুসলমানদের অনীহা এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধক। তাঁদের জ্ঞান নেই, জ্ঞান থাকলেও সদবুদ্ধি ও দানপ্রবৃত্তি নেই। আঘাত পেলে চৈতন্য জাগে, তারও আর দেরী নেই, কারণ, "হিন্দু ভ্রাতাদিগের পিতৃলের গুলি সম্প্রতি যে রূপভাবে ইহাদের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে--তাহাতে যদি ইহাদের চৈতন্যের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির কিছু আশা করা যায়। নতুবা সাহিত্যের খুব উন্নতি হওয়া একেবারেই অসম্ভব।"[১]

শিরাজী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানের অনায়াস অধিকার বোধ করেছেন। কিন্তু দেখেছেন অচেতনতার অভাবে সে অধিকার বাধের প্রয়োগক্ষেত্র সঙ্কুচিত। নজীর স্থাপন করে, এমন কি আঘাত করে চৈতন্য সৃষ্টি করা যায়, মুসলমানের জড়তা কাটিয়ে ওঠার জন্য এ মুহূর্তে আঘাতও কাম্য মনে করেছেন।

১। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান পশ্চাৎপদ কেন? কার্তিক, বই, ৫৫০-৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবেশী হিন্দু সমাজকে শিরাজী সাহিত্য চর্চার মাধ্যমেই আত্মসচেতনতাবোধ জাগাতে দেখেছেন, এক্ষেত্রে ইতিহাস চর্চা বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। শিরাজীর নিজের মানস পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল ইতিহাস সম্পর্কে কৌতুহল থেকে, প্রচারক জীবনে এর চর্চা আরো বেড়ে গিয়েছিল। হিন্দুর মত মুসলমানদের সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য যুক্তিগ্রাহ্য নির্ভর পথও তিনি ইতিহাসের মধ্যে দেখেছেন। এ একারণে ইতিহাসের গৌরবকে খুঁড়ে নিয়ে আসবার গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প মনে করেছেন সাহিত্য।[১] সামগ্রিকভাবে শিরাজীর সাহিত্যের অন্যতম প্রেরণাস্থল হল ইতিহাস। ইতিহাস চেতনা, এবং বর্তমানের দীনতা থেকে উত্তরণ পরস্পর সংযুক্ত। ইতিহাসের যেসব অংশের প্রতি শিরাজী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেখানে মুসলমানদের অতীত গৌরব প্রায় লুপ্ত পূর্বের মত। শিরাজী সাহিত্যের মাধ্যমে ইতিহাসকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করেছেন। কেবল তাই নয়, দূর ইতিহাসকে অবলম্বন করে তিনি বর্তমানকেও ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন, বর্তমান মুহূর্তের সমস্যা সমাধানের উপায় অন্বেষণ করেছেন, শিরাজীর উপন্যাস এসবের বড় নিদর্শন।

তিনি বলেছেন "যে কূপের সহিত প্রাকৃতিক উৎসের সংযোগ আছে, তাহার জল কমিতে পারে বটে, কিন্তু কিছুতেই যেমন শুষ্ক হইতে পারে না, ঠিক সেইরূপ যে জাতির ইতিহাস অতীতের মহান গৌরব কাহিনীতে পরিপূর্ণ, সে জাতির যদি ইতিহাসের সহিত পরিচয় থাকে, সে জাতিও অধঃপতিত এবং পর-প্রত্যাশী হইতে পারে বটে, কিন্তু সে জাতি কখনও মরিতে পারে না। তাহার জাতীয় প্রাণ হইতে মনুষ্যত্ব ও পুনঃ প্রত্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা একেবারে কখনও দূরীভূত হইতে পারেনা।"[২] মুসলমানের সেই প্রাকৃতিক উৎসের সংগে সংযোগ আছে বলে তিনি মনে করেছেন, তাঁদের বর্তমান নিদ্রাবস্থা সাময়িক ব্যাপার। তিনি বলেছেন, বাংলার মুসলমানদের সুপ্তিমগ্নতার অন্যতম কারণ ইতিহাস চেতনার অভাব, তারও প্রধান কারণ শিক্ষার ত্রুটি। মুসলমান ছাত্ররা বিজাতীয় শিক্ষকের নিকট থেকে বিকৃত ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ করে থাকে। বিজাতীয় লেখকদের রচিত ইতিহাসে ত্রুটি সম্পর্কে ভূদেব বঙ্কিম প্রমুখ লেখকও নিঃসংশয় [illegible] ছিলেন না।[৩]

১। পূর্ব, পৃঃ ৭৬, ৭৪-৭৫।

২। ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতা, আল-এসলাম-ভাদ্র, ১৩২৩।

৩। পূর্ব, পৃঃ ১৭-১৮।

শিরাজী হিন্দু সাহিত্যিকদের হাতে বিকৃত ইতিহাসের আরো অবনতি ঘটতে দেখেছেন, ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অসম অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যেকার এ ব্যবধান ভবিষ্যতে দুর্যোগকেই নিশ্চিত করে তুলবে, এ সম্পর্কে মুসলমানদের সতর্ক করে দেবার জন্যও তিনি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সব হিন্দু লেখকই যে খারাপ এমন মনোভাব তার নেই, গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা রজনীকান্ত চক্র [1] এর মতে তিনি পারসীদান বাবু যদুনাথ সরকারের তুলনা দিয়ে, যদুনাথ সরকারকে আদর্শ মনে করেছেন।[2] লক্ষণীয় হল, বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য যদুনাথ সরকার খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, একালেও তা অম্লান। যদুনাথ সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের ফলে শিরাজীর নিজেরও ইতিহাসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতা প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর বিতর্ক দেখা দিয়েছিল।[3]

সাধারণভাবে হিন্দুর রচিত গ্রন্থে মুসলমানের গৌরবকথা অনুপস্থিত, সুতরাং মুসলমানদের নিজেদের কথা লিখতে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। "মুসলমান যদিও দেশ-শাসনে অক্ষম নহে"[4] তবু

Dhaka University Institutional Repository

ঘরের কথা, দুঃখের কথা দিয়েই আগে শুরু করতে হবে, শিরাজীর ইতিহাস চর্চার অনুপ্রেরণার উৎস এখানেই।

তিন

শিরাজী সাহিত্যের মধ্যে ইতিহাসকে বহুলাংশে মিশ্রিত করেছেন, এবং সাহিত্যের শক্তি সম্পর্কে ছিলেন নিঃসন্দেহ। প্রতিবেশী হিন্দুসমাজ সাহিত্যের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বংশধরকে গঠন করেছে। সে কারণে তিনিও রাজকোষ অথবা বীর যোদ্ধাদের সমবেত শক্তির তুলনায় সাহিত্যের ক্ষমতা স্বীকার করেছেন। সাহিত্যের শক্তি অনুভব করেই তিনি ইতিহাসের দিকে চেয়ে লক্ষ্য করেছেন, যে কোন জাতির অভ্যুদয়কালের ও পতনকালের পার্থক্য সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। অভ্যুদয়কালের সাহিত্য হয় মহাকাব্য, পতনকালের সাহিত্য হয় "কুৎসিৎ কদর্য ভাবপূর্ণ উপন্যাস, কাব্য ও আখ্যায়িকা"[৫] ইত্যাদি। সাহিত্যের মাধ্যমেও পতিত জাতিকে তার পতনের কারণ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া যায়।[৬]

১। শিরাজী "চন্দ্র" লিখেছেন কিন্তু গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতার নাম রজনীকান্ত চক্রবর্তী।
২। ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতা, আল এসলাম, ভাদ্র, ১৩২০।
৩। পূর্বে, পৃঃ ৮৪-৮৫।
৪। (ক) ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতা, আল এসলাম, ভাদ্র, ১৩২০।
(খ) মুসলমান সমাজে দুই একটি কথা, প্রবাসী, কার্তিক, ১৩১৯।
৫। সাহিত্য সম্মিলনীও জাতি সংগঠন, সুচিন্তা, পৃঃ ২১৭। প্রবন্ধটি প্রথমে নবনূর জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ এবং আষাঢ়, ১৩১০ পরে আল এসলাম, বৈশাখ, ১৩২২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
৬। সাহিত্যের প্রভাব ও প্রেরণা, সোলতান, ২৫শে শ্রাবণ, ১৩০০।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় প্রচুর গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকা প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হচ্ছে, সেখানে সমাজ হিতকর কিছু থাকেনা। অথচ সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সমাজহিত, এবং কল্যাণকর সাহিত্য বলতে তিনি দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও জীবনী এবং "গবেষণা ও স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত প্রবন্ধ" বুঝেছেন। তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে উপন্যাস, গল্প, ও প্রেমের প্রণয়কাহিনী রচনার দিকেই আগ্রহ বেশী। কেবল গল্প উপন্যাস নয়, কবিতার ক্ষেত্রেও অধঃপতনের স্রোতকে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন।[১] উপন্যাস সম্পর্কে তার মতামত[২] অধিকতর স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত। এসব বক্তব্য থেকে সাহিত্য চিন্তায় সিরাজীর যে ধারণা স্পষ্ট হয় তা হল, উপন্যাসের চেয়ে চিন্তামূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান চর্চাই সমাজ গঠনের উপযুক্ত মাধ্যম। উপন্যাসের অশুভ প্রভাব বেশী, উপন্যাস নাটক তরুণ চিত্তে আত্মবিস্মৃতি আনে সমাজ ও দেশ গঠনের জন্য তা অনুকূল নয়। সং লক্ষ্যহীন কবিতার প্রভাবও উপন্যাসের সমতুল্য।

১। সাহিত্য শক্তি ও জাতি সংগঠন, সুচিন্তা, পৃঃ ২৫।

২।(ক) "সর্বাপেক্ষা উত্তম উপন্যাস লেখ। গাঁজার দম দিয়া একটা গল্পের স্রোত বহাইয়া দাও। নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ, অভিসার ও পলায়ন লইয়া খুব চমৎকার বর্ণনা কর, এবং সুকুমার সাহিত্যের ভিতর দিয়া মুসলমান জাতির প্রতি প্রচুর পরিমাণে গালি বর্ষণ কর-বিষের স্রোত প্রবাহিত কর দেখো মজার হইবে। হিন্দু নায়কের জন্য অসূর্যম্পশ্যা মুসলমান বাদশাহজাদীগণকে অন্তঃপুর হইতে টানিয়া বাহির কর, হতভাগ্য মুসলমানদিগকে তীব্র বিদ্রূপবাণে জর্জরিত কর, তৎপর নায়ক বা নায়িকাকে সাগরগর্ভে ডুবাইয়া দাও, অথবা উদাসী বা উদাসিনীর বেশে সাজাইয়া দাও খুব মজাদার একখানা উপন্যাস হইয়া উঠিবে। ~~কেহ বলিবে দ্বিতীয় বঙ্কিম, কেহ বলিবে দ্বিতীয় নাটকের~~ গেল। ছাপাইয়া দাও, যথেষ্ট টাকা হইবে, এবং সমালোচনায় মুক্তকণ্ঠে চারিদিক বিকম্পিত হইয়া উঠিবে। কেহ বলিবে দ্বিতীয় বঙ্কিম, কেহ বলিবে দ্বিতীয় নাটকের অভ্যুদয় হইয়াছে, আর চাই কি, তোমার জন্ম ও জীবন সফল হইয়া গেল। দেশ অধঃপাতে যাক-হিন্দু-মুসলমান হিংসানলে প্রজ্বলিত হউক, তাহাতে তোমার কি? তুমি ত রায়-বাহাদুর বঙ্কিম। তোমার আর চিন্তা কি? ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জন্ম ও জীবন।" প্রাগুক্ত, পৃঃ২৮-২৯।

(খ) "বঙ্গীয় মুসলমানগণ পদে পদে মরিয়া গিয়াছে, এখন আর সেই মৃতদেহকে বিষাক্ত প্রেমরস সিঞ্চনে পচাইও না।" প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২।

(গ) "তবে হিন্দুরা আক্রমণমূলক ও কুৎসামূলক যে সমস্ত উপন্যাস লিখিয়াছেন---তাহার জওয়াব মূলক উপন্যাস লেখা অবশ্যই সমর্থনযোগ্য ও প্রকাশমূলক। কারণ ইহাতে একদিকে মোছলমান পাঠকগণের অন্তর হইতে দুর্বলতা ও ভিত্তিহীন অলীক ধারণা দূর হইয়া যাইবে, অন্যদিকে হিন্দু লেখকগণ উপযুক্তরূপ বাধা পাইলে তাহারা হিন্দু মোছলমানে যাহাতে হিংসা বিদ্বেষ প্রচারিত হয় সে রূপ পুস্তক লেখার দুঃসাহস ও বৃথা প্রয়াস স্বীকার করিবেন না। তদ্দ্বারা হিন্দু মোছলমানে একতা স্থাপিত হইবে। বিষে বিষ ক্ষয় করে ইহাই কথা। উপন্যাসের প্রধান মারাত্মক দোষ এই যে, উহা পাঠককে নিতান্ত চঞ্চল, চপলতা ও বিলাসপরায়ণ করিয়া তোলে। ইহা সর্ববাদীসম্মত ধ্রুব সত্য যে, তরুণ বয়সে উপন্যাস পাঠে মুগ্ধ হইলে সে আর কাব্য ইতিহাস বা দর্শন বিজ্ঞান পাঠ করিতে পারে না।" সাহিত্যের প্রভাব ও প্রেরণা, ছোলতান, ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৩০।

(ঘ) "আমার মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে জাতীয় জীবন গঠন কুশল করিয়া তুলিতে হইলে প্রায় সমস্ত উপন্যাস ও নাটক নভেল অগ্রাহ্য করিতে হইবে। নারীর চিত্র আঁকা একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিৎ। কিন্তু ব্যাপার এমনি গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সিগারেট, বিড়ি ও তেলের শিশিতে সুন্দরী নারীর বিলাসিনী মূর্তি না দিলে তাহা বিক্রয় হয় না। এখন দেশের লোক যদি স্বাধীনতা পায় তাহা হইলে চণ্ডুখানাও একদিন পাঠাগারে পরিণত হইবে।" ইত্যাদি। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের চেয়ে চিন্তামূলক প্রবন্ধের গুরুত্ব দিলেও উপন্যাসের ক্ষমতাকে তিনি অস্বীকার করেননি, কেবল তাই নয়, আধুনিক শিক্ষিত মানসের কাছে উপন্যাসের গভীর প্রভাব সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন বলেই একে দূরে রাখতে চেয়েছেন। সচেতনভাবে শিরাজীর সামনে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র; বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পর থেকেই তাঁর উপন্যাস সমূহ কিভাবে সামাজিক রাজনৈতিক শক্তির উৎস হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছিল তাও তিনি দেখেছেন। হিন্দু সমাজের নিকট বঙ্কিমের উপন্যাস সাধারণত ইতিহাসের স্থান গ্রহণ করেছিল, সেই একই সঙ্গে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত সংহত বাস্তুতে রূপ গ্রহণ করেছিল। বঙ্কিমের রচনাবলী ইতিহাস নয়, উপন্যাস। কিন্তু ইতিহাসের বিকৃতি শিরাজীকে পীড়া দিয়েছিল বলেই শিরাজী একই সঙ্গে উপন্যাসের প্রতি অনীহা এবং ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ বোধ করেন। এ কারণে উপন্যাস সম্পর্কে কিছু আক্রমণাত্মক কথা প্রসঙ্গতঃ বঙ্কিমকে এবং তাঁর উত্তরসূরীদের উদ্দেশ্য করেই লিখেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সামাজিক রাজনৈতিক প্রভাব শিরাজীর ঈর্ষার কারণ, অসম্ভব নয়, এ কারণেও উপন্যাস সম্পর্কে শিরাজীর এ মনোভাব থাকতে পারে। রাজনৈতিক ও প্রচারক হিসেবে সাধারণ মুসলমানের কাছে বঙ্কিমের উপন্যাসের এক একটি ব্যাখ্যাও শিরাজীকে দিতে হয়েছিল। এ ব্যাপারে একটি সঙ্গে যেমন তাঁর রচিত উপন্যাস, তেমনি উপন্যাস সম্পর্কে সাধারণ বক্তৃতাও এ প্রসঙ্গে বিচার্য।[১] শিরাজীর এসব বক্তব্যের গুরুত্ব আপেক্ষিক, তিনি সম্ভবতঃ হিন্দুদের বিকল্প হিসেবে আদর্শবাদী উপন্যাস চেয়েছিলেন, উপন্যাসের একেবারে পক্ষপাতী ছিলেন না তা ঠিক নয়।

উপন্যাসের জনপ্রিয়তা শিরাজীর কল্যাণ চিন্তাকে বিচলিত করেছিল। তিনি লক্ষ্য করেন, আধুনিক সাহিত্যে মানব চিত্ত ও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে উপন্যাস অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম, কিন্তু সেই একই সঙ্গে এর অশুভ প্রভাব তরুণ চিত্তকে কলুষিত করতেও সক্ষম। উপন্যাস যদি সামাজিক কল্যাণের আদর্শ সৃষ্টি করতে না পারে তবে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশী, সুতরাং সর্বতোভাবে উপন্যাসের প্রভাব বর্জন করে চলাই শ্রেয়। প্রত্যক্ষ সত্যটিও তাঁর স্মরণে ছিল, বঙ্কিমের উপন্যাসসমূহ হিন্দুর সমাজগঠনে যেমন সহায়ক হয়েছে তেমনি অন্যদিকে মুসলমানের হীনমন্যতাবোধও সৃষ্টি করেছে। এ কারণেই তিনি হিন্দু ও মুসলমানের ভাষাকে পৃথক করে দেখেছেন, কিন্তু সাহিত্যের উত্তরাধিকারকে নয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অগ্রাধিকার দাবী করেছেন, শিক্ষা, অর্থনৈতিক এবং অন্য সব ক্ষেত্রে অসমান অবস্থার জন্য খেদ করেছেন, হিন্দুর তুলনায় মুসলমান সাহিত্যিকের ধর্মবুদ্ধি অনেক বেশী। মুসলমান সমাজকে সম্পদ অর্জন এবং সাহিত্য সেবা

১। পূর্ব, চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদির মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে, এক্ষেত্রে যে কোন রকমের দুর্বলতা প্রায় আত্মহননের সমতুল্য। সুতরাং মুসলমান সাহিত্যিকদের জন্য যুগোপযোগী হল জ্ঞান বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, চিন্তামূলক প্রবন্ধের চর্চা, উপন্যাসের মাধ্যমে চলতে পারে, কিন্তু বলেছেন উপন্যাসিকের হাতে অকল্যাণের আশঙ্কা বেশী। উপন্যাস আত্মবিস্মৃতি আনে, এবং জাতীয় জীবনের দুর্যোগময় মুহূর্তগুলোতে যে কোন রকমের আত্ম-বিস্মৃতি স্বাধীনতার অন্তরায়। অগ্রসর হিন্দুকে অনুসরণ করে অনেক মুসলমান সাহিত্যিক জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিস্মৃত হয়ে পড়েছেন, এ ব্যাপারে তিনি তাঁদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তবে হিন্দুর রচিত কুৎসামূলক উপন্যাসের প্রত্যুত্তর দানের জন্য উপন্যাস রচনাকে তিনি সমর্থন করেছেন, তার কারণ এর ফলে হিন্দু এ ধরণের গ্রন্থ আর লিখবে না এবং "তদ্দ্বারা হিন্দু মোছলমানে একতা স্থাপিত হইবে।" জাতীয় স্বাধীনতার জন্য হিন্দু মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী, এবং এ ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্বেষমূলক সাহিত্য প্রতি-রোধ ও সৎ সাহিত্যের প্রসার আবশ্যক। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক কল্যাণ চিন্তা হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের নিকট তিনি সম্প্রসারিত করেছেন, সিরাজীর সাহিত্য চিন্তার এটা অন্যতম বিশেষত্ব। মুসলমানদের জন্য এমন উপন্যাস চেয়েছেন যেখানে মুসলমানদের শৌর্য বীর্যের প্রকাশ ঘটবে, তারা ঐতিহ্য সচেতন হয়ে উঠবে, এটা কেবলমাত্র মুসলমান উপন্যাসিকদের দ্বারাই সম্ভব। এজন্য তিনি মুসলমানদের দ্বারাই "সমগ্র ইতিহাস, উপন্যাস কাব্য দর্শন, বিজ্ঞান ও প্রবন্ধ"[১] লিখিত হবার আশা করেছেন। অন্যত্র নূর পত্রিকায় উপন্যাসের "সৌগন্ধ" চেয়েছেন, প্রকাশও করেছেন। সিরাজীর নিজের উপন্যাসও প্রাসঙ্গিক ভাবে স্মর্তব্য। কেবল উপন্যাস নয়, কবিতার ক্ষেত্রেও অনুসরণযোগ্য আদর্শ মোটামুটিভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং উপন্যাসের মত জাতীয় চিন্তামূলক কবিতা রচনাও করেছেন।[২]

মুসলমান সাহিত্যিকদের সাধনক্ষেত্রে এগিয়ে আসবার জন্য তিনি বারবার আহবান জানিয়েছেন। কেননা, জাতীয় প্রয়োজন মুহূর্তে তাদের সহায়তা সবচেয়ে বেশী কাম্য।[৩] মুসলমানের জন্য বিশেষভাবে "লেখনী ও রসনা অর্থাৎ লেখনী শক্তি ও বক্তৃতা শক্তির আবশ্যকতা" পুনরুচ্চারণ করেছেন।

কেবলমাত্র সখ মেটাবার জন্য তিনি সাহিত্য চর্চা অনুমোদন করেননি, এর সঙ্গে সামাজিক দায়িত্বের প্রশ্নও এসে পড়ে। "পবিত্রতম মাতৃপ্রতিম বঙ্গভাষাকে চরিত্রহীন কুৎসিত স্বভাব উপন্যাসিক এবং ভন্ড কবিকুলের"[৪] হাত থেকে রক্ষার জন্য 'মুসলমান সাহিত্য সেবকগণ'কে আহবান জানিয়েছেন। কিন্তু

১। সাহিত্য ও জাতীয় জীবন, সূচিনা, পৃঃ ১১০।
২। পূর্বে, চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৩। সাহিত্য শক্তি ও জাতি সংগঠন, সূচিনা, পৃঃ ৩০-৩৪।
৪। সাহিত্য ও জাতীয় জীবন, সূচিনা, পৃঃ ১০০।
৫। সাহিত্য শক্তি ও জাতি সংগঠন, সূচিনা, পৃঃ ৩৯-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের তুলনায় অনগ্রসর মুসলমান সাহিত্যিকদের এ ব্যাপারে দায়িত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী। তা সত্ত্বেও তিনি লক্ষ্য করেছেন, ত্রিশ বছর আগে হিন্দু সমাজে যে পরিমাণ শিক্ষিতের হার ও উদ্যমের সাহিত্য চর্চা ছিল, তাঁর সমকালে শিক্ষিত মুসলমানের হার সেকালের হিন্দুর তুলনায় দ্বিগুণ হলেও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয়নি। এর কারণ হিসাবে সিরাজী লিখেছেন, "আমাদের শিক্ষিত লোকদিগের প্রাণের স্পন্দন ও ভাবের প্রবাহ নিতান্তই দুর্বল ও ক্ষীণ।" এ ছাড়া রয়েছে "কেবল আলস্য ও কঠোর ঔদাস্য"। এটা অবশ্যই পরিহার্য, এ ছাড়া পরিত্রাণ নেই। মুসলমান যে কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর সময় পান না, কিন্তু "এই শ্রেণীর ফুরসৎ-হীন দায়িত্ব নিগড়বদ্ধ প্রাণীরাই হিন্দুদিগের মধ্যে সাহিত্যের পত্তন ও গঠন করিয়াছে।" প্রধান বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু, চণ্ডীচরণ, যোগীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ।[1]

মুসলমানদের মধ্যে পাঠ বিমুখতা রয়েছে, তিনি লক্ষ্য করেছেন হযরত মোহাম্মদের(দঃ) জীবনী সম্পর্কে রচনা প্রতিযোগিতায় তাঁর ঘোষিত পুরস্কারের জন্য প্রাপ্ত পাঁচটি রচনার মধ্যে চারটি হিন্দু ছাত্রের এবং একটি মাত্র মুসলমান ছাত্র লিখিত। এদের মধ্যেও প্রথম এবং দ্বিতীয় পুরস্কার লাভের গৌরব দুজন হিন্দু ছাত্র অর্জন করে।[2] সিরাজীর মতো নওয়াব আবদুল লতিফও প্রায় একই রূপের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন।[3]

সাহিত্য চর্চার অভাবে মুসলমান পিছিয়ে পড়ছে, অন্যদিকে হিন্দু জাতীয় সংগ্রামে অগ্রসর। সাহিত্যের মাধ্যমেই মুসলমানদের জড়তা কাটিয়ে তিনি উপযুক্ত করে তুলতে চেয়েছেন। সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের অধিকার সত্তায় মুসলমানদের উপযুক্ত করে তোলাই হচ্ছে সিরাজীর সাহিত্য চিন্তার যোগফল।

শিক্ষা

এক

সিরাজীর সাধারণ শিক্ষা এবং নারী শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করেছেন, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর লক্ষ্য ছিল সামাজিক কল্যাণ সাধন।

সিরাজীর সামনে ছিল মুসলমান সমাজ, প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের প্রসংগও প্রায়ই এসেছে মুসলমান সমাজকে উন্নত করে তোলার উপায় হিসাবে। মুসলমান সমাজকেও তিনি ধারাবাহিকতা সহ

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১-০২।
৩। পূর্বে, পৃঃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository

বুঝেছেন, মুসলমান সমাজের অতীত শিক্ষার গৌরব কথা এখানেও বলেছেন, কিন্তু শিক্ষা প্রসংগে শিরাজীর দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই আধুনিক এবং যুগোপযোগী। শিক্ষাকে তিনি আধুনিক জীবনের অভিব্যক্তি মনে করেছেন। ইতিহাস আলোচনা করে শিরাজী দেখেছেন, শিক্ষা ও সম্পদ পারস্পরিক নির্ভরশীল এবং শিক্ষা ও সম্পদের সমন্বয়ই সামাজিক অগ্রযাত্রা অপ্রতিহত করে তুলতে পারে।

শিরাজী নিজে কখনো মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেননি। তিনি ইংরেজী স্কুলে পড়েছেন এবং সে স্কুলও হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তাঁর একাডেমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বলা যায়, গৃহে ইসলামী পরিবেশ এবং স্কুলে মিশ্রিত সংস্কৃতির পরিবেশ। এ অবস্থায় কেবলমাত্র স্কুলে অধ্যয়ন করে ইসলাম ধর্ম ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সুশিক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না, তিনি সেভাবে তা পাননি। ইসলাম ধর্মের সংগে তাঁর অধিকতর সংযোগ প্রচারক জীবনের ফল এবং সে সংযোগও শুরু হয়েছিল স্কুলে অধ্যয়ন কালে। সেজন্য দেখা যায়, ইসলামের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ দেখালেও তার মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ হয়ে যাননি, প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গী কখনো বিসর্জন দেননি।[১] এমন কি বিভিন্ন স্থানে হযরত মোহাম্মদের (দঃ) যে সব উক্তি সংকলন করেছেন সেখানে ধর্মপালনের চেয়ে জ্ঞান অর্জনকে উপরে স্থান দিয়েছেন।

সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি মুসলমানদের ধর্ম শিক্ষাকে অবহেলা করেননি, অত্যাধিক গুরুত্বও দেননি। মুসলমান সমাজের প্রধান সমস্যাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন ধর্ম শিক্ষা নয়, বরং বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস শিক্ষার অভাব হিসাবে। প্রতিবেশী হিন্দু সমাজকে তিনি এভাবে দেখেছেন, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রভাবে তাঁরা জীবন সংগ্রামের উপযোগী হয়েছেন, নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকেই পরিবর্তিত করে তুলেছেন। বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শন শিক্ষায় উন্নত হিন্দু সমাজের সংগে ধর্মবোধ যুক্ত হবার ফলে ভারতীয়, বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুর সমাজ-জীবন পরিশীলিত হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে মুসলমানদের ক্ষেত্রে অবিরত ঘটেনি। একদিকে মোল্লা মৌলবীদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন, অন্যদিকে মুসলমানদের ------ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তাঁদের জ্ঞান চর্চার অতীত ইতিহাস[২] তুলে ধরে তাঁদের পথকে আলো দান করে তুলতে চেয়েছেন। একদা মুসলমানদের সমৃদ্ধ অতীত ইউরোপকে জ্ঞান বিজ্ঞান, দর্শন শিক্ষা দিয়েছে, কিন্তু ইউরোপ এখন নিজস্ব আলোকধারা সৃষ্টি করে নিয়েছে। তারা এখন সমৃদ্ধতর, সুতরাং তাদের নিকট থেকে আধুনিক শিক্ষাকে গ্রহণ করা আবশ্যক। বলা বাহুল্য, তিনি ইংরেজকে

১। পূর্বে, দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
২। (ক) মোসলেম মাহমুদ, প্রচারক, ফাল্গুন, ১৩০৬।
(খ) প্রাচীন মুসলমানদের জ্ঞান চর্চা ও মুসলমান সুধীমন্ডলী, ইসলাম প্রচারক, শ্রাবণ-ভাদ্র ও আশ্বিন, -কার্তিক, ১৩১০।

ভাষার মধ্যে আরবীকে প্রয়োজন মনে করলেও ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, রুশ ভাষা, অর্থাৎ যেসব ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান বৃহত্তর মানুষের কাছে এসে পৌঁছেছে তাকে অধিকতর প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। মুসলমান জাতির কখনো এরকম উন্নত অবস্থা হলে তখনই আরবী ভাষা চলতে পারে তার আগে নয়।[1] যেসব ভাষা চর্চার মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞানের সুফল জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেয়া সম্ভব, সে ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলেও মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি ছিলেন নিঃসংশয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাশ হবার পর তিনি বলেছেন, "কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ন্যায় ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বাংলা ভাষা পড়ানো Compulsory - করা হয় নাই। ইহাতে বাংলা ভাষা চর্চার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত হইবে। মাতৃভাষার বিপুল চর্চা এবং মাতৃভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলন ব্যতীত জাতির মঙ্গল সুদূর পরাহত।"[3] ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিরাজীর মানসিক মুক্তিচিন্তার পরিচয় এখানে পাওয়া যায়, বিদেশী ভাষার আধিপত্যের অংশ থেকে সমাজ প্রগতিটুকু পৃথক করে নিতে পেরেছেন। সাহিত্যে কল্যাণ চিন্তার ফলে

১। "আল্লাহতালাকে হাজার ধন্যবাদ যে, এ যাবৎ কোনও দিন নূতন মাদ্রাসা খুলিবার পরামর্শ দেয় নাই। যে শিক্ষা দুর্বলতার জন্মদাতা, সেই শিক্ষাকে ব্যাহত করা, মহাপাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে।"--- দ্রঃ সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মোসলেম মহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, ইসলাম-দর্শন, ভাদ্র, ১৩৩১।

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূর্ণতা, চিন্তার ধারা, নূর, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৬।

৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চিন্তার ধারা, নূর, বৈশাখ, ১৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

ঘৃণা করতে শিক্ষা দিয়েছেন কিন্তু ইংরেজের বিদ্যাকে নয়, বরং ইংরেজের জ্ঞান চর্চাকে যথাযথ অনুশীলন করে সামাজিক উন্নয়নের পথ অনুসন্ধান করতে বলেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশী দ্রব্য বর্জনের সঙ্গে বিদেশী শিক্ষা বর্জনও চলছিল। বিদেশী শিক্ষার ব্যবহার সম্পর্কেও শিরাজীর কোন ক্ষোভ ছিল না, বিদেশী শিক্ষার মাধ্যমে এদেশবাসীদের পরিপূর্ণ মানুষ করে তোলারই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু বিদেশীদের গোলাম নয়।১ যে শিক্ষা মানুষকে ইংরেজের গোলামীর উপযুক্ত করে তোলে, পরনির্ভর করে দেয়, চাতুরীগত গ্রহণে পরিণত করে তা অবশ্যই বর্জনীয়। কিন্তু সেই একই সঙ্গে ইংরেজের দর্শন ও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা অবশ্যই অনুসরণ করা আবশ্যক। শিরাজী দেখেছেন, কি বাহুবল নয়, এই জ্ঞান বিজ্ঞানের কারণেই ক্ষুদ্র দ্বীপের শ্বেতদ্বীপবাসীরা ভারতে ও বিশ্বের বহু অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছে। একদা মুসলমানরাও এরকম সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিল। মুসলমানরা যে সময় জ্ঞানবিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ অগ্রসর ছিল, কিন্তু সে গৌরবসূর্য এখন আর মধ্যগগনে নেই।

আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত জাতিসমূহের ভাষা শিক্ষাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বিদেশী

সীমাবদ্ধতা থাকলেও সিরাজী এখানে অনেক অগ্রসর, যুক্তির চেয়ে স্রষ্টা নিজেই অনেকদূর অতিক্রম করে এসেছেন, এমন কি সমকালীন বৃহত্তর মুসলমান সমাজ থেকেও কোন কোন দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে।

সিরাজীর শিক্ষা চিন্তার মধ্যে ডিগ্রী অর্জন নয়, বরং মনুষ্যত্ব অর্জন, প্রাধান্য পেয়েছে। এ জন্য মুসলমান সমাজের বাস্তব প্রয়োজনের কথা মনে রেখে দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছেন। তাঁর লক্ষ্য হল বর্জন/নয়, গ্রহণ, এবং এ গ্রহণ ক্ষমতাকে যত বাড়ানো ও বিচিত্রমুখী করা যায়, জাতি-[illegible] করে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সংযোগের সেতু ক নির্মাণ করে দেয়া যায়, সেটাকেই সিরাজী সমাজ গঠনের উপযোগী বলে মনে করেছেন।

গৃহীত শিক্ষার ফলে সমাজের কি কল্যাণ সাধিত হবে সে ভাবেই তিনি শিক্ষার মূল্যায়ন করেছেন। ফলে সেবামূলক কাজেও তিনি শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এবং যে শিক্ষা সমাজের জন্য বহির্দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় তাকে নিঃসংকোচে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থেকেছেন। ইংরেজের জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষাকে প্রকৃতপক্ষে তিনি ইংরেজের নিকট থেকে মুক্তির উপায় হিসেবেই দেখেছেন।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্য করেছেন, নিম্ন পর্যায়ের এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের অবস্থা প্রায় বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত। মুসলমান ছাত্র সংখ্যা প্রাথমিক পর্যায়ে বেশী থাকলেও পরে কমে যায় তার কারণ সীমাহীন দারিদ্র্য। তাদের সাহায্য করার মত কোন ফাণ্ড নেই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।[1]

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ দারিদ্র্য, বিভিন্ন সূত্রেই এটা জানা যায়।[2] এর সমাধানের চেষ্টাও হয়েছে। সিরাজী এ ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী না হয়ে মুসলমান সমাজের নিজস্ব শক্তির ওপরেই নির্ভর করেছেন। তিনি দেখেছেন, মুসলমান সমাজের বেশীরভাগ হল গরীব দরিদ্র কৃষক, এদের অর্থ ও শ্রমেই প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়েছে। উচ্চশিক্ষার আংশিক খরচও তারা দিতে পারে, মুসলমান ছাত্রদের পান সিগারেট ও জলপানি খরচের অর্থ এজন্য প্রদানের প্রস্তাব করেছেন। এ ছাড়া জেয়াফত, কোরবানী ও ঢাকাদের অর্থও দেয়া আবশ্যক। উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের অভাব মুসলমান সমাজের পতনের অন্যতম কারণ, নব্য যুবকগণ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে মুসলমান সমাজের উন্নতির পথ প্রশস্ত করে দিতে পারে। তাদের কেবলমাত্র ধর্মশিক্ষা কিংবা বাস্তব প্রয়োজনহীন শিক্ষা হলে চলবে না, এর সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদির সংযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।[3]

১। মুসলমান ছাত্রবৃত্তি, নূর, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।
২। পূর্বে, পৃঃ ৮-৫, ১৬-১৫।
৩। মুসলমান ছাত্রবৃত্তি, নূর, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক শিক্ষার প্রতি তিনি আহবান জানিয়েছেন, কিন্তু জীবন সম্পর্কহীন ও ঐতিহ্য বোধহীন শিক্ষা কোন কল্যাণ আনতে পারে না সে ব্যাপারে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন।[১] শিক্ষা ক্ষেত্রে ত্রুটির ফলে অনেকেই আত্মমর্যাদা লাভের পরিবর্তে তা হারিয়ে ফেলেছে, "পূর্বপুরুষের ব্যবসায় বা জীবিকার প্রতি তাহাদের ঘৃণা সঞ্চিত হইতেছে। কৃষকের ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া আর কৃষিকার্য্যকে সম্মানের চক্ষে দেখে না।"[২] মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীও একই প্রকার ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।[৩] শিরাজী ঐতিহ্য ভাবধারা পুষ্ট আদর্শবাদী সাহিত্যিক ছিলেন, তিনি উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে মুসলমানদের হীনমন্যতাবোধ দূর করে আধুনিক মনন শক্তির অধিকার দান করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রতি-যোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টির মাধ্যমে অগ্রসর হতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেছেন, স্বাধীন জাতির তুলনায় পরাধীন জাতির পথ আরো পৃথক হওয়া উচিত।[৪] তিনি মুসলমান সমাজকে ক্রমেই বাস্তবের মুখো-মুখি নিয়ে এসেছেন, সংগ্রামের স্পৃহা শক্তি ও প্রেরণা দান করেছেন। পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে শক্তি চাই, এবং আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শক্তি সাধনাকে অগ্রসর করে তোলা সম্ভব। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিবেশী উন্নত হিন্দুর সংগে তিনি যেমন তুলনা করেছেন তেমনি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানের দৃষ্টান্তও উল্লেখ করেছেন।[৫] "বাংলায় হিন্দুদেরও শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ আছে, কিন্তু মুসলমানদের তা নেই। শিক্ষা-ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতা তাদের আত্মবিস্মৃতির পথই প্রশস্ত করবে। এ কারণে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে মুসলমানদের সুপ্রয়োগ করে তোলাই ছিল শিরাজীর শিক্ষা বিষয়ক চিন্তার মূল কথা, এ ক্ষেত্রে বাংলা শিক্ষিত হিন্দু এবং আলীগড় কেন্দ্রিক শিক্ষিত মুসলমান তাঁর দৃষ্টান্ত স্থল।

দুই

স্ত্রী জাতির শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে তিনি সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের সামাজিক অগ্রগতির অনিবার্য পরিমাপক বলে মনে করেছেন। স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে শিরাজীর বক্তব্য সমকালে ঠিক নতুন না হলেও অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, মার্জিত, স্পষ্ট, প্রত্যয় এবং প্রভাবসৃষ্টিকারী। এর সবচেয়ে বড় দিক হল, বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সামনে নিয়ে শিরাজী তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন, এবং বৃহত্তর মুসলিম সমাজে তা প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছেন। বস্তুত, শিরাজীর সমকালে শতাব্দীক মুসলমানদের সংগে শিক্ষিত সমাজের পরিচয় ঘটেছে, পাশ্চাত্য দর্শন সাহিত্য ইত্যাদি অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষিত ও আলোকিত শ্রেণীর

১। শিক্ষার পরিণাম, ছোলতান, ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৩০।
২। প্রাগুক্ত।
৩। Vernacular Education in Bengal, pp.29-30.
৪। শিক্ষার পরিণাম, ছোলতান, ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৩০।
৫। জাতীয় কলেজ, নূর, মাঘ, ১৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

নিকট নারী পুরুষের সমান অধিকার মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমান সমাজে সুশিক্ষার অভাবে তাদের সে অধিকার বোধ ছিল সংকুচিত। মুসলমান সমাজের এ সমস্যা থেকে তিনি উত্তরণ ঘটাতে সহায় সহায়তা করেছেন, স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা ইত্যাদি আন্দোলনের মাধ্যমে নারীর আইনগত, ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থানকে তিনি তাদের নিকট ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এ জন্য বক্তৃতা দিয়েছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, এমন কি উপন্যাসও এ মতাভিসারী করেছেন, যেখানে নারীর স্বাধীনতা পুরুষের সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে।

শৈশব ও কৈশোরে মাতার নিকট থেকে রমণী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কর্মজীবনে এর সঙ্গে বাস্তবতার সংযোগ ঘটেছিল।[১] তিনি মুসলমানদের জীবন যাত্রা অতি কাছাকাছি থেকে উপলব্ধি করেন যে নারীর উপযুক্ত শিক্ষার অভাবেই সামাজিক অগ্রগতির সম্ভাবনাটুকু বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হিন্দুর সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে মুসলমানের তুলনা করে নারী জাতির দুর্গতিকে মুসলমানদের সমষ্টিগত দুর্বলতার অন্যতম কারণ বলে অনুভব করেছিলেন। সিরাজীর এ অনুভব আন্তরিক ছিল বলে সমস্যাটিকে তিনি দূর করার সাধ্যমত চেষ্টাও করেছিলেন।

'স্ত্রী শিক্ষা' নামে প্রকাশিত গ্রন্থটি বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতির কলিকাতাস্থ তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১৯ সালে এবং বর্ধিত ~~তৃতীয়~~ সংস্করণ ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের পরে স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ বর্ধিত সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্ধিত সংস্করণে বক্তৃতা অংশে তিনি কিছু পরিবর্তনও করেছেন, এ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মুসলমান সমাজের আরো কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করেছেন। রচনায় হল, বক্তৃতা ছাপার সময় দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর চিৎকার চিৎকার, করতালি ধ্বনি, মহা আনন্দ ধ্বনি, আনন্দ সূচক কলরব, শেম শেম, আনন্দধ্বনি, চতুর্দিকে উচ্চহাস্য এবং আনন্দ ধ্বনি, উচ্চহাস্য ইত্যাদি বক্তৃতার অংশ হিসাবেই প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়েছে।

সিরাজী মনে করেছেন "পুরুষ সমাজের দেহ এবং মাতৃজাতি সেই দেহের আত্মা।"[২] কেবলমাত্র দেহধারণ, দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি যথেষ্ট নয় সেই সঙ্গে আত্মার বিকাশের প্রতিবন্ধকতাকে দূর করতে হবে। কেননা, মানুষের সম্পূর্ণতার পরিচয় হল তার দেহ ও আত্মার সম্মিলিত রূপ। শাস্ত্রানুসারে স্ত্রী জাতির মর্যাদা পুরুষের সমান, কিন্তু মুসলমান সমাজে স্ত্রী জাতি এখন যেমন অবহেলিত তার কোন সংগত কারণ নেই। কেবল শাস্ত্রবাণী নয়, রমণীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য লেখক অতীত ইতিহাসের দিকে ফিরে

১। পূর্বে, দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২। স্ত্রী শিক্ষা, বর্ধিত ~~চতুর্থ~~ সং, পৃঃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছেন, বিবি রহিমা[১] ইসলামে বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রথম ব্যক্তি-"বেহেশতের দেবী"র মুক্তাদু সংগ্রহ করেছেন। স্ত্রী জাতির মধ্যে কোন পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করেননি, প্রতিপক্ষের এ যুক্তির সমর্থনে তিনি বলেছেন, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরদ্রোহী শয়তানও কখনো জন্মগ্রহণ করেনি।

স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সমকক্ষ হিসাবে দাঁড়ার করে নিয়ে সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেখেছেন, পুরুষ প্রধান ও পুরুষ শাসিত সমাজে স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা ও স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ বলেই তারা পুরুষের তুলনায় পশ্চাৎপদ। অথচ একদা মুসলমান রমনীরা কেবলমাত্র গৃহে নয়, সমরক্ষেত্রেও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। এখন তাঁরা সুযোগের অভাবেই পশ্চাৎপদ, সমাজের বর্তমান অবস্থায় পুরুষের বিশেষ উদ্যোগ ছাড়া নারীদের অনগ্রসরতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়, অন্যদিকে তাঁদের অংশগ্রহণ ছাড়া সামাজিক উন্নতিও প্রকৃত অর্থহীন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা শিরাজীকে পীড়িত করলেও তিনি হতাশ হননি।

নারী পুরুষের অসম অবস্থাকে তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন, পুরুষ যখন সামাজিক উন্নতির প্রসংগ নিয়ে বিতর্কে রত, "আমাদের রমনীকুল তখন অন্তঃপুরের অন্ধ কোটরে অজ্ঞানতা এবং মূর্খতার পান সাজিয়া অথবা অলংকার ও পানচূর্ণ লইয়া মহা কোলাহল উপস্থিত করিয়া থাকে।"[৩] এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় হল স্ত্রী শিক্ষা দান। সন্তানের শিক্ষা শুরু হয় তার জন্মের দীর্ঘকাল আগে থেকে। নজীর হিসাবে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট-এর মাতার প্রসংগ এবং হজরত মোহাম্মদ(দঃ) এর উপদেশাবলীর ব্যাখ্যা তিনি এভাবে দিয়েছেন, "আদর্শ মাতার আদর্শ জীবন ও উপদেশই কেবল সন্তানকে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী করতে পারে।"[৪] মুসলমানরা এখন "ঘোরতর অদৃষ্টবাদী হইয়া পুরুষকার, যত্ন এবং অধ্যবসায়কে দূরে নিক্ষেপ"[৫] করেছে কিন্তু এটা থেকে মুক্তি আবশ্যক।

ইংরেজদের বিশ্বব্যাপী সাফল্যের মূল কারণ হিসাবে তিনি দেখেছেন মাতৃজাতির শিক্ষা। কেবলমাত্র অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজের শিক্ষা তাঁদের জন্য সবটুকু নয়, তা হলে প্রায় শতাধিক বছর একই শিক্ষা পেয়েও ভারতবাসীর তেমন উন্নতি হয়নি কেন?

১। আদর্শ সতী বিবি রহিমা, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩১৪।

২। স্ত্রী শিক্ষা, পৃঃ ৪-৫।

৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

৪। প্রাগুক্ত, বর্ধিত সংস্করণে সংযোজিত অংশ, পৃঃ ১১।

৫। প্রাগুক্ত, সংযোজিত অংশ, পৃঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

অবরোধ প্রথাকে পাপকর্মের সমতুল্য মনে করে বলেছেন, "পৃথিবীতে মানুষের স্বাধীনতা-হরণের ন্যায় পাপ কার্য আর কিছুই নাই।"[১] এবং "স্ত্রী জাতির অবরোধ প্রথা এই মুক্তি ও জীবন রক্ষার ভীষণ [illegible] প্রতিকূল, সুতরাং সাক্ষাৎ ঈশ্বরদ্রোহিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।"[২] অবরুদ্ধ অবস্থা সুস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এবং দুর্বল মাতা দুর্বল জাতির জন্মদাত্রী। প্রতিযোগিতা ছাড়া কোন উন্নতি হয় না, এবং স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির অন্যতম উপায় হল বিদ্যালয়ে মেয়েদের শিক্ষাদান। মুসলমানদের অতীত ইতিহাস আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন সে সময় পর্দা ছিল কিন্তু অবরোধ ছিল না। পুরুষ বাহিত পালকী চড়ে অবরুদ্ধ অবস্থায় মেয়েদের চলাফেরাকে শিরাজী নিন্দা করেছেন,[৩] বেগম রোকেয়াও এ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে মন্তব্য করেছেন।[৪] শিরাজী আরো একটু অগ্রসর হয়ে ইউরোপীয় রমণীদের সুস্থ অবস্থার সংগে তুলনা দিয়ে বাংলায় মুসলমান রমণীদের করুণ অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। শিরাজী দেখিয়েছেন, মুসলমানদের মধ্যে অবরোধ প্রথা হিন্দুর সংগে সামাজিক মিশ্রণের ফল।[৫] পরবর্তী-কালে অশিক্ষিত মোল্লা মৌলবীদের অপব্যাখ্যার ফলে অবরোধ প্রথা ধর্মের অংশ বলে পরিগণিত হয়ে উঠেছে। শিরাজী হিন্দুকে যেমন আক্রমণ করেছেন, অশিক্ষিত মোল্লা মৌলবীদের বিরুদ্ধেও একই ভূমিকা পালন করেছেন।[৬] অবরোধ প্রথা মুসলমান সমাজে প্রচলিত থাকলেও এভাবে এর একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, প্রথাটি মুসলমান সমাজে বহিরাগত, এবং এটা প্রমাণিত হলে মুসলমানের জন্য এ বর্জন করা সহজ হবে। শিরাজী হিন্দু সমাজকে আক্রমণের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেননি, এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা, পাশাপাশি মুসলমান সমাজেও কশাঘাত করে, যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দান করে অবরোধ প্রথা বর্জনের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মুসলমান সমাজের নিজস্ব ত্রুটি নিরাময় [illegible] করার দিকেই তাঁর অধিকতর লক্ষ্য ছিল। মোল্লা মৌলবীদের সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে শিরাজী সচেতন ছিলেন, কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে প্রায় ক্ষেত্রেই সামাজিক উন্নতি ব্যাহত হয় বলে একদিকে আধুনিক শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন, অন্যদিকে মোল্লা মৌলবীদের প্রভাব খর্ব করার কথাও বলেছেন।

১। স্ত্রী শিক্ষা, পৃঃ ৩৪।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯-৪০।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০।
৪। মতিচুর, রোকেয়া রচনাবলী, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৩, পৃঃ ১৯-৬২।
৫। স্ত্রী শিক্ষা, পৃঃ ৫২-৫৩।
৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫-৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাভাবিকতার মধ্যেই বিকাশ সম্ভব, তিনি স্বাভাবিক গুণেই মানুষের পূর্ণাঙ্গতা কামনা করেছেন। অবরোধ প্রথা এ স্বাভাবিকতার বিপরীত, কেননা, পাপকর্ম নিভৃতে হয়, ঠিক প্রকাশ্যে নয়। নিজেদের মনের শক্তিতে স্ত্রী জাতি ধর্মানুরাগিনী বা সতী পরায়ণ না হলে তিনি জবরদস্তি করার পক্ষপাতী নন।[১] স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য আবশ্যক সুস্বাস্থ্য ও ব্যায়াম চর্চা, এবং পরিত্যাজ্য বাল্য-বিবাহ, এ ব্যাপারে সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। বাল্যবিবাহ সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন সময়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন। শিরাজী বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জাতীয় জীবনে নারীর অংশ-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী, কেননা, "মাতা যদি দেশ হিতৈষিনী হয় তাঁহার সন্তানের পক্ষে দেশদ্রোহী হওয়া কঠিন ব্যাপার।"[২] তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাংলায় অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমান এ ব্যাপারে উদাসীন।[৩] মুসলমানদের আহবান জানিয়ে বলেছেন, "হে মূর্খ ও অন্ধ মোসলমান! আজই তুমি কংগ্রেস ও কনফারেন্সে ভিন্ন জাতীয় নারীর সম্মুখে দাঁড় করিবার জন্য তোমার নারী খুঁজিয়া পাইতেছ না। দুদিন পরে তোমার গতি কি হইবে? আজ অন্য জাতির নারী আসিয়া যেমন রাজনৈতিক মঞ্চ দখল করিতেছে সেখানে আমাদের নারীরা যদি সে রাজনৈতিক মঞ্চ দখল করিতে না পারে তাহা হইলে এ অগৌরবের, এ হীনতার এ দারিদ্র্যের সীমা আছে কি?—

অবশ্য সকল কার্য্যেই পরিচ্ছেদের সীমার মধ্যে থাকিয়া করিতে হইবে এবং এসলাম ধর্মে ইহার জন্য প্রকান্ড ক্ষেত্র বিদ্যমান।"[৪]

নারী শিক্ষার ব্যাপারে শিরাজী কেবলমাত্র মানবিক মানবতাবোধকে নির্ভর করেননি, তিনি সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়েও অগ্রসর হয়েছেন। এ লক্ষ্য হল, সর্বপ্রকারে মুসলমানদের জাতীয় জীবনের উপযোগী করে তোলা। উদ্দেশ্য হল জাতীয় জীবন গঠন, উপলক্ষ হল নারীর সর্বপ্রকার মুক্তিসাধন এবং সমাজের পল্লীর অভ্যন্তরভাগে শিক্ষার আলোক ও মুক্তির চৈতন্য জাগ্রত করা। সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ইত্যাদি সকল বিষয়কে দার্শনিকভাবে নির্ভর করে শিরাজীর এ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে, শিক্ষা, নারী শিক্ষা ইত্যাদি যেসবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশমাত্র। নারী শিক্ষা কেবলমাত্র শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সার্বিক মুক্তি অর্জন এর সংগে সম্পর্কিত। সাধারণ শিক্ষা ও স্ত্রী শিক্ষার উভয় ক্ষেত্রেই শিরাজী সমকালীন পটভূমি

১। স্ত্রী শিক্ষা, পৃঃ ৬০।
২। নারী শক্তির উদ্বোধন ও জাতীয় জীবন, সোলতান ১২ই পৌষ, ১৩৩০।
৩। চিন্তার ধারা- স্ত্রী শিক্ষা, নূর, মাঘ, ১৩২৬।
৪। নারী শক্তির উদ্বোধন ও জাতীয় জীবন, সোলতান, ১২ই পৌষ, ১৩৩০।

বিচার করেছেন এবং মুসলমান সমাজের প্রয়োজনের আলোকে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গী কালোপযোগী।

ধর্ম

এক

ধর্ম সম্পর্কে সিরাজীর বক্তব্যও নানা অর্থেই তাঁর সমাজচিন্তার অংশ। ধর্মাদর্শকে তিনি জাতি গঠনের সংগে যুক্ত করেছিলেন বলে ঐতিহাসিক অবস্থা বর্ণনার দিকেই অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ধর্মের ঐতিহাসিক গৌরব বিবৃত করে মুসলমানদের নতুন ভাবে অনুপ্রাণিত করাই ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। তিনি দেখেছেন, একদা ইসলাম ধর্ম যেভাবে যুক্তিগ্রাহ্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিল, সঠিকভাবে উপস্থাপিত করে পুনরায় ইসলামকে সেভাবে ব্যবহার করা যায়। ধর্মবিশ্বাস ও অতীত গৌরবের ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুতির ফলে ভারতের বিশেষত: বাংলায় মুসলমানদের জীবনে অধ:পতন ঘটেছে, সুতরাং তাদের পূর্ব গৌরব স্মরণ করিয়ে দেবার মাধ্যমেই আবার অগ্রগতি সাধন করানো সম্ভব। এজন্য ইসলাম ধর্মের পূর্বগৌরবের প্রসংগে বাংলার মুসলমানদের কথা বারবার তিনি টেনে এনেছেন। এ ছাড়া প্রচারক জীবনে[১] ধর্ম কথার সংগে সম্পর্কহীন হতে পারেননি বলেও সমাজ চিন্তা প্রকাশের ক্ষেত্রে ধর্মব্যাখ্যাকে ব্যবহার করতে হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শাস্ত্রীয় বিতর্ককে মুখ্য করে তোলেননি।

ইসলামের আবির্ভাবকালে আরবের সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা এবং ইসলামের সংস্পর্শে আরবের মরুভূমিতে উল্লেখ্য পরিবর্তন সমূহ লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। প্রাথমিক যুগে ইসলামের সম্প্রসারণের সময় একই সাথে ধর্মপ্রচার এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিরূপে ইসলামের প্রসারকে মনে হয়েছিল ইসলামের সামাজিক রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ হিসাবে। সিরাজী সিরাজীর সমকালে অন্যান্য প্রচারক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ ভারতীয় মুসলমানদের অধ:পতিত অবস্থাকে ভিন্ন প্রেক্ষিতে হলেও ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার সংগে তুলনা করেছিলেন, এবং পরাধীনতাসহ সকল অধ:পতনের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন ইসলামের প্রতি বিশ্বাসের শিথিলতা। তাঁরা বাংলার মুসলমান সমাজের উন্নতির প্রয়োজনে ইসলামকে পুনর্ভাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেন, ঐতিহাসিক ইসলামের পুনরুজ্জীবন এবং ধর্মবিশ্বাসের সংস্কার।

১। পূর্বে, পৃ: ৩৭-৫২।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় খৃষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে মুসলমান প্রচারকদের সংঘাত[১] প্রসংগত স্মর্তব্য। মিশনারীদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে। এদের অর্থনৈতিক অবস্থার সুযোগেই মিশনারীরা প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রচারকদের অন্যতম লক্ষ্যও ছিল মিশনারীদের প্রতিহত করা। এ ছাড়া পরাধীন ভারতবর্ষের গ্লানিও সচেতন সমাজ মানসকে স্পর্শ করেছিল। এরকম বহুবিধ অবস্থার চাপে বাংলায় সাধারণ মুসলমান জনচিত্ত যখন দ্বিধা দ্বন্দ্বে আন্দোলিত, এ সময়েই বিভিন্ন প্রচারক ভেবেছেন, ইসলামের প্রাচীন গৌরবে ফিরে যাওয়া বর্তমান সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। এদের সঙ্গে শিরাজীর একটি বৈসাদৃশ্যও আছে, তিনি ভেবেছেন ইসলামের প্রাচীন গৌরবে ফিরে যাওয়া হয়ত সম্ভব নয়, তবে যুক্তিসংগত পথে ইসলামের প্রাচীন গৌরবকেই বর্তমানে নিয়ে আসা, মুসলমানদের জীবন ব্যবস্থার সংগে যুক্ত করে তোলা সম্ভব এবং তা আবশ্যক। শিরাজীর এ দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক এবং ইতিহাসবোধ সম্পন্ন, কোন কোন দিক দিয়ে ব্যতিক্রমী। ইসলামের পূর্ব কথার উচ্চারণ অবলম্বন করলেও এখানেই তিনি অন্যান্য প্রচারককে ছেড়ে এবং সমকালের অনেক দূর পথটা অতিক্রম করে এসেছেন।

ঐতিহাসিক ইসলামের মূল শক্তি কি? নিঃসন্দেহে একেশ্বরবাদ, এবং তিনি অনুভব করেছেন, এই একেশ্বরবাদের মাধ্যমেও প্রাথমিক যুগে ইসলামের পক্ষে বিস্তৃত সম্ভব হয়েছিল। প্রথম অবস্থায়, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) নিজে এর নেতৃত্ব দান করেন, এবং তাঁর প্রদর্শিত পথে বিশ্বাসী অনুগামীরা ইসলামের ঐতিহাসিক বিস্তারকে সম্পূর্ণ করে তোলেন। ইসলামের অন্তর্নিহিত সাম্যগুণ একে আরো সম্পূর্ণতা দান করেছিল। সাম্যবাদের সঙ্গে ঐক্যবাদের অবস্থান সম্পৃক্ত, অসাম্যই অনৈক্যের প্রসূতি। ইসলাম এ অসাম্য দূর করেছিল বলেও সম্ভবতঃ পৃথিবীব্যাপী ইসলামের বিস্তৃতি সম্ভব হয়েছিল।

শিরাজী দেখেছেন, সমকালীন পটভূমিতে জাতিগঠন কিংবা পরাধীনতা মোচনের জন্য ঐক্যের প্রয়োজন অপরিসীম, মুসলমানদের এ ব্যাপারে উদাসীনতা রয়েছে। কিন্তু ঐক্যবল ছাড়া মানুষের মধ্যে বলের সৃষ্টি হয় না, এবং হযরত মোহাম্মদ (দঃ) নিজে এর সাক্ষী।[২]

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির উত্থান ও পতনের ইতিহাস অনুসরণ করে তিনি দেখেছেন, অর্থনৈতিক অধিকার সবচেয়ে বড় শক্তি। দারিদ্র্য মানুষের মহৎ গুণাবলীর ক্ষতিসাধন করে, মানবতার বিকাশে বাধা দেয়। এটা

১। পূর্বে, পৃঃ ১৫।

২। ইসলাম ও ঐক্যশক্তি, নূর, লালপুর-টেক, ১৩২৬। প্রবন্ধটি পরে মোহম্মদী ৪র্থ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ সংখ্যায় পুনঃ প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সত্য, জাতিগতভাবে তা সমান ভাবেই সত্য। বাংলায় মুসলমান সমাজে দারিদ্র্য দূর করার ব্যাপারে শিরাজী তাঁর প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেন, এটা করতে গিয়ে দেখেন এক ধরনের ধর্মব্যবসায়ীর প্রচারের ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলতার জন্ম হয়েছে। একদিকে তিনি যুক্তি ও বিবেচনা-বুদ্ধিকে জাগ্রত করে দেশের উদাসীনতা দূর করতে চেষ্টা করেন এবং অন্যদিকে মুসলমানদের আলস্য দূর করতে এবং ধর্মপ্রচারকারীদের অদ্ভুত প্রভাব প্রতিহত করতে চেষ্টা করেন। ইসলাম ধর্ম সঠিকভাবে প্রতিপালনের জন্য সম্পদ আহরণের ব্যাপারে শিরাজীর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত হয়েছে।[১] তিনি ইসলাম ধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন প্রয়োজনের আলোকে, এক্ষেত্রে সমকালীন প্রভাব কেবল নয়, অন্যান্য মুসলমান সাহিত্যিকের সাধারণ জগৎ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছিলেন।

পার্থিব জীবনের প্রতি বিমুখ থেকে পরকালের সাধনা করা অর্থহীন। শিরাজী দেখেছেন, বিত্তে পতন ঘটলে চরিত্রগতভাবে হীনদশার সৃষ্টি হয় এবং পতনদশা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। আত্মবিশ্বাস নষ্ট

১।(ক) "ধনবল ব্যতীত জগতে কোন কার্যই সম্পাদিত হইতে পারে না। ইসলাম এই সত্য অতি গভীরভাবে মুসলমানদিগকে শিক্ষা দেয়। ইসলামের পাঁচ ফরজের মধ্যে দুই ফরজ হজ্জ ও জাকাত ধনের উপরেই স্থাপিত। ধনাধিকারী না হইলে হজ্জ ক্রিয়ার ও জাকাত দিবার অধিকারী হওয়া যায় না। অন্যান্য হজ্জ ও জাকাত ধর্মের পঞ্চ আরকানের মধ্যে গণ্য, সুতরাং পূর্ণভাবে ধর্মের আদেশগুলি প্রতিপালন করিতে হইলে হজ্জ করা ও জাকাত দেওয়া একান্ত কর্তব্য।"— এসলামের [illegible], সুচিন্তা, পৃঃ ১৭-১৮।

(খ) "সুদ গ্রহণ হিন্দু ধর্মেও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আশ্চর্য, মনু কুসীদজীবিকে অস্পৃশ্য ও সমাজের বর্জনীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কুসীদ জীবির অন্ন গ্রহণ পর্যন্ত হারাম করিয়াছেন।
ব্রাহ্মণের জন্য পীতবস্ত্র ব্যবসায়ও হারাম করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ যদি পীত বস্ত্রের ব্যবসা করে তবে তাহার জাতিপাত হইবে, এ ব্যবস্থা স্পষ্টভাবেই দিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার, হিন্দু সমাজ এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। বরং হিন্দুরা উক্ত দুই ব্যবসায় মনুর প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া জয়যুক্ত করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু মোসলমান এমন ধর্মপ্রাণ, এমন ধর্মভীরু, ধর্মপ্রাণতায় এমন মত্ত মোসলমান জাতি এমনই জ্ঞানহীন যে, দেশে সুদ দিতে দিতে মোসলমানেরা অতুল মুলুক জোত জমি হারাইয়া পথের ভিখারী হইলেও দেশের জাতির ধন সম্পত্তি স্বজাতির ঘরে রাখিবার জন্য এবং ব্যবসা সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সুদ গ্রহণের আবশ্যকতা প্রতি মুহূর্তেই তীব্রভাবে উপলব্ধি করিলেও ধর্মের সম্মানের জন্য তাহা হারাম বলিয়াই মনে করিতেছে।"---এসলামের শিক্ষা, আল এসলাম, শ্রাবণ, ১৩২৬।

(গ) "পেটের ক্ষুধায় যে ছটফট করে, লজ্জা নিবারণের জন্য যাহার ছিন্ন কৌপিন পর্যন্ত নাই, তাহাকে আর রোজা রাখিতে ও নামাজ পড়িতে উপদেশ দিয়া লাভ কি? তাহাকে একবার পেট পুরিয়া খাইতে দাও। তাহার অন্নকষ্টের অভাব দূর কর, তাহাকে দুই বেলা পরিতৃপ্ত ও পরিতুষ্ট করিয়া তোল,— তাহার পরে বলিও রোজার কথা। আগে তাহাকে আল্লার করুণায় পরিতুষ্ট হইতে দাও। আল্লা মেহেরবান বুঝিতে দাও। তার পরে তাহাকে আল্লার শোকরিয়া আদায়ের জন্য নামাজ পড়িতে বল। তখন সে নামাজের মধ্যে পরম রস পরম তৃপ্তি উপলব্ধি করিবে। তখনই তাহার নামাজ সিদ্ধ হইবে।"---
"আমরা যখন বলি 'হজ্জ' 'জাকাত' ফরজ তখনই বুঝিতে হইবে যে মালদার হওয়া 'ফরজ' অর্থাৎ অপরিহার্য্য কর্তব্য, যেহেতু মালদার না হইলে হজ্জ ও জাকাত করা ফরজ হয় না। যদি কেহ বলেন যে, মালদার হওয়া ফরজ নহে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, হজ্জ ও জাকাতও ফরজ নহে। কিন্তু এরূপ কথা বলিলে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই এক পাগল বলিয়া গণ্য হইবে।"---
"তাই বলি যে মোসলমান। যদি ইহলোক ও পরলোকের কল্যাণ চাও যদি আল্লার 'রহমত' ও রসুলে খোদার 'শাফায়াত' চাও, তাহা হইলে সমস্ত শক্তির দ্বারা অর্থোপার্জনের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিয়া লক্ষপতি, কোটিপতি হও।"— এছলাম ও ধনবল, আল এসলাম, অগ্রহায়ণ, ১৩২৬। প্রবন্ধটি পরে [illegible], ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৩০ সংখ্যায় পুনঃ প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

হয়, এবং যে শূন্যাবস্থার মধ্যে স্বেচ্ছারোপিত বিধি নিষেধ তাদের পিষ্ট করে। সুতরাং প্রকৃত অধঃপতন ঘটে হৃদয়ের অভ্যন্তরে এবং যে পতনের চরিত্র হল অসাধু, প্রথং, রোজা, ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে প্রকৃত ব্যাখ্যার অভাব। মোটামুটিভাবে অজ্ঞানতাকে তিনি ধর্মবোধের অভাবের সংগে সমগুরুত্বীয় করে তুলেছেন, তিনি দেখেছেন, মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাসের প্রতি অনীহা প্রায় অজ্ঞানতা জনিত।

ধর্ম জীবিত মানুষের জন্য, মৃতের জন্য নয়। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব যদি জীবনের চেয়ে মৃত্যুর পথকেই প্রশস্ত করে তোলে তবে সে ধর্ম দিয়ে কি লাভ? এক্ষেত্রে মুর্খদের জন্য নামাজ রোজার প্রয়োজন আছে কিনা প্রশ্ন তুলেছেন, সৃষ্টিকর্তার করুণা উপলব্ধির আগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন আছে কিনা তা বিবেচনা করে দেখার জন্য আহবান জানিয়েছেন।

মুসলমানের জন্য পরলোক সম্পর্কে তিনি সন্দিহান হননি, কিন্তু ইহলোকের ভোগ পরিত্যাগ করে পরলোকের প্রতি আকৃষ্টবোধ করেননি, মনে করেছেন, ইহলোকে ঐশ্বর্য না থাকলে পরলোকেও মাল তা জুটবে না। মুসলমানদের মধ্যে এক শ্রেণীর প্রচারক ইসলাম ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ইহলোকে সম্পদ ও ক্ষমতা অর্জন সম্পর্কে বিমুখ করে তুলেছেন, এদের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য সিরাজী ধর্মের ব্যাখ্যা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। তিনি স্পষ্ট দেখেছেন, "ধর্মপ্রাণতার ন্যাকামির" মধ্যে কোন ধর্ম নেই, গোলাম জাতি মসজিদে পড়ে থাকলেও সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ লাভে বঞ্চিত। প্রকৃতপক্ষে "আত্ম উপলব্ধি, আত্মপ্রতিষ্ঠা আত্মপ্রকাশের ভিতর দিয়াই ধর্মের সূচনা এবং আত্মশক্তির বিপুল দ্যোতনা ও সত্যের বিপুল ব্যঞ্জনাই হইতেছে ধর্মের পূর্ণ পরিণতি। সুতরাং পরাধীন, দুর্বল সর্বতোভাবে শক্তিহীন জাতির পক্ষে ধর্ম ধর্ম করিয়া চিৎকার করা বা ধার্মিকতার ভান করা তাহাদের পক্ষে চন্দ্রমা মর্দনে বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।"[১] মুসলমানদের সম্পদ হানির অন্যতম কারণ হল সুদ প্রদান। ইসলাম ধর্মে সুদ গ্রহণ ও সুদ প্রদান দুটোই সমান অপরাধ হলেও মুসলমান সুদ দিয়ে ভিখারী হচ্ছে কিন্তু গ্রহণ করে সম্পদশালী হতে পারছে না। তিনি তুলনা করেছেন, সুদ গ্রহণ হিন্দু ধর্মে নিষিদ্ধ হলেও তারা তা গ্রহণ করে ঈর্ষা জীবনকে গড়ে তুলছে, কিন্তু মুসলমানদের তাতেও চৈতন্য সৃষ্টি হয়নি। সুদ প্রদান না করা এবং সুদ গ্রহণ করা উভয়ই সম্পদবৃদ্ধির সহায়ক, শাস্ত্রের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে হিন্দুর সুদ গ্রহণ এবং সুদ প্রদান করে মুসলমানের পাপ ধর্মের নজীর সামনে দিয়ে সিরাজী মুসলমান সমাজকে সুদ প্রদান না করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। সম্ভবতঃ এর বিকল্প নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বিত্ত অর্জন ও সামাজিক কল্যাণের সাধনের জন্য সুদ গ্রহণ করাকেও অনুমোদন করতে পারেন।

১। শক্তির প্রতিযোগিতা, সাধনা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিক দিয়েও ব্যাখ্যা করেছেন, মুসলমানের জন্য হজ্ব ও যাকাত অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু ধনের অধিকারী না হলে তা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রকৃত ধর্ম পালনের জন্যও সম্পদের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। সম্পদের অধিকার ব্যক্তি জীবনের মত একটি জাতিকেও স্বতন্ত্র অধিকার এনে দিতে পারে, এবং এ ক্ষমতা পৃথিবীতে সকল কল্যাণের উৎস। ধর্ম যথার্থভাবে প্রযুক্ত হলে শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই একটি জনগোষ্ঠীকে অগ্রসর করে দিতে পারে। কোন কোন শ্রেণীর আলেমের অপপ্রচারের ফলে মুসলমান সমাজে দারিদ্র্য আদর্শায়িত হয়ে উঠেছে। এদের হাত থেকে মুক্তির জন্য এবং মুসলমান সমাজের উদাসীনতা দূর করার জন্য তিনি ধর্ম ব্যাপারে সহায়তা নিয়েছেন। এখানে ধর্ম উপলক্ষ মাত্র, সাধারণভাবে মুসলমান সমাজে ধর্মের প্রভাব বেশী ছিল বলে নিজের কল্যাণ আদর্শ রূপায়িত করার জন্য ধর্মের উপলব্ধি সহজে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পাশাপাশি মোল্লা মৌলবীদের প্রভাবকেও প্রতিহত করেছেন। সূফী ও দরবেশগণ ইসলামের বিকৃত ও ভিত্তিহীন ব্যাখ্যা দান করে মুসলমান সমাজকে আরো অধঃপতিত করে তুলেছেন, সিরাজী এদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।[1] প্রবন্ধটি আল-এসলাম পত্রিকায় প্রকাশের সময় সম্পাদকীয় মন্তব্যে সিরাজীকে সমর্থন করে মোল্লা মৌলবীদের ভূমিকায় নিন্দা করা হয় এবং বলা হয়, "প্রবন্ধটি সংস্কারমূলক। চিকিৎসককে যেমন রোগীর অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা দিতে হয়, সংস্কার প্রয়াসীর কর্তব্যও তদ্রূপ।---সুতরাং প্রবন্ধটি ধর্মমতের প্রতিকূল একথা বলিবার উপায় নাই।"[2] অন্যত্র মোজাম্মেল হকের "মহর্ষি মনসুর" গ্রন্থের সমালোচনায় এটাকে তিনি "এসলাম ধর্মে ভীষণ আঘাত" বলে বর্ণনা করেছেন।[3]

মোজাম্মেল হকের এ গ্রন্থ সম্পর্কে সিরাজীর আপত্তির কারণ ছিল এখানে যে, এসবের মাধ্যমে বাংলায় পীর পূজা, গোরপূজা, পৌত্তলিকতা সৃষ্টি হবে, উর্দু সাহিত্য ও কবিতার মাধ্যমে হিন্দুস্থানের মুসলমানরাও এক সময় এভাবে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। প্রসংগতঃ কায়কোবাদকেও মহাশ্মশান কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথমেই মূর্তিপূজা সম্বন্ধ একটি কবিতার জন্য তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন এবং ডাঃ আবুল হোসেনের মসজিদ অভিনন্দনে "হিন্দুকে টেক্কা দিয়া দেবী গুরুপূজার" বর্ণনা দানের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করেছেন। সিরাজীর সংস্কার কারণ অন্যখানে, তিনি পারিপার্শ্বিক সমাজের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামকে ব্যাখ্যাদানের পক্ষপাতী ছিলেন, আবার বিকৃতির আশংকায় সংগত-ভাবেই ইসলামের মৌল নীতিমালা থেকে দূরে সরে যেতে চাননি। একজন সূফী মনসুর হাল্লাজের [illegible]

১। এসলামের শিক্ষা, আল এসলাম, শ্রাবণ, ১৩২৬।
২। সম্পাদকীয় মন্তব্য, প্রাগুক্ত
৩। এসলাম ধর্মে ভীষণ আঘাত, আল-এসলাম, পৌষ, ১৩২৪।

Dhaka University Institutional Repository

দাবীকে এবং সুফী দরবেশদের দ্বারা ইসলামের অপব্যাখ্যাকে নিন্দা করেছেন, ওহাবী, ফরায়েজীদের মত পীরপূজা গোরপূজা ইত্যাদির বিরোধিতা করেছেন আবার একই সঙ্গে শক্তি সাধনা ও যুবকদের স্বাস্থ্য ভিত্তিক ক্রীড়া কৌতুকের জন্য ধর্মের অনুষ্ঠানকে সমর্থন করেছেন। সম্পদ ও ধনবল বৃদ্ধির জন্য সুদ ও অন্যান্য ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসকেও পুনর্মূল্যায়ন করে দেখতে প্রস্তুত হয়েছেন। এ সবের মধ্যে আপাতঃ বিরোধ ও বৈষম্য থাকলেও সব কিছুর অন্তরালে, তাঁর মনোজীবনের অন্তঃপুরে একটি সমন্বয়বোধও বিদ্যমান। ইসলামকে তিনি সমকালীন সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনের আলোকে ব্যাখ্যা দান করে কার্যোপযোগী করে তুলতে চেয়েছিলেন। এভাবেই ইসলামের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত সামাজিক ন্যায় বিচার, জাতীয়তাবোধ, মূল্যবোধ, জীবন দর্শন ইত্যাদি মিশ্রিত করে দিয়েছেন। এটা শিরাজীর সমকালীন মুসলমানদের বাস্তব প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত।

ধনবল প্রতিষ্ঠার পর তিনি ইসলামের সেবাকর্মের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন, এখানে ইসলামের সামাজিক প্রয়োজনমূল্য অনুভব করেছেন। খ্রীষ্টান মিশনারীদের সম্পর্কে বিরূপ থাকলেও তাদের কল্যাণমূলক কাজ তিনি প্রত্যক্ষ করে ছিলেন। সেই সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকর্মের মাহাত্ম্যও তাঁর মন কেড়ে নিয়েছিল।[১] ইসলাম ধর্মকেও তিনি সেভাবে দেখেছেন; ইসলামের দুটো দিক, ঈমান ও বিশ্বাস এবং আমল সালেহ বা সৎকার্য। এ বিষয়েও আলেমদের নিষ্ক্রিয়তা ও বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয়তাকে তিনি আক্রমণ করেছেন।[২] তিনি আরো অগ্রসর হয়ে ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী, মার্কিন জাতির নজীর দিয়ে বলেছেন, আমল বা সেবার মাধ্যমেও তাঁরা পৃথিবীতে প্রাধান্য করেছেন, তাঁরা আপাত দৃষ্টিতে কাফের হলেও আমলের দিক দিয়ে আদর্শ মুসলমানের যোগ্যতা তাদের আছে।[৩]

ইসলামের ভবিষ্যৎ কি? অন্তর্নিহিত শক্তিই হল ইসলামের ভবিষ্যৎ এবং এ কারণে বিশ্বের কোটিকোটি মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। ইসলামের সে গৌরবময় যুগের অবসান হলেও এবং বর্তমান অবস্থায় এর মধ্যে সে প্রভা না থাকলেও বৃহৎ নদী এখনো নিঃশেষিত নয়। দুষ্ট শক্তির পূর্ণ প্রভাব কেন্দ্র মহানগরী লন্ডনে 'এক খোদার পূত মন্দির' স্থাপিত হতে এবং আমেরিকা মহাদেশে ইসলাম প্রচারিত হতে দেখে তিনি আশান্বিত হয়ে উঠেছেন।[৪] এ মহামুহূর্তে প্রয়োজন ধর্ম জ্ঞান বিজ্ঞানের

১। পূর্বে, পৃঃ ৪২-৪৬।
২। ইসলাম ও আমল, নূর, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।
৩। প্রাগুক্ত।
৪। ইসলামের ভবিষ্যৎ, সুচিন্তা, পৃঃ ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

সাধনাকে প্রভাবিত করা, বিজ্ঞানশিক্ষা জ্ঞান পিপাসা একদা মুসলমানদের এ সব ক্ষেত্রে অগ্রসর করে দিয়েছিল।[১] বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের জাগরণ প্রয়াসের মধ্যে সিরাজী মুসলমানদের পুনর্জাগরণের সম্ভাবনাও প্রত্যক্ষ করেছেন, "ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ান, আমেরিকার থিয়োসফী এবং ভারতের ব্রাহ্মমত ইসলাম সূর্য্যের উষারুণ জগতে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহারা যে সত্য প্রচার করিতেছে, তা ইসলামের পূর্ণাঙ্গস্বরূপ।[২]" ইসলাম সম্পর্কে সিরাজীর মতামতও শেষ পর্যন্ত সমাজ চিন্তা ও রাষ্ট্রনৈতিক স্পর্শ করেছে।

বাংলায় মুসলমান সমাজের দিকে চেয়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন, ইংরেজ আগমনের পর হিন্দুরা যখন নতুন বাণিজ্যে লিপ্ত হয়েছে মুসলমান তখনও সুখবিলাসী।[৩] কেবল ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি শহর কেন্দ্রিক বিত্তবান মুসলমান নয়, সাধারণ চাষার সংকট সম্পর্কেও তিনি অনুভব করেছেন, পাট চাষীর শ্রমেই সুতোর বণিক এবং হিন্দু মহাজনের অর্থ বহুগুণিত হচ্ছে, কিন্তু মুসলমান চাষীর ভাগ্য বিড়ম্বিত।[৪] প্রায় এ রকম পরিস্থিতিতে ধর্মের অবস্থান সম্পর্কেই তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, "ধর্মের ভিতর দিয়া জাতিকে মহৎ, বৃহৎ, পুষ্ট ও শক্তি সম্পন্ন হইবার শিক্ষা যদি না দিতে পারে তবে সে ধর্ম যতই উচ্চ আকাশ হইতে আবির্ভূত হউক না কেন, তাহা জাতিকে উৎসন্নের পথে, জাহান্নামের পথেই টানিয়া লইবে।"[৫] আরো পরবর্তীকালে তুর্কি আন্দোলনের পটভূমিতে বলেন, "এসলামই যদি বিনাশ হয় স্বরাজ বা স্বাধীনতা আসিবে কোথা হইতে ?"[৬]

ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সিরাজীর সিদ্ধান্তের পরিণতি এখানে। তিনি ধর্মবিশ্বাসের সংস্কার চাননি তা নয়, কিন্তু সামাজিক শক্তি হিসাবে ইসলাম ধর্মকে সমাজ কল্যাণের উপযোগী হতে হবে। ইসলামের মধ্যে এটা আছে, কিন্তু প্রয়োজন এর সঠিক ব্যাখ্যা দান করে উপযুক্ত ভাবে একে ব্যবহার করা।

ধর্ম আলোচনার ক্ষেত্রেও তিনি মুসলমানদের আত্মশক্তি জাগরণের জন্য আহবান জানিয়েছেন। এ জন্য তাঁর সমাজ চিন্তা, ধর্মচিন্তা রাষ্ট্রভাবনার এক সূত্রে গাঁথা, একটি থেকে অন্যটিকে পৃথক করে দেখা যায় না। ধর্মকে কেবলমাত্র বিশ্বাস ও প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেননি, তিনি একে বৃহত্তর জগৎ জীবন, সমকালীন সমাজ রাজনীতি ইত্যাদির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করে নিয়েছেন। এভাবে ধর্ম, সমাজ,

---

১। ইসলামের মূল পদ্ধতি, সুচিন্তা, পৃঃ ১৬।
২। ইসলামের ভবিষ্যৎ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭।
৩। এসলাম ও সমাজ, মাসিক এসলাম, অগ্রহায়ণ, ১৩২৬।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ
৫। এসলামের শিক্ষা, মাসিক এসলাম, শ্রাবণ, ১৩২৬।
৬। শার্দুলনাদ, মোসলেম জগৎ, ০২শে শ্রাবণ, ১৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি, ইতিহাসকে বাংলায় মুসলমানদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সামনে নিয়ে আলোকিত করে তুলেছেন, বাংলায় ইসলাম ধর্মকে প্রত্যক্ষ জগৎ ও জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দেন। শিরাজীর সমকালে মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে এরকম প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী বিরলপ্রায়। ধর্মকে এভাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে শিরাজীর কিছু কিছু মানসিক কারণও বিদ্যমান ছিল। সমকালীন হিন্দু সমাজে ধর্মবোধ মিশ্রিত রাজনীতির গভীর প্রভাব[১] শিরাজী অনুভব করেছিলেন, মুসলমান সমাজেও শিরাজী ধর্মকে সেভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমান সমাজে শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক অনগ্রসরতা ইত্যাদির কারণে শিরাজীর এ আহবান কোন সাংগঠনিক রূপ পায়নি, সমাজের মধ্যে সেভাবে বিস্তৃত হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন আকারে গড়ে ওঠেনি।

সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ধর্মের অসাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন, সেজন্যে ইসলাম ধর্মকে যেমন রাজনীতি ও সমাজ চিন্তার শক্তি আকারে ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন, তেমনি একই সঙ্গে সতর্ক ছিলেন যাতে ধর্মকে এভাবে ব্যবহার করার ফলে সুযোগসন্ধানী গোঁড়া, কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বার্থবাদী মোল্লা মৌলবী, পীর দরবেশ যেন বাংলার মুসলমান সমাজকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবার অবস্থা সৃষ্টি না করে।

সমাজ ও রাজনীতি

এক

বাংলায় মুসলমান সমাজের কল্যাণ চিন্তার সঙ্গে শিরাজী নিজেকে গভীরভাবে সম্পর্কিত করে তুলেছেন। শিরাজীর কর্মক্ষেত্র ছিল সাধারণভাবে মুসলমান সমাজের মধ্যে, সেকারণে মুসলমান সমাজের সমস্যার কথা তাঁর রচনায় বার বার উচ্চারিত, তেমনি সমাধানের পথও মোটামুটিভাবে প্রদর্শিত।

শিরাজী মুসলমান বলতে প্রাথমিকভাবে বাংলার মুসলমান বুঝেছেন, এর পর ভারতীয় মুসলমান এবং শেষে বিশ্বমুসলমান। তিনি বাঙালী মুসলমানের কল্যাণ কামনা করেছেন এবং অনেকটা সেই কল্যাণসূত্রে বিশ্ব মুসলমানের সঙ্গে গভীর সংযোগ/অনুভব করেছেন। অন্য একটি কারণও ছিল, বাংলায় শিক্ষিত হিন্দুর সঙ্গে প্রতিযোগিতার ভয়, এবং ভারতীয় শাসন কাঠামোতে পরাধীনতার যন্ত্রণা থেকে

১। পূর্বে, প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

আশ্রয় পাবার সম্ভাবনাতেই তিনি বিশ্ব মুসলিমের দ্বারস্থ হয়েছেন। এ বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় যেমন অতীত গৌরবের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে বর্তমান রাজশক্তিরও অধিকারী। এভাবে বিশ্ব মুসলমানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করায় তাঁর রচনায় যথা স্পষ্টতঃ প্যান ইসলামবোধের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু প্যান ইসলামের সঙ্গে সিরাজী বিশেষ ধারণাও যুক্ত করে নিয়েছেন।

প্যান ইসলাম মোটামুটিভাবে ধর্মীয় ভিত্তিতে বিশ্ব মুসলিম সংগঠন, এবং লক্ষ্য ছিল বিশ্বের সকল অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে কার্যকর ঐক্যবন্ধনের প্রতিষ্ঠা। আপাতঃ দৃষ্টিতে ধর্মীয় বলে মনে হলেও এর একটি রাজনৈতিক চরিত্রও ছিল। ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতীয় শক্তির সামনে সঙ্কটে পতিত হয়ে সুলতান আবদুল হামিদ একটি রাজনৈতিক শক্তি জোট গঠনের আবশ্যকতা বোধ করেন, আফগানিস্থানের সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী সুলতানের অন্যতম পরামর্শদাতা ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আফগানীই প্যান ইসলামী ধারণাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। তুরস্কের খিলাফত বিশ্ব মুসলমানের জন্য সহানুভূতির কেন্দ্রস্থল ছিল, এমনকি এখানে খিলাফতের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে বিশ্বের সকল অঞ্চলের মুসলমান খিলাফতের প্রতি দুর্বলতাবোধ করেছিলেন। একটি পর্যায়ে আফগানীর সঙ্গে সুলতানের মতবিরোধ দেখা দেয়।[১] জামালউদ্দীন আফগানী ভারতে প্যান ইসলামী ধারণার সম্প্রসারণ ঘটান, তাঁর প্রভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে বিভিন্ন সময়ে মুসলমানরা আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় হাতের পাখা নাড়িয়ে গেছেন। মানসিক দিক দিয়ে তো বটেই এমন কি ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষকে শত্রুর দেশ মনে করে আফগানিস্থানে হিজরত করার প্রবণতাও দেখা গিয়েছিল। তুরস্কে খিলাফতের অবসানের পর ভারতীয় মুসলমানরা হতাশ হন এবং প্রায় অবলম্বন-হীন হয়ে পড়েন। তিরিশের দশকের শুরুতেই কবি ইকবাল জাতীয়তার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে নতুন ব্যাখ্যা দেন, ভারতীয় মুসলমানের দৃষ্টি মুসলিম বিশ্ব থেকে সরে এসে ভারতীয় সমস্যার ওপর পতিত হয় এবং ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধ নবরূপে জন্মলাভ করে।

আফগানী সিরাজীর কিশোরকালের গুরু সহচর, প্যান ইসলাম সম্পর্কে সিরাজীর ধারণা অনেকাংশে আফগানী এবং ইকবালের মিশ্রিত রূপ। সম্ভবত, বাংলার মুসলমান সমাজের উন্নতি সাধনের প্রয়োজনেই তিনি বিশ্ব মুসলমানের দ্বারস্থ হয়েছেন, কিন্তু নিজের মুসলিম সত্তাকে বিলীন করে নয়। ফলে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যকে যেমন সাধন করতে চেয়েছেন তেমনি হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত ঐক্যেই ভারতের ভবিষ্যত নির্ভরশীল এ সম্পর্কে তিনি দ্বিধাহীন। রবীন্দ্রনাথও হিন্দু মুসলমানের বৃহত্তর ঐক্যের জন্য

১। Sharif - al- Mujahid- Pan-Islamism, A History of the Freedom movement Vol.III, part I, pp.93-116.

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বাংলায় রাজনীতি, সমাজ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব কোন সময় হিন্দু মুসলমানের তিক্ত সম্পর্ক শিরাজীকে বহির্ভারতে যাবার জন্য প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে। শিরাজীর সমকালের উন্নত, ও রাজশক্তির অধিকারী, এবং অতীতের গৌরবদীপ্ত মুসলমানরা বাংলার, বিশেষতঃ ভারতসীমার বাইরে অবস্থিত। বাংলায় অধিকারহীন মুসলমানের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য ভারতীয় এমন কি বহির্ভারতীয় মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা শিরাজীর জন্য প্রয়োজন ছিল, এটাই প্যান ইসলামের সঙ্গে শিরাজীর সংযোগ সৃষ্টি করেছে। অন্য একটি কারণও সম্ভবতঃ ছিল, জাতীয়তাবাদ। রাজনীতিতে হিন্দু ধর্মের সংযোগ ঘটিয়ে হিন্দু ভারতের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ সূত্র করে, এর মধ্যে মুসলমানের স্থান ছিল সংকীর্ণ। বঙ্কিমের সাহিত্যের দেশপ্রীতির সঙ্গে হিন্দুত্বের সম্পর্ক বিবেকানন্দের মধ্যে নতুনভাবে আলোড়িত হয়, বঙ্কিমের মৃত্যুর পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনীতিতে এসব আদর্শের বাস্তবায়ন আরাধ্য হয়ে ওঠে। বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা ভারত আবিষ্কারের একটি বর্ণাঢ্য অধ্যায়, শিরাজীর সমকালের সাহিত্য রাজনীতি, সমাজচিন্তায় এটা সার্বিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। হিন্দুর চোখে তখন অতীতের বৃহত্তর ভারতের স্বপ্ন, রবীন্দ্রনাথের মানস, নেতা, সুভাষ প্রমুখও এ সবের অন্যতম। রোমান্টিকতা বিলাসী শিরাজী এটা উপেক্ষা করতে পারেননি,[১] শিরাজীর সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি চিন্তা অনুসরণ করলে দেখা যাবে অগ্রসর শিক্ষিত হিন্দুর আত্মসাক্ষাৎকারটিকেই শিরাজী বেশ নিকট থেকে এবং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, এজন্য হিন্দুর মত তিনিও ভারতীয় এবং বহির্ভারতীয় মুসলমানদের কাহিনী তুলে ধরে বর্তমান ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার নির্জিত মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। ভারতের বাইরে মুসলমানদের কোন কোন শক্তিকেন্দ্র তখনো বর্তমান ছিল, শিরাজী এ সবের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেননি, তাঁর প্যান ইসলামী চিন্তাধারার মূল সূত্রগুলো এখানেই। শিরাজী পূর্বসূরির জাতীয় চৈতন্য-পুষ্ট, প্যান ইসলাম তাঁর অন্তরের দান, এবং এ জাতীয় ভাবধারাও হিংসা ও প্রেমে সমন্বিত হিন্দু মুসলমানের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে গঠিত।

দুই

ইংরেজের সঙ্গে ধারাবাহিকতা সূত্রে বাংলার মুসলমানদের অতীত বর্তমানের অবস্থা তিনি নিরূপণ করেছেন। মোটামুটিভাবে হান্টার, [illegible] প্রমুখের মতামতই শিরাজী মেনে নিয়েছেন যে, বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা বিদেশাগত মুসলমানদের বংশধর, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে

১। পূর্বে, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

বিচ্যুত হবার পর তাঁদের আর্থিক দুরাবস্থার উৎস খুঁজে পেয়ে, এবং তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছে।[১] এসবের মূল হল শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা, এবং সামগ্রিক পরিণতি হল জীবন সংগ্রামে অনুপস্থিতি।

বাংলার মুসলমানেরা বিদেশাগত মুসলমানদের বংশধর হলেও বাংলায় তাঁদের মিশ্রণ ঘটেছে। এ মিশ্রণের ফলাফল অনেক ক্ষেত্রেই শুভ হয়নি, যেমন এ কারণে বাংলার মুসলমানরা তাঁদের আরবী ও তুর্কী শৌর্য হারিয়েছে, পূর্ব পুরুষদের গৌরবময় ঐতিহ্য চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং আত্ম-বিস্মৃত দুর্বল জাতিতে পরিণত হয়েছে। মুসলমান সমাজকে এ আত্মবিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করাকে কেন্দ্র করেই শিরাজীর সমাজ চিন্তা [illegible] আবর্তিত।

ইতিহাসের আলোকে মুসলমান সমাজের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে শিরাজী অগ্রসর হয়েছেন এবং চৈতন্য সৃষ্টির সকল কেন্দ্রকেই স্পর্শ করেছেন। জাতীয় অবস্থা থেকে পুনরায় থাকলে পতন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে অংশীদার হয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়, এজন্য চেয়েছেন আপন প্রতিষ্ঠা অধিকারেই মুসলমানদের ক্ষমতাগ্রহণের উপযোগী করে তোলা। সেকারণে হিন্দুর সঙ্গে যেমন সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন তেমনি আবার জাতিবৈর, কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্বেষও সৃষ্টি করেছেন।

শিরাজী অনুভব করেছিলেন ইংরেজের অধীনে থেকেও ভারত ও বাংলায় হিন্দু সমাজের মধ্যে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, মুসলমানের এ ব্যাপারে কোন ভূমিকা নেই, পরাধীনতা তাদের সামগ্রিক চৈতন্যকে বিনষ্ট করেছে, নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কেও তারা উদাসীন। বিত্ত ছাড়া এ উদাসীন্য দূর করা সম্ভব নয়, আলস্য, কুশিক্ষা, বা অশিক্ষা, ধর্ম প্রচারকদের অপব্যাখ্যা সম্মিলিতভাবে বাংলায় মুসলমানদের বিত্ত অর্জনের বিপুল বাধাস্বরূপ।

শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে বাধা অপসারণের মাধ্যমে মুসলমানদের বিত্ত অর্জনের পথও তিনি মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানরা তুলনায় অনেক উন্নত, জাগরণের প্রদীপ শিখাও তাদের হাতে, কিন্তু ভারতীয় মুসলমানরা, বিশেষতঃ বাংলায় মুসলমানরা নির্জীব। পরাধীন ভারতের হিন্দুরা তো বটেই, এমন কি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানরাও জীবন সংগ্রামে অনেক অগ্রসর, কিন্তু বাংলার মুসলমানরা তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ। এর কারণ বাংলায় মুসলমানদের সম্পদের অভাব এবং পরাধীনতা। পরাধীনতা সম্পদ হরণের অন্যতম কারণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্পদ থাকলে কিংবা অর্জিত হলে জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি হওয়া যায়। শিরাজী বাংলায় মুসলমানদের সেই বাস্তবের মুখোমুখি

১। আবু তালেব ও তোহায় স্মৃতি, সোলতান, ১৪ই আষাঢ়, ১৩৩০।

এনে দিয়েছেন, পরাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করেছেন, সম্পদের অভাবে ভবিষ্যতের অন্ধকারময় দিনগুলি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। সম্পদ না থাকলে পরাধীনতার শৃংখল মোচন করা অসম্ভব।

তিনি মনে করেছেন, "চট্টগ্রাম এবং ঢাকা জেলার মোছলমানদিগকে বাদ দিলে সমস্ত বাঁঙ্গালার মোছলমান সমাজই ব্যবসা বাণিজ্যে উদাসীন।" মাড়োয়ারীরা সম্বলহীন হয়ে এসেও উত্তর, পূর্ববঙ্গ ও আসামের ব্যবসা বাণিজ্য অধিকার করেছে, তারা জমিদারী ক্রয়ও করেছে। "তাহা, তিনি ও আমরা টাকা লুটিলেও, সে টাকা বাঁঙ্গালার বাহিরে যায় না। দেশের টাকা দেশেই থাকে, এবং দেশেই খরচ হয়। দেশের নানা কার্য্যে ইচ্ছা অনিচ্ছায় দান খয়রাত করিতে হয়।--কিন্তু মাড়োয়ারীদিগের সহিত বাঁঙ্গালা মুল্লুকের কোনও সংস্রব নাই। তাহারা যদি বাঁঙ্গালার অধিবাসী হইত তাহা হইলে তাহাদিগের দ্বারা এমন সাংঘাতিক ক্ষতি হইত না।" কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিতেরা এ ব্যাপারে উদাসীন। অর্থাভাবেই তাদের মধ্যে কোন সামাজিক কল্যাণ হচ্ছেনা, কোন সংগঠনও গড়ে উঠছেনা।" ইহার দুইটি কারণ। প্রথম কারণ হইতেছে অবিশ্রান্তভাবে বিজাতীয় নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করা এবং সুদ দেওয়া।"[১]

দারিদ্র্যকেই তিনি সবচেয়ে বড় পাপ মনে করেছেন, কেননা, "দারিদ্র্যতা মানুষকে বেঈমান করে চোর করে, ডাকাত করে, মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক করে।"[২] দারিদ্র্য এবং দুর্বলতা অশিক্ষিতভাবে "মুসলমানদিগকে এতদূর আত্মসম্মানবিহীন করিয়াছে যে, অনেক স্থলে ভদ্রলোক বলিলে কেবল হিন্দুকেই বুঝায়।"[৩] মুসলমান সমাজের নিকট তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, তাদের মধ্যে পাপ কর্ম বৃদ্ধি পাবার অন্যতম কারণ দারিদ্র্য নয় কি?

আগেও বলা হয়েছে মুসলমানদের দারিদ্র্যের অন্যতম একটি কারণ হিসাবে তিনি দেখেছেন সুদ প্রদান। এখানে বলেছেন, "বাঁঙ্গালার প্রায় সমস্ত সুদখোর মহাজনই হইতেছে হিন্দু আর খাতক প্রায় সবই মুসলমান। মুসলমান শাস্ত্রে সুদ লেওয়া ও দেওয়া উভয়ই নিষিদ্ধ হইলেও মুসলমানেরা নিজের বেলায় শাস্ত্রের আদেশ মানিয়া সুদ না লইলেও দিবার বেলায় তাহারা শাস্ত্রের আদেশ পদদলিত করিয়া হিন্দুদিগকে অবিশ্রান্তভাবে যোগাইতেছে।"[৪] অন্যত্র বলেছেন, "এই একশত বৎসরের মধ্যে সুদ দেওয়ার ফলে হিন্দুরা এখন জমিদার, আর আমরা প্রজা। তাহারা বাবু, আমরা চাষা। যেরূপ ব্যাপার তাহাতে আর ২৫ বৎসরের মধ্যে হিন্দু ও মাড়োয়ারীরা সম্পূর্ণভাবে আমাদের কর্ত্তা ও প্রভু হইয়া দাঁড়াইবে।"[৫]

মুসলমান সমাজের নিকট তিনি বহু প্রশ্ন রেখেছেন, পাপ কর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকাই পবিত্র জীবন-যাপনের পথ, এর উপায় কি, নিজেদের সম্পদের অধিকারী করে তোলা, শিল্প বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া, এজন্য

১। মোছলমানদিগের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান, ছোলতান, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।
২। প্রাগুক্ত
৩। ভারতের বর্তমান অবস্থা ও মুসলমানের কর্তব্য, ছোলতান, ২১শে ভাদ্র, ১৩৩০।
৪। হিন্দু মুসলমানের সমস্যা, কাটিং বই, ৫৫০-ক।

৫। মোছলমানদিগের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান, ছোলতান, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কারের ও অন্যান্য সম্ভাব্য বাঁধা দূর করা। শিরাজী নিঃসন্দেহে ছিলেন, শিল্প সংগঠন ও ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া সম্পদ অর্জন সম্ভব নয়।[১] কিন্তু ব্যক্তিগত সামান্য বাণিজ্য পরিচালনায় সহায়ক নয় বলে যৌথ কারবারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, এতে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যবোধ বৃদ্ধি পাবে।[২] বাংলায়, বাংলায় মুসলমানদের পূর্বপুরুষ অন্বেষণের ক্ষেত্রে বিদেশাগত মুসলমানদের প্রাধান্য হলেও বাংলায় সাধারণ কৃষিজীবি, নিম্নবিত্ত, শ্রমিক ইত্যাদির মধ্যে বৃহত্তর সমাজের ভাগ্যের তিনি জড়িত করে দেখেছেন। তিনি নিজে তাদের সংগেই আত্মীয়তা বোধ করেছেন বেশী। মুসলমান সমাজের কিছু লোক বিত্তবান হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু সবচেয়ে কল্যাণকর হল যৌথ সাম্যবাদাধীন শিল্প ব্যবস্থা ও কৃষির মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে মুসলমান সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন। এক্ষেত্রে দরিদ্র হিন্দু কৃষককেও তিনি পৃথক করে দেখেননি।[৩] আবার স্বরাজের জন্য প্রথম কর্তব্য হিসাবে সাধারণ মুসলমানের ভাগ্যোন্নয়ন করার কথা বলেছেন।[৪] মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভিন্ন পেশাকে অধিকার করে নেবার জন্য তাদের উৎসাহিত করেছেন।[৫] দরিদ্র মানুষের পর্যায়ে তিনি হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থকে অভিন্ন করে দেখেছেন, সকল সম্প্রদায়ের দরিদ্র জনসাধারণকে একটি শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু শিক্ষিত ও বিত্তবান হিন্দু সম্পর্কে সে সংযম সর্বত্র রক্ষা করতে পারেননি।

তিন

ভারতে, বিশেষ করে বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের ইতিহাস যেমন বিচিত্র সাহিত্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছে।[৬] শিরাজীর সাহিত্যের একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের অম্লমধুর প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এগুলো এমন ভাবে মিশ্রিত যে, কেহ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ সেই তেমন পাননি, সমাজের বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে সে ব্যাপারে অনুকূল পরিবেশও ছিলনা।

১। শিল্প সংগঠন ও জাতীয় জীবন, সোলতান, ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩০।
২। মোছলমানদিগের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান, সোলতান, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।
৩। "পৃথিবীর সমস্ত দ্রব্য পণ্যের মূল্য উৎপাদনকারী বা বিক্রেতাই নির্ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু পাটের অবস্থা ঠিক তাহার বিপরীত। যে কৃষক মাথার রক্ত জল করিয়া পাট উৎপাদন করে তাহার কিন্তু পাটের মূল্য নির্ধারণের কোন হাত নাই। বিদেশী বণিকদিগের কৃপার উপরে পাটের মূল্য নির্ভর করে।— এক্ষণে আমাদের কর্তব্য কি? বক্তব্য এই যে, দেশের সমস্ত পাট চাষীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া পাটের একটা নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করা।—স্বদেশী বা স্বরাজ আন্দোলনের মত একটি নূতন আন্দোলন চাই। কৃষকদিগকে পাট চাষ বন্ধ রাখিবার সময় বিনা সুদে ঋণ দিবার জন্য ব্যাংক চাই। এক বৎসরের জেদ ধরিয়া থাকিতে পারিলেই আমরা জয়লাভ করিতে পারিব। হিন্দু ও মোছলমান সমস্ত শ্রেণীর লোকেরই সমবায় হইতে হইবে। পাটের দর চড়াইতে পারিলে সর্বশ্রেণীর লোকেরই যে সুবিধা ইহা তাহাদের বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক।"—পাটের বিশেষ কথা, দৈনিক সোলতান, ১লা ভাদ্র, ১৩৩০।
৪। সিরাজগঞ্জ বঙ্গীয় মোসলেম মহাসভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, ইসলাম দর্শন, শ্রাবণ, ভাদ্র, ১৩৩১।
৫। অপরাধ ও [illegible], আল এসলাম, অগ্রহায়ণ, ১৩২৬।
৬। পূর্ব, প্রথম অধ্যায়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান—আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭০।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতে ইংরেজ শাসনের সূচনা থেকেই হিন্দু মুসলমানদের বিরোধ ছিল প্রতিযোগিতানির্ভর। হিন্দু পূর্বেই অগ্রসর থাকার ফলে মুসলমানের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে উঠেছিল, অথচ নবজাগ্রত মুসলমানের স্বার্থে সংকুলানের জন্য সম্প্রসারিত আকাশ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অগ্রসর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিন্দুর পাশাপাশি মুসলমানের পক্ষে একমাত্র উপায় ছিল হিন্দুর সংগে প্রতিযোগিতা করে তা অর্জন করা। একারণে প্রতিযোগিতা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, সাহিত্যে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের প্রতিফলনও তত তীব্র হয়ে উঠেছে। সিরাজী আত্মপ্রসারণেচ্ছু মুসলমান জনচিত্তের নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে, সাহিত্যে প্রকাশিত তাঁর কোন কোন মন্তব্য আপাতঃ রমনীয় নয়। কিন্তু রাজনৈতিক লক্ষ্য মনে রাখলে এ সবের তাৎপর্য অপেক্ষাকৃত ভিন্ন হয়ে আসে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু মুসলমানের সমন্বিত স্বাধীন ভারতবর্ষ কামনা করেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিন্দুকে বর্জন করার কথা ভাবেননি। বরং সংখ্যালঘু মুসলমানকেই এর জন্য প্রস্তুত করে তুলেছেন, কেননা এদের সংখ্যালঘুর বিনাশ বা বিলীন হয়ে যাবার আশংকা বেশী। সামাজিক প্রয়োজনকে তিনি যেমন পরিকল্পিত ভবিষ্যৎমুখী করেছেন তেমনি পারিপার্শ্বিক অবস্থা দিয়েও তা বিচার করেছেন।

শিক্ষিত হিন্দু ছিল তাঁর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র, একারণে সামগ্রিকভাবে মুসলমান সমাজের উন্নতি-সাধনের উদ্দেশ্যে সাহিত্য সমাজ অর্থনীতি জীবিকা, ও রাজনীতিতে মুসলমানকে তিনি হিন্দুর সম্মুখীন করে দিয়েছেন ১ এবং এগুলো সিরাজীর নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। অন্যত্র হিন্দু মুসলমানের মিলনের অন্তরায় হিসাবে তিনি নয়টি কারণের উল্লেখ করেছেন, এসবের মধ্যে রয়েছে হিন্দু জমিদারেরা ঈদের সময়েও গো-কোরবানী করতে দেন না, মুসলমানরা তাদের কাছারিতে বসার আসন পায় না, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র লাল রায় প্রমুখ হিন্দুর রচিত বিদ্বেষমূলক গ্রন্থ প্রচারিত হচ্ছে, নাটক অভিনীত হচ্ছে, কলিকাতায় ঢাকায় বিদ্যালয় স্থাপনের সময় কোন মুসলমানকে পৌরহিত্য করতে ডাকা হয়নি, বেনাফত ফান্ডে হিন্দুরা কম চাঁদা দিয়েছেন, যশোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশনে মতিলাল ঘোষ, শিশির ঘোষ প্রমুখ হিন্দু মনীষীদের গৌরব উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু মুন্সী মেহেরুল্লার কথা বলা হয়নি, হিন্দু মহাজনরা মুসলমানের

১। "বাঙ্গালার মোসলমান সমাজের দৈনন্দিন জীবনে ইংরাজের পরাধীনতার তেমন সংস্পর্শ নাই,- কাজেই তেমন কোনও অনুভূতিও নাই। তাহারা দৈনন্দিন জীবনে যে হিন্দুর প্রভাবকেই মর্মে মর্মে অনুভব করে। সত্য কথা বলিতে গেলে বাঙ্গালী মোসলমানের দৈনন্দিন জীবনের সংস্পর্শেই হিন্দু সমাজ। মোসলমানের অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, হিন্দু জমিদার, মোসলমান প্রজা, হিন্দু উকিল মোসলমান মোওক্কেল, হিন্দু মহাজন, মোসলমান খাতক, হিন্দু মাষ্টার ও প্রফেসার, মোসলমান ছাত্র, হিন্দু ডাক্তার ও কবিরাজ, মোসলমান রোগী, হিন্দু ব্যবসায়ী, মোসলমান কৃষি, হিন্দু ধনী, মোসলমান দরিদ্র, হিন্দু নায়েব দেওয়ান, মোসলমান পেয়াদা, হিন্দু অফিসের বাবু, মোসলমান মজুর এবং হিন্দু বাবু, মোসলমান ভাবু। মূল কথা, মোসলমানের অবস্থা হিন্দুর প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিপরীত অবস্থা হইতে অন্য বিষয়ে যাহা হউক, রাজনৈতিক বিষয়ে স্বার্থ ঐক্য সংস্থাপন দুরূহ ব্যাপার। যেমন সূর্য ও বিদ্যুতে বন্ধুত্ব হয় না, গরীব ও ধনীতে সৌহার্দ্য হয় না, তেমনি উন্নত ও অবনত জাতিতেও একতা হওয়া সম্ভব নহে। হিন্দু আজ যেখানে যাইয়া পৌঁছিয়াছে, মোসলমান যতদিন সেখানে না পৌঁছিবে, মোসলমান ততদিন স্বরাজের নামে মাতিয়া উঠিবে না- উঠিতে পারে না।" সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মোসলেম মহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, ইসলাম দর্শন, শ্রাবণ-১৩৩১।

Dhaka University Institutional Repository

নিকট থেকে সুদ গ্রহণ করে মুসলমানদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করছে[১] ইত্যাদি।

বস্তুতঃ, সিরাজীর এসব বক্তব্য প্রায়ই সমকালীন প্রসঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এক সময় বলেছিলেন, হিন্দুর মনের উদারতা আবশ্যক, রাজনীতি সচেতন শিক্ষিত যুবকও সাম্প্রদায়িক দোষ মুক্ত নয়, মুসলমান প্রজার প্রতি তাঁরা যুক্তিসংগত আচরণ করতে পারছেন না।[২] অন্যদিকে অশিক্ষিত কাঠমোল্লার দল মুসলমান সমাজকেও বদ্ধ জলাশয়ের মত গ্রহণ বিমুখ করে তুলছে। সিরাজী হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বর্তমান সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ মানসিকতাকে ভেঙে সামগ্রিক কল্যাণের উপযোগী করে তুলতে চেয়েছেন। মুসলমানের পক্ষে যতক্ষণ উন্নতি লাভ করার আগে এটা সম্ভব নয়, এজন্য হিন্দুর নিকট থেকেই মুসলমানের স্বজাতিপ্রেমের শিক্ষা নেবার জন্য বলেছেন।[৩] হিন্দু সভাকে শুদ্ধি, সংগঠন আন্দোলন, কোরবানীতে বাধা প্রদান, মসজিদের সামনে বাজনা ইত্যাদি সিরাজীকে বিচলিত করেছিল। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এসবের প্রতিক্রিয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী, এগুলো বিস্তারিত হলে ঈপ্সিত সামাজিক রাজনৈতিক কল্যাণ সাধন বিলম্বিত হতে পারে এজন্য তিনি চিন্তিত হয়েছিলেন। [illegible] হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাস করেও এ পর্যন্ত হিন্দু কখনও ইচ্ছাপূর্বক মসজিদের সামনে বাজনা বাজায়নি, কিন্তু এখন যে করছে তা কিছু স্বার্থবাদী হিন্দুর রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের জন্য।[৪] মওলানা আকরম খাঁও মনে করেছেন, হিন্দুর মত বাজনা বাজানোর ব্যাপারে মুসলমানের সচেতনতাও রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের প্রকাশ। কেবল তাই নয়, হিন্দু যে মুসলমানের কোরবানীতে বাধা প্রদান করছে তারও কারণ রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিপ্রণোদিত।[৫] প্রায় একই সময়ে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কনফারেন্সের শিবিরের অনতিদূরে মোসলেম মহাসভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে সিরাজী ঘোষণা করেছেন, "আমার হিন্দু ভ্রাতারা যে উপকার সাধনে আমাদের চিত্তের সুপ্ত চৈতন্যকে জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছে, তজ্জন্য তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।"[৬] বলা বাহুল্য, সুস্পষ্ট স্বার্থ সংঘাতই শেষ পর্যন্ত রাজনীতিতে রূপান্তরিত হয়ে

১। (ক) হিন্দু মুসলমানের একতা, মোহাম্মদী, ২৮শে বৈশাখ, ১৩২৯।
(খ) প্রাগুক্ত, রওশন হেদায়েৎ, ফাল্গুন, ১৩৩২।
২। হিন্দু মুসলমান, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৮।
৩। "প্রতিবেশী প্রবল ও উন্নত হিন্দু জাতির নিকট মোছলমান-জাতি স্বজাতিপ্রেম শিক্ষা লাভ করুক ইহাই এই বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দুর সহিত কোনরূপ হিংসা পোষণ বা তাঁহাদের সহিত অপ্রীতিকর ব্যবহার করা কর্তব্য প্রবন্ধের এরূপ আপত্তিজনক অর্থ যেন কেহ গ্রহণ না করেন। বাঙ্গালা দেশে আজ বিশ-পঁচিশ বৎসর হইতে হিন্দু-মোছলমানে একতা-প্রয়াসী মোছলমানের মধ্যে আমরাই অগ্রনী। আমরাই সর্বাগ্রে মোছলমানদিগকে হিন্দুর সহিত মিলিত হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার নিমিত্ত আহবান করিয়াছি এবং এ যাবৎ সেই নীতি পালন করিয়া চলিতেছি।"— স্বজাতি প্রেম, পৃঃ৯-১০।
৪। যোগ্যতমের উদ্বর্তন, আবে হায়াত, পৃঃ ৩১-৩২।

৫। পূর্বে, পৃঃ ২১-২২।

৬। সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মোসলেম মহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, ইসলাম দর্শন, ভাদ্র, ১৩৩১।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক কনফারেন্সের পাশাপাশি বঙ্গীয় মোসলেম মহাসভার অনুষ্ঠান সম্ভব করে তুলেছিল এবং সিরাজী ছিলেন এর অন্যতম প্রাণশক্তি।[1]

হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই পরাধীন হলেও হিন্দু আপন অধিকারেই অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে, মুসলমান তার সমান না হয়ে উঠলে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, এজন্য উন্নত জাতির সংগে প্রতিযোগিতা কাম্য।[2] বিশ্বভুবনের সর্বত্রই শক্তির মাহাত্ম্য[3] এবং আত্মশক্তির উপলব্ধি দুর্বলতা মোচনের সহায়ক।[4] অনুশীলন সমিতি, ব্যায়াম চর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে হিন্দুর শক্তি সাধনা পূর্ণমাত্রায় চলছে।[5] কিন্তু মুসলমানের এ ব্যাপারে কোনও চৈতন্য নেই। ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে শক্তির অসমতা সৃষ্টি হয়েছে, এটা সাম্প্রদায়িক অনৈক্যেরও মূলে। কেননা, শক্তির সংগে স্বার্থবুদ্ধিও জড়িত থাকে, শক্তির সমতা থাকলে স্বার্থবুদ্ধিও নিয়ন্ত্রিত থাকবে। কিন্তু "যে মুহূর্তে পার্থক্য ঘটিবে সেই মুহূর্তেই সংগ্রাম ও যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। মানব জাতির মধ্যে আবহমান কাল যত যুদ্ধ বিগ্রহ, দ্বন্দ্ব কলহ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কারণ শক্তি বা স্বার্থের পার্থক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই শক্তির ও স্বার্থের পার্থক্য অতীতে যেমন ছিল ভবিষ্যতেও তেমনি থাকিবে। সুতরাং অতীতে যেমন যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছে ভবিষ্যতেও তেমনি হইবে। কখনও ইহা বন্ধ হইবে না, বন্ধ হইতে পারে না। কারণ সৃষ্টির নিয়ম হইতেছে সংহতি, শক্তির মর্যাদা ও শক্তির প্রতিষ্ঠা। যাহারা ভাবেন, পৃথিবীতে শান্তির যুগ আসিতেছে তাহারা নিতান্ত নির্বোধ ও সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় রহস্যোদ্ঘাটনে একান্ত মূর্খ।"[6] বিপুল সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মধ্যেও সিরাজী বলেছেন, "এমন কাজ মোছলমান করিবে না যাহাতে প্রতিবেশী জাতির সহিত অনর্থক বিবাদ বাধিতে পারে। শান্তি রক্ষার জন্য সর্বদা যত্নবান থাকিতে হইবে। হিন্দু মোছলমান সদ্ভাব সংস্থাপনে প্রাণপণে প্রয়াস হওয়া উচিত। অন্যথায় কোন জাতির মংগল নাই।"[7]

১। পূর্বে, পৃঃ ৬৬-৬৭।

২। আত্মত্যাগ ও জাতীয় উন্নতি, নূর, মাঘ, ১৩২৬। প্রবন্ধটি ছোলতান, ১৪ই আষাঢ়, ১৩৩০ সংখ্যায় পুনঃ প্রকাশিত হয়।

৩। শক্তির লীলা, নূর, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৬।

৪।(ক) "হিন্দু কোন জাতির লোক যদি অন্য বিজাতীয় লোকাপেক্ষা সত্য সত্যই আপনাদিগকে নিকৃষ্ট বা হীন বলিয়া বিশ্বাস করে তবে সে রোগের প্রতিকার নাই। সমগ্র স্বর্গীয় শক্তিও যদি তাহার পৃষ্ঠ পোষকতা করে তথাপি সে অধম, সেই অধমই থাকিবে।"—জীবন প্রবাহ, ছোলতান, ২১শে আষাঢ়, ১৩৩০।

(খ) "দুর্বলের প্রতি বিধাতার কোনও অনুগ্রহ নাই। দুর্বলের জীবন ধারণ শুধু সবলের সেবা ও পুষ্টির জন্য। --ফলতঃ সৃষ্টির ভিতরে দয়া, অনুগ্রহ মেহেরবাণী বলিয়া কোনও জিনিষ নাই। সৃষ্টির সর্বত্র কেবল শক্তির প্রতিযোগিতা ও লীলা প্রকটমান। যে শক্তিশালী, যে ক্ষমতাশালী, সেই বাঁচিবে, সেই টিকিবে। জগতের প্রভুত্ব, সুখ ও সৌভাগ্য সম্ভোগ তাহারই জন্য।"—যোগ্যতমের উদ্বর্তন, আবে হায়াত, পৃঃ ২৫।

(গ) "যে কোন ঘা দেয়, সে অত্যাচারী হইতে পারে। কিন্তু সে অধম নহে। বরং সে ক্ষমতাশালী।-- কিন্তু যে ঘা খায়, এবং বিনা প্রতিবাদে নীরবে তাহা হজম করে, সে নিশ্চয়ই অধম ও অক্ষম।"—আত্মাবলম্বন ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা, সওগাত, পৌষ, ১৩২৬।

৫। ভারতের বর্তমান অবস্থা ও মুসলমানের কর্তব্য, ছোলতান, ২১শে আষাঢ়, ১৩৩০।

৬। যোগ্যতমের উদ্বর্তন, আবে হায়াত, পৃঃ ২৭।

৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

তাহতে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের ইতিহাস অনুসন্ধান করে তিনি দেখেছেন, তাতে হিন্দুরা ছিল সম্রাট আকবরের দক্ষিণবাহু, এমনকি, "আওরঙ্গজেবের মত গোঁড়া বাদশাহের সেনাপতি জয়সিংহ ছিলেন।" বর্তমান মুহূর্তেও তিনি লক্ষ্য করেছেন, হিন্দুর সংগে বাস করতে হবে, বাঁচতে এবং মরতে হবে। ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিই পরধর্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয় এজন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, "সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাহারা তোমাদিগকে হিন্দুদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে নিষেধ করে, অথবা সাগ্রহ সম্মতি দান করেনা, তাহারা হয় নির্বোধ, না হয় গভর্ণমেন্টের চর, না হয় ইসলামের ও মুসলমানের শত্রু, না হয় মীরজাফরের বংশধর। ইহারা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।"[1]

শিরাজীর সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের পরিণতি এখানেই। বস্তুতঃ, শিরাজীর সমকালের উন্নত ও অতীতের গৌরবদীপ্ত মুসলমানরা বাংলার বিশেষতঃ ভারতের সীমার বাইরে অবস্থিত। তারা কেবলমাত্র প্রেরণার স্থল ছাড়া আর কিছু নয়। বহির্বিশ্বের মুসলমানদের দ্বারা রাজ্যহরণের আশংকা নেই, ফলে তাদের সংগে শিরাজী প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হননি। অন্যদিকে হিন্দুর সংগে প্রতিযোগিতার অবশ্যম্ভাবী ফল হল সাহিত্যে হিন্দু সম্পর্কে কোথাও কোথাও অসহিষ্ণু কটুকর উক্তি। এগুলো শেষ কথা নয়, সাধারণ দরিদ্র মুসলমানকে শোষণের ব্যাপারে হিন্দু মহাজনের মত মুসলমান ভিক্ষাজীবি মোল্লা মৌলবী এবং ভণ্ড পীর ফকিরদেরও সমানভাবে অপরাধী মনে করেন। হিন্দু ও মুসলমানের সহাবস্থানকে তিনি অস্বীকার করেননি, এমন কি অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রসরমান হিন্দু সমাজকেও আদর্শ মেনেছেন। তাছাড়া হিন্দুও মুসলমানের মত সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু দূরের মুসলমান যতটুকু প্রেরণাদায়ক হতে পারে, তার চেয়ে নিকটের হিন্দু উদ্দেশ্য সাধনের অধিকতর উপযোগী। বর্তমান মুহূর্তে মুসলমানের গৌরব কেবলমাত্র ইতিহাসে সীমাবদ্ধ, কিন্তু হিন্দু নিকটতম প্রতিবেশী। এজন্য শিরাজী সমকালীন হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে বিরাজমান জাতিবৈরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে জাতিবৈর স্ফূর্তির উপযুক্ত ক্ষেত্র মনে করেছেন।[3] কিন্তু বাংলায় মুসলমানদের নিকট ইংরেজ অনেক দূরের বস্তু। উনিশ শতকের শেষভাগে এমন কি এ শতকের গোড়াতেও শিক্ষিত হিন্দুর নিকট লক্ষ্য ছিল দূরের মুসলমান এবং নিকটের ইংরেজ, একই উপায়ে পরবর্তীকালের মুসলমানের জন্য লক্ষ্য ছিল দূরের মুসলমান এবং নিকটের হিন্দু।[4] এজন্য মুসলমানের সমাজচিন্তা ও রাজনীতি চিন্তা হিন্দুর তুলনায় সহজেই অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট হতে পেরেছে। শিরাজী হিন্দুর মত ইংরেজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের

১। নিখিল বঙ্গীয় কর্মী সম্মেলন, সভাপতির অভিভাষণ, পৃঃ ১৫।
২। আসামে বাঙালী মোছলমান, মোহাম্মদী, ১০ই পৌষ, ১৩৩৩।
৩। পূর্বে, পৃঃ ৪০।
৪। আরো বিবরণ, পূর্বে, পৃঃ ১৬৪-৬৫।

সভ্য করে তুলেছিলেন, মুসলমানকে হিন্দুর সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশীদার করে তুলেছিলেন, এখানেই সিরাজীর সমাজ চিন্তা তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থা অতিক্রম করে জাতীয়ভাবধারা ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। বৃহত্তর মুসলমান সমাজের তুলনায় এখানে তিনি অনেক অগ্রসর, দেশের স্বাতন্ত্র্যের জন্য হিন্দুর সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেছেন। "পরাধীন ও পরপদলুণ্ঠিত ভারতবর্ষে" ধর্মের নামানুষ্ঠানে "কাছা ও টিকির বহরকে"[১] সমানভাবেই নিন্দা করতে পেরেছেন।

মুসলমান সমাজে নিজস্ব শক্তির উৎসকেও তিনি জাগ্রত করে তোলবার চেষ্টা করেন। ব্যক্তির সমন্বয়ে সমাজ গঠিত হয়, সুতরাং ব্যক্তির উপযুক্ত বিকাশও সমাজ গঠনের সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত। ব্যক্তির সামনে আত্মপ্রতিষ্ঠার বাস্তবতাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "এ সংসার প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভীষণ ও ভয়াবহ ক্ষেত্র। এখানে স্নেহ মমতা দয়ার অনুগ্রহ বলিয়া কিছুই নাই। যতক্ষণ ক্ষমতাশালী, বিত্তশালী অর্থশালী না হইতেছ, ততক্ষণ কে তোমাকে মানে আর চেনে? চিনিলেই বা মানে কয়জনে? তুমি উপযুক্ত হও, ক্ষমতাশালী হও, বিত্তশালী হও তখন মান সম্মান আপনা আপনি চরণতলে ধূলিপুঞ্জের ন্যায় লুণ্ঠিত হইবে।"

তিনি এ প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে মানুষকে তিন প্রকারে শ্রেণীকরণ করেছেন, যারা আদর্শী নয় -তাদের দ্বারা সমাজ কলঙ্কিত হয়। অন্য এক শ্রেণী সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেও ঘূর্ণিবাত্যায় স্থির থাকতে পারে না। এদের সকলের ওপরে এক শ্রেণীর দৃঢ়চেতা, অসমসাহসী, অধ্যবসায়শীল মানুষ আছে যারা মানবজাতির অলঙ্কারস্বরূপ। এরাই প্রকৃত অর্থে স্থির সামাজিক আদর্শ, এদের মত করেই সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তোলবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।[২] এজন্য সবচে প্রয়োজন মনুষ্যত্বের, এর অভাবেই সত্য মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন হয়। অনুশীলিত মনুষ্যত্বের এ শক্তিকে জাগ্রত করার মাধ্যমেই পৃথিবীকে আলোকিত করে তোলা সম্ভব, সিরাজী এরই পক্ষপাতী ছিলেন।[৩] মুসলমান সমাজের নিকট বাস্তবতাবোধের ব্যাখ্যা দান করে তাদের চলমান বিশ্বের উপযোগী করে তুলতে চেয়েছেন, প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের সঙ্গে সহাবস্থানের, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সম্মিলিত আবেগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তুলেছেন এখানেই সিরাজীর সমাজ চিন্তার অন্যতম বিশেষত্ব। তিনি বলেছেন, "খনিজ নিষ্কাশন ব্যতীত ভূমি সরল হয় না, বৃক্ষ ফলপুষ্প ধরে না, তেমনি হৃদয়ের কুসংস্কার ব্যতীত আত্মার জীবন, অঙ্কুরিত এ

১। শক্তির প্রতিযোগিতা, সাধনা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮।

২। জীবন ও সংগ্রাম, সাধনা, পৌষ, ১৩২৬। পরে মোসলেম পত্রিকায়, ২৮শে আষাঢ়, ১৩৩০ সংখ্যায় পুনঃ প্রকাশিত হয়।

৩। মনুষ্যত্ব, সাধনা, মাঘ, ১৩২৬।

এবং মুকুলিত হয় না।"[১] এ মন্তব্যের আহ্বান হিন্দু মুসলমান সকলের জন্য, শিক্ষিত বাঙালীর জন্য প্রযোজ্য।

চার

সিরাজীর সমাজচিন্তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল রাজনীতি। সমাজ চিন্তার মত এক্ষেত্রেও তিনি মুসলমানদের নিয়ে শুরু করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়কেই স্পর্শ করেছেন।

সিরাজী বাংলার মুসলমানদের দেশের এ পতিত অবস্থায়, তাদের এ পতনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে দেখেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বিচ্যুতি। মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় মুসলমানের কেন্দ্রীয় রাজশক্তিকে দুর্বল করে, বাংলায় সিরাজদ্দৌলার নিকট থেকে ইংরেজ শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেয়, এবং কালক্রমে অস্ত্রশক্তির এবং জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত ইংরেজ সর্বক্ষেত্রের অধীশ্বর হয়ে ওঠে। সিরাজী লক্ষ্য করেছেন, আত্মবিস্মৃতির ফলে মুসলমানদের পতন ঘটেছে এবং পতনের ফলেই তাদের আত্মবিস্মরণও চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। মুসলমানরা এখন ইংরেজদের কূটকৌশলের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত, কেবল স্বদেশে নয়, মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ইংরেজের বিজয় গৌরবের সঙ্গে মুসলমানের পরাজয় প্রায় সম্পর্কিত। ইংরেজকেই তিনি প্রধান আক্রমণ স্থল বলে চিহ্নিত করেছেন, সেকারণে তাঁর রাজনীতি চিন্তার সবচেয়ে বড় কথা হল স্বাধীনতা।

সামাজিক ক্ষেত্রে যে হিন্দুকে তিনি প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করেছেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদেরও ইংরেজের অধীনস্থ হিসাবে দেখেছেন। এখানে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের স্বার্থকেও জড়িত করেছেন, এবং তাদের একত্রে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্য আহবান করেছেন। অনগ্রসর মুসলমানদের মনে ইংরাজ মুক্তির জন্য তাদের এ প্রেরণা দিতে চেষ্টা করেছেন, স্বাধীনতার উত্তরাধিকার অর্জন সম্পর্কে। ইংরেজের সঙ্গে মুসলমানের সামাজিক বিরূপ বাধা কারণেই হয়তো সেজন্য সিরাজীর চিন্তাতে ইংরেজের অবস্থান কেবলমাত্র রাজনীতির মধ্যেই, ইংরেজের শাসনের ফলে মুসলমানদের সামাজিক রাজনৈতিক অধিকার সংকুচিত হয়েছে সুতরাং তাদের সঠিক সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থান অর্জন করার সঙ্গে ইংরেজের অবশ্যম্ভাবী প্রস্থান সম্পর্কিত।

হিন্দু জমিদারেরা যেভাবে সমাজ কল্যাণমূলক কর্মে নিবেদিত, সুপ্রতিষ্ঠিতদের উদ্যম, মুসলমানদের ক্ষেত্রে তার অভাব রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে অভিজাতদের সংখ্যা এমনিতেই বেশী নেই, যারা আছেন

১। কুসুম প্রাণ, বক্তৃতা, রংপুর, ১৩১২।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা আত্মকেন্দ্রিক, রাজনীতি অসচেতন, স্বাজাত্যবোধ বিমুখ, মুসলমানদের সামাজিক উন্নতির প্রতি আগ্রহী নন। হিন্দু জমিদারেরা কংগ্রেসের রাজনীতিকে যেমন গতিশীল করে তুলেছেন, মুসলমান জমিদার-শ্রেণী এ ব্যাপারে পশ্চাৎপদ। এজন্য সিরাজী জমিদার শ্রেণীর পরিবর্তে সাধারণ কৃষক প্রভৃতির ওপর নির্ভর করেছেন। তাছাড়া প্রত্যক্ষভাবেও সিরাজী সাধারণ শ্রমজীবি মানুষের অনেক কাছাকাছি, প্রচারক জীবনে মুসলমান সমাজের বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি তাদের দারিদ্র্য দেখেছেন, আত্ম-নির্যাতনমূলক কুসংস্কার দেখেছেন, ধনী মুসলমানের সঙ্গে দরিদ্র মুসলমানদের সম্পর্কহীনতা দেখেছেন। মুসলমানদের এ অনৈক্য যেমন ব্যক্তিগত তেমনি জাতিগত, এসলামিয়া পাট কোম্পানী, জাতীয় ধনভান্ডার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে যৌথ ও সামাজিক মালিকানায় সম্পদের উৎসকে স্থাপন করে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। তাঁর যুক্তি মত গোষ্ঠী কিংবা হিন্দু সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চৈতন্য যদি জাগতে পারে, মুসলমান সমাজে ঐক্য স্থাপনের বিস্তৃত পটভূমি সত্ত্বেও তাদের মধ্যে তা কেন সম্ভব নয়?

সিরাজী দেখেছেন, মুসলমানদের হীনবল হবার অন্যতম কারণ হল আত্মবিস্মৃতি এবং বাহুবল চর্চার অভাব। অতীতের পূর্বগৌরব স্মরণ করার পাশাপাশি এজন্য সিরাজী মুসলমানের বাহুবলের উদ্বোধন করেছেন, সে সুযোগ তিনি পেয়েছেন মহররম উৎসবের মধ্যে। প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ শিবাজী উৎসব, প্রতাপাদিত্য উৎসব উপলক্ষে বাহুবলের প্রদর্শন করছে, কিন্তু মহররম উৎসবের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা এ ব্যাপারে বিমুখ। এ জন্য তারা হীনমন্যতায় ভুগছে, শক্তি সম্পর্কে সন্দেহে আন্দোলিত। শক্তিসাধনাই মূল কথা, উৎসব একটি উপলক্ষ মাত্র, বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে হিন্দুরা যেমন একটি সুযোগ পেয়েছিল, তার উপযুক্ত ব্যবহারও করেছিল। হিন্দুর উৎসবগুলোর সামাজিক রাজনৈতিক সাফল্যের সিরাজী প্রত্যক্ষদর্শী, মুসলমানের জন্য কোন বিকল্প না থাকলে তারা হিন্দুর উৎসবে যোগ দেবে এবং এর ফলে আত্মবিস্মৃতি আরো বাড়বে। এজন্য তিনি মহররমের শোকের অংশটুকু বর্জন করে, ব্যায়াম চর্চা, লাঠি খেলা, তরবারি খেলা, অর্থাৎ শক্তিপ্রকাশের মাধ্যমগুলো পুনরুজ্জীবনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। সাধারণ শিক্ষা, এমন কি স্ত্রী শিক্ষারও অংশ করে তোলেন ব্যায়াম চর্চা। সিরাজী প্রথম যৌবনেও সিরাজগঞ্জে ব্যায়াম শিক্ষাগার স্থাপন করেন।[১] এবং শেষ বয়সে যখনই সুযোগ পেয়েছেন উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে শাগরেদদের দিয়ে বাহুবলের প্রদর্শন করেছেন।[২] মুসলমানদের তিনি রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত করে তুলতে চেয়েছিলেন,[৩] এ শতকের পূর্বার্ধে আফগানিস্তানের [illegible] জাগরণ এবং শিক্ষিত হিন্দু

১। এম, নূরউদ্দীন রোকনী/ডাঃ সুলতান প্রতাপ সিরাজী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী স্মরণিকা, পৃঃ ৩৭।

২। পূর্ব, চতুর্থ অধ্যায়।

৩। "বিপ্লবের যুগে- রাজনৈতিক পরিবর্তনের যুগে, যে জাগিবে-সে বাঁচিবে, যে উন্মত্ত হইবে সেই বাঁচিবে, সেই টিকিবে।"—ভবের উচ্ছ্বাস, কার্তিক বর্ষ -৫৫০-ক।

সম্প্রদায়ের শুদ্ধি আন্দোলনের মধ্যেও তিনি অনুভব করেছিলেন। আফগান আক্রমণের আশঙ্কায় ইংরেজ পাইবার রোডওয়ে স্থাপন করে, হিন্দু অসহযোগ আন্দোলন থামিয়ে দেয়, হিন্দুদের সংগঠিত করার জন্য একই প্রতিক্রিয়া থেকে শুদ্ধি আন্দোলনের সূচনা হয়।[১] বলা বাহুল্য, শুদ্ধি আন্দোলন সম্পর্কে এ ধারণা সিরাজীর নিজস্ব, তবে আফগান আক্রমণের জন্য বাংলার হিন্দু ও শঙ্কিত ছিলেন না তা নয়।[২] কারণ যাই হোক, হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে এসময়ে এক প্রকার শীতলতা সৃষ্টি হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের মত স্বরাজ আন্দোলনের ব্যর্থতার আশঙ্কাও তাকে স্পর্শ করেছিল।[৩] স্বাধীনতা সম্পর্কে সিরাজীর ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট, তিনি বলেছেন, "এক বৃক্ষের নিম্নে যেমন অন্য বৃক্ষ জন্মিতে পারে না, তেমনি এক জাতির পরাধীনতার আওতায় অন্য জাতি জ্ঞানে, ধর্মে, শৌর্যে, বীর্যে, কখনও বাড়িয়া উঠিতে পারে না। পরদেশ নীচে বীজ পড়িয়া চারা জন্মিলেও তাহা যেমন অনাহারে শুকাইয়া মরিয়া যায়, আকাশের নীচে মুক্ত বাতাসে রোপণ না করিলে, অচিরেই মরিয়া যায়, তেমনি পরাধীনতার অন্ধ ছায়ায় কোন জাতি দীর্ঘকাল অবস্থান করিলে বাঁচা ও বাড়া দূরে থাকুক অচিরেই তাহার জীবনী শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়।-- যে নদীর জেলের স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায় তাহা যতই বৃহৎ ও বিস্তৃত হোক না কেন, তাহার জল যতই নির্মল হোক না কেন, সেই নদীতে যেমন বাণিজ্য তরণী ও স্টীমার চলাচল করিতে পারে না, তেমনি যে জাতির স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে জাতির মনের দারিদ্র্যতেও বড় বড় কাজ করিবার এবং আপন জোওয়া কীর্তি রাখিবার কিংবা গৌরব করিবার মত বড় বড় খেয়ালের নৌকা সঞ্চরণ করিতে পারে না। সেই জন্য আগে জাতির মুক্তি চাই, তাহার পরে গৌরব ও প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজন। ফুল আগে ফুটিবে, তাহার পরে গন্ধ ছুটিবে এবং সৌন্দর্যে সকলকে মুগ্ধ করিবে।"[৪] অন্যত্র একটু ভিন্নভাবে প্রায় একই কথা পুনরুচ্চারণও করেছেন[৫], এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু মুসলমানকে পৃথক করে দেখেননি। তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটী নরনারীর একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান ও চিন্তার বিষয় হউক।"[৬]

পাঁচ

সামাজিক, ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে জাতি ও স্বজাতি সম্পর্কীয় শব্দ এর অর্থ বাংলার মুসলমান, সর্বভারতীয় মুসলমান, এমন কি বিশ্ব মুসলমান, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতি অর্থে কেবল বাংলার হিন্দু মুসলমানের

১। মোসলেমের ঐর্ষাতত্ত্ব, আবে হায়াত, পৃঃ২৯-৩০।
২। পূর্ব, পৃঃ ২৮।
৩। বেদনা, সোলতান, ১৮ই মাঘ, ১৩৩০।
৪। জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার প্রয়োজন, সোলতান, ১৪ই ভাদ্র, ১৩৩০।
৫। বেদনা, সোলতান, ১৮ই মাঘ, ১৩৩০।
৬। জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার প্রয়োজন, সোলতান, ১৪ই ভাদ্র, ১৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

সম্মিলিত অবস্থান নয়, সমস্ত ভারতের সকল জাতি সত্তাকেও তিনি এক করে তুলেছেন। বাংলার ভৌগোলিক সীমা তাঁর অব্যবহিত লক্ষ্য হলেও সমস্ত ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাঁর কাম্য ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান অংশ নেন, শিরাজী তাঁদের অন্যতম, রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে হিন্দু-ধর্মের ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক ইংকে বিচলিত করেছিল, একারণে তিনি মুসলমানদের জন্য বিকল্প পথ অনুসন্ধান এর পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু হিন্দুর সংগে বিবাদ করে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াননি। এজন্য মুসলমান-দের মধ্যে যারা স্বাধীনতার প্রতি উদাসীন তাদের রাজনৈতিক সুবিধাবাদী বলেছেন, বৃহত্তর মুসলমান সমাজকে এদের বর্জন করে চলার জন্য তিনি উপদেশ দিয়েছেন।

উনিশ শতকের শেষভাগে শিক্ষিত হিন্দু জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির জন্য অতীত সন্ধানী হয়েছিল, এবং ভারতে বহু শতাব্দী একত্রে বসবাসরত হিন্দু মুসলমানের কেবলমাত্র সংঘাতের চিত্র তাদের জন্য প্রেরণা-দায়ক হয়েছিল। সমকালীন মুসলমানের সংগে এর কোন সংযোগ না থাকলেও তিক্ত সম্পর্ক সৃষ্টি হতে বিলম্ব হয়নি। শিক্ষিত মুসলমান হিন্দুর অংশগ্রহণ পরবর্তীকালে এর বিপরীত চিত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন, তুলনামূলকভাবে মুসলমানের প্রচেষ্টা ছিল আত্মরক্ষামূলক। জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি যদি স্বজাতিবহির্ভূত অন্য গোষ্ঠীর মানুষকে অনাত্মীয়, এমন কি অনেক ক্ষেত্রেই শত্রুভাবাপন্ন করে তোলে, বাংলায় শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কও কোন কোন দিক দিয়ে তাই দাঁড়িয়েছিল।[১] শিরাজী স্বজাত্যপ্রীতি ও রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধের মধ্যে বিপুলভাবে আন্দোলিত হয়েছিলেন। তিনি মুসলমানের গৌরবযুগের কথা স্মরণ করেছেন, কিন্তু হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়েছেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা শিরাজীর লক্ষ্য ছিল, তিনি প্রজাতন্ত্রও চেয়েছেন, কিন্তু স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতিতে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যা লঘু জনগোষ্ঠীর অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা কিছু ব্যক্ত করেননি। তাঁর উপন্যাসে স্বাধীনতা রক্ষা, রাজ্যস্থাপন সবই আছে, সামন্ততান্ত্রিক পটভূমিতেও তিনি অনেক ক্ষেত্রে নেমে এসেছেন, কিন্তু প্রজা-তন্ত্রের সৃষ্টি হয়নি। শিরাজী কেবল শক্তি সাধনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু যেভাবে শক্তি সাধনার বিকাশ দেখতে চেয়েছেন, একমাত্র দুর্বল ভারতের একটি অনগ্রসর সমাজের পক্ষেই তা উপযুক্ত হতে পারে। অতীত ভারতে মুসলমানদের প্রাধান্যবোধকে যেভাবে স্মরণ করেছেন তাঁর উদ্দেশ্য এটা হতে পারে যে, পুনরায় স্বাধীন ভারতের অর্থ যে মুসলমানের পূর্ব গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। প্রজাতান্ত্রিক প্রথায় রাজনৈতিক ভাবে তা আর সম্ভব নয়, এটা দিয়ে একটি আদর্শ সমাজ গঠন করা যেতে পারে মাত্র। এটা তিনি বোঝবার

১। পূর্বে, প্রথম অধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করেননি। সুতরাং সিরাজীর চিন্তায় স্বাধীন ভারতের সম্ভাব্য চিত্র অনেকাংশেই কল্পিত, সংযুক্ত স্বাধীন ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানের অবস্থান দেখলে সিরাজীর স্বপ্ন ভঙ্গ হতে পারত। কিন্তু তার অর্থ এই নয়, সিরাজীর রাজনৈতিক চিন্তায় দ্বিজাতিতত্ত্বের পূর্বাভাস ছিল। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানের পার্থক্য স্বীকার করেননি, এমন কি নির্যাতনের দুঃখও নয়।

অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে [তিনি] মুসলমানদের তুর্ক তাতুরীর মোহ পরিত্যাগ করতে আহবান করেন, খিলাফত পরবর্তী হিন্দু মুসলমান বিরোধের পটভূমিতে মওলানা মহম্মদ আলী প্রমুখ যখন কংগ্রেস রাজনীতি থেকে দূরে সরে যান, সিরাজী তখনও কংগ্রেসের সংগে একাত্মতাবোধ করেছেন। এমন কি শুদ্ধি আন্দোলনের সংঘাতও তাঁকে দূরে সরাতে পারেনি।

সিরাজী সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য রক্ষাকে মুসলমান সমাজের উন্নতির সহায়ক মনে করেছিলেন। কিন্তু ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে সামগ্রিকভাবে দেখেছেন, সেকারণে বলেছেন, "মোসলমানদিগকে স্বরাজ সংগ্রামে দুত অগ্রসর করিবার জন্যই স্বতন্ত্র জাতীয় সভা ও আপাতঃ রাজনৈতিক দল গঠন করা কর্তব্য। নচেত হিন্দুর সহিত সর্বতোভাবে মিশিয়া গেলে, মোসলমানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কিছুই থাকিবে না। আর রাজনীতি বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ক্ষেত্রে যখন হিন্দু মোসলমানে যত পার্থক্য চিরকালই কিছু কিছু থাকিয়া যাইবে, তখন আমাদের স্বতন্ত্র পলিটিক্যাল বডি Political body, গঠন করা একান্ত আবশ্যক। পতিত জাতিকে উঠাইতে হইলে তাহাকে সকল বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ও অবকাশ দেওয়া কর্তব্য, নতুবা প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে সে কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। এই রাজনৈতিক স্বতন্ত্র দল গঠনেই হিন্দু ও মোসলমানের সংগম, গঙ্গা ও যমুনা বিভিন্ন নির্ঝর হইতে নির্গত হইলেও প্রয়াগ বা আহমদাবাদে আসিয়া উভয়ে যেমন সম্মিলিত হইয়াছে তেমনি একদিন স্বাধীনতার মুক্তির জন্য হিন্দু মোসলমানকে সমানভাবে মিলিতেই হইবে।"[১]

স্মরণীয়, স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠনের কথা যখন তিনি বলছেন তখন মুসলিম লীগ (১৯০৬) এবং জমিয়ত-উল-উলেমা (১৯১৯) ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান। মুসলিম লীগের সৃষ্টি হয়েছিল, ঢাকায়, তৎকালীন পূর্ববাংলার প্রচুর মুসলমান এর সদস্য হয়েছিলেন। জমিয়ত-উল-উলেমা দেওবন্দ কেন্দ্রিক হলেও পূর্ব বাংলায় এর শাখা বিস্তৃত হয়েছিল, সিরাজীর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এর বাংলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

মুসলিম লীগ এবং জমিয়ত উভয়েই ধর্মকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ক্রিয়া কর্ম চালালেও তাদের

১। কবি সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মোসলেম মহা সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, ইসলাম দর্শন, ১৩০১।

দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল, মুসলিম লীগ ধর্মের কথা বললেও ইংরেজের সহায়তা নিয়ে রাজনীতিতে টিকে থেকেছে অন্যদিকে ইংরেজের বিতাড়নকেই প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে অবিভক্ত কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। লীগের প্রগতিশীল অংশ বিত্তবান মুসলমানদের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং বাংলায় এ রকম মুসলমানের সংখ্যা কম ছিল, কিন্তু অবিভক্তের রাজনীতির মধ্যে ধর্মকে অস্বীকার করে তারা অধিকদূর অগ্রসর হননি, তাঁরা ধর্মকে ঠিক আধুনিক সমাজ গঠনের উপযোগী করে তুলতে পারেননি। শিরাজী জীবদ্দশায় সদস্য না হলেও তাদের সামাজিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গীকে গভীরভাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। অন্যদিকে মুসলিম লীগের স্বাধীনতার ব্যাপারে অনাগ্রহ, সুবিধাবাদী ও ইংরেজ তোষণ নীতিতেও আস্থাশীল ছিলেন না, সেকারণে কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেও ধর্ম এবং রাজনীতি সম্পর্কে নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলেছিলেন। এ কারণেই শিরাজীর দৃষ্টিতে ধর্ম যেমন সমাজ ও রাজনীতি গঠনের সহায়ক তেমনি সকল শ্রেণীর মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র কৃষক শ্রমিকের ভাগ্য-এর সঙ্গে অভিন্ন। তা সত্ত্বেও মুসলমানদের প্রয়োজনে যে পৃথক দলের কথা তিনি বলেছেন, তার সম্ভাব্য গঠন কাঠামো এটা মনে হতে পারে যে, এ দলের সামাজিক ভূমিকা হবে সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের পরিপূরক কিংবা তার চেয়েও অগ্রসর। কিন্তু তাঁর প্রজাতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মুসলমানের পূর্ব গৌরব এবং সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ কিংবা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ নয়। শিরাজী ১৯৩১ সালের [illegible] মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ বিতর্কযোগ্য হয়ে উঠলেও তখনও তা ঠিক সঙ্কটজনক অবস্থায় আসেনি, সুতরাং শিরাজীর উভয় সামাজিক রাজনৈতিক দর্শন অস্পষ্টতায় পড়েনি। তা সত্ত্বেও তিনি মুসলিম গৌরবকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে বহু রকমের সোজা পথ বের থাকলে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যকেই সম্ভবতঃ মেনে নিতে পারতেন। রাজনৈতিক পরিবেশও অবশ্য সেভাবেই ক্রমে সৃষ্টি হয়ে আসছিল। শিরাজী স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী কালে মুসলিম লীগও পূর্ণ স্বাধীনতার পথ গ্রহণ করে, মুসলমানের পূর্ব গৌরবকেও সামনে নিয়ে অগ্রসর হয়। হিন্দুর ক্রমবর্ধমান সামাজিক রাজনৈতিক চাপের মুখে শিরাজী হয়ত মুসলমানদের জন্য কোন বিকল্প উন্নততর রাজনৈতিক সংস্থা বা সংগঠনের অভাবে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক দর্শনকে সমর্থন করতে পারতেন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের দিক থেকে এটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়।[1]

১। পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ছয়

শিরাজীর জীবদ্দশায় বাংলায় শিক্ষিত মুসলমানদের সামাজিক রাজনৈতিক মতামত প্রথম দুই দশকে প্রধানতঃ দুটো শিবিরে বিভক্ত ছিল, একদল সমাজকে অবিকল এবং পরিবর্তনহীন রাখার পক্ষপাতী, অন্যেরা মুসলমান সমাজের জড়তা কাটিয়ে একে আধুনিক বিশ্বের উপযোগী করে তুলতে চেয়েছেন। এরা যুগোপযোগী শিক্ষা দান, স্ত্রী শিক্ষা দান, অবরোধ প্রথা বর্জন, এমন কি ধর্মের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দান করে সমাজ প্রগতিকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। ভাষা ও সাহিত্যকেও জীবনের সংগে সম্পর্কিত করে তুলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে চেয়েছেন। অন্যদিকে বিপরীত শিবিরের সদস্যরা ধর্ম, সমাজ এবং এমন কি ভাষা সাহিত্যকেও সেভাবে সঙ্কীর্ণ করে তুলেছিলেন। অনেকটা এ কারণেই অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীলদের হাতে ভাষা ও সাহিত্যের মত শিল্প মাধ্যমও প্রয়োজনের নিরিখে ব্যবহৃত হয়েছে, তারা একে জাগরণমূলক নানা মুখী উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার করে তোলেন। জাগরণের প্রেরণা সৃষ্টির জন্য এদের মধ্যে প্রায় সকলেই মুসলিম বিশ্বের এবং মুসলমানের অতীতের গৌরবজনক ইতিহাসের দিকে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জটিলতার ফলে প্রতিফলিত মূল্যবোধ বিচলিত হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গের পর বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশেষ করে পূর্ববাংলার শিক্ষিত এবং মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকের পক্ষেই কংগ্রেসের জাতীয় রাজনীতির সংগে উত্তরোত্তর সম্পর্ক রক্ষা করা কঠিন হয়ে ওঠে। একজন মাআজ মন্তব্য করেন, "মুসলমান জাতি চিরকালই রাজভক্ত। যে জাতি একেশ্বরবাদী, তাঁহারা রাজভক্ত না হইয়া পারেনা।"[1] জাতীয় ও ধর্ম বোধ শিরোনামে ইসলাম প্রচারক পত্রিকাতেই মন্তব্য করা হয়, "বঙ্গ বিভাগের বিক্ষোভজাত বিকৃত স্বদেশী আন্দোলনকারী হিন্দু নেতৃবৃন্দের বিদ্রোহমূলক বক্তৃতায় দেশে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে।—ইহারা ধোঁকা দিয়া মুসলমানদিগকে বোকা বানাইয়া [illegible] চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ মুসলমান দলপতিগণ সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করাতে তাহাদের বড় সাধ বাদ পড়িল, সকল আশা ভরসা মিটিয়া যাইবার উপক্রম হইল।"[2] অথবা, "যেমন হিন্দুর দেবতাগণ বাহ্যিক পরিচ্ছদে অপূর্ব শোভাসম্পন্ন, কার্য্যতঃ প্রাণহীন জড় পদার্থ—তাহাদের কল্পিত স্বদেশী আন্দোলনেরও অবিকল সেই অবস্থা।"[3] ইসলাম প্রচারক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় এ ধরনের মন্তব্য আরো প্রকাশিত হয়েছে। এর বিপরীত চিত্রও ছিল, যেমন, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদকে একিনউদ্দিন কল্যাণকর মনে করেননি।[4]

১। একজন মাআজ—বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন, ইসলাম প্রচারক, সেপ্টেম্বর, ১৯০৫।
২। জাতীয় ধর্ম ও সংবাদ, ইসলাম প্রচারক, ফাল্গুন, ১৩১০।
৩। বঙ্গীয় মুসলমানদিগের গাত্রোত্থান, সম্পাদক, প্রাগুক্ত।
৪। একিনউদ্দীন আহমদ—বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, নবনূর, আশ্বিন, ১৩১২।

Dhaka University Institutional Repository

কংগ্রেসের প্রতি মুসলমানদের যুক্তিসংগত মনোভাব গ্রহণের জন্য শেখ ওসমান আলি বি-এল, আহ্বান জানিয়েছেন।[১] রাজনীতি সম্পর্কে এ সময়কার পত্র-পত্রিকা ও মুসলিম সাহিত্যিকদের মতামত আপেক্ষিক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াও মিশ্র।

সিরাজী তাঁর সাহিত্যিক, প্রচারক এবং রাজনৈতিক জীবনের সূচনাপর্বে ইসলাম প্রচারক পত্রিকা থেকে প্রচুর সহায়তা পেয়েছিলেন, কিন্তু এর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি। ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় যখন তিনি মুসলিম জাগরণমূলক কবিতা প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করছেন, পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতির দুর্যোগপূর্ণ সময়ে বংগভংগ, স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদির সংগে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকেছেন। এ কারণে তিনি মুসলমান সমাজের একাংশের নিকটই বরং নিন্দিত হয়েছেন বেশী। পরবর্তীকালের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সংগে একান্তই নিজস্ব মনোবৃত্তির আলোকে যুক্ত থেকেছেন।

আরো পরে মোটামুটিভাবে সওগাত, ছোলতান ইত্যাদি পত্রিকা জাতীয় রাজনীতির সংগে মুসলিম স্বার্থের একটি আপোষ রফার ব্যবস্থা করেছে, জাতীয় রাজনীতি প্রবাহের সংগে মুসলমানদের যেমন সম্পর্ক নির্ণয় করেছে, তেমনি জাতীয় রাজনীতির বিচ্যুতির সমালোচনাও করেছে।

শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষকদের সংঘ, যুবকের সমাজ ইত্যাদি গড়ে উঠছে, সওগাত পত্রিকা এনে বলেছে, "এই সমস্ত দাবী দাওয়া নিজের দাবী বলিয়া গ্রহণ না করিলে কংগ্রেসকে একদিন বাধ্য হইয়াই সকলের সাহায্য চাহিতে হইবে।"[৩] মুসলিম লীগ সম্পর্কে বলেছে, "মুসলিম লীগ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বটে, কিন্তু আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, উহা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান।--প্রত্যেক কাজে কংগ্রেসের ভিটো দিয়া থেকে মুসলিম লীগের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। মুসলমান সমাজের ন্যায্য দাবী দাওয়া লইয়া কংগ্রেসের সহিত শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করিবার জন্যই মুসলিম লীগ"।[৪] স্বরাজ সম্পর্কে ছোলতান মন্তব্য করেছে, "স্বরাজের মহত্বকে বুঝিয়া তাহার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ব্যাখ্যা করিয়াই তুষ্ট হইব, কেবল মাত্র দাওয়া লিখিয়াছি বলিয়াই যে স্বরাজ পাই, তাহা বলিয়া আনন্দে আটখানা হইব, তাহার কোন অর্থ নাই।--স্বরাজের এরূপ ভুল অর্থ করিয়া যাহাতে আমাদিগকে প্রতারিত ও পথচ্যুত করা না হয়, তৎপ্রতি কংগ্রেসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।"[৫] সিরাজী নিজেও ছোলতান পরিচালনার সংগে যুক্ত ছিলেন, ছোলতান, সওগাত ইত্যাদি পত্রিকার মত সিরাজীর রাজনৈতিক মত মোটামুটিভাবে উদার-

---

১। শেখ ওসমান আলি বি-এল-- কংগ্রেস ও মুসলমান জাতি, হাফেজ, ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭।
২। পূর্বে, দ্বিতীয় অধ্যায়।
৩। কংগ্রেস ও মন্ত্রীত্ব : সম্পাদক, সওগাত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬।
৪। এবারকার মুসলিম লীগ : সম্পাদক, প্রাগুক্ত, মাঘ, ১৩৩৫।
৫। স্বরাজের ব্যাখ্যা, ছোলতান, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

-নৈতিক। অবশ্য দুয়েকটি ক্ষেত্রে প্রকাশিত শিরাজীর রাজনৈতিক মতামতকে পত্রিকার নিজস্ব মত বলে মানতে কোনকোন পত্রিকা অস্বীকার করেছে। বাহ্যতঃ শিরাজীর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কোন কোন ক্ষেত্রে বদলেছিল, যেমন সিরাজগঞ্জে পাটচাষী এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্বার্থকে কেন্দ্র করে মোসলেম মহাসভার আয়োজনে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন ক্ষেত্রেই নিজের ধারাবাহিক রাজনৈতিক দর্শন থেকে শিরাজী সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাননি।

দেশে মুসলমানদের রাজনীতিকে পুষ্টি করে তোলবার জন্য প্রাচীন ইতিহাস এবং বহির্বিশ্বের মুসলমানদের সঙ্গে তিনি আত্মিক সম্পর্ক বরাবরই বোধ করেছেন। কেবল শিরাজী একা নন, সে সময়কার শিক্ষিত মুসলমানদের অধিকাংশ একারণে বাংলা ও ভারতের সীমা অতিক্রম করে গেছেন। এয়াকুব আলী চৌধুরী এর কারণ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "ভারতে ভারতীয় মুসলমানগণ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই, স্বদেশ তাহাকে বিদেশী করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্যই তাহাদের দৃষ্টি চঞ্চল হইয়া বাহিরে ঘুরিয়া ফিরে--তাহাদের শূন্যপ্রাণের ব্যাকুলতা ভারতের বাহিরের মুসলমানকে জড়াইয়া ধরিয়া শান্তি-লাভের চেষ্টা করে। কাবুল- তুর্কী শক্তি সম্পদের মধ্যে আপনার ব্যথিত অন্তরকে ডুবাইয়া রাখে।"[২] বলা বাহুল্য, এ বক্তব্যের সঙ্গে শিরাজীর একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, তিনি মুসলিম বিশ্বকে নিয়েছেন বাংলায় মুসলমানদের শক্তির রাজনীতি গড়ে তুলবার জন্য, ব্যথিত অন্তরের শান্তিলাভের জন্য নয়। বস্তুত মুসলমান শিরাজীর ধ্যান নয়, উপলক্ষ মাত্র। তা সত্ত্বেও খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর বাংলায় সচেতন মুসলমানরা যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন, প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে অব্যাহত সম্পর্কের কারণে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাছাড়া মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বাংলার মুসলমানদের জন্য যে ধরনের জাতীয়তাবোধ, এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, তার বাণীরূপের প্রয়াসে তিনি ততদিন বন্দী, এবং শেষ পর্যায়ে মোটামুটিভাবে [illegible]। নির্বাসনের পূর্বমুহূর্তে সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নয়, বরং কারা-বরণের মধ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন যে জাতীয় রাজনীতি থেকে তিনি সরে দাঁড়াননি। তা সত্ত্বেও সাহিত্যে প্রকাশিত তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ক্রমেই যেমন স্বাতন্ত্র্যের জন্মদান করেছে, তিনি তার সঙ্গেও সম্পর্ক রাখতে পারেননি, মৃত্যু তাঁকে উত্তরকালের সম্ভাব্য সাহিত্যিক পরিণতি থেকে সুনিশ্চিতভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। একারণে চূড়ান্ত বিচারে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ যেমন খুব স্থিত নয়, তেমনি সমন্বিত জাতীয় ভাবধারাও তাঁর সাহিত্যের প্রক্রিয়ার সঙ্গে একেবারে অবিচ্ছেদ্য নয়।

১। পূর্বে, পৃঃ ৯০।
২। এয়াকুব আলী চৌধুরী—ভারতের মুসলমান ও স্বদেশিকতা, সওগাত, শ্রাবণ, ১৩৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি, শিরাজীর সাহিত্য, শিল্প, ধর্মচিন্তা, সমাজ দর্শন ইত্যাদির অনিবার্য সংযোগস্থল হল রাজনীতি। আবার এ যুগজীবী রাজনীতিবোধই তাঁর সাহিত্য, শিল্প, ধর্মবোধ, ও সমাজচিন্তাকে বৃত্তাকারে আলোকিত করেছে, তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিকও এসবের মধ্য দিয়ে বহুবর্ণে বিকশিত।

(খ) আত্মজীবনীমূলক রচনা ও ভ্রমণ কাহিনী

এক

শিরাজীর প্রথম জীবনের কারাবরণের অভিজ্ঞতা নিয়ে 'কারাকাহিনী', এবং শেষ জীবনে কারাবরণের বিবরণ নিয়ে রচিত হয় 'জেলের রোজনামচা'। কারাকাহিনী 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু জেলের রোজনামচা সম্ভবতঃ প্রকাশিত হয়নি। তাছাড়া রয়েছে 'তুরস্ক ভ্রমণ', গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল ১৯১৩, গ্রন্থটি তুরস্ক থেকে লিখিত এবং মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত পত্র সমষ্টি।

ভূমিকাতে দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে বলা হয়েছে এবং প্রকাশক উল্লেখ করেছেন, "পুস্তকের শেষ খণ্ডেই মূল্যবান বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, পাঠকগণ প্রথম খণ্ড পাঠ অপেক্ষা দ্বিতীয় খণ্ড পাঠে অধিকতর আনন্দিত হইবেন এবং তাহাতে বহু চিত্তাকর্ষক নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিবেন।"[১] গ্রন্থের শেষে দ্বিতীয় খণ্ডের সম্ভাব্য সূচী সম্পর্কে বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, তুরস্ক থেকে প্রত্যাবর্তন কালে মিশর, বোম্বাই, দিল্লী, আলীগড়, ভূপাল, কলিকাতা ও সিরাজগঞ্জে অভ্যর্থনার বিবরণ ইত্যাদি থাকবে। সুতরাং ধরে নেয়া যায়, এগুলো প্রথম খণ্ডের পরবর্তী সময়ের রচনা। দ্বিতীয় খণ্ডটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

'কারাকাহিনী' শিরাজীর প্রথম জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। প্রচারক ও কর্মজীবনের মাধ্যমে সমকালীন রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল, অনলপ্রবাহ কাব্য গ্রন্থে তা প্রকাশের মাধ্যম খুঁজে পেয়েছিল, পরাধীন ভারতে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক কারাবরণের পথটিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। চন্দননগরে আত্মগোপন করে থাকাকালীন সময়টি তাঁর এ মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণের পর্যায়। নিজের সুরাহার জন্যেই তিনি পরাধীনতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, এবং ক্রমেই স্থিতাবস্থা অতিক্রম করে নিজের বিশ্বাস ও জীবনের রূপরেখা স্পষ্ট করে তুলেছিলেন। সমকালীন মুসলমান ইসলামবাদীর পরামর্শে

১। প্রকাশকগণের নিবেদন, তুরস্ক ভ্রমণ, প্রথম খণ্ড।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে চাঁদে চলে যাননি। এর মধ্যে দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসটুকুই আরো দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারাবরণের ভীতি কেটে গেছে, রাজনৈতিক সংগে সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়েছে। স্বাধীনতা নামক সম্পদ মহামূল্যেই মাত্র কেনা যায় এবং নিজের, সমাজের, জাতির সঠিক আত্মবিকাশের জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য এ সত্যটিও তিনি এ নির্জন বাস ও কারাবরণ থেকে উপলব্ধি করেন। চন্দননগরে থাকলে তাঁর আত্মোপলব্ধির জন্য এতটা মূল্যবান সময়, পরবর্তীকালে আর কখনো এরকম অখণ্ড অবসর পাননি। এ সময়ে তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী হল আত্মসন্ধানীর, সব কিছুতেই তিনি নিজের অনুভবের ~~[illegible]~~ আলোকে স্থাপন করেছেন, ফলে অনেক ক্ষেত্রেই নির্দোষ মানুষের ঘটনাও হাস্যরসি-কতার স্পর্শে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। এ পটভূমিতে বসে শিবরাম যখন আত্মকথা বলেছেন, সমাজ, দেশ অনিবার্যভাবেই তাঁর চিন্তের সংগে মিশ্রিত হয়েছে। এ সময় উপন্যাস রচনা, আত্মগোপন করে বেড়ানো প্রকৃত অর্থে তাঁর নিজেকেই নব নবরূপে আবিষ্কার। অতি সাধারণ এবং তুচ্ছ ঘটনা বর্ণনা করতেও তিনি চমৎকার রসবোধ মিশ্রিত করেছেন। যেমন, "আমি মোটেই ওয়ালীকে নিতান্ত ব্যাকুল এবং দুঃখিত দেখিয়া তাহাকে স্পষ্টভাবে সুস্বরে সহিত বুঝাইয়া দিলাম যে, আমি চোর নহি। আমাদের দেশের ও জাতির মঙ্গলের জন্য একখানি বই লিখিবার জন্যই আমার নামে গবর্ণমেন্ট ওয়ারেন্ট বাহির করিয়াছেন। সে আমার কথা শুনিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় একজন পশ্চিমা নীচ জাতীয় স্ত্রীলোক একটি প্রদীপ হস্তে ধীরে ধীরে ছাদের উপর আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সহসা আমাকে শোয়া দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল যে, "ইঁহোহি চোর বাবু ইঁহা পলাইল বাড়ে।" আমি ও তাহার কথা শুনিয়া একেবারে অবাক।"[১]

দুই

কারামুক্তির পর তুরস্ক ভ্রমণ রচনার মধ্যে দুটো বিষয় উল্লেখযোগ্য, একদিকে তিনি মুসলমান সমাজের হিতচিন্তার বিভিন্ন দিক নানাভাবে প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে নিঃসংকোচে এবং প্রায় নিরলঙ্কৃতভাবে আত্মকথা বিবৃত করেছেন।

তুরস্কে মেডিকেল মিশনে স্বাস্থ্য বিভাগের ইন্সপেক্টর হিসাবে তাদের আমলদারীর বন্দোবস্ত দেখে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে তাঁর ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল।[২] এ অভিজ্ঞতার ফল ফল, শরীর চর্চা, স্বাস্থ্যরক্ষা, ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর পরবর্তী রচনাবলী। বোধহয় এ অঞ্চলের মুসলমানদের ব্যবসাবাণিজ্যে উন্নতি তাঁর

১। কারাকাহিনী, সাধনা, আষাঢ়, ১৩২৮।

২। তুরস্ক ভ্রমণ, পৃঃ ১২।

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[১] সিরাজী বাংলায় মুসলমানদের ব্যবসা বাণিজ্যে পিছু হটে অপব্যয় আচরণের কথা মনে করবারই বলেছেন। এখানে মহরম উৎসবের আড়ম্বর দেখেছেন,[২] বাংলায় মহরম উৎসব প্রচলনের প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। মসুর যাত্রাকে তিনি বীরত্বব্যঞ্জক মনে করেছেন।[৩] আলেকজান্দ্রিয়া, এডেন, কনস্টান্টিনোপল প্রভৃতি দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। পরে লিখেছেন, "মুসলমানকে দক্ষিণ হস্তে কোরাণ এবং বাম হস্তে বিজ্ঞান গ্রহণ করিতে হইবে।"[৪] অথবা, "দক্ষিণ হস্তে কোরাণ এবং বাম হস্তে বিজ্ঞানকে পরম শ্রদ্ধা সহকারে বরণ করিয়া লইতেই হইবে। নতুবা জগতে আমাদের ঠাঁই নাই।"[৫]

যুদ্ধের ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য দেবার জন্য আবেদন করে বলেছেন, "তোমরা আহার করিবার সময় মনে রাখিও তোমার সহস্র সহস্র ভাই বোন কাতর দৃষ্টিতে করুণ কণ্ঠে সামান্য আহারের জন্য তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে। কুকুর বিড়ালকে ভাত দিবার সময় তোমার ক্ষুধার্ত ভাই ভগ্নীদিগের কথা একবার স্মরণ করিও।"[৬] তুরস্ককে ইউরোপের কোন শক্তিই ঋণ দিচ্ছে না, অথচ যুদ্ধের জন্য প্রচুর অর্থ আবশ্যক। ভারতীয় মুসলমানদের অর্থ সাহায্য প্রদানের জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।[৭] হেলালে ওসমানিয়া পত্রে মুসলিম জগৎকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলার জন্য আটটি প্রস্তাব দেন। তুর্কী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লেখেন, পরে তা তুর্কীতে অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।[৮] রণক্ষেত্রের অবস্থা সম্পর্কে টাইমস পত্রিকায় প্রবন্ধ পাঠ করে মনে করেছেন, "তাহার উত্তর কেবল তোমাদের পক্ষেই সম্ভব।"[৯] মুসলমানের ঐক্যবোধ সম্পর্কে বলেছেন, বিশ্বব্যাপী তাঁদের ভ্রাতৃত্ব অছিন্ন।[১০] মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে এককালীন উপার্জন দেবার এবং বাংলার প্রত্যেক জেলা থেকে পাঁচজন করে শিক্ষার্থী এখানে পাঠাবার জন্য বাংলার মুসলমানদের আহ্বান জানিয়েছেন।[১১] হিরাতে মক্কা ও তোরাত নদীর মাঝামাঝি বিস্তীর্ণ অনাবাদী ভূখণ্ডে ভারতীয় মুসলমানদের বসতি স্থাপনের কথা বলেছেন।[১২] বিশ্বব্যাপী এবং সমগ্র ভারতে মুসলমানদের সঙ্কট মুহূর্তে ভারতে প্রত্যাবর্তন। হিন্দুর

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২।
৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২-১৩।
৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০।
৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১।
৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬-১০।
৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯।
১০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০।
১১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪।
১২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্নে তিনি নিঃসংশয়। তাজমহলের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, নানা কারণে হিন্দু মুসলমানের সদ্ভাব নষ্ট হলেও, মিলন অবশ্যম্ভাবী।[১] মুসলিম হিন্দুর মধ্যে ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্ক, ভারতে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক, ভারতে হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের সুসংবিত বিকাশের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে তুরস্কে অবস্থান কালে বাস্তব বিচার বুদ্ধি দিয়েই অনুভব করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর নিজের মধ্যে কোন প্রকার দ্বিধা বা অসমর্থতা ছিলনা, কেবল তাই নয়, মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে তাঁর কিশোরকালের কল্পনা এ সময়ে বাস্তবের সংস্পর্শে পরিণত রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। তুরস্ক থেকে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তীকালে রচিত সাহিত্যের মধ্যে এসব সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতাই নানাভাবে পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

তুরস্ক-ভ্রমণ গ্রন্থে শিরাজী ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে আপন অন্তরের কথাও বাঙ্গাপন করেছেন। তুরস্কে গমনের ব্যাপারে তিনি নিজের মনের মধ্যেই যেমন বাধাগ্রস্থ হয়েছেন তেমনি যখন উৎসাহনা পেয়েছেন তাও নিজের মনের মধ্য থেকেই। আকর্ষনটি তের প্রবল ছিল বলে স্বা[illegible]নবজাত সন্তান, দারিদ্র্য গ্রস্থ পরিবার, সুজলিত স্বদেশ পিছনে ফেলে জাহাজে আরোহন করেছেন। আত্মবিশ্বাসে সুস্থির শিরাজী যাত্রামুহূর্তে সবচেয়ে বেশী ক্রন্দন করেছেন।[২] ঊর্ধ্বে নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ, নীচে অনন্ত বিস্তৃত সমুদ্র, সমুদ্রের বিরাটত্বের সম্মুখে মানুষের সকল অহংকার বিলীন হতে দেখেছেন। এ সময়কার অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য গদ্যভাষা আর এগোতে পারেনি, তিনি কবিতায় বলেছেন,

"কতকাল হতে তুমি গাহিছ কি সঙ্গীত মহান,

কি অপার ভাবপূর্ণ। মুগ্ধ হতে কবির পরাণ।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, অনন্তরা সমুদ্রের অন্তরতুল্য, সমুদ্র আদি জননী। সন্তান কোলে নিয়ে জননী সিন্ধু উত্তাল নিদ্রাহীন, তাই তার অন্তরাশির মধ্যে নিত্য ক্রন্দন।[৪] রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এখানে পড়তে পারে। শিরাজী সমুদ্রের অথৈ জলরাশি এবং মনোহর কল্লোল শুনে সুমধুর সঙ্গীত অনুভব করেছেন, সে সঙ্গীতের মধ্যে কবিচিত্ত মুগ্ধ। সমুদ্রকে যখন অপূর্ব মনে করেছেন, তখন বর্ণনার চেয়ে কবিতার আশ্রয় নিয়েছেন। তুরস্ক-ভ্রমণ গ্রন্থে এরকম কবিতার সংখ্যা তিনটি, প্রথম কবিতা 'সমুদ্রকে নিয়ে',[৫] দ্বিতীয় কবিতা "ভূমধ্যসাগর দর্শনে"[৬] এবং তৃতীয় কবিতা "সমুদ্রে সূর্যোদয়।"[৭] এ ছাড়া

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ২২।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ২৫।
৪। সমুদ্রের প্রতি (১২৯৯) সোনার তরী, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৫৭, পৃঃ ৫৫-৫৮।
৫। তুরস্ক ভ্রমণ, পৃঃ ২৫-২৬।
৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ৪২-৪৬।
৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬-৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্র কবিতাংশও রয়েছে। তাঁর কবিতায় সমুদ্রের সূর্যোদয়ের ভীষণ সৌন্দর্য কবিচিত্তকে কিভাবে নাড়া দিয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে। যেমন,

উপরে অনন্ত নভো নাচেছে অনন্ত সিন্ধু
তার মাঝে নব রবি যেন সিন্দুরের বিন্দু।

হিন্দু রমণীর কপালে সিন্দুর চিহ্নকেই কবি এখানে সমুদ্রে সূর্যোদয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

অন্য একটি প্রসঙ্গে হিমালয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন ; "গিরিচূড়া হইতেই গিরিরাজ হিমালয় আমাকে যেন প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছিল।" এর পর গদ্য যখন কবির মনে সাড়া দিতে পারেনি, তিনি কবিতায় বলেছেন,

"নরকর বিরচিত অত্যদ্ভুত চির চমৎকার
কুতুব মিনার কিম্বা প্যারিসের আইফেল টাওয়ার,
"তাজ মহল" কি "তাজ রোহরা" যত কেন কল্পনা বর্ণনা
হিমাচল তুলনায় অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র রেণুকনা।"[১]

তুরস্কে 'বাবে আলী'তে তিনি একটি বক্তৃতা দেন, এতে সভায় তুর্কিস্থ সমাজের একাংশের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে, তিনি স্বরচিত কবিতা ও সঙ্গীত তাঁদের পাঠ করে শোনাতেন, সেখানে বসে সেগুলো অনুবাদ করে তাঁদের বুঝিয়ে দিতেন। তুর্কী অফিসারদেরও গজল ও কবিতা শুনিয়েছেন। শিবিরে অবস্থান করেই ডায়েরী প্রবন্ধ পত্র ও রিপোর্ট ইত্যাদি লিখেছেন।[৩] "জনৈক তুর্কীর অনুরোধে "আজাদাত্‌-বে শিরাজোর" 'ইউরোপের প্রতি" কবিতার ফরাসী ভাষায় অনুবাদ শুনে মন্তব্য করেন, "আমি যদি কবি হইতাম তাহা হইলে আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতাম।"[৪] তিনি চাতালজা রণক্ষেত্রের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন,

"আমরা চাতালজার ছাউনি বাইরে থাকিয়াও যুদ্ধের ভীষণতা তীব্রভাবে উপলব্ধি করিতেছি। কামানের অগ্নিশিখা এবং গোলা বিস্ফোরণে আকাশ মণ্ডল মুহুর্মুহু উল্কাকার ধারণ করিতেছে। অমুত্র চাতালজা প্রদেশে বিপুল তুর্কী বাহিনী রণক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছে। মর্মরা সাগর এবং কৃষ্ণ সাগর হইতে তুর্কী রণতরী শত্রু দলের প্রতি বিষমভাবে গোলা বর্ষণ করিতেছে। -- এদিকে বুলগারগণও আড্রিয়ানোপলের পতনে এবং রুশের সাহায্যে নূতন তেজে চাতালজা লাইন ভঙ্গ করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ

১। হিমাচলদর্শন, ছোলতান, ২৫শে আশ্বিন, ১৩৩০।
২। তুরস্ক ভ্রমণ, পৃঃ ৮৬।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৯।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

করিতেছে।"[১]

অথবা, "আমরা ক্রমাগত পাহাড়ের উপরে উঠিতে এবং নামিতে লাগিলাম। সূর্য তখন নীলা-কাশের পশ্চিম প্রান্তে রক্ত শিখা বিস্তার করিতেছিল। একটা পর্বতশৃঙ্গ হইতে সূর্য্যের অস্তগমন দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। আমার চক্ষে সে দৃশ্য যেমন মনোহর তেমনি কবিত্বপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এক খন্ড কৃষ্ণ জলদ সূর্য্যের অর্দ্ধেক অংশ আবৃত করিয়াছিল। নিম্নের অর্দ্ধাংশ হইতে আরক্ত আলোক-শিখা বিচ্ছুরিত হইয়া সমগ্র চাতালজা প্রদেশের অসংখ্য পাহাড়কে রঞ্জিত করিয়াছিল। ---আমি সেই নির্জনে পাহাড়ের মাথায় বসিয়া চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। সম্মুখস্থ পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে অসংখ্য তুর্কী শিবির দেখা যাইতে লাগিল। শিলিস্ত্রীর দিক হইতে অনবরত তোপের আওয়াজ শুনা যাইতে লাগিল। সান্ধ্যপবনে পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'চিনা' শাখাগুলি মর্ম্মরস্বরে দোল খাইতে লাগিল। সে দৃশ্য বাঙ্গালার গোধূলি রাগ-রঞ্জিত শ্যামল-শস্য ক্ষেত্রের মনোহর দৃশ্যাবলী মেন সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। বাঙ্গালার তরুবল্লী, বাঙ্গালার গ্রামপল্লী, বাঙ্গালার রাখাল ও কৃষকদিগের মেঠো সঙ্গীতের স্মৃতি আমার চিত্তকে আকুল করিতে লাগিল। বাঙ্গালার বসন্ত কালিন মধ্যাহ্নিত কোকিল-কুহু-কুজিত, অলি-গুঞ্জন মন্দ্রিত, নানা পুষ্পাভরণ ভূষিতা বাসন্তী প্রকৃতির রমনীয় শোভায় আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে আলোক প্রবাহের সঞ্চার করিল। আমি উচ্চৈঃস্বরে "মা! আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি" গানটি গাইতে লাগিলাম।

সঙ্গীত শেষ হইলে আবার আমি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। পাহাড়ের নানাস্থানে অনেক সদ্যমৃত অশ্বকঙ্কাল দেখা যাইতে লাগিল। জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসের তুষার স্তূপে এবং কর্দ্দমে পতিত হইয়া ভীষণ শীতে এই সমস্ত অশ্ব প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। এখানকার নিদারুণ ও কষ্টাবহ শীতের কথা চিরকাল স্মৃতিপথে বিরাজমান থাকিবে।"[২]

অথবা, "দুইখানি তুর্কী রণতরী অনবরত রুশগার ব্যূহ লক্ষ্য করিয়া তোপ ছুড়িতে ছিল। তোপের অগ্নি শিখায় বহুদূর আলোকিত এবং আমাদের চক্ষুর দৃষ্টি ব্যাহত হইতেছিল। সম্মুখের পাহাড়ে অনবরত দুপসেল এবং সিতাইয়েল বিদীর্ণ হইয়া ভীষণ নিনাদে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমেই তোপ ও শ্রপনেলের উজ্জ্বল বিদ্যুৎ সন্নিভ অগ্নি-শিখায়

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ১১৭-১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

আকাশ মণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমরা পাহাড়ের শিখরে দাঁড়াইয়া এই ভীষণ-সুন্দর রণরঙ্গ দেখিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূরে আমাদের সম্মুখের পাহাড়ের গায় উপর্যুপরি বুলগার পক্ষের নিক্ষিপ্ত সুপ্নেলের মণ্ডল ফাটিতে লাগিল। আর সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ বিকাশের ন্যায় তীব্র শিখায় আমাদের চক্ষু ঝলসিতে লাগিল। তুর্কী পক্ষের তোপ সকল পাহাড়ের অন্তরালে থাকিয়া গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল।"

"বুলগারদিগের তোপের গোলা ঊর্দ্ধ আকাশে উঠিয়া বিদীর্ণ হওয়ায় ধূমপুঞ্জ কুণ্ডলীকৃত ধূম্রজালসমূহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল।"[১] ইত্যাদি।

উভয় পক্ষের প্রচন্ড গোলার মধ্যে রণক্ষেত্রের ভীষণ ও সৌন্দর্যের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা কাল্পনিক নয়, এমন কি স্মৃতি রোমন্থনও নয়। প্রতিদিনের ঘটনাকে তিনি ডায়েরী এবং পত্রাকারে ধরে রেখেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আগুনের গোলক, মুমূর্ষু সৈনিকের আর্তনাদ, যুদ্ধের বিপুল ধ্বংসলীলা, তুর্কীবাসীদের দুঃখ যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করেছেন, তারই অবসরে মনের প্রশান্তি ও নিশ্চিত আশ্রয়ের জন্য কল্পনা দিয়ে বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে ফিরে এসেছেন। বাংলাকে তিনি প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করেছেন এবং বাংলার মানুষকে হিন্দু মুসলমানের ভেদবুদ্ধি দিয়ে পৃথক করে রাখেননি। সিরাজীর আগে বাংলায় আর কোন সাহিত্যিক সম্ভবতঃ এভাবে পরদেশীদের আত্মরক্ষার সংগ্রামে অংশ নিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হননি।

তুরস্ক ভ্রমণকালে সিরাজী সিরিয়া পরিভ্রমণও করেন। সিরিয়া পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র রচনা আকারে আল এসলাম পত্রিকায় প্রকাশ করেন,[২] কিন্তু এটা তুরস্ক ভ্রমণ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এখানেও প্রাকৃতিক পটভূমিতে নিজের অভিজ্ঞতার নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন।

"অতঃপর গোধূলির শেষ আলো মিলাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তোরণ হইতে অবতীর্ণ হইয়া "চমৎবা" হাসপাতালের দিকে দ্রুতবেগে অনুধাবিত করিলাম। শুক্ল দশমীর চন্দ্র ক্রমে আলোক বিকীর্ণ করিতে লাগিল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতবেগে অনুধাবিত করিলাম। সেই ক্ষীণ চন্দ্রালোকে আমাদের অশ্বগুলি যখন নির্জন প্রান্তর উপত্যকা এবং অরণ্যমধ্যে পদাঘাতে প্রতিধ্বনি তুলিয়া ধাবিত হইতেছিল, অশ্বের বেগে আমাদের পার্শ্বস্থ তরবারীর কোষ, যখন রেকাবের সহিত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিতেছিল, আমাদিগের পরিশ্রম এবং ঘর্মাক্তকলেবর ললাটে যখন স্নিগ্ধ নির্মল বায়ুর প্রবাহ শৈত্য ঢালিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, তখন সেই অবসন্ন শরীরেও বীরজনোচিত স্ফূর্তি ও উৎসাহ বোধ

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯।

২। আল এসলাম, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫, এবং পৌষ, ১৩২৫।

করিতেছিলাম। মরুজীবী অথবা অগ্নিজীবীর জীবন যেমন কঠোর, সেই তুলনায় তাহা অধিকতর স্ফূর্ত ও মুক্তও বটে।"[১]

প্রবাসে নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলোতে সিরাজী তাঁর কবিহৃদয়ের চতুর্দিকে এভাবে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, নিজেকেই এ পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত দেখে চমৎকৃত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ"(১৮৯৫) গল্পের কোন কোন বর্ণনা অংশের অস্পষ্ট দূরাভাস এখানে থাকলেও সিরাজীর এ বর্ণনা বাস্তবের স্পর্শজাত, অভিজ্ঞতাটুকু সত্যই মনোহর, পূর্বসূরী কোন রচনার মধ্যে আদৌ বিলীন হয়ে যাবার মত নয়।

তিন

তুরস্ক সিরাজীর আকাঙ্ক্ষালালিত স্বপ্নের দেশ, এখানে ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনে বাস্তব ও কল্পনার সমাহার ঘটেছে। প্রচারক জীবনের সঙ্গে সংযোগ, পরাধীন ভারতে মুসলমানদের অস্তিত্বতা, মুসলিম বিশ্বে দুর্যোগের সূচনা, তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম, এগুলো সম্মিলিতভাবে তাঁকে তুরস্কের অজানা পথে অজানা ভাগ্যের সন্ধানে টেনে এনেছিল। যুদ্ধের পটভূমিতে জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দুঃসাহসিক সে পথ, এখানে আগমনের ফলে স্বর্ণাকর্ষের একটি অনুদ্ঘাটিত ভুবনও তাঁর জন্য অপেক্ষিত ছিল। প্রাচ্যের অনুরাগকে সিরাজী এর বিপুল শিহরণ বোধ করেছিলেন। মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাস্তব সংযোগ তুরস্ক ভ্রমণ গ্রন্থের অন্যতম প্রতিপাদ্য, কিন্তু সেই একই সঙ্গে আবিষ্কারের আনন্দও যুক্ত হয়েছে। ভ্রমণের উত্তেজনার মধ্যে [তিনি] নিজেকে যেমন নতুন আলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তেমনি পরাধীন স্বদেশ ভূমিকেও নতুনভাবে আবিষ্কার করে নিয়েছেন।[৩] কেবল তাই নয়, পরাধীন ও ভাগ্য বিড়ম্বিত মাতৃভূমি, পতিত স্বজাতির ভাগ্যকেও এক করে দেখেছেন। এদের উদ্ধারের চিন্তাও যেমন এক সঙ্গে করে নিয়েছেন, তেমনি তা উদ্ধারের জন্য আত্মোৎসর্গকেই সে মুহূর্তে সবচেয়ে বড় এবং প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন।

তুরস্ক ভ্রমণ গ্রন্থে তিনি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রামরত তুরস্কের বাস্তব দৃশ্য বর্ণিত হবার ফলে এ গ্রন্থ সাধারণ বাঙালী পাঠক বিশেষতঃ বাঙালী মুসলমান পাঠকের মনে উচ্চাশা সৃষ্টি করেছে, তাদের হতাশা মোচন করতে সহায়ক হয়েছে।

১। সিরিয়া পরিভ্রমণ, আল এসলাম, পৌষ, ১৩২৬।
২। গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিংশ খণ্ড। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬১, পৃঃ ২৩১-৩৩।
৩। পূর্বে, পৃঃ ৫৭-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে সিরাজীর ব্যক্তিজীবনের ভ্রমণ অভিজ্ঞতাই সংগ্রামরত তুরস্কের সংগে বাংলায় মুসলমান এবং স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামরত বাঙালী পাঠকের সেতুবন্ধ সৃষ্টি করেছে। সিরাজীর ব্যক্তিজীবন এক্ষেত্রে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের অংশ, এভাবে জাতীয় জীবনের সংগে নিজ হৃদয় এবং অস্তিত্বের অভিন্ন সংযোগ সূচিত হয়েছে তুরস্ক ভ্রমণকে কেন্দ্র করে। এর আগেই অনলপ্রবাহ গ্রন্থ রচনার জন্য কারাবরণ তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকেই জাতীয় জীবনের সংগে যুক্ত করে দেয়, বৃহত্তর জাতীয় ও সামাজিক সমস্যার সংগে সংযোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েই ছিল। তাঁর এ স্বাধীনতা পিপাসা অপেক্ষাকৃত পরিণত রূপ পায় পরবর্তীকালে, এসবের প্রকাশ ঘটেছে সাহিত্য সৃষ্টির বিভিন্ন অংশে। একারণে সিরাজীর তুরস্ক ভ্রমণ গ্রন্থে বর্ণিত ভ্রমণ কাহিনী বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য ভ্রমণ কাহিনী থেকে অপেক্ষাকৃত স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত, যে বাস্তব অবস্থার সংগে এখানে সংযোগ ঘটেছিল অন্যত্র তা নেই। গ্রন্থটি কেবল মাত্র রম্য দৃশ্য কিংবা অভিজ্ঞতার বিবরণ নয়, এটা স্বাধীনতা পিপাসু চিত্তের বিপুল আর্তনাদও বটে। সমকালীন বাংলার মুসলমান সমাজে, এমন কি পরাধীন ভারতের সর্বত্র এ বেদনাবোধ ও আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত। তুরস্ক ভ্রমণ গ্রন্থের রচনানৈপুণ্য ও লেখকের আন্তরিকতা সে বেদনাবোধকে আরো গভীর ও বিস্তৃত করে দিয়েছে।

সিরাজীর সাহিত্যিক ও কর্মজীবনের প্রায় সূচনা হয়েছে ইংরেজের কারাগারে, শেষ হয়েও গেছে আবার কারাগারে। একবার মাত্র স্বাধীনতার স্বাদ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তুরস্কে অবস্থানকালে। সিরাজীর সামনে ছিল তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম, পশ্চাতে ইংরেজের নিকট দাসত্বের বন্ধনজ্বালা, দুঃখিনী মাতৃভূমির হাতে পরাধীনতার শৃঙ্খল। সেবা কর্মের জন্য গেলেও তিনি ছিলেন সৈনিকের বেশে, যেমন বাইরে তেমনি অন্তরে। সৈনিকের মতই সামনের রণক্ষেত্রে অগ্নিপরীক্ষা, আহতের যন্ত্রণা, বিজয়ের উৎসাহ, পরাজয়ের গ্লানি, আহত সৈনিকের আর্তনাদ সব মিলিয়ে সিরাজীর অন্তর্লোককে স্পর্শ করেছে। আহত সৈনিক ও মানুষের সেবাকর্মের সংগে যুক্ত থাকার ফলে যুদ্ধের মধ্যে মানবতার অবমাননা ও যন্ত্রণা যেমন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি অনুভব করেছেন যুদ্ধই মানুষকে পরাধীনতার হাত থেকে পরিত্রাণ এনে দিতে পারে, যুদ্ধের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল মানুষের কল্যাণ। তিনি যুদ্ধকে দেখেছেন কিন্তু সমগ্রতে বিচ্ছিন্ন করে নয়, অর্থাৎ স্বাধীনতা হরণকারী আগ্রাসী যুদ্ধ অবশ্যই অন্যায় যুদ্ধ এবং আত্মরক্ষামূলক হলে তা অবশ্যই ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ, এ দুয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। এ ছাড়া যে যুদ্ধ মানবাত্মার শৃঙ্খল মোচন করে তাও ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিত। ইসলামের প্রথম দিককার যুদ্ধে দেশজয়ের সংগে সত্যের মহিমায় বিশ্ব আলোকিত হয়, মানবাত্মার মুক্তি ঘটে। সেকারণে ইসলামের গৌরবময় যুগে প্রত্যাবর্তন নয়, বরং গৌরবময় যুগের নব আবির্ভাব সম্পূর্ণ করার জন্য সিরাজী মুসলমানদের এক হাতে কোরাণ অন্য হাতে বিজ্ঞান নেবার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য বলেছেন, বারবার বাহুবলের উচ্চারণ করেছেন, বাহুবলের ওপর নির্ভর করতে বলেছেন, কেবলমাত্র বাহুবল বর্তমান কিন্তু পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হতে পারে না বলে বাহুবলের গৌরব সৃষ্টির জন্যই এ গ্রন্থেও একাধিকবার কোরাণ ও বিজ্ঞান শিক্ষার সমন্বয় সাধন করতে বলেছেন। বাহুবল এবং বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ মাহাত্ম্য তুরস্কের রণক্ষেত্রে যেয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন। তুরস্কের বাহুবল ছিল, কিন্তু আধুনিক ইউরোপের বিজ্ঞান ও বাহুবল দুটোই ছিল। উন্নত ইউরোপ ও সুপ্ত তুরস্কের দুঃসময়ের পার্থক্য তিনি প্রত্যক্ষ এবং গভীরভাবে অনুভব করেছেন বলকান রণক্ষেত্রে বসে, ইউরোপের উজ্জ্বলতা দেখে নিজ বাসভূমে এবং আপন অনুজের দারিদ্র্যকেই তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করেছেন। আধুনিক ইউরোপ এবং বর্তমান তুরস্ককে তিনি অত্যন্ত নিকটে থেকে দেখেছেন, ইউরোপের দুঃসাহস বলে ইউরোপের বস্তু ঐশ্বর্য ও তুরস্কের প্রাচীন গৌরব, আলোকের পাশেই অন্ধকার দেখেছেন। সেবা কর্মের মধ্যে থেকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল রাজনৈতিক আলোকসন্ধানের এবং সামাজিক কল্যাণকর্মীর। একারণে ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান এবং মুসলমানের ঐক্য-বোধকে সম্মিলিত করে তিনি এক নতুন আদর্শ সৃষ্টির সূত্র নির্দেশ দিলেন। দেশেও উন্নততর হিন্দুর সংগে প্রতি-যোগিতায় বিপন্ন বোধ করেছেন, সেই সংগে পরাধীনতার যন্ত্রণা থেকে ক্লান্তিহীন চিত্তে পূর্ব গৌরবের ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন। তুরস্ক ভ্রমণ গ্রন্থে সে সবের ব্যাকুলতাবোধ প্রকাশিত।

নজরুলের 'ব্যথার দান'[১] (১৯২২) এবং অন্যান্য রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের পাঠকগণ রণক্ষেত্রের আবেগ ও উত্তেজনার সংগে পরিচিত হয়েছেন। এক্ষেত্রেও অবশ্য শিরাজী নজরুলের অগ্রজ, নজরুলের আগেই শিরাজী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ পান। নজরুল ইংরেজ সেনাবাহিনীরই অন্যতম একজন সৈনিক ছিলেন, শিরাজী ইংরেজের সেনাবাহিনীর সদস্য নন। তিনি যে রণক্ষেত্রে অংশ নেন ইংরেজ সেখানে মিত্র পক্ষ নয়। এ জন্য ইংরেজ নিন্দিত হয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে সমগ্র ভারত থেকে যে কয়েকজন মাত্র মুসলমান সেবাব্রতে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিকূল ইউরোপের সম্মুখীন হয়েছেন শিরাজী তাঁদের অন্যতম, সমগ্র বাংলা থেকে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এ সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। শিরাজী সেবাকর্মের জন্য গেলেও সৈনিকের মর্যাদা অর্জন করেছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রের বর্বরতা কিংবা সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিধর্মিতা দুটোরই প্রত্যক্ষদর্শী। শিরাজী নজরুলের পূর্বসূরী অগ্রজ, কিন্তু দৃষ্টি ক্ষমতার দিক দিয়ে নজরুল উজ্জ্বলতর।

চার

১৯৩০ সালে জেলের রোজনামচা যখন লেখেন, তিনি তখন নির্মম বাস্তবের মুখোমুখি। একদিকে

১। নজরুল রচনাবলী, প্রথম খন্ড।

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্য অন্যদিকে রোগজীর্ণতা, তার মধ্যে পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপন দুঃখকেই লালন করেছেন। পূর্ব কর্মজীবনে বাংলায় সামাজিক রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, ইতিমধ্যে রাজনীতির বাগ্রবাহ অপেক্ষাকৃত তরুণদের হাতে এসেছে, সেখানে তার সঙ্গে এক ধরণের দ্বন্দ্বের সূচনাও হয়েছে। মুসলমান সমাজেও অপেক্ষাকৃত তরুণরা কোন কোন দিক দিয়ে তার চেয়ে অগ্রসর, প্রবীণরা অনেক পশ্চাতে, অর্থাৎ তিনি প্রায় অবলম্বন হীন, কেবলমাত্র স্বাধীনতার মন্ত্র জপ করে অগ্রসরদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। কিন্তু রাজনীতির লক্ষ্য কেবলমাত্র স্বাধীনতা নয়, বরং পূর্ণ রাজনৈতিক জীবন গঠন, তাছাড়া রুশ বিপ্লবের পর থেকে শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণের ফলে রাজনীতির শক্তিকেন্দ্রও ইতিমধ্যে ঢের জটিল হয়ে উঠেছে। এ সময়েই গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে জীবনে শেষবারের মত কারাবরণ করেন। তাঁর জীবনীশক্তি প্রায় সমাপনের প্রান্তে, সুতরাং হতাশায় আচ্ছন্ন হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ও ছিল না। দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁকে ক্রমাগত জীর্ণ করেছে, রোগ ও দারিদ্র্যের সামনে তিনি হতাশায় আচ্ছন্ন হয়েছেন, পুনর্বার আত্মশক্তিতে উন্মুখ হয়েছেন, এরই প্রকাশ ঘটেছে 'জেলের রোজনামচা' রচনার মধ্যে।

এ সময়েই তিনি কৃষ্ণভক্তিমূলক কিছু গান রচনাও করেন।[১] ব্যাধি এবং দারিদ্র্য জনিত সঙ্কটের ফলে তিনি এ সবের মধ্যে সম্ভবতঃ অবলম্বন খোঁজার চেষ্টা করেছেন। সময়ও শেষ হয়ে আসছিল, এখানেই তিনি বহুমূত্রের সঙ্গে খোঁচায় আক্রান্ত হন, কারাগারে সাময়িকভাবে নিরাময় হলেও মুক্তকাল পরে এই খোঁচাই পুনর্বার বৃদ্ধি পেয়ে তাঁর জীবনাবসানের কারণ ঘটায়।

শিরাজীর আত্মকথার দুটো অংশ, একটি স্বদেশে এবং অন্যটি তুরস্ক প্রবাসে থাকাকালীন। বৃহত্তর অর্থে শিরাজীর সব রচনাই আত্মকথামূলক, সকল রচনার মধ্যেই ব্যক্তি শিরাজীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, রচনার শিল্পকর্মকে অতিক্রম করেও বারবারই তাঁর ব্যক্তি সত্তা মুখর হয়ে এসেছে। শিরাজী ইংরেজ শাসিত সমগ্র দেশকেই একটি বৃহত্তর কারাগার বলে মনে করেছেন, কিন্তু সেই একই সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, মানুষ, বিশেষ করে বাংলার মুসলমানেরা অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, দারিদ্র্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কিভাবে নিজের মনের চারপাশে দেয়াল তুলে রেখেছে, নিজেরাই কারাগারের মত বন্ধনদশা সৃষ্টি করে নিয়েছে। এসকল বন্ধনদশা থেকে মুক্তির আহবান তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনার উৎস, অন্যান্য সাহিত্য রচনার উপকরণ। উৎস নানাভাবেই এসব উপকরণ সংগ্রহ করতে সহায়তা করেছে।

১। পূর্বে, পৃঃ ২৬৭-৪০১

Dhaka University Institutional Repository

(গ) বিবিধ রচনা

প্রবন্ধ

শিরাজীর এ শ্রেণীর গদ্যগ্রন্থ হল তিনটি, স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা (১ম সং, ১৯১৬), তুর্কী নারী জীবন (দ্বি-সং, ১৩২৫), এবং আদব কায়দা শিক্ষা (বর্ধিত ও সংশোধিত দ্বি-সং, ১৩২৭)। এ ছাড়া গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত প্রবন্ধও আছে। স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে নাম পরিবর্তন করার কারণ তিনি এভাবে উল্লেখ করেছেন, "সমগ্র স্পেন রাজ্যের তৎকালীন মুসলমান সভ্যতার আলোচনা বইয়াই সমাপ্ত বিধায় এবার পুস্তকখানির নাম স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা রাখা হইল।"[১] তৃতীয় সংস্করণে "মহানগরী গ্রানাডা" সম্পর্কে আলোচনাও স্থান পেয়েছে।[২]

মুসলমান শাসনাধীন স্পেন সম্পর্কে শিরাজী বিভিন্ন রচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, এসবের অন্যতম হল স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা ও স্পেন বিজয় কাব্য। স্পেন বিজয় কাব্যের ঘটনা হল ঠিক যে মুহূর্তে স্পেন মুসলমান অধিকারে আসছে, আর স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা হল স্পেনে মুসলমানদের অতীত গৌরবের মধ্যাহ্নকালের চিত্র। এখানে লেখকের উদ্দেশ্য, বাংলায় মুসলমানদের কাছে পূর্বেকার বিজয় মহিমা সম্পর্কে গৌরববোধ জাগ্রত করা এবং সে আলোকে বর্তমান গ্লানির অপনোদন করা।

শিরাজী নিজে কখনো স্পেনে যাননি, সুতরাং ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণাদির ওপর তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে। এ গ্রন্থে কল্পনার কোন সুযোগ নেই, বাংলায় মুসলমান পাঠকের নিকট স্পেনের বিবরণ তাঁর বক্তৃতার মতই জোরালো ভাষায় প্রকাশ করেছেন মাত্র। স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা সম্পর্কে শিরাজীর অভিজ্ঞতা হল পরোক্ষ, তুরস্ক সম্পর্কেও প্রথমে তাই ছিল। তুরস্কের ব্যাপারে শিরাজী ইতিহাসের সংগে বর্তমানকে মিশিয়ে নিতে পেরেছিলেন, কিন্তু স্পেনের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয়নি।

স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা গ্রন্থে শিরাজীর অভিজ্ঞতার উৎস পূর্বেকার ঐতিহাসিকবৃন্দ, এমন কি ইউরোপীয় ও খৃষ্টান ঐতিহাসিকদের তথ্য প্রমাণ নির্ভর। শিরাজী খৃষ্টান ঐতিহাসিকদের নিকট থেকে নিঃসংকোচে গ্রহণ করেছেন, এবং তাঁর যুক্তিও এখানে যে, ইতিহাস ও বিদেশী ভাষার বন্ধন থেকে মুসলিম গৌরবের চিহ্নগুলো ছিন্ন করে এনে বাংলায় মুসলমানদের জীবন গঠনে ব্যবহার করতে চেয়েছেন।

১। দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন, স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা।

২। স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা, ৩-সং, পৃঃ ৫৫-৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বক্তৃতায় এটা বলেছেন, কবিতায় লিখেছেন, এ গ্রন্থে গদ্যে সে সবের বাস্তব বর্ণনা দিয়ে তা স্বকে সপ্রমাণ করে সে গৌরববৃদ্ধিতে নিয়ে গেছেন। কেবল সিরাজী নন, তাঁর সমকালে এবং উত্তরকালে স্পেন সম্পর্কে অন্যান্য মুসলমান কবি সাহিত্যিকের রচনা থেকে জানা যায়, সে সময়কার মুসলমান পাঠকও এসব ইতিহাসের নাটকীয় রূপান্তর গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল, সেদিক দিয়ে সিরাজী বাংলায় সমকালীন মুসলমানদের একটি বাস্তব প্রয়োজনও মিটিয়েছেন। স্বল্পকালের মধ্যেই এ গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ প্রকাশ দেখে গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা অনুভব করা যায়। মুসলমান শাসিত স্পেনের যে দিকটি সিরাজীর সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা হল কেবলমাত্র মসজিদ ও অন্যান্য গৌরবের চিহ্ন নয়, বরং বর্তমান ইউরোপের নব জাগরণের পিতামাতা হিসাবে স্পেনের অবস্থান। বর্তমান ইউরোপের উজ্জ্বলতা স্পেনের মুসলমান সভ্যতার উপর থেকে, সুতরাং ইউরোপের নিকট এই মুহূর্তেও মুসলমানদের হীনমন্যতাবোধের কারণ নেই। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের গৌরব বোধের উৎস হল এক ও অভিন্ন ধর্ম, ঐতিহ্য, ইতিহাস, সুতরাং ইউরোপের উজ্জ্বলতা সৃষ্টিতে বাংলার মুসলমানেরা যেমন গৌরব বোধ করতে পারে, তেমনি বর্তমানের গ্লানিকর অবস্থা থেকে মুক্তির বাস্তব পটভূমিও সৃষ্টি করে তুলতে পারে। এ দৃষ্টির তাগিদেই এ গ্রন্থে অতীত গৌরবের আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিত্তি, তার এ আহ্বানকে প্রমাণসিদ্ধ করে তোলার জন্য বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের রচনা তিনি ব্যবহার করেছেন। এমন কি অমুসলমান ঐতিহাসিকেরাও স্পেনে মুসলমানদের গৌরব কথা অস্বীকার করতে পারেননি, এটাও সিরাজীকে অনেকাংশে প্রেরণা দিয়েছিল।

মুসলমানরা একদা শক্তির আধার ছিলেন, সিরাজী দেখেছেন শক্তির মৃত্যু নেই, রূপান্তর গ্রহণ করে মাত্র। শক্তির সে প্রদীপ শিখা প্রজ্জ্বলিত রাখার উপযুক্ত স্থান হল অন্তরে, আর অনবরত আঘাত করে বা উৎসাহ দান করে তাকে জাগ্রত করে রাখা সম্ভব। আত্মশক্তির সক্রিয় হয়ে ওঠা জাগরণ সাপেক্ষ। সিরাজী বাংলায় মুসলমানদের সেই জাগরণের পুনরাবৃত্তিকেই অনবরত চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, এবং সে জাগরণ যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য সঠিক ইতিহাসের বর্ণনা দিয়ে কিংবা ইতিহাসের শূন্য স্থানকে সৃষ্টি প্রক্রিয়া দিয়ে পূর্ণ করে দিতে চেয়েছেন। ইতিহাসের আবেগ প্রবণ চিত্র কোন বিজয় কাব্য ও সমর্থক কবিতায়, আর বাস্তবতামন্ডিত বর্ণনা হল স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা গ্রন্থে। তা সত্ত্বেও রচনায় কোন কোন অংশ মনোমুগ্ধকর। এসব বর্ণনায় গদ্য ভাষাও কাব্যময় হয়েছে, যেমন,

"প্রাচীনকালে সভ্যতা সৌন্দর্য্য ও শিল্পের বিচিত্র লীলাভূমি ও কর্মচঞ্চল কর্ডোভা নগরীর বলিয়া

Dhaka University Institutional Repository

যে সমস্ত মহানগরী খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তন্মধ্যে গৌরবান্বিত, সৌন্দর্য্য সমলঙ্কৃত, সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্পেনের কর্ডোভা মহানগরী অন্যতম। বোগদাদ ব্যতীত কর্ডোভা মহানগরীর সহিত অপর কোনও নগরীর নামও উল্লিখিত হইবার যোগ্য নহে। স্পেনকে পরী বলিয়া কল্পনা করিলে কর্ডোভাকে তাহার চক্ষু বলিয়া স্থান দিতে হয়। প্রাচীন আরব ঐতিহাসিকগণ কর্ডোভাকে স্পেনের পাত্রী বা কনে (Bride) বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।"১

অথবা, "মুসলিম আরবদিগের দেহ এবং বাহ্য প্রকৃতি রোমীয় এবং মন ও অন্তর প্রকৃতি গ্রীসীয় ছিল। বোধ হইত যেন রোমীয়দিগের দেহ এবং গ্রীকদের আত্মা লইয়া মুসলিম আরবগণ ভূমণ্ডলে নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন।--তাজমহল পৃথিবীর বক্ষে ভারতীয় শিল্পের একটী বিরাট গোলাপ ফুল কিন্তু আলহামরা জগতের বক্ষে বহু গোলাপের কমনীয় কুঞ্জ।--আলহামরা কবিতার বিরাট নন্দন কানন।"২ গ্রন্থের শেষে বলেছেন, "তাহার পর পৃথিবী বহু যুগান্তর অবস্থান্তর লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু হায়! আজও স্পেনের জন্য তাহার দীর্ঘনিঃশ্বাস থামিয়া যায় নাই।"৩

এ দীর্ঘনিশ্বাস শিরাজীর নিজেরও। মুসলিম গৌরবের চিহ্নগুলো পুনর্গঠন করতে গিয়ে শিরাজী নিজেও অশ্রুপূর্ণ চোখে তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তা সত্ত্বেও এ গৌরব পুনঃসৃষ্টি অসম্ভব নয়, শিরাজী একথা বিশ্বাস করতে চাননি। তিনি মনে করেছেন এ গৌরবের স্থায়ী বিনাশ নেই, তা পুনরুদ্ধার সাধনা সাপেক্ষ মাত্র।

দুই

তুর্কী নারী জীবন (১৩২০) গ্রন্থটির প্রকাশক রংপুর লালবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত মুন্সী মোহাম্মদ শাহাদৎউল্লা চৌধুরী। গ্রন্থের শেষে নিবেদন শিরোনামে শিরাজী লিখেছেন, "আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এই পুস্তক প্রকাশের জন্য রংপুর লালবাড়ী নিবাসী খ্যাতিনামা জমিদার শ্রীযুক্ত মুন্সী শাহাদৎউল্লা চৌধুরী সাহেব যথোচিতভাবে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ৫০ টাকা দান করিয়া বদান্যতা এবং সমাজ-হিতৈষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।"

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১-২।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

এটা দেখে মনে হয়, এ গ্রন্থের প্রকাশক শিরাজী নিজেই, অর্থ সাহায্য পাবার জন্যে সৌজন্য বশতঃ মুন্সী খাজা নূরুল্লা চৌধুরীর নাম উল্লেখ করেছেন।

তুর্কী নারী জীবন গ্রন্থটি নানা অর্থেই শিরাজীর স্ত্রী শিক্ষা গ্রন্থের পরিপূরক। স্ত্রীশিক্ষা গ্রন্থে তিনি বাংলায় মুসলমান রমনীদের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক জীবনের পুনর্গঠনের প্রয়াস করেছেন, তুর্কী নারী জীবন গ্রন্থে এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাস্তব নজীর স্থাপন করেছেন। এ গ্রন্থে বাংলায় মুসলিম রমনীদের সঙ্গে তুর্কী রমনীর তুলনায় পার্থক্য এবং অনুন্নত অবস্থাকে চিহ্নিত করেছেন, তাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য আগ্রহী করে তুলতে চেয়েছেন।

তুর্কী রমনীদের সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের বিকাশের ক্ষেত্র অত্যন্ত প্রশস্ত এজন্য তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন বাধামুক্ত। তাদের সাহিত্যিক, রাজনৈতিক সাংবাদিকতা প্রতিভা শিরাজীর দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল, স্বদেশ-চিন্তায় তাঁরা পুরুষদের মতই অংশ নিয়েছেন। সাধারণ তুর্কী রমনীদের তিনি "জাতীয় কল্যাণ ও ধর্মের মূর্তি,"[১] বাইরের জীবনে সাধারণ নারী পুরুষের সম্পর্ককে "মাতা ও পুত্র সাদৃশ" অতি সূক্ষ্ম এবং পবিত্র"[২] বলেছেন। তুর্কী নারীদের স্বাধীনতা আছে কিন্তু তাঁরা ইউরোপীয় খৃষ্টানদের মত সে স্বাধীনতাকে অপব্যবহার করেন না, তাঁরা সমাজে বিশেষভাবে সম্মানপ্রাপ্ত। তাঁরা অবরোধবাসিনী নন, কিন্তু পর্দাহীনও নন।

বস্তুতঃ, শিরাজী মুসলমান গৌরবের অতীত কেন্দ্র হিসেবে আরবের তুলনায় তুরস্ক ও স্পেনের কথাই বেশী বলেছেন। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব আরবের মরুভূমিতে কিন্তু এর রাজনৈতিক গৌরবের বিকাশ তুরস্ক ও স্পেনকে কেন্দ্র করে। স্পেন তখন কেবলমাত্র কৃষ্টির সুখময় এবং বিরহের বেদনাপূর্ণ স্মৃতিভার, কিন্তু তুরস্ক বিশ্ব মুসলমানকে আত্মিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে বর্তমান মুহূর্তে জীবন্ত। এ কারণে শিরাজী অতীত ও বর্তমান তুরস্কের সঙ্গে পরাধীন বাংলা ও ভারতভূমির ভাবজগতের সম্মিলন ঘটাতে চেয়েছেন। এ প্রার্থনাই ভারতবহির্ভূত মুসলিম সমাজের সঙ্গে বাংলার মিলন দৃশ্য রচনায় প্রাণশক্তি হিসেবে কার্যকর।

তিন

আদব কায়দা শিক্ষা গ্রন্থটি প্রথম দিকে, চন্দননগরে আত্মগোপন করে থাকাকালে রচিত হয়,[৩] কিন্তু প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে, ১৩২৬ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৩২৭ সালে পরিবর্ধিত ও সংশোধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ নামে প্রকাশিত হয়। শেষ সংস্করণটিতে বিজ্ঞাপন আকারে লিখিত হয়েছে

১। তুর্কী নারী জীবন, পৃঃ ১৯।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।
৩। পূর্ব, পৃঃ ৯৪।

"এবারে পুস্তকের স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইল এবং অনেকগুলি নূতন প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।"

গ্রন্থে বারোটি পরিচ্ছেদ ও পরিশিষ্ট এভাবে বিভাজিত করেছেন, নাম প্রকরণ, সম্বোধন প্রকরণ, অভিবাদন প্রকরণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, আহার প্রকরণ ও অভ্যর্থনার নিয়ম, উপহারদানাদি, সন্তানের আদব, উপবেশন-প্রণালী, বিদায়, স্বাস্থ্যনীতি, বিবাহ-নীতি, ও বুজর্গদিগের সভ্যতা, পরিশিষ্ট আকারে আহার সম্বন্ধে, সাধারণ নিয়মাবলী, এবং উপসংহার।

প্রসংগতঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের লিখিত 'পারিবারিক প্রবন্ধ' গ্রন্থটির[1] সংগে তুলনা করলে শিরাজীর রচনা সূচী কোন কোন দিক দিয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নিকট সন্নিহিত মনে হতে পারে।

বাংলায় মুসলমান সমাজকে শিরাজী দুভাবে ভাগ করেছেন, সম্ভ্রান্ত, এবং নিম্নশ্রেণীর পেশাজীবি সাধারণ মুসলমান। শিরাজী যদিও মুসলমান সমাজের কল্যাণের জন্য কোন পেশাকেই নীচ বা ঘৃণ্য মনে করেননি, তা সত্ত্বেও সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের সামাজিক আদর্শকে সকল মুসলমানের জন্য আচরণযোগ্য মনে করেছেন। এতে মুসলমানদের মধ্যে আত্মচৈতন্য সৃষ্টি হবে, তা ঐক্যবোধের ও সহায়ক। শিরাজী মনে করেছেন মুসলমানদের ক্ষেত্রে বিত্তের সংগে আভিজাত্যের কোন সম্পর্ক নেই, বিত্তবান মুসলমানের অভিজাত হওয়াটা এবং অভিজাত মুসলমানদের বিত্তবান হওয়াটা আবশ্যিক নয়, যদিও আত্মবিকাশ বা প্রসারণের জন্য বিত্তের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। আভিজাত্য হল রক্তবাহিত, পুরোপুরি অর্জন সাপেক্ষ নয় তা সত্ত্বেও মুসলমানের আভিজাত্যবোধ সুস্থ ও সুন্দর ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের অনুকূল। বাংলায় অভিজাত মুসলমানেরা বিদেশাগত কিংবা তাদের উত্তরপুরুষ, এবং মুসলমান আমলের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, বিত্তবান ব্যবসায়ী অবস্থার বিপাকে পড়ে কৃষিকর্মের কিংবা অন্যান্য পেশার সংগেও যুক্ত হয়েছেন। মোটামুটি ভাবে খন্দকার কাজেম রাব্বি প্রমুখের মত মুসলমানদের পূর্বপুরুষের ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন, একারণেই শিরাজী তাদের সামাজিক আচরণবিধি পুনর্গঠন করতে চেষ্টা করেছেন। এদের মুসলমানত্বের সচেতনতা সৃষ্টি এবং এটাও পরোক্ষে সামাজিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আত্মবিস্মৃতি জাত অধঃপতন থেকে মুক্তির জন্য এটা নিবেদিত ছিল। এজন্য মুসলমান সমাজে কি আচরণমূলক সংস্কার প্রচলিত আছে তা নয়, বরং আদর্শায়িত চিত্রকেই তিনি গঠন করতে চেষ্টা করেছেন।

গ্রন্থের নিবেদন অংশে বলেছেন, মুসলমানদের "চিত্ত সুখকর আদব-কায়দাও সমধিক রূপে

১। ভূদেব রচনা সম্ভার, পৃঃ ৪৫৩-৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুগ্ধলুব্ধ করিয়াছিল।"[১] এ ছাড়া "আদবকায়দা মুসলমানদের পারিবারিক সম্পত্তি ছিল।"[২] কিন্তু ভাগ্য-চক্রের পরিবর্তনের ফলে বাংলায় মুসলমানদের জ্ঞান, শিক্ষা ও সম্পদে অধঃপতন ঘটেছে, সম্ভ্রান্ত পরিবার-গুলো বিলুপ্ত, ফলে তুলনামূলকভাবে অগ্রসর হিন্দুরাই মুসলমানদের আদর্শে পরিণত হয়েছে। এতে তাদের জাতিসত্তা ও মূল্যবোধ ক্রমবিলীন হয়ে যাচ্ছে, এটা ফিরিয়ে আনতে না পারলে বাংলার মুসলমান-গণ অবচেতন, শক্তিহীন ও মিশ্রিত জাতিতে পরিণত হবে এবং শেষ পর্যন্ত মুক্তির পথও অবরুদ্ধ হয়ে উঠবে।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষা এবং ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারে সর্বত্রই ত্রুটি রয়ে গেছে, বিষয় সম্পর্কে বর্তমানে উন্নত মুসলমান পরিবারগুলো ঠিক অভিজাত নয়, "সুতরাং এই সময় পরিবারের অধিকাংশই আদব-কায়দা বিষয়ে অনুন্নত।"[৩] মুসলমান পরিবারে আদব কায়দা শিক্ষার ব্যাপারে নিরাসক্তি শিরাজীকে প্রীত করেনি, তার চেয়েও বড় কথা হল, শিক্ষা ও সম্পদে উন্নত হিন্দুকে মুসলমান সমাজ অনুকরণ করতে দেখেই শিরাজী অধিকতর উদ্বিগ্ন হয়েছেন, এটাকেই মুসলমানদের পরাজয়ের সোপান বলে মনে করেছেন। এ ধরনের মিশ্রণের অর্থ হল মুসলমানের ঐতিহ্যগত সত্তার বিলোপ। শিরাজী তাঁর আশঙ্কা ও উদ্বেগকে চেপে রাখতে পারেননি, মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুর অনুসরণ প্রবণতাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বলেছেন, "কিন্তু উলঙ্গ শির হিন্দু বাবুদের দেখাদেখি স্কুলের মুসলমান ছেলেরা এবং অনেক ভদ্রাভিধেয় মুসলমান অদ্যাবধি উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে কাছিমাকা হাড়ির মত উলঙ্গ শিরে যথা তথা গমন করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করে না। ইহারা এমনি নির্লজ্জ এবং বে আদব যে, মসজিদিতেও পর্যন্ত উলঙ্গশিরে গমন করে।"[৪] উলঙ্গশির হিন্দু বাবুদের সঙ্গে তুলনা দেওয়াতে শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যে শিরাজীর এ মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।[৫]

১৯১৪ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে আদব-কায়দা শিক্ষা গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ততদিনে নানা কারণে সংকট কিংবা পরীক্ষার সম্মুখীন, সেকারণে তিনি মুসলমানদের চৈতন্য জাগাবার জন্য অনাবৃত শির হিন্দুকে কাছিমাকা হাড়ি সদৃশ বলেছেন। তা সত্ত্বেও হিন্দুর প্রতি আক্রমণ এখানে পরোক্ষ, বরং টুপিবিহীন মুসলমানকে প্রকারান্তরে কাছিমাকা হাড়ি বলে চিহ্নিত করেছেন। শিরাজী হিন্দু মুসলমানের এ বিভেদটি করেছেন সামাজিক ক্ষেত্রে, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়।

১। আদব কায়দা শিক্ষা, বর্ধিত ৩য় সং, পৃঃ ১।
২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।
৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।
৫। প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২১। বিস্তৃত বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

কেবলমাত্র হিন্দুর অনুকরণ নয়, ইংরেজকে যারা অনুকরণ করছে শিরাজী তাদেরও পরবর্তীকালে নিন্দা করেছেন।[১] স্বাস্থ্যনীতি, ব্যায়াম চর্চাকেও আদব কায়দার অংশ করে তুলেছেন।[২] জনার স্বাস্থ্য রক্ষার আবশ্যকতা বোঝাবার জন্য হজরত মোহাম্মদের(দঃ) নজীরও স্থাপন করেছেন।[৩] বাল্য বিবাহ বর্জন, উপযুক্ত পাত্র পাত্রীর বিবাহ অনুমোদন করে বলেছেন, "পাত্র পাত্রী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পরস্পর মনোনয়ন করিয়া যে বিবাহ করে, তাহাই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত। এইরূপ মনোনয়ন বিবাহ এসলামেরও অনুমোদিত।"[৪]

এখানে শিরাজীর সামাজিক উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়, সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি বিজ্ঞানবুদ্ধি ও ধর্মবোধের মিলন ঘটিয়েছেন। নারী শিক্ষা ও নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা দানের মাধ্যমে তিনি যেভাবে নারীর ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির প্রয়াস করেন, সেসবের স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত বা পরিণতি ছিল নরনারীর প্রেমাসক্তিজনিত মিলন প্রক্রিয়া। এদিক দিয়ে শিরাজীর পক্ষে অনিবার্য ছিল সামাজিক উপন্যাস রচনা কিন্তু জাতীয় প্রেরণা সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহের জন্য তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসকেই আশ্রয় করেছিলেন। শিরাজী উপন্যাসের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক মুসলমানত্বকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, আদব কায়দা শিক্ষা গ্রন্থের মধ্যে তার সামাজিক রূপ অনুসন্ধানের প্রয়াস, কিন্তু এর মধ্যেও একটি সুগভীর রাজনৈতিক অভিব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে উঠে। ভূদেব বঙ্কিমের হিন্দুত্ববোধের সংগে শিরাজীর মুসলমানত্ব-বোধের তুলনা এখানে প্রাসঙ্গিক।

ভূদেব এবং বঙ্কিম উভয়েই নিষ্ঠাবান হিন্দু, কিন্তু তাঁদের মধ্যে মৌলিক প্রভেদও রয়েছে। ভূদেব সুস্থ হিন্দুত্ব বোধের সৃষ্টি করেন, এ ধর্মবোধ মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে দেয়, আত্মসচেতন পরিবেশ সচেতন করে তোলে কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার প্রতি বৈরী করে তোলে না। এখানে সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে এর মধ্যেই এক ধরণের বিক্ষুব্ধ শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল যা বৈরী পরিস্থিতি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলনা। বঙ্কিম এদিক দিয়ে ছিলেন ভূদেবেরই অনিবার্য সামাজিক রাজনৈতিক পরিণতি। বঙ্কিম প্রতিভার তীব্র দীপ্তালোক ভূদেবকে কার্যত আড়াল করে দেয়। ভূদেবের সংগে বঙ্কিমের একটি ধারাবাহিকতা থাকলেও বঙ্কিমের হিন্দুত্ববোধই জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে দূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে, এবং অহিন্দুর জন্য স্থান সঙ্কুচিত করে দেয়।

১। এসলামিক আদব কায়দা, নূর, বৈশাখ, ১৩২৭।

২। আদব কায়দা শিক্ষা, পৃঃ ৯৭-১০৫।

৩। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে হযরত মোহাম্মদ(দঃ), এসলাম দর্শন, শ্রাবণ, ১৩২৬।

৪। আদব কায়দা শিক্ষা, পৃঃ ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজী আদব কায়দা শিক্ষা গ্রন্থটি রচনা করেছেন চন্দন নগরে বসে, এ সময়ে ভূদেব বঙ্কিমের রচনা কিভাবে তাঁর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা লক্ষ্য করা গেছে।[1] স্বাভাবিকভাবেই সিরাজী আদব কায়দা শিক্ষা গ্রন্থের মধ্যে বিপরীতভাবে ভূদেব-বাক্যকেই মিলাতে চেয়েছিলেন, এবং দৃষ্টির প্রকাশটি ছিল ভিন্ন। তিনি মুসলমান সমাজকে অবলম্বন করেছেন, লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে সামগ্রিক চেতনাবোধের সৃষ্টি। এ ব্যাপারে অনেকাংশে তিনি সফলও হয়েছিলেন, গ্রন্থটির প্রতি মুসলমান সমাজ বিমুখ হয়নি।

গ্রন্থে প্রকাশিত আদব কায়দাকে দুভাবে শ্রেণীকরণ করে নেয়া যায়, (ক) ধারাবাহিক ধর্মীয় সামাজিক ঐতিহ্যবাহিত, এবং (খ) মানসিক ও শারীরিক সুস্বাস্থ্য রক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কিত। দুটোই সমান গুরুত্ব পেয়েছে বরং ঐতিহ্যবাহিত রীতি নীতিকেও তিনি সমকালীন প্রেক্ষিতে বিচার করেছেন এবং বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত করে তোলার চেষ্টা করেছেন, বিচার ও মূল্যায়ন না করে গ্রহণ করেননি। কিছু কিছু অসংগতিও আছে, যেমন, "নিজের স্ত্রীর সহিতও সম্ভ্রমসূচক ভাষায় কথাবার্তা বলিবে। আহ্বান করিতে হইলে বিবি সাহেবা বলিয়া সম্বোধন করিবে। তবে নির্জনে আমোদ প্রমোদে বা হাসি ঠাট্টা রসিকতার সময় সুযোগে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পার।"[2] মানবচরিত্রের অসংগতি কৌতুকের উদ্রেক করে, এ কালের পাঠকের কাছে এটা বড্ড বেশী হাস্যকর বলে মনে হয়েছে।[3]

মুসলমান সমাজের কল্যাণের জন্যে সিরাজীর আন্তরিক উদ্বেগ এ গ্রন্থে অনুভব করা যায়। সিরাজী এখানে আদব কায়দা উপন্যাসের পাত্র পাত্রীদের মধ্যে নানাভাবে প্রয়োগ করেছেন, লেখকের আত্যন্তিক সতর্কতার ফলে কোথাও কোথাও পাত্র পাত্রী আচরণ সর্বস্ব হয়েও উঠেছে। তিনি আদব কায়দা নিজের এবং নিজের পরিবারের মধ্যেও প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন, নিজের সুগন্ধিপ্রীতি, পুষ্পপ্রিয়তা, টুপী পরিধান ইত্যাদি এ সবের অন্যতম। আচরিত আদব কায়দার সঙ্গে নিজেও বিচ্ছিন্ন নন, এ জন্য তাঁর প্রচারিত আদর্শের একটি বিশেষত্বও আছে।

চার

প্রবন্ধ এবং অন্যান্য গদ্য রচনায় সিরাজীর বক্তব্যের মোটামুটি দুটো রূপ লক্ষণীয়, আদর্শ এবং তার বাস্তবায়িত রূপ। তাঁর আদর্শ ছিল কল্যাণের, কিন্তু জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন আদর্শের কোন মূল্য

১। পূর্ব, চতুর্থ অধ্যায়।
২। আদব কায়দা শিক্ষা, পৃঃ ২৫।
৩। মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৪০৫।

Dhaka University Institutional Repository

নেই বলে তাঁকে বাস্তব একটি দিকের সংগে যোগ রাখতে হয়েছে। এখানেই মুসলমান সমাজের বিপুল অসংগতি তাঁর চোখে পড়েছে, এবং তিনি সেসব দূর করার চেষ্টাও করেছেন, সে কারণেই বক্তব্যের প্রকাশ ঘটনা সাপেক্ষিক হয়েছে। এ কারণে প্রবন্ধে প্রকাশিত তাঁর বক্তব্যের মধ্যে আপাতঃ দৃষ্টিতে তেমন কোন পরস্পরবিরোধিতা নেই, জীবনের প্রথমে তিনি যে সুরে উচ্চারণ করেছেন, শেষ পর্যায়ে এসেও তার মধ্যে মৌলিক কোন পরিবর্তন হয়নি। তবে প্রকাশ রীতি ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে বক্তব্য অপেক্ষাকৃত শক্তি সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। প্রথম দিকে তাঁর ভাষা ও সাহিত্য, ধর্ম বিষয়ক ধারণাসমূহ সবই অব্যবহিত সমাজচেতনা কেন্দ্রিক ছিল, রাজনীতির সংগে তাঁর বাস্তব সম্পর্ক যত বেড়েছে, সাহিত্য সৃষ্টিও রাজনীতির সম্পর্ক তত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তাঁর জীবন ও সাহিত্যের সমষ্টিগত চেতনা অনুসরণ করলে রাজনীতি বোধটিই প্রখর হয়ে আসে। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই স্বাভাবিক ছিল। মুসলমান সমাজের এবং একই সংগে সম্মিলিত হিন্দু মুসলমানের হিতচিন্তা তার [illegible] মধ্যে ছিল বলে শ্রেণীগতভাবে হিন্দু অনাত্মীয় হয়ে ওঠেনি, এটাও তাঁর সামাজিক চিন্তাধারার একটি কল্যাণকর দিক।

তাঁর প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা সম্পর্কে সমকালে ভালোমন্দ দুরকমের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।

কবি নোয়াজ খাঁ সুচিন্তা গ্রন্থ সম্পর্কে লিখেছেন, "প্রবন্ধগুলি এক কথায় বলিতে গেলে শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে, প্রিয়বাদিতাপূর্ণ না হউক সত্যবাদিতাপূর্ণ। প্রবন্ধগুলির সর্বত্র এমন একটি মনোহারিতার আবরণ আছে যাহাতে উহাদের স্থান বিশেষের অনুর্বর অপ্রিয়তা অনেকাংশে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। এই চিত্তাকর্ষক দ্রব্য তিনদিকে দ্রষ্টব্য,——লেখকের ভাষা সম্পদ, তাহার রচনাভঙ্গী এবং তাহার বিশাল হৃদয়ের বল। ইহা এক প্রকার অবিসংবাদিত সত্য যে শিরাজী সাহেবের মত মনের বল লইয়া কম মুসলমান লেখকই লিখিয়া থাকেন।"[১]

কবি নোয়াজ খাঁ নূর পত্রিকার লেখক ছিলেন এবং সঙ্গীত সঞ্জীবনী গ্রন্থে তাঁর গান প্রকাশিত[২] হওয়া থেকে মনে হয় তিনি শিরাজীর অন্যতম সুহৃদও ছিলেন।

প্রবাসী পত্রিকায় শিরাজীর রচনা সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করা হয়।

আদব কায়দা শিক্ষা ঃ

"গ্রন্থকার বাঙ্গালা হুজুরের উপর স্থানে অস্থানে বড়ই উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাতে

১। কাটিং বই ৫৫৩-ক।
২। পূর্ব, পৃঃ ১৯৩।
৩। প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২১।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁহার নিজের আদব কায়দার উৎকর্ষ সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙালী হিন্দুর অপরাধ তাহারা "কামিনাখা হাড়ির মতো" খালি মাথা লইয়া কথা তথা বিচরণ করে, ধুতি পরে, মুসলমানেরা তাহাদের অনুকরণ বিবিধ বিষয়ে করে। কিন্তু শিরাজী মহাশয়ের নামে শিরাজের গন্ধ থাকিলেও তাঁহার সহিত আরব পারস্যের সম্পর্ক বাস্তবিক কতখানি তাহা আমরা জানিনা। ফটোগ্রাফে তুরস্ক দেশিদের বেশে তাঁহাকে দেখিয়াছি। কিন্তু এখন বোধ হয় তিনি বুঝিয়াছেন যে,

বোঁটা যবে কাটা গেল, বুঝিল সে খাঁটি
সূর্য্য তার কেহ নয়, সবি তার মাটি।"

তিনি নামে ও পোষাকে যতই বিদেশী হোন না কেন, তিনি বাঙালী। সুতরাং বাঙালী মুসলমানের নাম বাংলা ভাষায় রাখা হইলে তাহার ক্রোধ করা অন্যায়, আরবের লোকের নাম আরবীতে হইবে, বাঙালীর নহে --তা সে ধর্মে যাহাই হোক না কেন। গ্রন্থকারের গালির ভাষা অত্যন্ত অসংযত, অভদ্র, একেবারে আদব কায়দার মুন্ডপাত, তবু খাঁটি বাংলা।

যাহাই হোক, এই গ্রন্থখানিতে আদব কায়দার অনেক কথা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হিন্দু মুসলমান সকলেরই ধীর ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিবার যোগ্য। অনেক শিক্ষণীয় ও পালনীয় কথা ইহাতে আছে।"

তুরস্ক ভ্রমণ :

"এই গ্রন্থখানি বহু বিচিত্র তথ্যে পূর্ণ হওয়ায় অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।--ইহা পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। এই গ্রন্থ সাধারণের নিকট সমাদর লাভের যোগ্য, কারণ একজন বাঙালী নিজের চোখে এমন দেশ দেখিয়া আসিয়াছেন যাহা সচরাচর কাহারও দেখার সুবিধা হয় না, এবং এই গ্রন্থে সেই বাঙালীর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।"

তুর্কী নারী জীবন :

"গ্রন্থকার শিক্ষিত ও বহুদেশ দর্শনে-মার্জিতবুদ্ধি বলিয়া অবরোধ প্রথা ও অজ্ঞান অশিক্ষার যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। আমাদের মুসলমান ও হিন্দু সমাজ-ইহা হৃদয়ঙ্গম করিলে দেশে শুভকর্মের সূচনা সহজ হইয়া আসিবে।"

স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা :

" এক কালে মুসলমানেরা স্পেন অধিকার করিয়া ইউরোপের শিক্ষাদাতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্পেনের কর্ডোভা নগরী শিক্ষা, সভ্যতা শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই পুস্তকে সেই কর্ডোভায়

Dhaka University Institutional Repository

বৃত্তান্ত ও ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সাপ্তাহিক হিতবাদী[১] পত্রিকায় স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা সম্পর্কে বলা হয়, "গ্রন্থের ভাষা সরল ও সুখপাঠ্য, আমরা এই পুস্তক পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি।" এবং তুর্কী নারী জীবন গ্রন্থ সম্পর্কে বলা হয়, "পুস্তকখানি কেবল মুসলমান বলিয়া নহে, প্রত্যেক বাঙ্গালী হিন্দু রমনীরও পাঠ করা উচিত।"

আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেছেন "যথার্থ হিতকর গ্রন্থের শক্তিশালী রচয়িতা হিসাবে তিনি মুসলিম সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।"[২]

ইব্রাহিম খাঁ বলেছেন, মুসলমান সমাজে তাঁর স্ত্রী শিক্ষা প্রভৃতি বিবেকানন্দের শিক্ষণীয় বক্তৃতার বিকল্প হয়ে উঠেছিল।[৩]

মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, "তাঁহার স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলন কল্পনা বিলাস নহে, ইহা তাঁহার কথা ও কাজের সামঞ্জস্য রক্ষার নিদর্শন।"[৪]

শামসুন্নাহার মাহমুদ বলেছেন, "তাঁর 'তুরস্ক ভ্রমণ' ও 'তুর্কী নারী জীবন' গ্রন্থ সেকালে সমাজে যথেষ্ট প্রেরণার সঞ্চার করেছিল।"[৫]

আনিসুজ্জামান বলেছেন, "তবে সিরাজীর ভাষা সুন্দর, যে ভাষাকে সাধারণতঃ বঙ্কিমী বলা হয় সেই ভাষারীতিতে তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল।"[৬]

আবদুল হাফিজ বলেছেন, "তাঁর গদ্যের ভঙ্গী বাগ্মিতাপূর্ণ সাবলীল। তাঁর স্ত্রী শিক্ষা, তুরস্ক ভ্রমণ, তুর্কী নারী জীবন, আদব-কায়দা শিক্ষা, সুচনা, স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা, প্রভৃতি পুস্তকের গদ্যের ধরণ বেশ প্রাঞ্জল অথচ প্রাণবন্ত।"[৭]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান এভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, "তাঁর ভাষার কাঠামো ছিল ঐশ্বর্যময়, তবু গতি ছিল স্বচ্ছন্দ, সে ভাষা ছিল সবলবর্ষী অথচ মধুময়।"[৮]

বিভিন্ন সময়ে সিরাজীর প্রকাশ রচনার ধারাবাহিক মূল্যায়ন থেকে এটা স্পষ্ট মনে হয়, তার ক্ষমতা কেউ অস্বীকার করেননি। এমন কি প্রবাসী পত্রিকা আদব কায়দা শিক্ষা গ্রন্থের প্রতি বিমুখ হলেও

১। হিতবাদী(?) ১৩২৩।
২। আবুল কালাম শামসুদ্দীন-দৃষ্টিকোণ, ঢাকা, ইষ্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৬, পৃঃ১০১।
৩। বাতায়ন, পৃঃ৯০।
৪। মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৩১৭।
৫। শামসুন্নাহার মাহমুদ-সিরাজী-স্মরণে, আনোয়ার সিরাজী, পৃঃ৭৫।
৬। মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৪৩৯।
৭। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, জীবন কথা ও সাহিত্য কীর্তি, সি-র, পৃঃ৪২৮।

৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১৮০।

Dhaka University Institutional Repository

লেখকের রচনাদক্ষতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট করেছে। গদ্যভাষা সৃষ্টির দিক দিয়েও শিরাজীর এ ক্ষমতার সৌধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধকে পরিপাটি করতে সহায়তা করেছে গদ্য ভাষা। ভাষাকে তিনি কোন অবস্থাতেই সঙ্কীর্ণ সামাজিক মোড়ক পরাতে সম্মত হননি।

শিরাজীর উপন্যাস এবং প্রবন্ধের ভাষা বঙ্কিমী রচনারীতির অনুসারী বলে সাধারণভাবে স্বীকৃত। এমন কি তাঁর কবিতার ভাষাও এ গদ্য ভাষারই অনুসৃত রূপ। বঙ্কিমের মত সংস্কৃত বহুল ও তৎসম শব্দের প্রতি তিনি প্রীতি প্রদর্শন করেছেন ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাননি। সমাজকর্মী ও রাজনীতির সংগে সংযোগ এবং পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা যার ক্ষেত্রে বঙ্কিমের তুলনায় কিছু স্বাতন্ত্র্য অর্জন করলেও তাকে সহায়তা করেছে। বঙ্কিমের গদ্য রচনার সাহিত্যিক পদ্ধতি শিরাজীর প্রেরণার উৎস, কিন্তু মুসলমান সমাজের অভ্যুদয়ে থাকার ফলে আলোচনার বিষয়বস্তু পৃথক হয়ে এসেছে এবং স্বাভাবিক ভাবেই বিষয়বস্তুর সংগে প্রকাশের অনিবার্য সম্পর্কও পরিবর্তিত হয়েছে। শিরাজী সংস্কৃত বহুল ও তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেই সংগে তৎসম শব্দকেও পুনরায় সমাসবদ্ধ করে তা নিজের মত করে তুলেছেন। তবে এভাবে সমাসবদ্ধ করে তোলায় কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন শব্দ গঠনের সম্ভাব্য সীমাও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এ ছাড়া প্রচুর অসমাপিকা ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে বাক্যকে দীর্ঘ করেছেন এবং বক্তব্যের তরঙ্গময়তা বাড়িয়েছেন। কিন্তু এখানেও কি পরিমিতিবোধ রক্ষিত হয়নি। কঠিন পারিবেশিক আটপৌরে শব্দের ব্যবহার ভাষার সৌন্দর্যবৃদ্ধি এবং বিনাশ দুটোই করেছে। এদিক দিয়ে শিরাজীর গদ্যরীতি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছাকাছি হলেও দুটোর মধ্যে ব্যবধান কম নয়।

শিরাজীর গদ্যের প্রয়োগমূল্য বঙ্কিমের চেয়ে পৃথক, শিরাজী গদ্যভাষা দিয়ে বাগ্মিতা সৃষ্টি করেছিলেন এবং বাগ্মিতা দিয়েই গদ্য ভাষাকে পরিমার্জনা করেছিলেন। ফলে তাঁর গদ্য ভাষায় যে বৈশিষ্ট্য এসেছিল তা অবশ্যই বঙ্কিমের নয়, এখানেই শিরাজী গদ্যের মধ্যে সৌন্দর্যের ও শক্তির তাৎপর্য-পূর্ণ মিলন ঘটিয়েছিলেন। মুসলমানদের মধ্যেও শিরাজীর গদ্যের সঠিক উত্তরসূরী না থাকার কারণ এখানে অনুভব করা যায়। শিরাজীর ক্ষেত্রে এটা তাঁর জীবনযাত্রার সংগে সম্পর্কিত, তার পরবর্তীকালে আর কোন গদ্যরচয়িতার মধ্যে সমানুপাত অবস্থার প্রয়োজন হয়নি, আর কেউ গদ্য ভাষার সংগে জীবনকে এভাবে মিশ্রিত করে তোলেননি। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর সমাজ ও রাজনীতি ও চিন্তার প্যাটার্নটিও পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই শিরাজীর আদর্শায়িত গদ্য ভাষার সংগে এর একটি ব্যবধান রচিত হয়েছে।

আধুনিক গদ্য ভাষার অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি দিক শব্দ সচেতনতা শিরাজীর যথেষ্ট ছিল,

Dhaka University Institutional Repository

শব্দের অর্থধারণক্ষমতাকে তিনি বেশ প্রসারিত করে দিয়েছেন। এদিক দিয়ে তাঁর গদ্য ভাষা অবশ্যই আধুনিক, এমন কি তাঁর বক্তব্যকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে কিংবা ভুলে গেলেও গদ্য ভাষার আকর্ষণ অপহৃত হয় না।

(ঘ) গদ্য রচনার মূল্যায়ন

এক

মিরজার প্রবন্ধের মূল্যায়নের ব্যাপারে মুসলিম সাধনার পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখা আবশ্যক। প্রথম মুসলমান গদ্য লেখকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের (১৮০০) প্রায় ষাট বছর পরে, খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকীর (১৮০৮–১৮৭০?) উচিত শ্রবণ (১৮৬০) গ্রন্থটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এর সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্য রচনার তুলনা করলে মুসলমানদের অনগ্রসরতা সহজেই ধরা পড়ে। এটা কেবলমাত্র গদ্য রচনার বিষয় নয়, সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের শিক্ষা সামাজিক ও চিন্তা জগতের অনগ্রসরতাও এর মধ্য দিয়ে অনুভবযোগ্য। খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকীর পরে মুসলমানদের মধ্যে গদ্য লেখক হিসাবে গোলাম হোসেন এবং শেখ আজিমদ্দীন-এর কথাও কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।[১]

এর পর উল্লেখযোগ্য হলেন মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৭–১৯১২) শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯–১৯৩১) মোজাম্মেল হক (১৮৬০–১৯৩৩), মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২–১৯৩৩) পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯?–১৯১৮), মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১–১৯০৭), আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, (১৮৬৯–১৯৫৩), মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৯–১৯৬৮), মুন্সী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন (১৮৭০–১৯৩০), মোহাম্মদ গোলাম হোসেন (১৮৭৩–১৯৬৪), মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫–১৯৫০), রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০–১৯৩২) প্রমুখ। এরা কেউ কেউ মিরজার বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সমকালীন। এদের পরে এসেছেন কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২–১৯২৬), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫–১৯৬৯), এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৭–১৯৪০), মুহম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯–১৯৩৬), এস, ওয়াজেদ আলী (১৮৯০–১৯৫১), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬–১৯৫৪) প্রমুখ।

১। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

গদ্য রচয়িতা হিসাবে মীর মোশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যে অন্যতম একটি আসন পাবার উপযুক্ত। সমালোচকের দৃষ্টিতে "প্রবন্ধ সমূহে তাঁহার অসাধারণ পান্ডিত্য ও গভীর গবেষণার পরিচয় না থাকিলেও তাহা দ্বারা লেখকের যে সহজ বুদ্ধিমুক্তি ও নিরপেক্ষ বিচার-শক্তির নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায় না।"[১] মীর মোশাররফ হোসেনের প্রবন্ধ সাধারণতঃ তিন প্রকার, সমাজ সচেতনতামূলক, আত্মভাবনামূলক এবং ধর্ম সম্পর্কিত। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি ধর্ম বিষয়ক রচনার প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করেন।

শেখ আবদুর রহিমের রচনার তুলনায় সৃষ্টি প্রচুর নয়, তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে। তিনি বিভিন্ন সময়ে পাঁচটি পত্রিকা - সুধাকর (সাপ্তাহিক), মিহির (মাসিক), মিহির ও সুধাকর (সাপ্তাহিক), মোসলেম প্রতিভা (মাসিক), মোসলেম হিতৈষী (সাপ্তাহিক), ইসলাম দর্শন (মাসিক) সম্পাদনা করেন।[২]

পন্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদীর "সমাজ ও সংস্কারক" গ্রন্থটি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য, ইংরেজ সরকার কর্তৃক এটা বাজেয়াপ্ত হয়। এটা মূলতঃ জামালউদ্দীন আফগানীর জীবনী, তবে গদ্য-ভঙ্গিটি সাবলীল ও সুখপাঠ্য।

শিরাজীর সমসাময়িকদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রবন্ধ লেখক আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। ১৩০৫ থেকে ১৩৫৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর প্রায় চার শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।[৩] অনুসন্ধিৎসা এবং পান্ডিত্য সাহিত্য বিশারদের প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম পথ প্রদর্শক। শিরাজীর তুলনায় ইতিহাসকে তিনি বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন, শিরাজীর ইতিহাসবোধের সঙ্গে রাজনীতি মিশ্রিত ছিল।

আকরম খাঁ ও এবং ইসলামাবাদী শিরাজীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হলেও তাঁদের মধ্যে পার্থক্য আছেই। গদ্য রচনার ক্ষেত্রে শিরাজীর অবদান এদের তুলনায় ব্যাপক এবং শক্তিধরও বটে। শিরাজী তাঁর স্বদেশোপলব্ধি কিংবা জীবনাদর্শকে সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে গভীরভাবে মিশ্রিত করেছেন, যা এদের মধ্যে দেখা নেই, এদের কারো সাহিত্যিক অবদান সামগ্রিকভাবে শিরাজীর মত সৃষ্টি মুখর নয়।

১। অধীর দে- আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা, কলিকাতা, মুক্তি প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৮, পৃঃ ২৭৯।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১২১।

৩। মুহম্মদ এনামুল হক ও কবীর চৌধুরী (সম্পাদিত) - আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯, পরিশিষ্ট পৃঃ ১০-৯৯।

৪। পূর্ব, পৃঃ ৪৯-৫২।

Dhaka University Institutional Repository

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন এবং আরো পরবর্তীকালে মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের মোটামুটি অবদান নারীমুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে, শিরাজী প্রসংগতঃ তুলনীয়। রোকেয়া মুসলমান সমাজকে ধীরে ধীরে সচেতন ও সহনশীল করে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শিরাজী আঘাত করে সামাজিক বাঁধা দূর করতে চেয়েছিলেন। শিরাজীর মুক্তিচিন্তা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত, মুসলিম সমাজে রোকেয়ার প্রভাব বেশী পড়েছে। শিরাজীর বক্তব্য সমকালে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু যোগ্য উত্তরসূরীর অভাবে আর বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। অন্যদিকে নারী শিক্ষার অপেক্ষাকৃত প্রসারের ফলে রোকেয়ার উত্তরাধিকারী বের হতে দেরী হয়নি। তাছাড়া শিরাজী পুরানো সমাজের কুসংস্কার ভাঙার জন্য যেভাবে বিদ্রোহের পতাকা হাতে নিয়েছিলেন, মুসলমান সমাজের পক্ষে তার উত্তম বিকল্প ছিল রোকেয়ার নারী মুক্ত আবেদন। অবরোধবাসিনী রমনীর আর্তনাদের চিত্র রোকেয়া এবং শিরাজী উভয়েই দিয়েছেন, উভয়েই মুক্তালোকপথ প্রাচীর ভেঙে ফেলার আহবান জানিয়েছেন। শিরাজী দেখেছেন, শুধু কেবলমাত্র উপযুক্ত নারীই সুস্থ সুন্দর, গতিশীল ও আধুনিক চেতনাসম্পন্ন সমাজ গঠন করে তুলতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র সহ অন্যান্য সাহিত্যিকের নারী মুক্তি চিন্তার মুকুল শিরাজী হিন্দু সমাজের মধ্যে বাড়াবাড়ি হতে দেখেছেন, তথাপি স্বাভাবিক ভাবেই মুসলমান সমাজের প্রয়োজন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। রোকেয়ার গদ্যভাষা সাধু, অপেক্ষাকৃত অনলংকারবিহীন, রমনী সুলভের অনুকরণের মত সহজ ও মর্মস্পর্শী। রচনার কোথায় তাঁর ক্রন্দনও শোনা যায়, কিন্তু শিরাজীর মধ্যে ক্রন্দন নেই, যন্ত্রণা আছে এবং সে যন্ত্রণা থেকে উত্তীর্ণ হবার তেজোময় শক্তিও প্রদর্শিত। নারী মুক্তির ক্ষেত্রে শিরাজী ও রোকেয়ার তুলনায় লুৎফর রহমানের একটু পার্থক্য রয়েছে। রোকেয়া যেভাবে নারীকে শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন, শিরাজী তাকে নিয়ে আসেন সামাজিক ও জাতীয় জীবনে, লুৎফর রহমান দুস্থ রমনীদের জন্য সমাজকে প্রতিক্ষেত্রেই সহানুভূতির দ্বারা আর একটু প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন। তুলনায় বিচারে রোকেয়া ও লুৎফর রহমানের আবেদন মানবিক, কিন্তু শিরাজীর তা প্রধানতঃ রাজনৈতিক।

মীর মোশাররফ হোসেন থেকে শুরু করে লুৎফর রহমান পর্যন্ত সমসাময়িককালে আবির্ভূত সাহিত্যিকদের মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দীর্ঘজীবি ছিলেন, শিরাজীর তিরোধানের অনেক পরেও তাঁরা সক্রিয়ভাবে জীবিত ছিলেন। সু এদের সাহিত্যিক অবদানের সংগে সম্ভবত শিরাজীর তুলনা করা সমীচীন নয়। তবে তিরিশের দশকের সূচনা কাল পর্যন্ত এদের সকলের তুলনায় শিরাজীর সাধনাক্ষেত্র পৃথক, তাছাড়া কম উল্লেখযোগ্য নয়। প্রথম দুই

করেছেন, তার মধ্যে এলা প্রায় সম্পর্কহীন। শিরাজী এদের আঘাত বিরোধ বা সংঘ মনিষেরা সম্পর্কে নির্লিপ্ত থেকেছেন কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চাকে যেভাবে উৎসাহিত করেছেন, মুসলমানদের এক হাতে কোরাণ এবং অন্য হাতে বিজ্ঞান নিতে বলেছেন, সাম্প্রদায়িক উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন তাতে শিখা গোষ্ঠীর বক্তব্যের মধ্যে শিরাজীর মতের [বিরুদ্ধ] বৈষম্য থাকতে পারে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। মুসলমানদের মধ্যে যে কোন শুভ উন্নত সৃষ্টিকেই তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। সুতরাং এদের উদ্যোগকে প্রতিবাদ করতে পারেন বলে মনে হয়না। শিরাজী নিজের প্রবন্ধকে, স্বাতন্ত্র্যবাদ ও বিশ্বাসবোধকে প্রশ্ন করতে শিখিয়েছিলেন এবং শিখা ও মুসলিম সাহিত্য সমাজ সেই প্রবৃত্তিই জেগেছিল/ মুসলমান সমাজের নিকট। তিনি নিজেও মুসলমান সমাজে কল্যাণ সৃষ্টির জন্য প্রায় এ প্রশ্নগুলিকেই ভিন্নভাবে করেছিলেন। শিখা গোষ্ঠী ইসলামের নয়, বরং মুসলমানদের অন্ধ বিশ্বাসে যা তা করে তাদের চৈতন্য প্রবাহিত করতে চেয়েছেন প্রয়োজনবোধে ধর্মকেও নতুনভাবে মূল্যায়ন করে দেখার জন্য এ ত জোর লেখকরা প্রস্তুত ছিলেন।[1] শিরাজীর মানসিক গঠনের প্রকৃতি এর বিরোধী নয়, তিনি অবশ্য ধর্মীয় বিশ্বাসকে কঠিন পর্যায়ে নিতে সক্ষম ছিলেন, কিন্তু ধর্মকে ঠিক নয়। এখানে শিখা

১। "মুসলমানেরা ইসলামকে যেভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে তাহাতে সবখানেই অন্ধবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া গেলেও জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়না।---যদি দেখা যায় যে ইসলামের কোন বিধি মানব সমাজের উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে তবে নির্ভীকভাবে তাহা ত্যাগ করিয়া নূতন নূতন বিধি গড়িতে হইবে।"— আবুল হুসেন–আদেশের নিগ্রহ, শিখা, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৯২৮। উদ্ধৃত: মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, পৃঃ ৩৮০।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

দশকে কয়েকজন রচনা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও সমগ্রতা বিচারে তাঁরা কেউ এককভাবে শিরাজীর সঙ্গে তুলনীয় নন।

এর পর চতুর্থ অর্থাৎ বিশের দশকে শিখা গোষ্ঠীর আগমনের পর প্রবন্ধ রচনার বিষয় এবং প্রকাশভঙ্গী উভয়ই পরিবর্তিত হয়েছে। সামাজিক পরিস্থিতির ও পরিবর্তন ঘটেছে, প্রথম দুই দশকে যেমন বাঙালী মুসলমান সমাজের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় ছিল শিক্ষা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রসর-মানতার কারণে বিশের দশকে তার আর প্রয়োজন সেভাবে থাকেনি। ফলে শিখা গোষ্ঠী ও বুদ্ধির মুক্তি মুসলিম সাহিত্য সমাজ যে আন্দোলন নিয়েছে শিরাজী তা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তা সত্ত্বেও শিরাজী মুসলিম যৌবনকে যে রাজটীকা দিয়েছিলেন, নজরুল তা ধারণ করেছেন।

শিখা গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে শিরাজীর তুলনা প্রাসঙ্গিক। এদের শিক্ষা, সামাজিক অবস্থা, জাতিগত উত্তাপের সঙ্গে শিরাজীর কিছুটা ব্যবধান রয়েছে। তখনো যে সামাজিক দায়িত্ব শিরাজী পালন

গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর একটি পার্থক্যও দাঁড়িয়ে গেছে, এর অন্যতম কারণ সম্ভবতঃ প্রযোজক ও কর্মযোজনে বর্গের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সত্য যে, শিরাজী মুসলমান সাহিত্যিকদের এ ভাব আন্দোলন থেকে সর্বকতভাবে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে শিরাজী সহ অন্যান্য সাহিত্যিকের সকল প্রকার মনন / যোজনের পুষ্পিত বিকাশই হল শিখা ও মুসলিম সাহিত্য সমাজ। শিরাজী সমসাময়িক জীবিত থেকেও অর্থতঃ এর মধ্যে যেমন সম্পর্কযুক্ত নন, তেমনি দূরে থেকেও মুসলিম সাহিত্য সমাজের জন্ম সম্ভাবনার ধারাবাহিকতার ক্ষেত্র-তার মধ্যে যুক্তিপিপাসার গভীর প্রভাব দ্বারা যুক্ত। আন্দোলনের প্রতি ভালোবাসা শিরাজীকে মাহাত্ম্যে ভূষিত করেছে।

তৃতীয় দশকে প্রবন্ধ রচনার অন্যতম কৃতিত্ব যদি মুসলিম সাহিত্য সমাজকে দেয়া যায়, তাহলে মুসলিম সাধনার বিচারে প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের শিরাজীর এবং আবদুল

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্কিম সাহিত্য বিশারদের বলা যেতে পারে। সাহিত্য বিশারদের রচনারীতি অবশ্য পরেও উচ্চ বুদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া সাহিত্য বিশারদ এবং সিরাজীর গদ্য রচনার ক্ষেত্রও মোটামুটি ভাবে অভিন্ন নয়। সিরাজীর প্রবন্ধে অনেক পুনরাবৃত্তি দোষ আছে, কিন্তু মুসলমানদের সামাজিক রাজনৈতিক বক্তব্যকে তিনি যেভাবে চরম প্রকাশ দান করেন মুসলমান সমাজে তেমন বড় উদাহরণ দেখা নেই। সুতরাং বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে সিরাজীর অবদান যেমন অনুল্লেখ্য নয়, মুসলমানদের প্রেক্ষিত বিবেচনা করলে এ মানদণ্ড অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর হয়ে আসে। সিরাজীর উপন্যাস ও কবিতা বক্তব্য ধর্মী বলে প্রবন্ধ এবং ধর্মীয় গদ্য রচনা বিচারের ক্ষেত্রে এগুলো সার্থক।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

পূর্ব পাঁচটি অধ্যায়ে শিরাজীর কালপরিবেশ, জীবন ও মানসপ্রকৃতি এবং তাঁর রচিত সাহিত্য আলোচনা করা হয়েছে। শিরাজীর সাহিত্য রচনার পটভূমি এবং তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক মনে রাখলে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাগ্মিতা শিরাজীকে রাজনীতি ও সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত করেছে, কিন্তু সাহিত্যে এটা দুর্বলতার কারণও হয়েছে। শিরাজী প্রচারক জীবনে এবং রাজনীতিতে সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, কিন্তু বাগ্মিতাপ্রসূত অতিকথনদোষ ও প্রয়োজনচেতনা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে প্রায়ই শিল্পোত্তীর্ণ হতে দেয়নি।

শিরাজীর সামনে ছিল সমকালীন শিক্ষিত হিন্দুর একাংশ যারা বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকের রচনাকে রাজনীতির হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে বাস্তব করে তোলেন। জাতীয়তাবোধের যে প্রেরণায় হিন্দু সমাজ এসব সংঘাতের চিত্র ইতিহাস এবং অন্যান্য সূত্র থেকে সংগ্রহ করে আনে, সেই একই প্রেরণায় মুসলমানরা আত্মরক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছে। শিরাজী মুসলমান সাহিত্যিকদের হীনমন্যতা মোচন করার জন্য একদিকে যেমন মুসলমানদের বিচ্ছেদের কারণগুলো খুঁজেছেন, তেমনি অন্যদিকে মুসলমানদের কৃতিত্বের অংশটুকু বড় করে দেখিয়েছেন। প্রচারক জীবনের চারণপথে মুসলমানদের হীনমন্যতার বিস্তার দেখে তিনি শংকিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের সামনে আত্মপ্রত্যয় বা অবলম্বন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অনেক পরে শিরাজীর জবাব বঙ্কিমের প্রতি নয়, বরং শিক্ষিত হিন্দুর উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে মনে হয়। শিরাজী জাতিবৈর সৃষ্টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, মুসলমানদের কল্যাণ-চিন্তা এবং তাঁর পরাজয় বোধকে মুখ্য করে তুলেছেন। এ প্রক্রিয়া কোথাও কোথাও বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়ে উঠে ছিল।

শিক্ষিত হিন্দুর সংঘে এ প্রতিযোগিতাবোধটি প্রাধান্য পেয়েছিল উপন্যাসের ক্ষেত্রে। তবে শিরাজীর

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাস কেবলমাত্র নেতিবাচক ভূমিকার মধ্যে নিঃশেষিত নয়।

রায়নন্দিনী উপন্যাসে প্রতাপাদিত্য উৎখাতকে প্রতিহত করে তিনি সমকালীন মুসলমানকে দিতে চেয়েছেন ঈসা খাঁর বীরত্বের কাহিনী, এবং পৈতৃক রাজ্য রক্ষার ব্যাপারে ঈসা খাঁকে প্রস্তুত করে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু অনিবার্য কারণেই ঈসা খাঁর রাজ্য রক্ষা প্রধান নয়, বরং প্রেমই প্রধান হয়ে উঠেছে। এ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের জবাব দানের আকাঙ্ক্ষা মুখ্য অথবা গৌণ, কার্যতঃ তিনি রবীন্দ্রনাথের বউ ঠাকুরানীর হাট উপন্যাসকে অনুসরণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসের প্রভাব রায়নন্দিনী ছাড়া অন্যান্য উপন্যাসে, এমন কি মহাশ্মশান কাব্যেও পাওয়া যায়। দ্বিতীয় উপন্যাস তারাবাঈয়ের পটভূমিও সমকালীন শিবাজী উত্থান থেকে। এখানে শিবাজীর অপ্রতিহত রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা তিনি সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখেছেন, যদিও তাঁর সঙ্গে তারাবাঈয়ের প্রণয় কাহিনী লেখকের মনে স্থায়ী কোন ভাবের সৃষ্টি করেছিল বলে মনে হয় না। মুসলমান পাত্র-পাত্রী - মোহাম্মদ খাঁ ও মালিকা বানুকে দিয়ে শিবাজীর মত রাজ্য স্থাপন করাতে পারেননি, শিবাজীকেও প্রতিহত করতে পারেননি। ফিরোজা বেগম উপন্যাসে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পরও মুসলিম সাম্রাজ্য টিকে থাকেনি, নূরউদ্দীন উপন্যাসে নূরুদ্দিন রাজ্যে নূরউদ্দীনের প্রতিষ্ঠা দান করলেও প্রেম কাহিনীটিই বড় হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে হিন্দু মুসলমানের সংঘাত এবং মুসলমানের বিজয় ঘোষণার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও এগুলোকে অতিক্রম করে গেছে নারী পুরুষের সম্পর্কের উত্তাপ ও বাস্তবতা।

উপন্যাসে তিনি অতীত ইতিহাসের সঙ্গে সমকালের সংযোগ স্থাপন করে দিয়েছেন, এ সমকাল হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘাত প্রতিঘাতের ফলে সৃষ্ট। এ পটভূমিতে ইতিহাস নতুনভাবে ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হয়েছে। এজন্য অতীত ইতিহাসকে অবলম্বন করলেও তিনি ঠিক অতীত মুখী নন, বরং অতীত ইতিহাসের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে বর্তমান মুহূর্তগুলোকেই আলোকিত করে দিয়েছেন। তাঁর [illegible] কাব্যত্রয় ও একইভাবে ভারত ও বাংলায় সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত। উপন্যাস ও আখ্যানকাব্যে মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন এবং আদব কায়দা দিয়ে তাদের সামাজিক জীবন পুনর্গঠন করে তোলার প্রচেষ্টা আছে। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই গভীরতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যুক্ত ছিল। সাম্প্রতিক পরিণত অবস্থা রাজনীতির জন্ম দেয়, এগুলো সম্মিলিতভাবে মানুষের বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে রেখেছে পরাধীন ভারতে ইংরেজ বিরোধী জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ছিল

Dhaka University Institutional Repository

সেই মুহূর্তে মুক্তির সহায়ক। হিন্দু সমাজ পূর্বসূরী কবি সাহিত্যিকদের মাধ্যমে যে মুক্তি পিপাসা অর্জন করেছিল, সিরাজীর সাহিত্য সাধনা মুসলমানদের জন্য সে মুক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত ছিল। মুসলমান সমাজের বিশেষ অবস্থার পটভূমিতে সিরাজীর রচনা মুসলিম বিশ্বকে আঁকড়ে ধরার জন্যও মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তবে প্রচলিত প্যান ইসলামী ধারণার সংগে সিরাজী নিজস্ব বিবেচনা যুক্ত করে নিয়েছিলেন, মুক্ত সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রেই এসবের প্রকাশ রয়েছে। প্রেমের কাহিনী আর বিস্মৃতি আনে, জাগরণ প্রয়াসী জাতির জন্য যা বিস্মৃতি অনাকাঙ্ক্ষিত। এজন্য উপন্যাসে ও আখ্যান কাব্যে প্রেমের চেয়ে আদর্শ প্রচারকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন, যদিও তার সচেতন ইচ্ছা সর্বত্র প্রাধান্য পায়নি। তিনি রোমান্টিক আদর্শবাদী ছিলেন, যে কোন সম্প্রদায়ের আদর্শ ঘটনাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ইংরেজের প্রতি বিরূপ হলেও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিমুখ হননি। সচেতনভাবে চিন্তামূলক সংস্কারধর্মী প্রবন্ধের প্রতি আগ্রহ বেশী দেখিয়েছেন, এজন্য এমন কি তাঁর উপন্যাস এবং কিছুটা কবিতাও বক্তব্যের ভারে প্রবন্ধের সমগোত্রীয়।

সিরাজী ইংরেজ বিরোধী স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির ক্ষেত্রে অবিচল ছিলেন, পরাধীন ভারতে হিন্দু মুসলমানের ভাগ্যকে পৃথক করে দেখেননি, প্রচারধর্মী ছিল তার জাতীয়তার সংগে সম্পর্কিত, সাহিত্যে এসবের প্রকাশ ঘটেছে। প্রচার ধর্মের সংগে অব্যাহত সম্পর্কের ফলে তার সমগ্র জীবন কোন কোন দিক দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার সংগে প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে মিশ্রিত, তা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িকতাকে দমন করার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন, বিজ্ঞান ও কোরানকে সমভাবে মেলাতে চেয়েছিলেন। গোঁড়া ও অনুদার, ধর্মান্ধ মোল্লা, মৌলবী, পীর ফকিরদের হাত থেকে মুসলমান সমাজকে রক্ষার জন্য বক্তৃতা, সাহিত্য রচনা, ইত্যাদির মাধ্যম ব্যবহার করেছেন। তিনি মুসলিম জাগরণের অন্যতম কর্মী ছিলেন, এটাও তিনি পেয়েছিলেন উনিশ শতকের শেষ ভাগের হিন্দু কবি সাহিত্যিকদের সঞ্জীবনী থেকে। প্রচারক ও কর্মজীবনে সাধারণ মুসলমানদের সান্নিধ্যে এসে মুসলমান সমাজেই সেসব প্রয়োগ করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। তাঁর সমাজচিন্তা, শিক্ষা, ধর্মচিন্তা সমকালীন মুসলমান সমাজের জন্য যুগোপযোগী ছিল। মুসলমানকে তিনি উন্নত হিন্দুর সমান করে তুলতে চেয়েছিলেন। জমিদার মহাজনদের নির্যাতন থেকে কৃষককে রক্ষার জন্য হিন্দু ও মুসলমান কৃষকের ঐক্য কামনা করেছেন, তিনি শিক্ষিত হিন্দুর সংগে সংঘাতে লিপ্ত হলেও সম্প্রদায়গতভাবে সাধারণ হিন্দুর প্রতি প্রায়ই বিরূপ হননি। তবে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রেই আপেক্ষিক।

ইংরেজ আগমনের পর থেকে বর্তমান শতকের প্রথম তিন দশক পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের নিয়ামক শিক্ষা, সমাজ চিন্তা, রাজনৈতিক ঘটনাবলী মনে রাখা আবশ্যক। সিরাজী এর ঊর্ধে ছিলেন না

Dhaka University Institutional Repository

তা সত্ত্বেও তিনি সাম্প্রদায়িক সুস্থ সম্পর্ক সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন না এমন মনে করার কোন কারণ নেই। তিনি একই সংগে প্রতিযোগিতামূলক বিদ্বেষকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও সম্ভাব্য স্বাধীন ভারতে হিন্দু মুসলমানের মিলনের চূড়ান্ত সত্য মনে রাখলে আপাত বৈরিতা বা তিক্ততাবোধ কমে আসে।

সিরাজীর গীতি কবিতা জাতীয় ভাব উদ্দীপক, আখ্যানকাব্য গীতিকবিতার সমধর্মী, উপন্যাস প্রবন্ধের লক্ষণাক্রান্ত। কবিতার ক্ষেত্রেও তাঁর আদর্শ পূর্বসূরী হিন্দু কবি সাহিত্যিকবৃন্দ, পূর্বসূরীদের সংগে তাঁর কোন কোন রচনার সাদৃশ্য অত্যন্ত বেশী, একে প্রায় অনুকরণ বলা যায়। উপন্যাসে হিন্দুর প্রতি সদাশয় ভাব কবিতায় তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এখানে গোস্বামীর প্রসঙ্গে আবদুল, উভয়ের মঙ্গল মন্ত্রোচ্চারণের কথা একত্রে উচ্চারণ করেছেন, তবে অসাধ্য ঐক্যের প্রভৃতি বলে বিত্ত ও শিক্ষায় অগ্রসর হিন্দুর সমান হয়ে ওঠার জন্য মুসলমানদের আহবান করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করলেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধি কামনা করেছেন।

প্রবন্ধে ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি প্রসারিত। সিরাজীর সকল রচনাই বক্তব্য প্রধান, তবে প্রবন্ধে প্রকাশিত বক্তব্য তাঁর অন্যান্য বহু বক্তব্যের সারকথা বলে মনে করা যায়। উপন্যাসে কোন কোন পাত্র পাত্রীর ধর্মা[illegible] প আচারনিষ্ঠ মনে হলেও, প্রবন্ধে ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকের প্রতি কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। বরং মনে করা যায়, জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনার পূর্ণতার উৎস থেকে ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি সবই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি ছিলেন দ্বিধাযুক্ত, স্বাধীনতার অভাবকে মনে করেছেন সকল প্রকার মহৎ গুণাবলীর অনবকাশ হিসাবে। যৌবনে কারাবাস স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর নির্যাতন ভীতি দূর করে দিয়েছিল, তুরস্কের আত্মরক্ষার সংগ্রামে অংশ গ্রহণের ফলে যুদ্ধের প্রজ্বলিত অবস্থাই তাঁর নিকট অত্যন্ত বড় হয়ে উঠেছিল। তুরস্কভ্রমণ কাহিনী রচনার মধ্যে সিরাজীর মানসিকতার সংগে সমসাময়িকের সম্পর্ক প্রকাশিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ গ্রন্থটি নানা কারণেই বিশিষ্টতার দাবিদার।

সিরাজী মুসলমান সমাজে আদৃত ও নিন্দিত দুটোই হয়েছেন, এতে মুসলমান সমাজেও তাঁর স্থান অনুধাবন করা যায়। তিনি তাঁর বৃহত্তর কাল পরিবেশের তুলনায় প্রগতিশীল ছিলেন এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়েছেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলরা যখন অভিনন্দিত করেছে, সিরাজীকে তা প্রীত করেনি, তিনি তাদের কাছে বিবেক সাধারণ রাখেননি। কিন্তু তাঁর সাহিত্যে মুসলিম জাগরণের বাণীচিহ্নিত হিন্দুর

Dhaka University Institutional Repository

সংঘ সংকেতের কথা থাকার কারণে মরণোত্তর কালে এ প্রতিক্রিয়াশীলতাই তাঁকে ভালোবেসেছে। তাঁর সাহিত্যে সৃষ্টিশীলতার চেয়ে সামাজিক কল্যাণচিন্তা ও আদর্শবাদ প্রাধান্য পেয়েছে, ভাবরস মুখ্য হয়ে উঠেছে। বাগ্মিতা ও সাহিত্য সৃষ্টির এ রচনায় বৃত্ত থেকে প্রধানতঃ প্রচারক জীবন ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে বেরিয়ে আসতে পারেননি বলে জীবনের শেষ দিকেই প্রগতিশীল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, আত্মজীবনী রচনার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শিরাজীর স্থান যুগোপযোগী নয়। সমসাময়িক অন্যান্য মুসলমান কবি সাহিত্যিকের মত শিরাজীও হিন্দু পূর্বসূরীদের সৃষ্টিকর্মের পুনরাবৃত্তি করেছেন। বক্তব্যের ক্ষেত্রে সমসাময়িকতা থাকার ফলে কোথাও কোথাও তা বেশ উজ্জ্বলতা পেয়েছে। তবে মুসলমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বর্তমান শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে শিরাজীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য প্রমাণিত হয়। এ সময়ে উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, এমন কি বাগ্মিতার সম্মিলিত ক্ষেত্রে আর কোন মুসলমান কবি সাহিত্যিক একভাবে এত খ্যাতি পাননি ও বিতর্কিত হননি। শিল্প-গুণের ত্রুটি থাকলেও সামগ্রিক বিচারে তাঁর রচিত সাহিত্য তাঁকে সমাজ, রাজনীতি ও পরিবেশ সচেতন শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা দান করেছিল।

তাঁর মৃত্যুর পরে হিন্দু মুসলমানের তীব্র রাজনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থ সংঘাত, পৃথক জাতীয়তা সৃষ্টির আন্দোলন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, সাতচল্লিশের দেশ বিভাগ ইত্যাদি পর্যায়ক্রমিকভাবে দ্রুত ঘটে যায়। ফলে শিরাজীর সাহিত্যকর্ম গুরুত্ব অনেকখানি হারিয়ে ফেলে এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিক্রিয়াশীলদের নিকট আশ্রয় লাভ করে। তাঁর সাহিত্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এটা অনুকূল হয়নি।

000

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

(ক) মূল গ্রন্থ

ইসমাইল হোসেন সিরাজী: অনল প্রবাহ। সিরাজগঞ্জ, সৈয়দ আসাদ-উদ্দৌলা সিরাজী, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬০।

আদব-কায়দা শিক্ষা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, বর্ধিত ও সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩২৭।

ইসলামে জেহাদ বা মুক্তির বাণী, খুলনা, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ১৩৭২।

ইসলামের ডাকে সিরাজী সাহেবের বাণী, সিরাজগঞ্জ, ইমাদউদ্দীন আহমদ, ১৯৩৮।

উচ্ছ্বাস, কলিকাতা, শ্রীভূতনাথ পালিত, নব্যভারত প্রেস, ১৩১৪।

উদ্বোধন, কলিকাতা, শ্রীভূতনাথ পালিত, নব্যভারত প্রেস, ১৯০৮।

তুর্কী নারী জীবন, রংপুর, নায়েবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত মুন্সী মোহাম্মদ শাফায়েতুল্যা চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ, ১৩২০।

তুরস্ক-ভ্রমণ, কলিকাতা, শাহজাহান কোম্পানী, প্রথম সংস্করণ, ১৯১৩।

নবউদ্দীপনা, কলিকাতা, শ্রীভূতনাথ পালিত, নব্যভারত প্রেস, ১৩১৪।

নিখিল বঙ্গীয় কর্মী সম্মেলন (১ম অধিবেশন) সভাপতির অভিভাষণ, কলিকাতা, বিমল মুখার্জী, ১৯২৮।

প্রেমাঞ্জলি, শেখ আবদুল গফুর জালালী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২৩।

মহাশিক্ষা কাব্য, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৯। দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭১।

সিরাজী - রচনাবলী, উপন্যাস খণ্ড (রায়নন্দিনী, তারাবাঈ, ফিরোজা বেগম, নূরউদ্দীন) ঢাকা, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৭।

সঙ্গীত-সঞ্জীবনী, সিরাজগঞ্জ, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯১৬।

সুচিন্তা, কলিকাতা, মুন্সী মেরাজউদ্দীন আহমদ, ১৯১৬।

স্ত্রী শিক্ষা, ত্রিপুরা-চিনাইর নিবাসী মুন্সী বজলুর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত, বর্ধিত সংস্করণ।

স্পেন বিজয় কাব্য, কলিকাতা, মখদুমী লাইব্রেরী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯২০।

স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৯১৬।

স্বজাতিপ্রেম, কলিকাতা, আনজামরা লাইব্রেরী, ১৯৪৬।

অপ্রকাশিত গ্রন্থঃ জেলের রোজনামচা (গল্প), পুষ্পাঞ্জলি (কাব্য), পুষ্পাঞ্জলি (কাব্য), [illegible]

(খ) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা

অতীত কাহিনী, ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯০০।

অবরোধ প্রথায় দুর্গতি, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪।

অভিনন্দন, আল এসলাম, বৈশাখ, ১৩২২।

অভিভাষণ, কহেনুর, ২৫শে ফাল্গুন, ১৩০৪।

আত্মত্যাগ ও জাতীয় উন্নতি, নূর, মাঘ, ১৩২৬।

আত্মত্যাগ ও জাতীয় উন্নতি, ছোলতান, ১৩ই আষাঢ়, ১৩৩০।

আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা, সওগাত, পৌষ, ১৩২৪।

আত্মশক্তি ও প্রতিষ্ঠা, ইসলাম প্রচারক, মে-জুন, ১৯০৪।

আদর্শ ন্যায় পরায়ণতা, আল এসলাম, শ্রাবণ, ১৩২৫।

আদর্শ বিচারক, ছোলতান, ২৮শে চৈত্র, ১৩৩০।

আদর্শ সতী বিবি রহিমা, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩১০।

আনন্দিকা, ইসলাম প্রচারক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০১।

আফগান আমীর, প্রচারক, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩০৬।

অভ্যুত্থান, ছোলতান, ১১ই আশ্বিন, ১৩৩০।

আর্য এছলাম, ছোলতান, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।

আবুবকরের মক্কা, প্রচারক, পৌষ, ১৩০৭।

আরব, প্রচারক, পৌষ, ১৩০৭।

আরব কবির প্রাণের কথা, ছোলতান, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।

আর্তনাদ, ছোলতান, ৩২শে শ্রাবণ, ১৩৩০।

আশা, সাধনা, ফাল্গুন, ১৩২৭।

আশার বাণী, ছোলতান, ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০।

আশীর্বাদ, সাধনা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৩।

আশুরা, প্রচারক, আষাঢ়, ১৩০৭।

তিন

আমরা বাঙালী ও মোছলমান, মোহাম্মদী, ১০ই পৌষ, ১৩৩০।

আহবান, ভারতি, অগ্রহায়ণ, ১৩১২।

আহবান, নূর অল ইমান, চৈত্র ১৩৩৭।

আহমদী সঙ্গীত, ইসলাম প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল, ১৯০২।

ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতা, আল এসলাম, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০।

ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতা, আল এসলাম, ফাল্গুন, ১৩২০।

ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতা, সোলতান, ৪ঠা মাঘ, ১৩৩০।

ইসলাম ও সাহেব দর্শন, সোলতান, ফাল্গুন, ১৩৩০।

ইসলাম ও আমরা, নূর, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

ইসলাম ও বৈপ্লবিকতা, নূর, ভাদ্র-চৈত্র, ১৩২৬।

ইসলাম ও ঐক্যশক্তি, সোলতান, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ও বিজ্ঞান ,প্রচারক,পৌষ, ১৩০৭ ।

ইসলামের ভবিষ্যত,ইসলাম প্রচারক,নভেম্বর-ডিসেম্বর,১৯০১ ।

উচ্ছ্বাস,ইসলাম প্রচারক,জুলাই-আগস্ট,১৯০১ ।

উদগাথা,ইসলাম প্রচারক,মার্চ-এপ্রিল,১৯০০ ।

উদাসী(সমালোচনা),ইসলাম প্রচারক,বৈশাখ,১৩১২ ।

উদ্দীপনা,ছোলতান,আশ্বিন,১৩৩০ ।

উদ্বোধন সঙ্গীত,(১৯২৮ সনের ১৫ই আগস্ট কলিকাতা এলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ কর্মী সম্মেলনের উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে লিখিত।)

উন্মাদনা ও সিদ্ধি, আল এসলাম,বৈশাখ,১৩২৫ ।

উষায় আজান,নবনূর,মাঘ,১৩১২ ।

এ কি সে ভারত ,ছোলতান,কার্তিক,১৩৩০ ।

এছলাম ও আত্মোৎসর্গ,আল এছলাম,আশ্বিন,১৩২৬ ।

এছলাম ও ধনবল, আল এছলাম,অগ্রহায়ণ,১৩২৬ ।

এছলাম ও ধনবল,ছোলতান ,১৭ই ফাল্গুন,১৩৩০ ।

এছলামের শিক্ষা,আল এছলাম ,শ্রাবণ,১৩২৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

চার

এমাম শহীদ, ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯০২ ।

এমাম শহীদ, ইসলাম প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল, ১৯০২ ।

এসলাম ধর্মে ভীষণ আঘাত, আল এসলাম, পৌষ, ১৩২৪ ।

ঋষি আশীর্বাদ, ২৫শে আশ্বিন, ১৩০৪, কাপি ২ বই ৫৫০-ক ।

কবিতাগুচ্ছ, ইসলাম প্রচারক, ডিসেম্বর-১৯০৪, মে, ১৯০৫, জুন, ১৯০৫ ।

কবিতাগুচ্ছ, কোহিনুর, আষাঢ়, ১৩১৩ ।

কন্যা ও বধূ, ইসলাম প্রচারক, অক্টোবর, ১৯০৪ ।

কাজীর বিচার, ইসলাম প্রচারক, অক্টোবর, ১৮৯৯, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৮৯৯ ।

কারাকাহিনী, সাধনা, বৈশাখ, ১৩২৮, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮, আষাঢ়, ১৩২৮, আশ্বিন, ১৩২৮, কার্তিক, ১৩২৮, মাঘ, ১৩২৮ ।

কেন তবে তাব, আল এসলাম, পৌষ, ১৩২৫ ।

কোথায় এমন জাতি, ছোলতান, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩০।

ক্ষোভ, কোহিনুর, আষাঢ়, ১৩১২ ।

খদেশ, জাপান, ইসলাম প্রচারক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০৩ ।

খেলাফত সঙ্গীত, ছোলতান, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৩০ ।

গুপ্ত বাণী (হক দোস্ত ছদ্মনামে লিখিত), নূর, বৈশাখ, ১৩২৭ ।

চাঁদ সুলতানা, ইসলাম প্রচারক, মে-জুন, ১৯০২ ।

চিন্তার ধারা, নূর, মাঘ, ১৩২৬, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৬, বৈশাখ, ১৩২৭ ।

চোখ গেল, প্রচারক, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ ।

ছোলতান আবাহন, ছোলতান, ১১ই আশ্বিন, ১৩৩০ ।

জন্মভূমি (তুরস্ক হইতে), সুপ্রভাত, কার্তিক, ১৩২০ ।

জয়গান কর, আল এসলাম, মাঘ, ১৩২৫ ।

জাগরণ, ছোলতান, ১৮ই মাঘ, ১৩৩০ ।

জাগরণ গীতি, আল এসলাম, কার্তিক, ১৩২৪ ।

জাতীয় বন্ধন, নূর, মাঘ, ১৩২৬ ।

জাতীয় জীবন, আল এসলাম, ফাল্গুন, ১৩২৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার প্রয়োজন, সোলতান, ১৪ই ভাদ্র, ১৩৩০ ।

জাতীয় ধনভান্ডার, কাটিং বই, ৫৫০-ক ।

জাতীয় মহাসমিতি, মিহির ও সুধাকর, অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ ।

জীবন প্রবাহ, সোলতান, ৩১শে আষাঢ়, ১৩৩০ ।

জীবন সংগ্রাম, সাধনা, পৌষ, ১৩২৩ ।

জীবন সংগ্রাম, সোলতান, ২৮শে আষাঢ়, ১৩৩০ ।

জীবনের দৃঢ়তা, সাধনা, আশ্বিন, ১৩২৮ ।

দুর্বল প্রাণ, ইসলাম প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল, ১৯০২ ।

দুর্বল প্রাণ, নব্য ভারত, ফাল্গুন, ১৩১২ ।

ঢেঁকি অবতার (ব্যঙ্গ কবিতা, এক সেলাম ছদ্মনামে লিখিত), নূর, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৬ ।

তটিনী, ইসলাম প্রচারক, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ ।

নব জাগরণ, কাটিং বই, ৫৫০-ক ।

নবনূর ও ইসলাম, ইসলাম প্রচারক, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০০ ।

নববর্ষে উদ্বোধন, প্রচারক, মাঘ, ১৩০৬ ।

নব্য তুর্কী, সুপ্রভাত, ভাদ্র, ১৩২১ ।

নব্য যুবক ও ছাত্রদিগের প্রতি, কাটিং বই-৫৫০-ক ।

নারীত্ব, আল এসলাম, মাঘ, ১৩২২ ।

নারী জাতির দুর্গতি, আল এসলাম, ভাদ্র, ১৩২৩ ।

নারী জাতির দুর্গতি, আল এসলাম, ১৩২৪ ।

নারী শক্তির উদ্বোধন ও জাতীয় জীবন, সোলতান, ভাদ্র, ১৩৩০ ।

নারী শক্তির উদ্বোধন ও জাতীয় জীবন, সোলতান, ১২ই পৌষ, ১৩৩০ ।

নৈরাশ্য, আল এসলাম, আষাঢ়, ১৩২৩ ।

পবিত্রতা, ইসলাম প্রচারক, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ ।

পরিচয়, সোলতান, ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৩০ ।

পাটের বিশেষ কথা, দৈনিক সোলতান, ১লা ভাদ্র, ১৩৩০ ।

পারসী, ইসলাম প্রচারক, অগ্রহায়ণ, ১৩১১ ।

প্রাণের বেদনা, দৈনিক সোলতান, ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩০ ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণের মূর্ছনা, ছোলতান, চৈত্র, ১৩০১ ।

প্রাথমিক মুসলমান দিগের জ্ঞান চর্চা ও মুসলমান সুধীমণ্ডলী, ইসলাম প্রচারক, শ্রাবণ-ভাদ্র, ও আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১০ ।

পুষ্পাঞ্জলী, ছোলতান, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ ।

পুষ্পাঞ্জলী, ছোলতান, আষাঢ়, ১৩৩০ ।

প্রার্থনা, ইসলাম প্রচারক, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩১০ ।

প্রার্থনা, ইসলাম প্রচারক, অগ্রহায়ণ, ১৩১১ ।

প্রার্থনা, ছোলতান, বৈশাখ, ১৩৩০ ।

প্রেম, নবনূর, ফাল্গুন, ১৩১২ ।

ফজরের আযান, দৈনিক ছোলতান, ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৩০ ।

ফাতেহা দোহরা, ইসলাম প্রচারক, অগ্রহায়ণ, ১৩১১ ।

বঙ্গ ও বিহার বিজয়, ইসলাম প্রচারক, আগস্ট, ১৮৯৯ ।

বঙ্গ ও বিহার বিজয়, ইসলাম প্রচারক, সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯ ।

বঙ্গ ও বিহার বিজয়, ইসলাম প্রচারক, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০০ ।

বঙ্গ ও বিহার বিজয়, নূর, বৈশাখ, ১৩২৭ ।

বঙ্গভূমি, ইসলাম প্রচারক, মে-জুন, ১৯০০ ।

বজ্রবাণী, দৈনিক তকবীর, ঈদ সংখ্যা, ১৯২৭ ।

বাঙ্গালা ভাষার পরিচর্যা, আল এসলাম, মাঘ, ১৩২৪ ।

বাংলা সাহিত্যে মোসলমান পশ্চাৎপদ কেন?, কাটিং বই, ৫৫০-ক ।

বিচার, আল এসলাম, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫ ।

বিবাহ নীতি, আল এসলাম, কার্তিক, ১৩২০ ।

বিলাপ, ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারী, ১৯০০ ।

বেদনা, ছোলতান, ১৮ই মাঘ, ১৩৩০ ।

বোগদাদ চিত্র, ইসলাম প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল, ১৯০০ ।

বোগদাদ চিত্র, সওগাত, মাঘ, ১৩২৫ ।

বোরখা নীতি, ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯০২ ।

Dhaka University Institutional Repository

বোধন গীতি, ইসলাম প্রচারক, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০১ ।

ভগ্নীর প্রতি, ইসলাম প্রচারক, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ ।

ভবের উচ্ছ্বাস, কাটিং বই, ৫৫০-ক।

ভারত সঙ্গীত, ভারতি, কার্তিক, ১৩১২ ।

ভারতের বর্তমান অবস্থা ও মুসলমানের কর্তব্য, সোলতান, ২১শে ভাদ্র, ১৩৩০।

মনুষ্যত্ব, সাধনা, মাঘ, ১৩২৬ ।

মনুষ্যত্ব, সোলতান, ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ ।

মহাকবি কায়কোবাদ, মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩২৬ ।

মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, নব্যভারত, বৈশাখ, ১৩১৪ ।

মহাবীর গাজী আবদুল করিমের প্রতি, সোলতান, ১০শে অগ্রহায়ণ ১৩৩১।

মহাশিক্ষা কাব্য, আল এসলাম, আষাঢ়, ১৩২২, শ্রাবণ, ১৩২, ভাদ্র, ১৩২২, আশ্বিন, ১৩২২ ।

মহাশিক্ষা কাব্য, ইসলাম প্রচারক, মে-জুন, ১৯০৪, সেপ্টেম্বর, ১৯০৪, ডিসেম্বর, ১৯০৪ ।

মহাশিক্ষা কাব্য, নূর, মাঘ, ১৩২৬, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৬, বৈশাখ, ১৩২৭, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ ।

মাতৃভাষা, প্রচারক, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩০৬ ।

মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি, ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯০২ ।

মাভৈঃ, সোলতান, ১৪ই অগ্র ১৩৩০ ।

মালাবারে ইসলাম প্রচার, ইসলাম প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল, ১৯০০ ।

মালাবারে ইসলাম, ইসলাম প্রচারক, মে ও জুন, ১৯০০ ।

মুসলমান ছাত্রের শিক্ষা সমস্যা, কাটিং বই, ৫৫০-ক ।

মুসলমান ছাত্র বৃত্তি, নূর, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ ।

মুসলমান জাতি ও হিন্দু লেখক, ইসলাম প্রচারক, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০০ ।

মুসলমান জাতির বর্তমান অবস্থা, ইসলাম প্রচারক, জুলাই-আগস্ট, ১৯০১ ।

মুসলমান সম্বন্ধে দুই একটী কথা, প্রবাসী, কার্তিক, ১৩১১ ।

মুসলমান সাবধান, কাটিং বই, ৫৫০-ক ।

Dhaka University Institutional Repository

মোছলমানদিগের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান, ছোলতান, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।

মোল্লা টিল, ইসলাম প্রচারক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০৩।

মোসলেম জীবিত কি মৃত, মোসলেম জগৎ, ২৪শে ভাদ্র, ১৩৩২।

যোগ্যতমের উদ্বর্তন, আবেহায়াত।

রমজান, ইসলাম প্রচারক, বৈশাখ, ১৩১২।

রক্তের প্রতি, মোসলেম জগৎ, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

রৌপ্য সুবিধা, প্রচারক, কার্তিক, ১৩০৭।

শক্তির প্রতিযোগিতা, সাধনা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮।

শক্তির লীলা, নূর, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২।

শক্ত হও, আল এসলাম, ভাদ্র, ১৩২৫।

শিক্ষার পরিণাম, ছোলতান, ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৩০।

শিল্প সংগঠন ও জাতীয় জীবন, ছোলতান, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩০।

শোকগাথা, ছোলতান, ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৩।

শোক লহরী, ইসলাম প্রচারক, মে জুন, ১৯০০।

শোকোচ্ছ্বাস, ইসলাম প্রচারক, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৮৯৯।

শ্রাবণী, ছোলতান, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৩০।

সমাজে না, ইসলাম প্রচারক, মে, ১৯০৫।

সম্ভাষণ, আল এসলাম, পৌষ, ১৩২৪।

সম্ভাষণ, আল এসলাম, আষাঢ়, ১৩২৬।

সাম্য, সাধনা, মাঘ, ১৩২৮।

সাম্প্রদায়িক গোল, ছোলতান, ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৩০।

সাম্যবাদ।, কাটিং বই, ১৫০-ক।

সাধন, সাধনা, আষাঢ়, ১৩২৮।

সাহিত্য ও জাতীয় জীবন, আল এসলাম, আষাঢ়, ১৩২০।

সাহিত্য-শক্তি ও জাতি সংগঠন, আল এসলাম, বৈশাখ, ১৩২২।

সাহিত্য শক্তি ও জাতি সংগঠন, নবনূর, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০।

Dhaka University Institutional Repository

মন্থ

সাহিত্য শক্তি ও জাতি সংগঠন, নবনূর, আষাঢ়, ১৩১০।

সাহিত্যের প্রভাব ও প্রেরণা, সোলতান, ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৩০।

সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মোসলেম মহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ,

ইসলাম দর্শন, শ্রাবণ, ১৩৩১, ভাদ্র, ১৩৩১।

সিরিয়া পরিভ্রমণ, সুপ্রভাত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১।

সিরিয়া পরিভ্রমণ, আল এসলাম, ভাদ্র, ১৩২৫।

সিরিয়া পরিভ্রমণ, আল এসলাম, পৌষ, ১৩২৫।

সিসিলি দ্বীপে মুসলমানদিগের জ্ঞান চর্চা ও সুধীমণ্ডলী, ইসলাম প্রচারক, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০৩।

সিসিলি দ্বীপে মুসলমানদিগের জ্ঞান চর্চা, সওগাত, অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

সুধাঞ্জলি, নূর, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

সোলতান মাহমুদ, প্রচারক, মাঘ, ১৩০৬।

ঝুমুর, নবনূর, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩০৭।

স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা, আল এসলাম, মাঘ, ১৩২৩।

স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা, আল এসলাম, ফাল্গুন, ১৩২৩।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন   স্বজন স্মরণ, নবনূর, ভাদ্র, ১৩১২।

স্বজাতি প্রেম, সোলতান, ১৮ই কার্তিক, ১৩৩০।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে হযরত মোহাম্মদ (দঃ), আল এসলাম, শ্রাবণ, ১৩২৪।

আবুল হুসেন   হযরত ওমর, আল এসলাম, ফাল্গুন, ১৩২২।

আবুল মনসুর আহমদ   হিজরী নববর্ষ, আল এসলাম, আশ্বিন, ১৩২৩।

হিন্দু মুসলমানের একতা, মোহাম্মদী, ২৮শে বৈশাখ, ১৩২৯।

হিমাচল দর্শন, সোলতান, ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৩০।

(গ) সহায়ক গ্রন্থ

অচিন্ত্য কুমার সেন গুপ্ত : কল্লোল যুগ, কলিকাতা, ডি, এম, লাইব্রেরী, তৃতীয় প্রকাশ, ১৩৬০।

অজ্ঞাত (সংকলিত) : আবেহায়াত, কলিকাতা, মোহাম্মদ বদিউর রহমান, মোহাম্মদী প্রেস, প্রথম সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

দশ

অধীর দে : আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা, কলিকাতা, মুক্তি প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৮।

অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত : বাঙালা ঐতিহাসিক উপন্যাস, কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস। প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭।

অমলেন্দু দে : বাঙালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ। কলিকাতা, রত্না প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪।

অরবিন্দ ঘোষ : কারাকাহিনী, তা-বি।

অরবিন্দ পোদ্দার : বঙ্কিম-মানস, কলিকাতা, ইন্ডিয়ানা, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৯৬৬।

আনিসুজ্জামান : মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ১৯৫৭-১৯১৮, ঢাকা, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৭৪।

: মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৮০১-১৯৩০), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯।

: স্বরূপের সন্ধানে, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৭৬।

আবুল কালাম শামসুদ্দিন : অতীত দিনের স্মৃতি, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৮।

: দৃষ্টিকোণ, ঢাকা, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৬।

আবুল ফজল : রেখাচিত্র, চট্টগ্রাম, বইঘর, ১৯৬৫।

আবুল মনসুর আহমদ : আত্মকথা, ঢাকা, খোশরোজ কিতাবমহল, ১৯৭৮।

: আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, তৃতীয় বর্ধিত মুদ্রণ, ১৯৭৫।

আবুল হোসেন, ডাক্তার সৈয়দ : জ্ঞানভাণ্ডার, Calcutta. Printed & published by Syed Abul Hasem, B.A. 1924.

আবদুল ওদুদ, কাজী : শাশ্বত বঙ্গ, কলিকাতা, কাজী মুরশীদ বখত, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৮।

আবদুল বারি : কারবালা, তা-বি।

আবদুল মান্নান, কাজী : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

: সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, ঢাকা, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭০।

আবদুল হাই, মুহম্মদ ও আলী আহসান, সৈয়দ : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চট্টগ্রাম, বইঘর, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮১।

আমিনুল ইসলাম, এ, কে, এম : বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও কাব্য, ঢাকা, বুক স্টল, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৫৯।

আহমদ শরীফ : বাঙালার সুফী সাহিত্য, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৯।

: বিচিত চিন্তা, ঢাকা, চৌধুরী পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৮।

ইজারউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত) : অনল-প্রবাহের উৎস থেকে, ঢাকা, দরবার পাবলিকেশন্স, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭০।

: আলোর দিশারী, ঢাকা, সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭১।

ইব্রাহিম খাঁ : বাতায়ন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৭।

কায়কোবাদ : অমিয়-ধারা, ঢাকা, প্রকাশক আবুল খয়ের জয়েনউদ্দীন আহমদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৪৬।

: অশ্রুমালা, কায়কোবাদ কর্তৃক প্রকাশিত, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৫৬।

: মহরম শরিফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড একত্রে, কায়কোবাদ কর্তৃক প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৬।

: মহাশ্মশান, ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৬৭।

: শিবমন্দির বা জীবন্ত সমাধি কাব্য, ঢাকা, মোসাম্মৎ মেহেরউন্নিসা খাতুন কর্তৃক প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৪৪।

শ্রী কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ (সম্পাদিত) : রাজমালা, তৃতীয় লহর, আগরতলা, রাজমালা কার্যালয়, ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ।

কার্লমার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস : প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা-যুদ্ধ ১৮৫৭-১৮৫৯, মস্কো, বিদেশী ভাষায় প্রকাশালয়।

কেদার নাথ মজুমদার : ময়মনসিংহের বিবরণ, কলিকাতা, মান্যান এণ্ড কোং, ১৯০৪।

ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : প্রতাপ-আদিত্য, ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, কলিকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা

গিরিশ চন্দ্র ঘোষ : সিরাজদ্দৌলা, গিরিশ রচনা সম্ভার, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৩০ ।

গোলাম সাকলায়েন : বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য, ঢাকা, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৯ ।

: মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৭ ।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর : সরোজিনী নাটক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী (পঞ্চম ভাগ), কলিকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির ।

তারাপদ মুখোপাধ্যায় : আধুনিক বাংলা কাব্য, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, চতুর্থ মুদ্রণ ।

দীনেশচন্দ্র সেন : পূর্ববঙ্গ গীতিকা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৬ ।

দীপ্তি ত্রিপাঠী : আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, কলিকাতা, নাভানা, ১৯৬৯ ।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্রোহে বাঙালী বা আমার জীবন চরিত, কলিকাতা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, নূতন সংস্করণ, ১৯৫৭ ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৪ ।
ঐ দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৬৭ ।

নগেন্দ্রনাথ সোম : মধুস্মৃতি, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬১ ।

নজরুল ইসলাম, কাজী : নজরুল রচনাবলী, প্রথম খন্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫, ঐ দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৭ ।

নবীনচন্দ্র সেন : পলাশির যুদ্ধ, কলিকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১৯৬১ ।

নরহরি কবিরাজ : স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা, কলিকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬১ ।

নিখিল নাথ রায় (সম্পাদিত) : প্রতাপাদিত্য, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১০ ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : ভারতে জাতীয় আন্দোলন, কলিকাতা, গ্রন্থম, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫ ।

: রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৭০ ।

Dhaka University Institutional Repository

: রবীন্দ্র জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৫৫।

: রবীন্দ্র জীবনী, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬১।

বদরুদ্দীন উমর : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, ঢাকা, গ্রন্থনা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৯।

: সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা, ঢাকা, গ্রন্থনা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৯।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় প্রকাশ, ১৩৬৯।

: ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৭৬।

বিজিত কুমার দত্ত : বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৯।

বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত ও সংকলিত) : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র। প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬২।

: ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা বীক্ষণ গ্রন্থন ভবন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৩।

: ঐ, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, বীক্ষণ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬।

: ঐ, চতুর্থ খণ্ড, কলিকাতা, পাঠভবন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬।

বিনয়েন্দ্র মোহন চৌধুরী : কিছু ভারত। কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬।

বিপিনচন্দ্র পাল : নবযুগের বাংলা, কলিকাতা, যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড, ১৩৬২।

বুদ্ধদেব বসু : সাহিত্য চর্চা, কলিকাতা, দেজ পাবলিশিং, দেজ পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৬।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় : ভূদেব রচনাসম্ভার, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৬৯।

মধুসূদন দত্ত : মধুসূদন রচনাবলী, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭১।

মুজফ্‌ফর আহমদ : আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ১৯২০-১৯২৯, কলিকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৭১।

: কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা, কলিকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৬৯।

মুনীর চৌধুরী : তুলনামূলক সমালোচনা, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

চৌদ্দ

মুস্তফা নুরউল ইসলাম : মুসলিম বাংলা সাহিত্যে পাঠ পরিক্রমা, ঢাকা, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৯ ।
: সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭ ।

মুহম্মদ এনামুল হক : বঙ্গে সূফী প্রভাব, কলিকাতা, মোহসিন এন্ড কোং, ১৯৩৫ ।
: মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৬৫ ।

মোশাররফ হোসেন, মীর : বিষাদ-সিন্ধু, মশাররফ রচনা-সম্ভার, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮০ ।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা : প্রদেশিক কনফারেন্স, সিরাজগঞ্জ অধিবেশন, সভাপতির অভিভাষণ, Calcatta, Mohammadi press.

মোহাম্মদ আছির উদ্দীন প্রধান : মেহেরউল্লার জীবনী, জলপাইগুড়ি, গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ, ১৯০৯ ।

মোহাম্মদ আবুল কাশেম, ডাক্তার : ঈশা খাঁ-দুর্গামণি, কলিকাতা, মখদুমী লাইব্রেরী, ১৯৩০ ।

মোহাম্মদ ইসরিস আলী, শেখ : বঙ্কিম-দুহিতা, তা-বি ।

মোহাম্মদ গোলাম হোসেন : বঙ্গদেশীয় হিন্দু-মুসলমান, কলিকাতা, ১৮ নং হলওয়েল লেন "হানেফিয়া" প্রেস হইতে মুদ্রিত, ১৩১৭।

মোহাম্মদ নজিবর রহমান : হাসন-গঙ্গা বাহমনি, কলিকাতা, মখদুমী লাইব্রেরী, ১৩২৩ ।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : আধুনিক কাহিনী কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র, ঢাকা, বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬২ ।
: আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ১৮৫৭-১৯২০, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭০ ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক : জাতীয় মঙ্গল, কলিকাতা The Noor Library, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩২৪ ।

মোমতাজ হারুন (সম্পাদিত) : সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী স্মরণিকা, ঢাকা, মৌসিন প্রকাশনী, ১৯৭৯ ।

যদুনাথ সরকার, : শিবাজী, কলিকাতা, এম, সি, সরকার এন্ড সন্স ।

যোগীন্দ্রনাথ বসু : শিবাজী, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩০৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : কেদার রায়, ঢাকা, আলবার্ট লাইব্রেরী, ১৩২১।

: বিক্রমপুরের ইতিহাস, কলিকাতা, ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্স, ১৩১৬।

যোগেশচন্দ্র বাগল : ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, কলিকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, প্রথম সংস্করণ, ১৩৪৮।

: জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬১।

: বাংলার স্ত্রীশিক্ষা (১৮৮০-১৮৫৬), কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬।

: মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নবজাগরণের ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, এম, কে, মিত্র এন্ড ব্রাদার্স, ২য় সংস্করণ, ১৩৫২।

: হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, মৈত্রী, নূতন সংস্করণ, ১৩৭৫।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় : পদ্মিনী-উপাখ্যান, রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী, কলিকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ২য় সংস্করণ।

রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী : গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, মালদহ published by M. Abid Ali Khan প্রথম সংস্করণ, ১৯০৯।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬১।

: জীবনস্মৃতি, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৭২।

: বউ-ঠাকুরাণীর হাট, রবীন্দ্র রচনাবলী, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৩।

: রাজর্ষি, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৭০।

রমেশচন্দ্র দত্ত : রমেশ-রচনাসম্ভার, ২৪ পরগনা, অমর সাহিত্য প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৪।

রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮০।

: ঐ, তৃতীয় খণ্ড, ১৩৮১।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৭১।

: ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭১।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনারায়ণ বসু : সেকাল আর একাল, কলিকাতা, নূতন বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রী যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, শক, ১৮০০ ।

: রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, কলিকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬২ ।

রাধারমণ সাহা : পাবনা জেলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পাবনা, গ্রন্থকার প্রকাশিত, ১৩৩০ ।

: ঐ, ৪র্থ খণ্ড, পাবনা, গ্রন্থকার প্রকাশিত, ১৩৩৩ ।

রামরাম বসু : রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, কলিকাতা, রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ১৩৪৩ ।

রেজাউল করীম : বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, কলিকাতা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬১ ।

রেয়াজ-অল-দি আহমদ মাশহাদী, সম্পাদিত : মাশহাদী রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ঢাকা, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭০ ।

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন : রোকেয়া-রচনাবলী, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৩ ।
([illegible])।

শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৭ ।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলিকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী, ষষ্ঠ পুনঃমুদ্রণ, ১৩৮০ ।

সতীশচন্দ্র মিত্র : যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, প্রথম সংস্করণ, ১৩২৯ ।

সতীশ পাকড়াশী : অগ্নিদিনের কথা, কলিকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৪৪ ।

সত্যচরণ শাস্ত্রী : প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত, কলিকাতা, শ্রী সত্যচরণ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১১ ।

সফিউদ্দিন আহমদ, মৌলভী : মনোজকুমারী বা আর্য্য-জীবন সন্ধ্যা, কলিকাতা, মোহাম্মদ মাহমুদ আলাম খাঁ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৩৪ ।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলিকাতা, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭১ ।

Dhaka University Institutional Repository

সরফুদ্দীন আহমদ, আবু মুসা : স্বরূপকাঠি জীবন, ঢাকা, রেতায় পুনর্গঠন সংস্থা।

সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৭৭ এবং তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৭৬।

সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলিকাতা, ডি এন বি এ ব্রাদার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭২।

: ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (১৯০১–১৮) কলিকাতা, ডি এন বি এ ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭০।

সুশীল কুমার গুপ্ত : ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ, কলিকাতা, এ, মুখার্জী এ্যান্ড কোং (প্রাইভেট লিমিটেড), ১৯৫৯।

সেরাজুল হক, এম : সিরাজী-চরিত, কলিকাতা, সিরাজী লাইব্রেরী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৩৫।

সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, কলিকাতা, বসুধারা প্রকাশনী, ১৩৬৭।

হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন, শেখ : কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা, কলিকাতা, মখদুমী লাইব্রেরী, ১৯৩৪।

হবিবুল্লাহ, আবু মহামেদ : সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪ ([illegible])।

হাবিব, এম, এ : কর্মবীর সেরাজুল হক, পাবনা, আমার দেশ প্রকাশনী, ১৯৬৬।

ঐ : চলন বিলের ইতিকথা, পাবনা, আমার দেশ প্রকাশনী, ১৯৬৭।

হামিদ আলী, আব্দুল আলী মহাম্মদ : কাসেম বধ কাব্য বা সাহায়াতে ইমাম কাসেম (আঃ), ঢাকা, কটন-লাইব্রেরী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩২০।

হুমায়ুন কবির : বাংলার কাব্য, কলিকাতা, চতুরঙ্গ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৫।

: মোসলেম রাজনীতি, কলিকাতা, পূর্বাশা লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫০।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড।

Dhaka University Institutional Repository

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (প্রথম খণ্ড), কলিকাতা, [illegible] প্রকাশ মন্দির, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৪।

: ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, বুকল্যান্ড, ১৯৫৭।

(ঘ) সহায়ক প্রবন্ধ

আজহার আলী, শাহ : সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০।

আনোয়ার পাশা : মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি ও হিন্দু মেলা, সাহিত্য পত্রিকা, ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ : উপন্যাসে প্রতাপাদিত্য, সাহিত্য পত্রিকা, ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

আবদুল কাদির : এসমাইল হোসেন সিরাজী, সওগাত, কার্তিক, ১৩৩৫।

আবদুল কাদের, এম : সিরাজপুরের ঈসা খান, মাহে-নও, আশ্বিন, ১৩৬১।

: ঈশা খাঁ-[illegible], মাহে-নও, আশ্বিন, ১৩৭৫।

: বাঙলার বারভূঁঞা ইতিহাসের পুনর্গঠন, বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, ২২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

আবদুল গফুর জালালী, শেখ : অনল প্রবাহের কবি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর কারাবরণের কাহিনী, ইত্তেফাক, ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৭০।

আমজাদ হোসেন, মোঃ : ইসলাম ধর্ম প্রচারে সিরাজীর অবদান, সওগাত, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩

: মরহুম ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আজাদ, ৭ই শ্রাবণ, ১৩৬৮।

আলী আসগর, এ, এইচ : জাতীয় জাগরণে মহাকবি সিরাজী, দিলরুবা, আশ্বিন, ১৩৬৬।

: নারী জাগরণে সিরাজী, আজাদ, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৯।

আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক : ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আজাদ, ৩রা শ্রাবণ, ১৩৬০।

: রায়নন্দিনী, মাহে-নও, বৈশাখ, ১৩৬০।

: সিরাজী প্রসঙ্গে, মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০।

: স্পেন বিজয় কাব্য, মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০।

আহমদ ছফা : বাঙালী মুসলমানের মন, সমকাল, ফাল্গুন, ১৩৮২।

এবাদত হোসেন : সিরাজীর কাব্যের মৌলিক প্রেরণা, ইত্তেফাক, ৯ই শ্রাবণ, ১৩৬৬

উনিশ

: সিরাজীর কাব্যের মৌলিক [illegible], সাহিত্যিকী, ১৪শ বর্ষ, শরৎ সংখ্যা, ১৩৮৪

গোলাম সাকলায়েন : সিরাজী সাহিত্য পরিক্রমা, সাহিত্যিকী, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

: সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও সাহিত্য চর্চা, সওগাত, শ্রাবণ, ১৩৬৬।

: সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

[illegible] : সিরাজী প্রসঙ্গে, মাহেনও, মাঘ, ১৩৬৩।

জসীম উদ্দীন : সিরাজী–স্মৃতি, দিলরুবা, শ্রাবণ, ১৩৬১।

দেওয়ান আবদুল হামিদ : কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আজাদ, ৩২শে আষাঢ়, ১৩৬২।

: কবি এছমাইল হোসেন সিরাজী, মোহাম্মদী, চৈত্র, ১৩৬২ ও বৈশাখ, ১৩৬৩।

নুরুল হক, কাজী : রায়নন্দিনী, মোহাম্মদী, ভাদ্র, ১৩৬০।

রফিউজ্জামান : ইসমাইল হোসেন সিরাজী : যুগ[illegible], পূর্বাচল, আশ্বিন, ১৩৮৩।

মযহারুল ইসলাম : সিরাজী ও তাঁর কবিতা, সংবাদ, ২৪শে ভাদ্র, ১৩৬৮।

মুজীবর রহমান খাঁ : অনল প্রবাহের কবি, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

: অনল প্রবাহের কবি, মোহাম্মদী, পৌষ, ১৩৬২।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : সোনা বিন্দু কাব্য: ইসমাইল হোসেন সিরাজী, সাহিত্যিকী, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, অধ্যাপক : ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মাহেনও, মাঘ, ১৩৫৬।

মোহাম্মদ আবু তালিব, অধ্যাপক : বাংলা সাহিত্যে সিরাজী, মোহাম্মদী, আষাঢ়, ১৩৬১।

যদুনাথ সরকার : প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ, প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৬।

: প্রতাপাদিত্যের পতন, প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৭।

: প্রতাপাদিত্যের সভায় খ্রীষ্টান পাদরী, প্রবাসী, ১৩২৮।

: বঙ্গের শেষ পাঠান বীর, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮।

: বাঙ্গালার স্বাধীন জমিদারদের পতন, প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৯।

শফিউদ্দীন আহমদ : সিরাজী প্র.[illegible], ইত্তেফাক, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৪।

শামসুন নাহার মাহমুদ : সিরাজী স্মরণে, ইত্তেফাক, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৪।

[illegible] : [illegible] ১৮০২।

[redacted] : [redacted]

Dhaka University Institutional Repository

[illegible] : প্রতিক্রিয়ার রূপক, সিরাজীর উপন্যাস, বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, ২২শ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা।

: সিরাজীঃ জীবন ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

সিরাজুল হক : অমর প্রবন্ধের কবি, দিলরুবা, ফাল্গুন, ১৩৬৩।

: জাতীয় চেতনার অগ্রদূত সিরাজী, ইত্তেফাক, ০২শে আষাঢ়, ১৩৬৩।

হাবিবা খাতুন : ইসলামের সেবক সিরাজী, আজাদ, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৬১।

(ঙ) সাময়িক পত্র

আল এসলাম	নূর	ভারতী
ইসলাম দর্শন	প্রবাসী	মাহে-নও
ইসলাম প্রচারক	প্রচারক	মোহাম্মদী
কোহিনূর	বঙ্গনূর	সওগাত
ছোলতান	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা	সাধনা
দিলরুবা	বসুমতী	সাহিত্য পত্রিকা
নওরোজ	বাংলা একাডেমী পত্রিকা	সাহিত্যিকী
নবনূর	বাসনা	সুপ্রভাত
নব্যভারত	ভারতবর্ষ	[illegible]

(চ) সহায়ক ইংরেজী গ্রন্থ

Abdul Karim — Muhammadan Education in Bengal, Calcutta, Metcalfe press, 1900.

Abdul Karim — Murshid Quli Khan and His Times, Dacca, The Asiatic Society of Pakistan, First published, 19

Abdul Majed Khan — The Transition in Bengal, 1756-1775, Cambridge, At the University press, 1969.

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

A.B. Rajput : Muslim League Yesterday and Today, Lahore, Mohammad Ashraf, Kashmiri Bazar, 1948.

Abul Kalam Azad, Maulana : India wins Freedom, Bombay, Orient Longmans, Reprinted, 1959.

Afzal Iqbal, (Com & ed) : Select writings and speeches of Maulana Mohamed Ali, Lahore, Shaikh Muhamed Ashraf, 1944.

Aga Khan : India in Transition, London, Philip Lee warner, 1918.

Ali Azam, Md : Life of Maulavi Abdul Karim, Calcutta, Md. Ali Azam, 1939.

Allen, B.C. : Eastern Bengal District Gazetters, Dacca, Allahabad, The pioneer Press, 1912.

Amalendu De : Roots of Separatism in Nineteenth Century Bengal, Calcutta, Ratna prakashan, 1974.

Ameer Ali, Syed : A Short History of the Saraeens, London, Macmillan & Co Ltd, 1961.

Anil Seal, : The Emergence of Indian Nationalism, Cambridge, At the University Press, 1971.

Anonymous : Nawab Bahadur Abdul Latif C.I.E., Calcutta, Thacker spink co.

A.R. Desai : Social Background of Indian Nationalism, Bombay, popular Prakashan, Fifth edition, 1976.

A.R. Mallick : British Policy and the Muslims in Bengal, (1757-1856), Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1961.

Baljon, J.M.S. : The Reforms and Religious Ideas of Sir Sayyid Ahmad Khan, Lahore, Orientalia, Second edition, 1958.

B.D. Basu : History of Education under the Rule of the East India Company, Calcutta, The Modern Review office.

বাইপ

[illegible], James G[illegible] : The Ruin of Indian Trade and Industries, Calcutta, R. Chatterji, Second edition.

Bemanbehari Majumdar : History of political Thought, Vol.I, Calcutta, University of Calcutta, 1934.

Beveridge, H [illegible] : The District of Bakerganj, Bakerganj, Bakerganj District Council, Reprint, 1970.

Bipin Chandra pal : Memories of my life and times, Calcutta, Modern Book agency, 1932.

Blochmann, H(Trans) : The Ain-i-Akbari, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1927.

Bradley-Birt, F.B. : Dacca, The Romance of an Eastern Capital, London, G. Bell and Sons, Ltd, Second Edition, 1914.

[illegible] : Twelve Men of Bengal in the Nineteenth Century Calcutta, S.K. Lahiri and Co, Fourth edition.

Bright, John : Speeches, London, John Camden Hotten, 1869.

Browne, Edward G. : A Literary History of Persia, Volume I, Cambridge, At the University Press, 1956 & Volume II.

Buchanan : The History, Antiquities, Topography, and statistics of Eastern India, Vol.I, II, III, London, W M H. Allen and Co, MDCCCXXX VIII.

Buckland, C.E. : Bengal Under the Lieutenant Governers, Vol II, Calcutta, Kedarnath Bose, 1902.

Burn, Sir Richard(ed) : The Cambridge History of India, Volume-IV, Delhi, S. Chand & Co., 1963.

Campos, J.J.A. : Portuguese in Bengal, Calcutta, Butterworth & co(India)Ltd. 1919.

Coatman, J : India in 1925-26, Government of India.

Cotton, H.J.S. : New India or India in Transition, London, Kegan Paul, 3rd, ed, 1886.

Coupland, Sir Reginald : The Indian problem 1833-1935, Oxford, At the University press.

Dodwell, H.H.(ed) : The Cambridge History of India, Vol.VI, Delhi, S.chand & Co, 1964.

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

Duff, James Grant : A History of the Mahrattas Vol.I, Calcutta, R.Cambray & Co.1912 & Vol.II ;

Elphinstone, Monstuart: The History of India, London, John Murray, 1905.

Enamul Haq(ed) : Nawab Bahadur Abdul Latif, Dacca, Samudra prokashani, 1968.

Enamul Haq, Muhammad : A History of Sufi-ism in Bengal, Dacca, Asiatic Society of Bangladesh, First published, 1975.

Fazlul Huq, A.K. : Bengal Today, Calcutta, Gupta Rahman & Gupta, First Edition, 1944.

Fuzli Rubbee, Khondkar: The Origin of the Musalmans of Bengal, Calcutta, Thacker, spink and co, 1895.

Gibb, H.A.R. : Mohammedanism, Newyork, Oxford University press, Second Edition, 1962.

: ~~[illegible]~~

Haig, Sir Wolseley, (ed): The cambridge History of India Vol-III, Delhi S.Chand & Co.1958.

Hamilton, Walter : Description of Hindostan, Vol.I, London, John Murray, 1820.

Hitti, Philip K : History of the Arabs, London, Macmillan, Ninth edition, 1968.

Humayun Kabir : Muslim politics 1906-47 and other Essays, Calcutta, Firma K.L.Mukhopadhyay, 1969.

Hunter, William Wilson: Annals of Rural Bengal, London, Smith, Elder and Co.1868.

: A statistical Account of Bengal, Vol, IX, London, Trübner & Co.1876.

: The Imperial Gazetteer of India, Vol, VII, London, Trübner &Co.1881.

: The Indian Musalmans, Calcutta, The Comrade publishers, Reprinted from the Third Edition, 1945.

Dhaka University Institutional Repository

Hussain Ahmed Madni : An open letter to Moslem League, Lahore, Dewan's publications, 1964.

Jadunath Sarkar : Fall of the Mughal Empire, Vol.I, 1739-1754, Bombay, Orient Longman Ltd, Third Edition, 1964 Reprinted, 1971.

: History of Aurangzib Vol.I, Calcutta, M.C. Sarkar & sons, 1912, Vol.II, Vol.IV, 1919.

: House of Shivaji, Calcutta, M.C. Sarkar & sons, Ltd., Third edition, 1955.

: Shivaji and His Times, Calcutta, M.C. Sarkar & sons private Ltd. 1961.

: Studies in Aurangzib's Reign, Calcutta, M.C. Sarkar & sons, Ltd. 1933.

: The History of Bengal, Vol.II, Dacca, The University of Dacca, 1948.

Jamini Mohan Ghosh : Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, MCMXXX.

: The Sannyasis in Mymensingh, Dacca, Pran Ballav Chakrabarty, 1923.

Jawaharlal Nehru : An Autobiography, London, John Lane The Bodley Head, First Published, 1936.

: The Discovery of India, Calcutta, The Signet Press, First Edition, 1946.

J.C.Ghosh : Bengali Literature, London, Oxford University Press, 1948.

J.C.Sinha : Economic Annals of Bengal, London, Macmillan and Co., 1927.

Jogesh Chandra Bagal : Peasant Revolution in Bengal, Bharati Library 1953.

Kalikinkar Datta : Studies in the History of the Bengal Subah, 1740-70, Vol, I, Calcutta, University of Calcutta, 1936.

: The Santal Insurrection of 1855-57, Calcutta, University of Calcutta, 1940.

Kling, Blair B. : The Blue Mutiny, Philadelphia, University of of pennsylvania press.

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

Lane-Poole, Stanley : The Moors in Spain, London, T. Fisher Unwin, 1888.

Mirza Nathan : Baharistan-i-Ghaybi Vol-I, Assam, Published by the Government of Assam, First Edition, 1936 & vol-II.

Mohar Ali, Md. (ed) : Autobiography and other writings Nawab Abdul Latif Khan Bahadur, Dacca, The Mehrab Publications, 1968.

Momtazur Rahman Tarafdar : Husain Shahi Bengal 1494-1538 AD. Dacca, Asiatic Society of Pakistan, First Published, 1965.

Muin-ud-din Ahmad Khan : History of the Faraidi Movement in Bengal, (1818-1906), Karachi, Pakistan Historical Society, 1965.

: Selections from Bengal Government Records on Wahhabi Trials (1863-1870). Dacca, Asiatic Society of Pakistan, First Edition, 1961.

Mustafa Nurul Islam : Bengali Muslim public opinion as Reflected in the Bengali press 1901-1930, Dacca, Bengali Academy, 1973.

Narendra K. Sinha : The Economic History of Bengal, Vol-I, Calcutta, Published by the Author, 1956.

Nawab Ali Choudhury, Syed : Vernacular Education in Bengal, Calcutta, W. Newman & co. 1900.

Nazmul Karim, A.K. : Changing Society in India and Pakistan, Oxford University Press, First Published, 1956.

Nirad C. Chaudhuri : The Autobiography of An Unknown Indian, London, Macmillan & Co. Ltd, 1951.

N.K. Bhattasali : Bengal Chief's struggle, Calcutta, 1928.

O'Malley, L.S.S. : Bengal District Gazetteers, Jessore, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1912.

: Bengal District Gazetteers, Pabna, Calcutta, The Bengal Secretariat Book Depot, 1923.

Pattabhi Sitaramayya : The History of the Indian National Congress (1885-1935), Published by the working committee of the Congress, 1935.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Philips,C.H.(ed) : Select Documents on the History of India and Pakistan,Volume IV,London,Oxford University press,Reprinted,1964.

Quyamuddin Ahmad : The wahabi Movement in India,Calcutta,Firma, K.L.Mukhopadhyay,First Edition,1966.

Rais Ahmed Jafri (Nadvi),Syed(com & ed):Rare Documents ,Lahore,Muhammad Ali Academy, 1967.

Razi Wasti,Syed(ed) : Memoirs and other writings of Syed Ameer Ali , Lahore,People's Publishing House,First Edition, 1968.

R.C.Majumdar : Ancient Indian Colonies in the Far East,Vol.II, Suvarnadvipa,Calcutta,Modern Publishing Syndicate ,1938.

: History of the Freedom Movement,Vol.I,Calcutta, Firma K.L.Mukhopadhyay,1971,& Vol.II,1975.

: The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1957,Calcutta Firma K.L.Mukhopadhyay,Second Edition,1963.

Romesh Dutt : The Economic History of India under Early British Rule,London,Routledge & kagan paul Ltd. Seventh Edition,1950.

Smith,Vincent A. : The Oxford History of India,Oxford,At the Clarendon Press ,Third Edition(Reprinted),1961.

Smith,Wilfred Cantwell:Modern Islam inIndia,Lahore,Minerva Book shop, Second edition,1947.

Sufia Ahmed : Muslim Community in Bengal 1884-1912,Published by the Author,1974.

Sumit Sarkar : The Swadeshi Movement in Bengal,1903-1908, People's publishing House,1977.

Surendranath Banorjea: A Nation in Making ,London,Humphrey Milford, Second Impression,1925.

Tara Chand : Influence of Islam on Indian culture,Allahabad, The Indian Press(Publications)Private Ltd,1963.

The Board of Editiors: A History of the Freedom Movement ,Vol,I,Karachi, The Board of Editors,1957.

Dhaka University Institutional Repository

: Do, Vol.II, Part I,/& Vol III, Part I, Karachi, Pakistan Historical Society, 1960.

Thompson, Edward and Garrat, G.T. : Rise and Fulfilment of British Rule in India, Allahabad, Central Book Depot, 1973.

Tod, James : Annals and Antiquities of Rajast'han Vol.I,/ London, Routledge & Kegan paul Ltd, Reprinted, 1960.& Vol.II, Reprinted 1957.

Williams, L.F. - Rushbrook : India in 1917-1918, Calcutta, superintendent Government Printing, India.

: India in 1920, Calcutta, Superintendent Government Printing, India, 1921.

: India in 1921-22, Calcutta, Superintendent Government printing, India, 1922.

: India in 1922-23, Government of India.

: India in 1924-25, Calcutta, Government of India, 1925.

Zachariah, K : History of Hooghly College 1836-1936, Alipore, Superintendent, Bengal Government press, 1936.

Ziya-ul-Hasan Faruqi : The Deoband School and the Demand for Pakistan, Bombay, Asia Publishing House, 1963.

(ছ) সহায়ক ইংরেজী প্রবন্ধ

Abdul Quader : A Pioneer of Islamic Renaissance of Bengal, Morning News, 3rd May, 1970.

Mafizullah Kabir : Nawab Salimullah and Muslim Politics, 1876-1915 Bangladesh Historical studies, Vol.II, 1977.

Mahfuzullah, Md. : Syed Ismail Hossain Shiraji, The Pakistan Observer, 25th August, 1957.

S.C.Sanial : History of the Calcutta Madrassa, Bengal past and Present, Vol. VIII, Jan-June, 1914.

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) রিপোর্ট

Govt. of India Despatch, 1930, Government of India.

Report on Indian Constitutional Reforms Reprint, Calcutta, Government of India, 1928.

Sedition Committee, 1918, Report. Calcutta, Superintendent Government Printing, India, 1918.

(ঙ) অপ্রকাশিত সহায়ক গ্রন্থ

শামসুদ্দীন, এ, এইচ, মোঃ : বাংলা মহাকাব্য ও মধুসূদনের অনুগামিবৃন্দ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত পি-এইচ-ডি, অভিসন্দর্ভ, ১৯৭৯ ।

রাজিয়া মোবদিন চৌধুরী : বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত পি-এইচ-ডি- অভিসন্দর্ভ, ১৯৭৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসমাইল হোসেন সিরাজী সম্পর্কে

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকারের স্থান: বাণীকুঞ্জ, সি...
তারিখ: ২৭-১২-৭৬ ইং
সময়: সকাল ১০ টা।
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: বদিউজ্জামান।

(যতদূর সম্ভব সঠিক সন তারিখ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যের উল্লেখ করতে হবে।)

নাম: সৈয়দ ইউনুস উদ্দীন সিরাজী
পিতার নাম: মরহুম আবদুল করিম
জন্ম তারিখ: ১৯০৫, মহরম মাস
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাইনর পাশ
পেশা: ঝিনাইদহ মুনিপুর মাদ্রাসায় চার বছর শিক্ষক ছিলেন। নন কোঅপারেশনের সময় ইস্তফা দেন। এরপর থেকে ঠিকাদারী করেন। এখন অবসর জীবন যাপন করছেন।
ঠিকানা: বাণীকুঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।

১। সিরাজীর সঙ্গে যোগাযোগের সময় এবং যোগাযোগ কিভাবে ঘটল:
আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইসমাইল হোসেন সিরাজী। আমরা তিন ভাই, আমি সবার ছোট। বরাবর একই বাড়ীতে বাস করতাম। ১৯২০ এর দিকে বড় ভাই পাশেই এক টুকরো জমি কিনে সেখানে বাড়ী করে থাকেন।

২। সিরাজীর পেশাগত জীবনের পরিচয়, কোন পরিবর্তন ইত্যাদি জানা থাকলে তার বিবরণ:
বই লেখা, বক্তৃতা, খবরের কাগজে লেখা এগুলোই ছিল তাঁর পেশা। তাঁর একজন বন্ধু সহ তুরস্কে যাবেন বলে স্কুল পালান। তারপর থেকে পড়াশুনার সঙ্গে যোগ বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই তাঁর খ্যাতি মুসলিম বক্তা ও লেখক হিসেবে, সেটাই লেখাপড়ার প্রতি তাঁর মনোযোগ কমিয়ে দেয়। অনলপ্রবাহ প্রকাশিত হবার পর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বাবা পাটের অফিসে কাজ করতেন, পরে মেজো ভাই স্কুল মাস্টারি করলেন। আমাদের [illegible] অর্ধেক গেছে, সংসার চলে না। বড় ভাইকে রোজগার করতে হত, এবং এভাবেই বক্তৃতা করে, লিখে রোজগার করা হত। রোজগারের প্রয়োজন এত বেশী হয়ে পড়ে যে বড় ভাইকে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা সম্ভব হয়নি। দুই পেশার মধ্যেই তিনি এত জড়িয়ে পড়েন, ভালোও লাগত সুতরাং পরিবর্তন করবার প্রশ্ন ওঠেনি, প্রয়োজন, আর্থিক কারণই তাঁকে পেশা পরিবর্তন করতে দেয়নি।

৩। শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ সেবা বিষয়ক সংস্থা থেকে সিরাজীকে প্রদত্ত অভিনন্দন, সম্মান ইত্যাদির বিবরণ:
তুরস্ক থেকে আসার পর বহু মানপত্র পেয়েছেন, বহু সম্মান ও অভিনন্দন পেয়েছেন। তুরস্কে যাবার আগেও পেয়েছেন তবে পরে অভিনন্দন ও সম্মান পেয়েছেন অনেক বেশী।

৪। সিরাজীর সমাজ, সম্প্রদায়গত ও রাজনৈতিক মতামত। কোন পরিবর্তন হয়ে থাকলে তার বিবরণ ও প্রেক্ষিত:
কংগ্রেস করতেন। পূর্ণ স্বাধীনতা চাইতেন। সেজন্যই কংগ্রেসের সঙ্গে থাকতেন। মুসলমানদের তেমন কোন সংগঠন ছিল না, সুতরাং অন্য কোন পথও ছিলনা। মুসলিম লীগের সাধারণ কিছু সংগঠন দাঁড়ায় সেখানে [illegible] যাবার পর, কিন্তু সিরাজী পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে কংগ্রেস ছেড়ে আসেননি। তিনি মুসলিম জাগরণের কথা বলতেন, তুরস্ক থেকে ফেরার পর [illegible] জীবন শুরু হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

-তিন-

৫। সিরাজীর রাজনৈতিক জীবনের গঠনে কারা/কাদের সবচেয়ে বেশী প্রভাব কার্যকর ছিল এবং কিভাবেঃ

বাইরের মধ্যে ছিলেন মুনশী মেহেরুল্লাহ(যশোর) একবার তিনি, রায়ের সংগে সাক্ষাৎ করেন; তিনি সিরাজগঞ্জে এসেছিলেন। সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর বক্তৃতাতেও প্রভাবিত হয়েছিলেন। আব্বা তাঁকে বক্তৃতা সমাজসেবা ইত্যাদি কাজে উৎসাহিত করতেন। আব্বার চেয়ে মা এ ব্যাপারে অনেক বেশী সাহায্য ছিলেন।

৬। প্রত্যক্ষদর্শী/সিরাজীর সংগে অংশগ্রহণকারী হিসাবে সমকালীন রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্মের বিবরণ। সিরাজীর ভূমিকা ও বিরোধীদের ভূমিকা এবং বক্তব্যঃ

তাঁর মারা যাবার কিছু আগে রংপুর হাসপাতালে চিঠি লিখে দেখি। শেষ দেখি পাবনার নগরবাড়ী হাই-স্কুল প্রাঙ্গনের মিটিংএ। সব সময় যেতে পারতাম না। আমার পড়াশোনা ছিল। কলিকাতায় কলেজ স্কোয়ারের মিটিংএ ও দেখি। আবদুল গফুর জালালীই বেশী যেতেন সাথে।

আকরাম খাঁ মোক্তার, ইয়াকুব আলী পেশকার, আবদুল মজিদ তালুকদার উকিল, এরাই তাঁর বিরোধী ছিলেন। ওসমান গনি মোক্তার, সৈয়দ আকবর আলী এরাই সিরাজীকে ঘেরে ছিলেন। তুরস্কে যাবার সময়ও সিরাজী যাতে যেতে না পারেন সেজন্য এরাই তখনো বিরোধিতা করেন। এসবের কারণ হিংসা ছাড়া আর কিছু নয়।

৭। সিরাজগঞ্জে সিরাজীর প্রধান এবং অপ্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী কে/কারা/কোন দলের ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ কি আদর্শগত?ঃ

প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ঈর্ষা যা ছিল তা সব ব্যক্তিগত। প্রতিদ্বন্দ্বী যারা ছিলেন তাঁরা ঠিক দল হিসাবে ছিলেন না।

আর্থিক ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান সবাই সিরাজীকে সাহায্য করতেন। কিছু মহাজন হিন্দুদের সমালোচনা করলেও তিনি ছাড়েননি। মিয়া ভাই যেবার জেলে যান সেবার ভয়ঙ্কর আর্থিক দুর্গতি দেখা দেয়, এবং ডাঃ অনাথ বসু, সারদা সেন, ক্ষুদিরাম বসু, সন্তোষের লক্ষ্মীনাথ রায়ের মাসে মাসে মার কাছে টাকা দিয়ে যেতেন। মুসলমানদের মধ্যে যারা টাকা দিতেন তারা প্রায়ই সিরাজগঞ্জের মন, রংপুর, দিনাজপুর, ইত্যাদি অঞ্চলের অধিবাসী। তুরস্কে যাবার পর হিন্দু মুসলমান সবাই মার কাছে টাকা দিয়েছেন।

৮। সিরাজীর সমকালে এবং পরবর্তীকালে সিরাজগঞ্জে তাঁর প্রভাব কি রাজনৈতিক নেতা/সমাজসেবক/ধর্মীয় নেতা/সাহিত্যিক হিসাবে? তাঁর অনুসারীবৃন্দ কারা?

সাহিত্যিক ও ধর্মীয় নেতা হিসাবে, পুরোপুরি রাজনৈতিক হিসাবে নয়। সাহিত্য চর্চাকে তিনি উৎসাহ দিতেন। নানা বাবু সাহেবের বাড়ী ছিল পাবনার রাধানগর, পুলিশ জমাদারের চাকুরী করতেন। চাকুরীর জন্য তিনি সিরাজগঞ্জে আসেন এবং জায়গা কিনে বাড়ী করে থাকেন। মা ছিলেন নানার একমাত্র কন্যা মেয়ে। নানা যখন পাবনাতে ছিলেন সেই সময়ই মার বিয়ে হয়। নানা সিরাজগঞ্জে এসে বাড়ী করার পর আব্বা এখানে আসেন এবং থাকেন।

অনেকেই তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, এদের মধ্যে শেখ আবদুল গফুর জালালী, এম, সেরাজুল হক প্রমুখ রয়েছেন।

সৈয়দ ইউনুস উসমান
২৭/১২/৭৬

মুছাবঃ

তারিখঃ

একত্রিশ

ইসমাইল হোসেন সিরাজী সম্পর্কে
ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

(যতদূর সম্ভব সঠিক সন তারিখ এবং
প্রাসংগিক ঘটনার উল্লেখ করতে হবে।)

সাক্ষাৎকারের স্থান: সি—৩, ডি,রেলওয়ে কলোনী, শাহজাহানপুর, ঢাকা।
তারিখ: ১৪—১—৭৮ ইং।
সময়: বিকেল ৫ টা।
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: বজিউজ্জামান।

নাম: সৈয়দা কেরামতৌন মযেম সিরাজী
পিতার নাম: সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
জন্ম তারিখ: ১৯০৫ সাল
শিক্ষাগত যোগ্যতা: আই,এ, পর্যন্ত পড়েন।
পেশা: গৃহিণী।
ঠিকানা: বানিয়াপাড়া,পোঃ চান্দাই কোনা, বগুড়া।

১। সিরাজীর সঙ্গে যোগাযোগের সময় এবং যোগাযোগ কিভাবে ঘটল:

সকলের বড় মেয়ে। আমার বয়স যখন নয় বছর তখন থেকেই সপষ্ট মনে আছে।

২। শিল্পীর পেশাগত জীবনের পরিচয়: কোন পরিবর্তন ইত্যাদি জানা থাকলে তার বিবরণ: বক্তৃতা দিতেন, বই লিখতেন। সারা জীবন এটাই করেছেন, কোন পরিবর্তন দেখিনি। যেদিন দেখতাম টাকা পয়সা নেই, সেটা তুলে আনার চেষ্টা করেছেন, গানের জলসা বসাতেন। বাড়ীর সব মেয়ে সহ আমি গান গাইতাম। সবাইকেই সকালে কলেজের নামাজ আর মসজিদে মগরেবের নামাজ শেষে গান শোনাতেন। বাংলা, ধর্মের চর্চা ছিল কিছুর, আমাদের কোরাণ শরীফ পড়া শেখানো, কিভাবে খেলার মাঠে নিয়ে যাওয়া সবই করতেন। আমি প্রায় দশ বছর বয়স থেকেই আব্বার সঙ্গে সভা সমিতিতে গেছি। এগারো বছর বয়স থেকেই বক্তৃতা দিয়েছি। খেলাফত আন্দোলনের সময় সভা সমিতিতে গান গেয়েছি। আমাকে দিয়ে চরকায় সুতা কাটাতেন, দাদী কাটতেন, মা কাটতেন, আমরা সবাই কাটতাম। বড় পুকুর ঘাটে একটি বড় (১০ হাজার লোক ছিল) ঐতিহাসিক সভায় বক্তৃতা দেই। আব্বা সাথে ছিলেন। সিরাজগঞ্জে ছিলেন ভট্টাচার্য [illegible] [illegible], ইজ্জত আলী পেশকার, জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সারদা বাবু, দ্বিজেন ডাক্তার প্রমুখ সবাই ছিলেন।

৩। শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ সেবা বিষয়ক সংস্থা থেকে শিল্পীকে প্রদত্ত অভিনন্দন, সম্মান ইত্যাদির বিবরণ: একবার যখন ফাইভ ক্লাসে পড়ি আব্বার সঙ্গে ঢাকা আসি। ঢাকা স্টেশনে নামার পর বহু লোক স্লোগান দিয়ে আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে নিয়ে যায়। খেলাফত আন্দোলনের সময় ঢাকায় নবাব বাড়ী আহসান মঞ্জিলে বক্তৃতা করেন, অগণিত লোক হয়।

৪। শিল্পীর সমাজ, সম্প্রদায়গত ও রাজনৈতিক মতামত। কোন পরিবর্তন হয়ে থাকলে তার বিবরণ ও প্রকৃতি: কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দুটোই করতেন। সারাজীবন এটাই করেছেন। তখন মুসলিম লীগ হলেও তা তেমন দানা বেঁধে ওঠেনি, সুতরাং লীগ করার প্রশ্ন ওঠেনি। কংগ্রেস করলেও মুসলমানদের বড় করে তোলা তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল। হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্য তিনি আজীবন সাধনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]-

৫। সিরাজীর রাজনৈতিক জীবনে শত্রু/মিত্র কারা/কাদের সবচেয়ে বেশী প্রভাব কার্যকর ছিল এবং কিভাবে?- সব কিছুর পিছনে বড় অবদান হল আমার দাদীর। এর পরই আর নাম করছি। এদের সাহস ও উৎসাহ না থাকলে জীবনে এ সাফল্য তাঁর আসত না। আর যারা ছিলেন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী তাঁরা হলেন গোলাম মওলা, আবদুল গফুর [illegible], মির ইমান হাজী, [illegible] ডাক্তার, [illegible] ডাক্তার, [illegible] কবিরাজ, এরা সবাই আব্বার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এদের নিয়েই তিনি চলাফেরা করতেন, আনন্দে থাকতেন।

৬। প্রত্যক্ষদর্শী/সিরাজীর বংশে বংশধর দাবী হিসাবে সমকালীন রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্মের বিবরণ। সিরাজীর শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের ভূমিকা এবং বক্তব্যঃ
বি,এল, স্কুল, ভিক্টোরিয়া স্কুল, নদীর ধারে, [illegible] স্কুল, সিরাজগঞ্জ খাঁ সাহেবের মাঠে [illegible], সিরাজগঞ্জের বাইরে বাড়ীতে, [illegible], ইত্যাদি [illegible] আব্বার সঙ্গে [illegible]। চাচা/আব্বার ভয়ে আর যেতে পারিনি। কিছু বছু আব্বার বংশে আমার বোরকা না, আমার লেখাপড়া শেখা অনেকে পছন্দ করতেন না। আব্বার উপর [illegible] আমাকে লেখাপড়া শেখানোতে আপত্তি করে। ফজিলাতুন্নেসা স্কুলে পড়ুয়া মেয়ে দিয়ে বাড়ীতে পড়ত। বাড়ীতে বসে থাকত, আব্বা বলতেন আমার দু বছরের [illegible] মেয়েকে আমি পড়তে দিয়েছি, কোন মুসলমানের মেয়ে ঘরে বসে থাকবে? ফজিলাতুন্নেসা দু বোন, ফজিলাতুন আর শফিকুন (ছোট), দুবোনকে আব্বাই চাকরি দিয়ে আসেন এবং বহুদিন ১২টাকা করে চাকরি ইডেন স্কুলে ভর্তি করে দেন। পরে ফজিলাতুন এম,এ, পাশ করে যখন, আব্বা তখনো জীবিত। আব্বা খুব খুশী হন, আমি যা পারিনি, ফজিলাতুন তা পেরেছিল।

৭। সিরাজগঞ্জে সিরাজীর প্রধান এবং সর্বপ্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী কে/কারা/কোন দলের ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ কি আদর্শগত?ঃ
সমস্ত জীবনে ফিরিঙ্গীবিরোধী যারা করেছেন সেটা আদর্শগত বলা যেতে পারে। গোড়া ধর্মী মৌলভীদের বিরোধিতাই ছিল সারা জীবন।

৮। সিরাজীর সমকালে এবং পরবর্তীকালে সিরাজগঞ্জে তাঁর প্রভাব কি রাজনৈতিক নেতা/সমাজ সেবক/ধর্মীয় নেতা/সাহিত্যিক হিসাবে? তাঁর অনুসারীরা কারা?ঃ
সাহিত্যিক হিসাবে সমাজসেবী হিসাবেই তাঁর প্রভাব বেশী পড়েছিল বলে মনে হয়। রাজনৈতিক প্রভাবও ছিল। আঞ্চলিকভাবে অনেকেই তাঁকে অনুসরণ করেছেন।

সৈয়দা [illegible] বেগম সিরাজী
১৪-১-৭৮
সূত্রঃ[1]
তারিখঃ

১। তিনি ১১ই জুন, ১৯৮০ তিনি পরলোক গমন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তেত্রিশ

অন্যান্য সাক্ষাৎ দাতার বিবরণ

নামঃ মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ
পিতার নামঃ সৈয়দ আবু ইসহাক
জন্মতারিখঃ ২৭শে নভেম্বর, ১৯০০।
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ দেওবন্দে পড়েন, পরে লাহোর এশাতে এসলাম কলেজে পড়েন।
পেশাঃ পৈতৃক পেশা ছিল ইসলাম প্রচার ও পীর মুরিদী। তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। সাবেক পূর্বপাকিস্তান গণপরিষদের স্পীকার। বর্তমানে রাজনৈতিক দল গণ আজাদী লীগের সভাপতি।
ঠিকানাঃ গ্রাম-তারুটিয়া, পোঃ রশিদাবাদ, পাবনা।

তারিখঃ ৮/১/৭৮ ইং।

নামঃ আবুল ফজল মোঃ মুনিরউদ্দীন রোকনী
পিতার নামঃ মরহুম মৌলবী জমীরউদ্দীন রোকনী
জন্মতারিখঃ ১২৯৭, ভাদ্র মাস।
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বোর্ড টাইটেল মাদ্রাসা পাশ।
পেশাঃ শিক্ষকতা, প্রথমে সিরাজগঞ্জ দিনিয়ুর মাদ্রাসা, পরে ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ইসলামিয়া ডিগ্রী কলেজ।
ঠিকানাঃ গ্রাম মগোনের পাড়, পোঃ সিরাজগঞ্জ, পাবনা।

তারিখঃ- ২৬/১২/৭৬ ইং।

নামঃ মোহাম্মদ আজীজুর রহমান
পিতার নামঃ মোহাম্মদ মছির উদ্দীন
জন্ম তারিখঃ ১৯০০, এপ্রিল।
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি, এ, বিটি বি-টি।
পেশাঃ শিক্ষকতা। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত।
ঠিকানাঃ গ্রাম কয়্যাসী, পোঃ সিরাজগঞ্জ, পাবনা। তারিখঃ ২৬/১২/৭৬ ইং।

নামঃ ডাঃ মজুর উদ্দীন আহমদ
পিতার নামঃ মরহুম সিরাজউদ্দীন তালুকদার
জন্ম তারিখঃ ১৩০০, শ্রাবণ।
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ আই, এ, পাশ ও এল, এম, এফ (সাব)।
পেশাঃ ১৯৩১ এর আগে পর্যন্ত প্রাইভেট প্র্যাকটিস, ১৯৩১-৩৬, ইন্ডিয়ান আর্মি মেডিক্যাল সার্ভিসে এসিস্ট্যান্ট সার্জন, ১৯৩৭-৫১ সাল পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ গভর্ণমেন্ট হাসপাতালে চার্জ মেডিক্যাল অফিসার। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত।
ঠিকানাঃ সাহিদপুর, পোঃ সিরাজগঞ্জ, পাবনা।

তারিখঃ ২৭/১২/৭৬ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

কসবেবাঘার জমীদার বর্ত্তমান খোন্দকার মোহাম্মদ মজহর
আলী আবু দাউদ সাহেবের

বংশ পরিচয়।

১। হজরত শের-খোদা আলী করমউল্লাহ ওজহে রাজিঃ আঃ, ২। হজরত ইমাম শহিদ কারবালা, ৩। মহম্মদ, ৪। আবদুল্লা, ৫। জাফর, ৬। কাসেম, ৭। শাহ্ অবেদ উল্লা, ৮। শাহ্ মহমুদ, ৯। ছালেহ, ১০। আবু মোয়াজ্জম, ১১। আবু মহতেসম, ১২। মহমুদ, ১৩। আবু মকরম, ১৪। আবু ইউসফ, ১৫। আবু আহমদ, ১৬। আবু নাছের, ১৭। জালাল আহমদ, ১৮। আলী আহমদ, ১৯। নাছের আলী, ২০। আহমদ হোসেন, ২১। আবদুল অলিদ, ২২। মনসুর, ২৩। একরামল হক, ২৪। ছিদ্দিক, ২৫। মহম্মদ আলম, ২৬। ফজলুল আলী, ২৭। মায়াজ্জম আলী, ২৮। শাহামত আলী, ২৯। ছাদাকত আলী, ৩০। মকরম হোসেন, ৩১। তফজ্জল হোসেন, ৩২। ফুরকান হোসেন, ৩৩। একরাম [illegible], ৩৪। ছানি [illegible], ৩৫। মহ[illegible] হোসেন, ৩৬। ছাদাকত হোসেন, ৩৭। [illegible] হোসেন, ৩৮। [illegible] হোসেন, ৩৯। মহম্মদ হাফেউদ্দীন, ৪০। মুহম্মদ আলী, ৪১। আবদুল হক, ৪২। আবদুল ওদুদ, ৪৩। মহম্মদ কাসেম, (ইনিই [illegible] শাহ্ আবদুল ওহাবের কন্যাকে বিবাহ করেন;) ৪৪। শাহ্ আতিক উল্লা, ৪৫। শাহ্ কেরামউল্লা, ৪৬। গোলাম আলী, ৪৭। হায়দর আলী, ৪৮। খোন্দকার ওয়াহেদ আলী, ৪৯। খোন্দকার করেম আলী, ৫০। খোন্দকার মহম্মদ [illegible] আলী, ৫১। খোন্দকার মোহম্মদ মজহর আলী আবু দাউদ (বর্ত্তমান), ৫২। খোন্দকার মহম্মদ মহবুব আলী ও খোন্দকার মহম্মদ আসহাব আলী (নাবালক)।

প্রচার-সংবাদ।

১। বিগত ১৪ই বৈশাখ সিরাজগঞ্জ বি, এল, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হজরত [illegible] সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ [illegible] হোসেন সিরাজী [illegible] "ইসলাম ধর্ম্মের [illegible]" এবং "[illegible] জীবনের কর্ত্তব্য" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় শিরাজীর একটি প্রচার সংবাদ ।

Dhaka University Institutional Repository

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপর দিবস ১২ই বৈশাখ "পাশ্চাত্য শিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উভয় বক্তৃতায় বক্তা সাহেব অসাধারণ মেধাবিতা এবং বাগ্মিতা প্রকাশ করেন।

২। ৩১শে বৈশাখ সিরাজগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাই স্কুলের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মৌলবী মওলের আলী খান এবং সিরাজী সাহেব "জাতীয় উন্নতি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী দে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। ৭ই জ্যৈষ্ঠ ময়মনসিংহ শিবনা হাইস্কুলের ১ম বার্ষিক ছাত্র সমিতির অধিবেশনে মাননীয় কবি সিরাজী সাহেব "হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনী ও শিক্ষা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপর দিবস "ইস্‌লামের শিক্ষা ও সভ্যতা" বিষয়ে ৩ ঘণ্টা কাল ব্যাপী বক্তৃতা দেন। সভাপতি স্থানীয় জনৈক উকীল। তিনি বক্তার অজস্র প্রশংসা এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করেন।

৪। ৫ই আষাঢ় ময়মনসিংহ ধনবাড়ীর খ্যাতনামা জমীদার শ্রীযুক্ত সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত "মহফেলে মিলাদে" কবি সাহেব "মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনী" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

৫। ৩২শে আষাঢ় সিরাজগঞ্জ অমৃতলাল স্কুলগৃহে কোরাণ ও হাদিসের অনুবাদক শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র সেন "ইস্‌লামের শক্তি" সম্বন্ধে এবং সৈয়দ সিরাজী সাহেব "ইস্‌লামই একমাত্র ধর্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

৬। ৬ই শ্রাবণ সিরাজগঞ্জ বালিকা পটীতে এক সভা আহূত হয়। এই সভায় "মুসলমানদের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে কবি প্রবর সিরাজী মহোদয় ১ ঘণ্টাকাল ব্যাপিনী, অনর্গল বক্তৃতা প্রদান করেন।

৭। ৩রা আশ্বিন কুমিল্লা নগরীর টাউনহলে শ্রীযুক্ত মৌলবী মনিরুজ্জমান এবং কবি সাহেব "সমাজের উন্নতির উপায়" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপর দিবস উভয় মহাত্মা মুসলমান জাতির "অতীত গৌরব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কুমিল্লায় মুসলমান ছাত্র মণ্ডলী মাতোয়ারা হইয়া উঠে। পুনরায় ৫ই আশ্বিন সকালে বিকালে এবং রাত্রে উভয় মহাত্মাই বক্তৃতা করেন। সিরাজী সাহেবের অসাধারণ বাগ্মিতা এবং পাণ্ডিত্যে বিমোহিত হইয়া নগরের হিন্দু ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায় "ইস্‌লাম ধর্ম" সম্বন্ধে ৭ই আশ্বিন আর একটী বক্তৃতা শুনিতে ইচ্ছা করেন। স্থানীয় "প্রতিনিধি" পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পরে বক্তৃতা আরম্ভ হয়। বক্তা সিরাজী সাহেব ৩ ঘণ্টাকাল অনর্গল "ইস্‌লাম ধর্ম ও তাহার শিক্ষা" সম্বন্ধে গভীর ভাবপূর্ণ বক্তৃতা করেন। অসংখ্য শ্রোতা চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া একেবারে বিমোহিত হইয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় স্বমুখে "ইস্‌লামই একমাত্র সার ধর্ম" বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি বক্তাকে স্বর্গীয় শক্তি সম্পন্ন বলিয়া অভিহিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৮। ১০ই আশ্বিন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অন্নদা হাইস্কুলে সভা হয়। সিরাজী সাহেব ৩ ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া "মুসলমান সমাজের অধোগতির কারণ" সম্বন্ধে জলন্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি জনৈক হিন্দু উকীল বলেন, "ইনি এত অল্প বয়সে কিরূপে ঈদৃশ পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা এবং বিচার শক্তি লাভ করিলেন, ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয়।"

৯। ১৩ই আশ্বিন স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা বার লাইব্রেরীতে এক সভার অধিবেশন হয়। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী শ্রীল শ্রীযুক্ত উমাকান্ত রায় বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তা সিরাজী সাহেব ২ ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া "শিক্ষা বিস্তার ও দেশের উন্নতি" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলকে বিমোহিত করেন। সভাপতি মন্ত্রী বাহাদুর মন্তব্যে বলেন, "আমি এরূপ বক্তৃতা মুসলমান মুখে থাক্, হিন্দুর মুখেও শুনি নাই।"

১০। ১৮ই আশ্বিন সীতাকুণ্ড মাদ্রাসা গৃহে শ্রীযুক্ত মৌলবী মনিরুজ্জমান সাহেব এবং বাগ্মী প্রবর সিরাজী সাহেব "আদর্শ শিক্ষা" সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

১১। ৬ই কার্ত্তিক গুণাবতী রেল ষ্টেসনের নিকট মাদ্রাসা গৃহের সম্মুখে সভা হয়। স্থানীয় সব্ রেজিষ্টার সাহেব সভাপতি পদে বৃত হন। মৌলবী মনিরুজ্জমান এবং বক্তা সাহেব "সমাজের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১২। ৯ই কার্ত্তিক সীতাকুণ্ড মাদ্রাসার হেড্ মৌলবী শ্রীযুক্ত ওবায়দুল হক্ সাহেবের যত্ন ও উদ্যোগে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় ৬ হাজার শ্রোতা উপস্থিত ছিল। মাদ্রাসার ১৫০টী ছাত্র ভলেণ্টীয়ার সাজিয়া সভার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান ছিল। বাগ্মীপ্রবর সিরাজী সাহেব এবং মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান সাহেব "জাতীয় উন্নতি" সম্বন্ধে জলন্ত বক্তৃতা করেন।

১৩। ১৯শে ও ২০শে কার্ত্তিক চট্টগ্রাম টাউনে কাজেম আলী হাইস্কুল গৃহে সভার অধিবেশন হয়। ১ম দিনে "হিন্দু ও মুসলমানে একতা" এবং "ইস্লামের সভ্যতা" বিষয়ে বাগ্মীতিলক কবি প্রবর সিরাজী সাহেব গভীর ভাব পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় উদ্বোধন কবিতায় বক্তা এরূপ গভীর উত্তেজনা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। ২য় দিনে "আমাদের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে ৩½ ঘণ্টা কাল সিরাজী সাহেব গভীর ভাব ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় সকলকেই বক্তার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা এবং পাণ্ডিত্যে ধন্য ধন্য করিতে হইয়াছিল।

১৪। ২২শে কার্ত্তিক শনিবার চট্টগ্রাম মাদ্রাসা স্কুল গৃহে ২ ঘটিকার সময় এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার ৭।৮ শত ছাত্র সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বাগ্মীপ্রবর সিরাজী ৩½ ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া "মুসলমান ছাত্রদিগের কর্ত্তব্য ও জীবনের লক্ষ্য" সম্বন্ধে জলন্ত অগ্নি নিঃস্রাবের ন্যায় বক্তৃতা করেন। ছাত্রবৃন্দ বাগ্মীতায় বিমোহিত এবং ভাবে উত্তেজিত হইয়া ঘন ঘন করতালী ধ্বনিতে সভাস্থল

Dhaka University Institutional Repository

কম্পিত করিয়া তুলেন। ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর মৌলবী মকসুদ আহ্‌মদ এম, এ, সাহেব স্বমন্তব্যে বলেন, "এরূপ ক্ষমতাশালী বক্তার প্রশংসা করা বাহুল্য মাত্র।"

১৫। ১৪ই অগ্রহায়ণ ফেণী সব্‌ডিভিসানের হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে সভা আহূত হয়। বক্তাপ্রবর সিরাজী সাহেব অপরাহ্ন ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত "জাতীয় উন্নতি" ও "পাশ্চাত্য শিক্ষা" সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি প্রধান মুন্সেফ বলেন, "এতদিনে মুসলমান জাতির মোহ ভাঙ্গিবে।" এই সভায় বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা উর্দ্দু ভাষায় বক্তা সাহেবকে ২ খানি "এড্রেস" প্রদান করেন। উক্ত "এড্রেসের" দুই পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "মওলানা সিরাজী সাহেব অর্‌শ্‌ তক্‌ হেলা দিয়া; মোর্‌দা কওমকো কবর্‌ছে উঠা দিয়া।"

১৬। ১৫ই অগ্রহায়ণ সোমবার প্রাতঃকালে ফেণী মস্‌জিদে সওদাগরদিগের উদ্যোগে এক সভা হয়। বক্তা সাহেব "জাতীয় অধঃপতনের কারণ" সম্বন্ধে ২ ঘণ্টা-কাল বক্তৃতা করেন। অতঃপর মঙ্গলবার তিনি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বাটী প্রত্যাগত হন। বাটী আসিয়া ভয়ানক জ্বরাক্রান্ত হন। এক্ষণেও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন নাই। ইতি।

খাদেমুল কওম—

মোহাম্মদ রহমতুল্লা তালুকদার।

সাং পীড়াহাটী। (বগুড়া)

জাতীয় ও ধর্ম্ম-সংবাদ।

মহামান্য আমিরুল মুমেনিন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবার লয়লতুল কদরের নমাজ জামে হামিদিয়াতে, এবং ইদুলফেতরের নমাজ জামে সোলেমানিয়ায় সমাধা করিয়াছিলেন। পুনশ্চ, সুলতানী জাঁক জমকে তিনি মসজেদে গমন করিয়াছিলেন। ইদের দিন যে সকল দলে সৈন্য ও নৌ-সৈন্য স্থল ও জলপথে নিযুক্ত ছিল, সকলকেই সুলতানের আদেশের পক্ষ হইতে নগদ টাকা, সিগারেট এবং মিঠাই বিতরণ করা হয়। অন্যান্য দরিদ্র এবং ভিক্ষুকগণও উপযুক্ত অর্থ ও খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া, দুই হাত তুলিয়া আমিরুল মুমেনিনকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল।

মহামান্য আমিরুল মুমেনিন, স্বীয় দ্বিতীয় সেক্রেটারী এজ্জত পাশার ভগিনী আমিনা খানমকে, শফকতের দ্বিতীয় শ্রেণীর তমগা (পদক) প্রদানে সম্মানিত করিয়াছেন। আবার পাশা মহোদয়কে ইটালীর অধীশ্বর, স্বীয় রাজ্যের একটী উচ্চ শ্রেণীর পতাকা প্রদানে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

কন্‌ষ্টান্টিনোপলের সাগর শাখার উপর, এক জার্ম্মাণ কোম্পানী ১লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড ব্যয়ে, একটী উৎকৃষ্ট ও মজবুত লোহ-সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন। এই সেতু গালাটা ও ষ্টাম্বুলের মধ্যে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বর্ষ। মাঘ, ১৩২৬ প্রথম সংখ্যা।

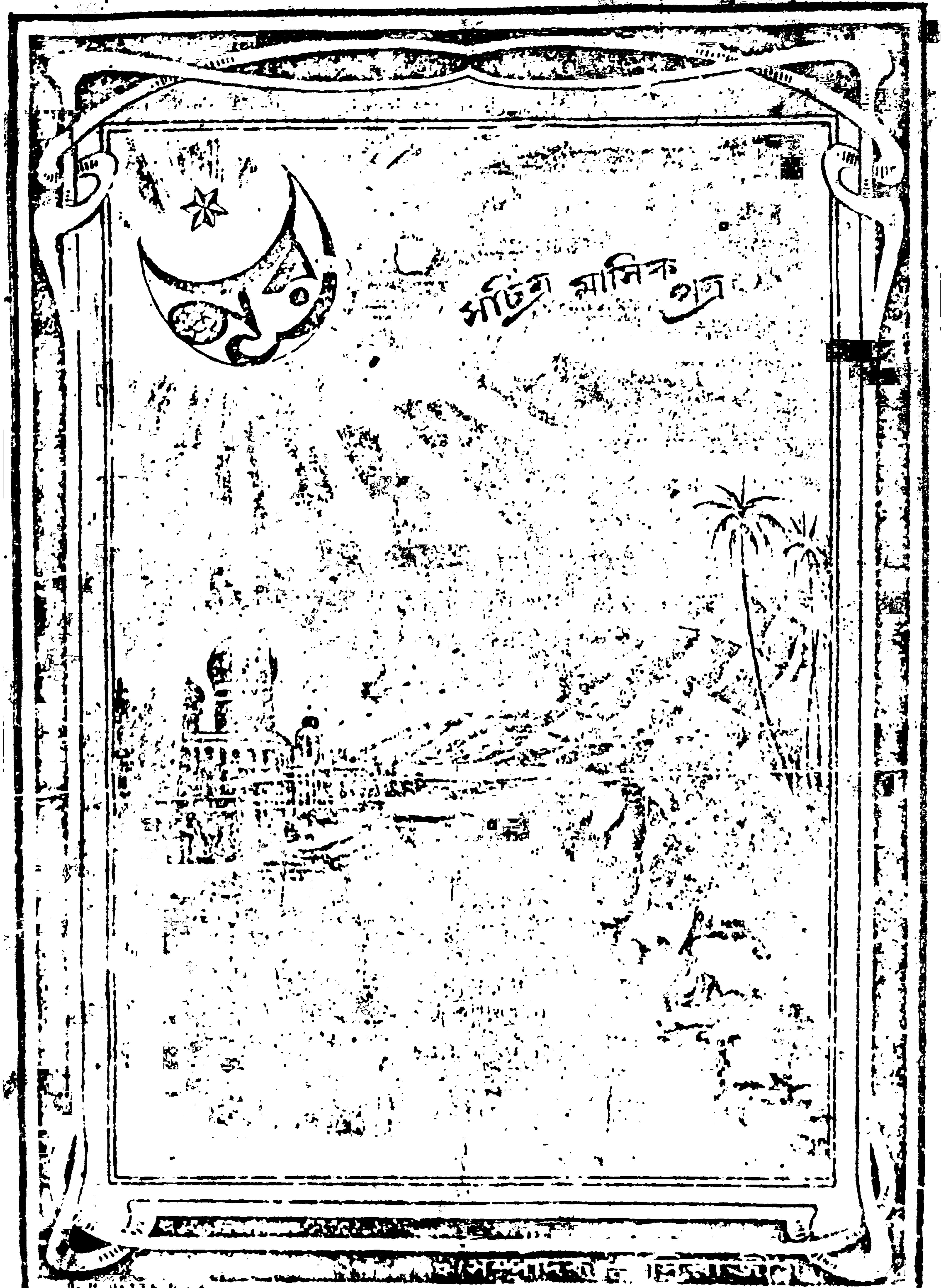

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।০ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ।৵০ আনা।
কার্য্যালয় :—৩১২, বেনিয়াপুকুর রোড, কলিকাতা।

শিল্পী অঙ্কিত মূল পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

উনচল্লিশ

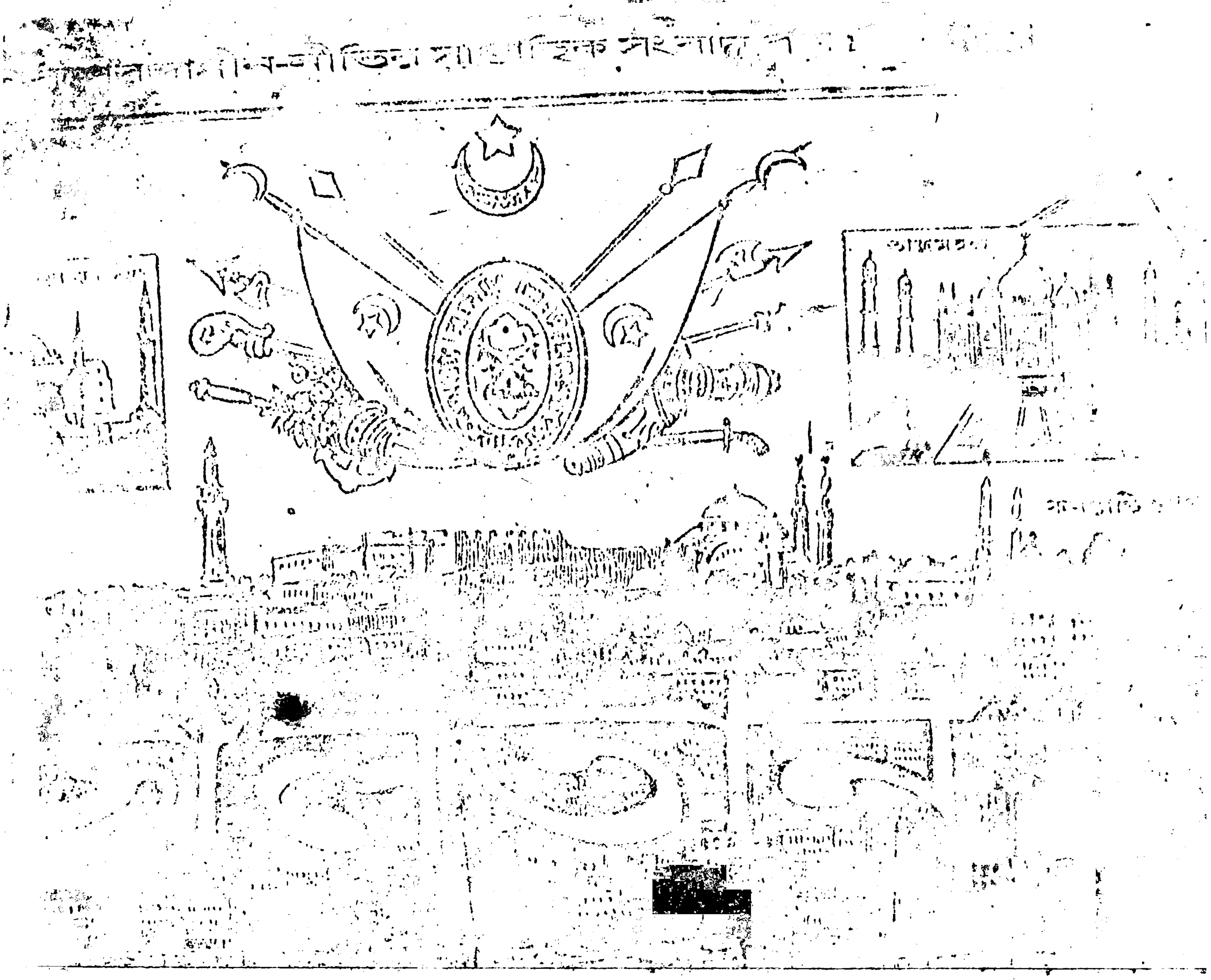

Dhaka University Institutional Repository

রায় নন্দিনী।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

গাজী—

সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

কর্ত্তৃক প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

১৩২২ সাল।

প্রকাশক—ফজলেররহমান মিঞা।

১৪।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ২৲ টাকা, বাঁধাই ২।০ আনা।

রায়নন্দিনী গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের নাম পৃষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

নব-উদ্দীপনা।

সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইস্মাইল
হোসেন সিরাজী।

জাগরে ভারতবাসি! নবতেজে নববলে,
পূরব গৌরব-রবি উদিছে উদয়াচলে।

কলিকাতা,
২১০/৫ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।
জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪।

মূল্য ।৶৹ আনা

গ্রন্থাগার
গবেষণা বিভাগ

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

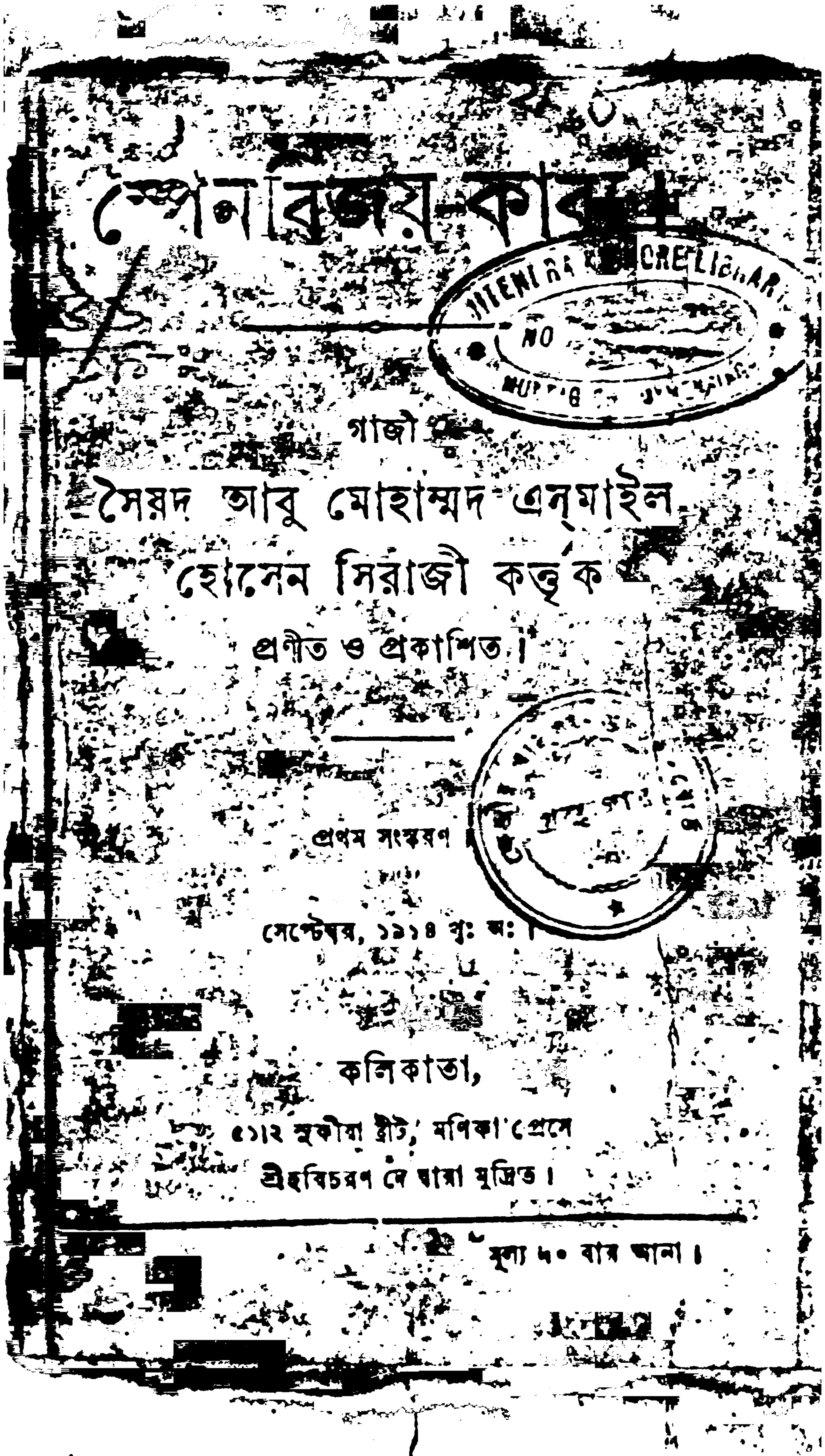

স্পেনবিজয়-কাব্য

গাজী

সৈয়দ আবু মোহাম্মদ এস্‌মাইল

হোসেন সিরাজী কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ খৃঃ অঃ।

কলিকাতা,

৫০।২ সুকীয়া ষ্ট্রীট, মণিকা প্রেসে

শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৷৷৹ বার আনা।

স্পেন বিজয় কাব্যের প্রথম সংস্করণের মলাট পৃষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গীত-সঞ্জীবনী

—:•:—

JITENDRA KISHORE LIBRARY

গাজী সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল
হোসেন সিরাজী প্রণীত।

কলিকাতা,
২নং কালুঘোষ লেন মল্লিকা প্রেসে শ্রীহরিচরণ দে
দ্বারা মুদ্রিত ও বাণীকুঞ্জ, সিরাজগঞ্জ হইতে
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৬।

মূল্য ।০ চারি আনা।

সংগীত সঞ্জীবনী গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের নাম পৃষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

প্রেমাঞ্জলি।

মহাশিক্ষা-কাব্য, বাসন্তী, মন্দাকিনী, অনল-প্রবাহ, উদ্বোধন, উচ্ছ্বাস,
নব-উদ্দীপনা; স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা, স্ত্রীশিক্ষা, আদব-
কায়দা শিক্ষা, সঙ্গীত সঞ্জীবনী, স্পেন-বিজয়
কাব্য, সুচিন্তা, তুরস্ক ভ্রমণ, তুর্কী
নারী-জীবন, রায়নন্দিনী,
প্রভৃতি গ্রন্থ-
প্রণেতা

গাজী সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল
হোসেন সিরাজী

(কবি-সোলতান এবং ওয়ায়েজুল এসলাম) কর্তৃক
প্রণীত

এবং

শেখ আব্দুল গফুর জালালী কর্তৃক
প্রকাশিত।

১৩২৩।

মূল্য বাধাই ।১০ আনা।

প্রেমাঞ্জলি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের মলাট পৃষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

[illegible] আবু মোহাম্মদ ইসমাইল

হোসেন সিরাজী প্রণীত।

[illegible] নিবাসী [illegible]

[illegible] উদ্দিন চৌধুরী [illegible]

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[illegible]

সন ১৩২০ [illegible]

[illegible]

Unive[illegible] [illegible]tional Reposito[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

সুচিন্তা।

JITENDRA KISHORE LIBRARY

গাজী সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল
হোসেন সিরাজী প্রণীত।

প্রকাশক
মুন্সী নেজাম উদ্দীন আহমদ।
১১৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

[illegible]

মূল্য।০ আট আনা।

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাস

স্বজাতি-প্রেম

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী

স্বজাতি প্রেম গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের নাম পৃষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

C. RAY & SONS. সৈয়দ সিরাজী। [তুরস্কে সৈনিকাবস্থায়।

তুরস্কে সৈনিকাবস্থায় সিরাজীর ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

C. RAY & SONS. সৈয়দ সিরাজী। [তুরস্কে সৈনিকাবস্থায়।

তুরস্কে সৈনিকাবস্থায় সি..ী..ীর ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজী সাহেব

মহামান্য তুরস্ক-সোলতান প্রদত্ত [illegible] ভূষিত

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

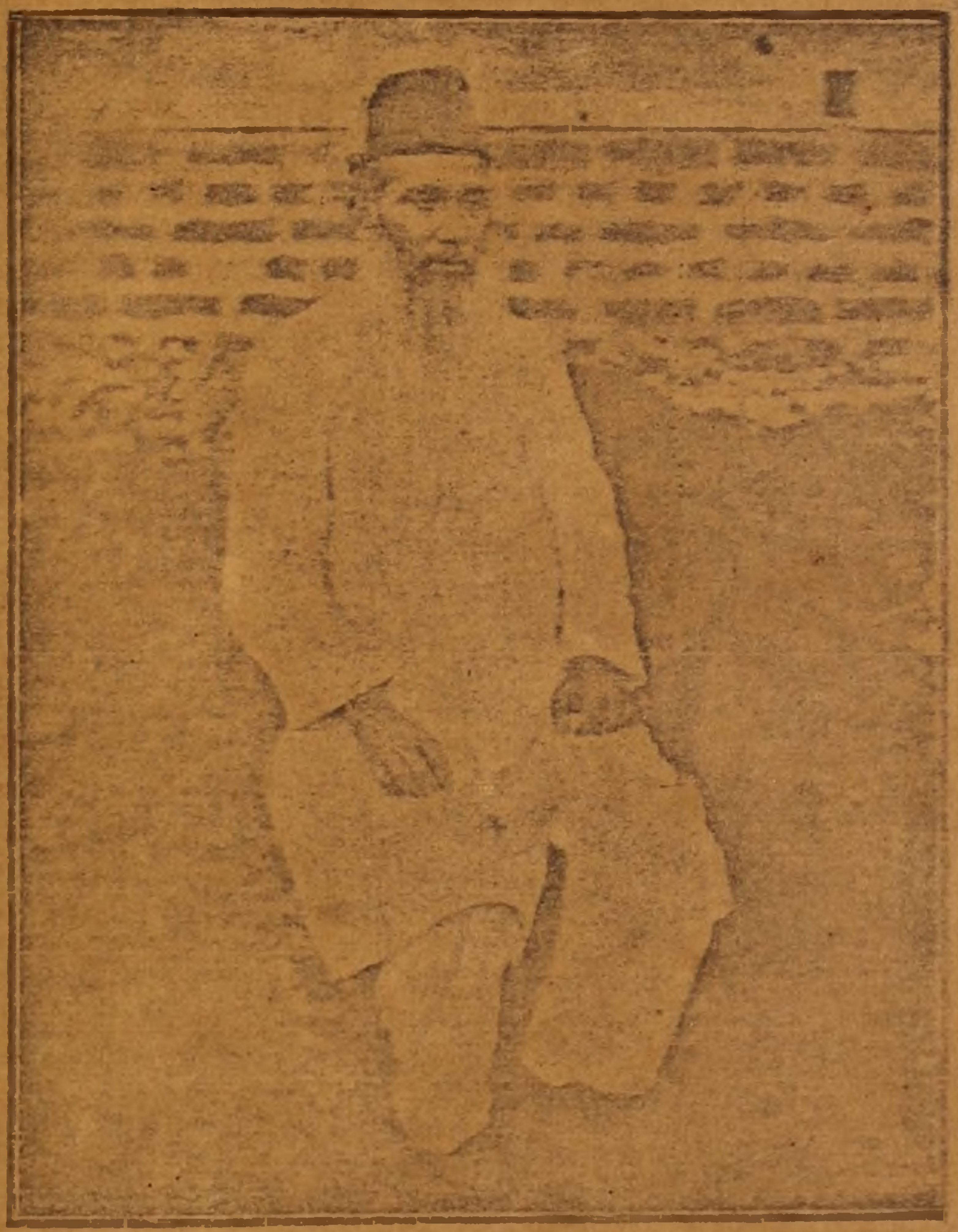

দেশ হিতে-সর্ব্বত্যাগী-সাধক—শিরাজী সাহেব

Dhaka University Institutional Repository

দেশ হিতে-সর্ব্বত্যাগী-সাধক—শিরাজী সাহেব

Dhaka University Institutional Repository

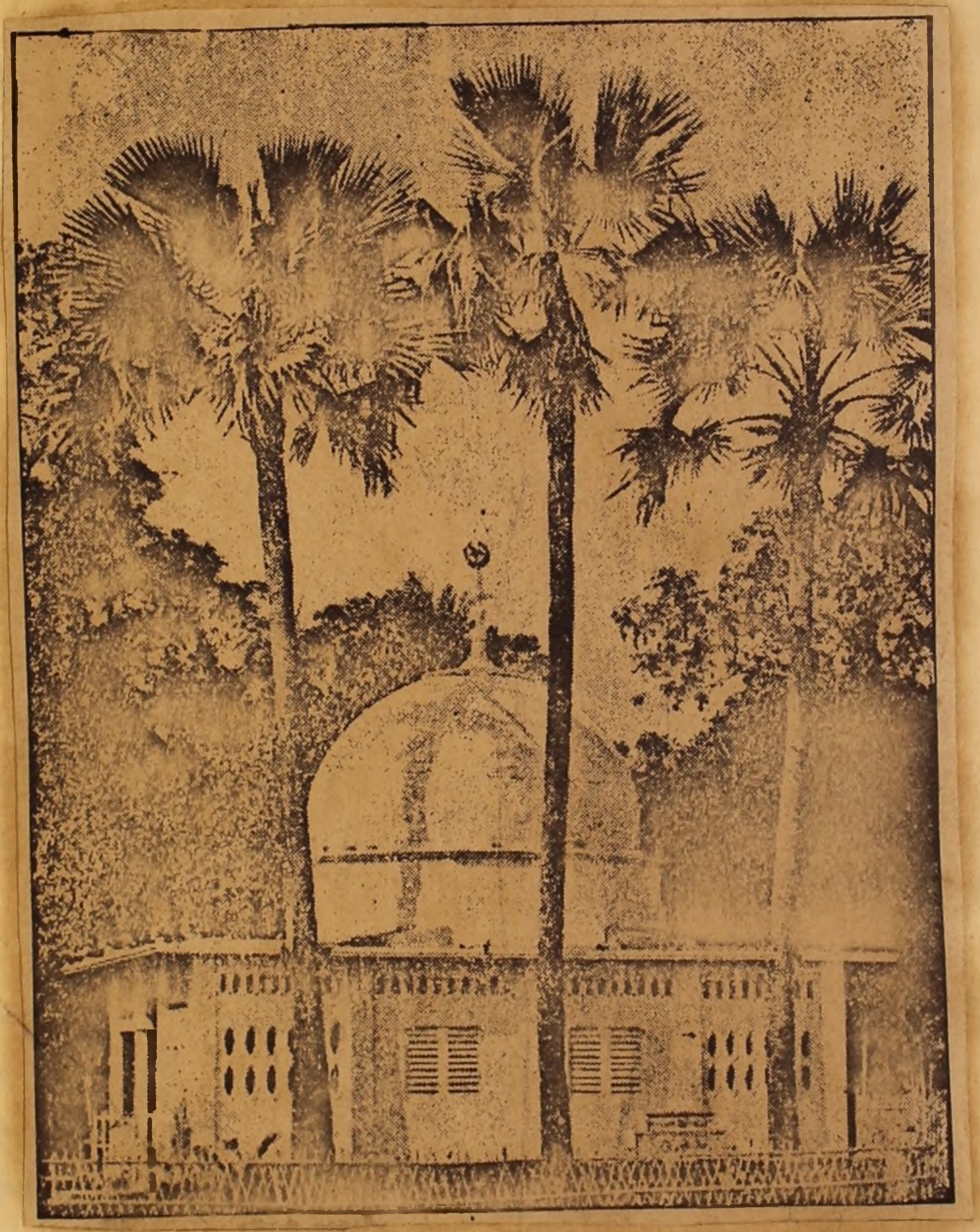

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

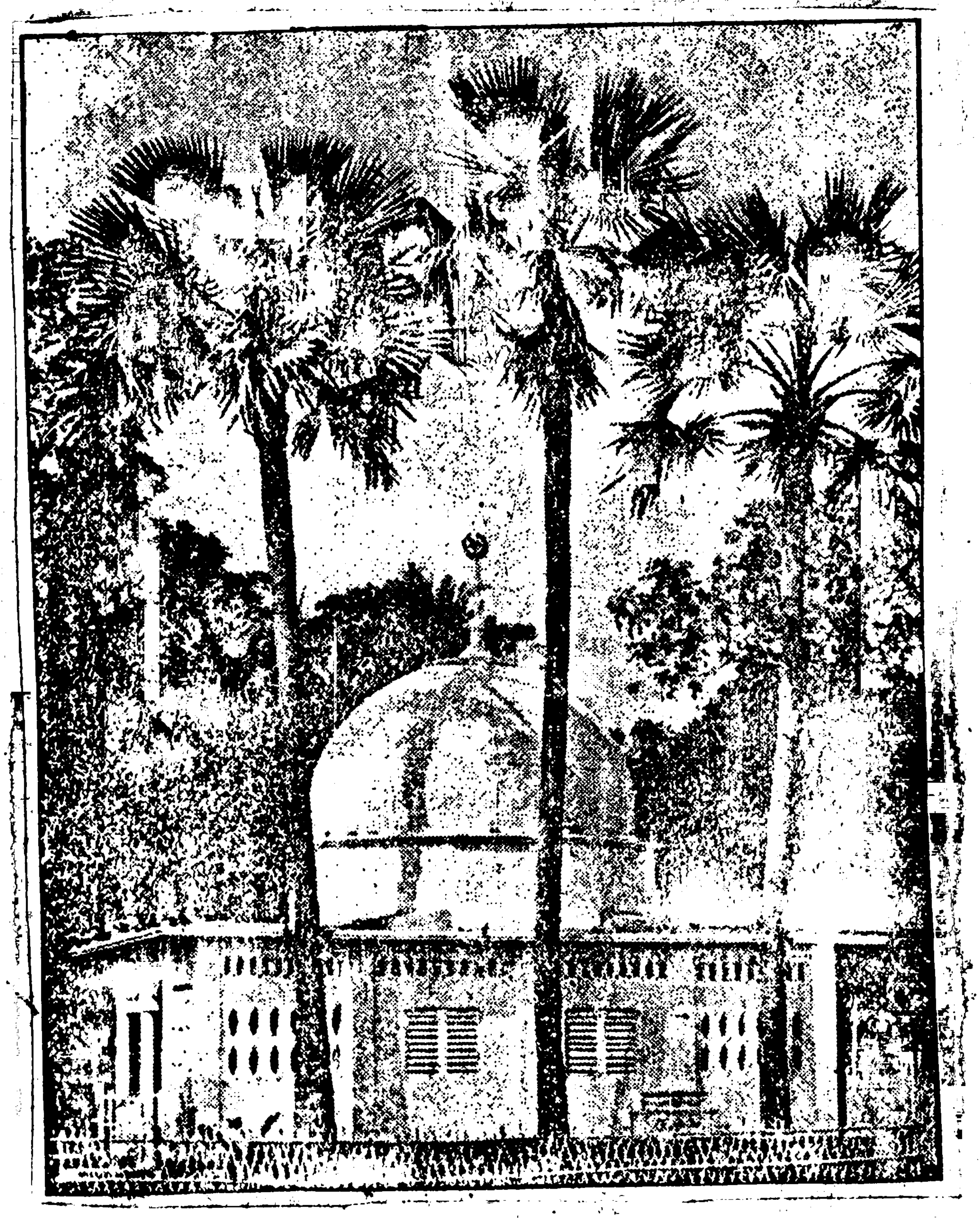

[illegible] [illegible] মসজিদ ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

সিরাজীর জীবন ও সাহিত্য রচনার কালপঞ্জী

১৮৮০ — সিরাজীর জন্ম।

১৮৮৫ — মহাদেব উদাসীন পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি।

১৮৮৮ — জ্ঞানদায়িনী স্কুলে ভর্তি।

১৮৯৫ — তুরস্কে পলায়নের ব্যর্থ প্রয়াস।

১৮৯৭— ১২ই ফেব্রুয়ারী বি, এল, হাই স্কুলে ভর্তি।

১৯০০— অনল প্রবাহ গ্রন্থ প্রকাশিত।

১৯০৩— ওয়ারেছন নেছার সংগে বিয়ে।

১৯০৫— বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ।

১৯০৬— (৩রা অক্টোবর)—সিরাজগঞ্জে আঞ্জুমানে ইসলামিয়া কর্তৃক সিরাজীর সংগে সম্পর্ক ত্যাগের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ। (১৩১৩)—সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিরাজগঞ্জে আগমনের সময় সিরাজী প্রহৃত।

১৯০৭— 'উচ্ছ্বাস', 'নব উদ্দীপনা', 'মহানগরী কর্ডোভা', 'স্ত্রী শিক্ষা' গ্রন্থ প্রকাশিত।

১৯০৮— উদ্বোধন গ্রন্থ প্রকাশিত।

১৯১০— দু বছরের জন্য কারাবরণ।

১৯১২— (১৪ই মে) কারামুক্তি। (২রা ডিসেম্বর) তুরস্কে মেডিকেল মিশনে গমন।

১৯১৩— (২০শে জানুয়ারী) তুরস্কে জাতীয় দলের সভায় বক্তৃতা। (১৫ই জুলাই)—তুরস্ক থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন। তুরস্ক ভ্রমণ গ্রন্থ প্রকাশিত।

১৯১৪— 'স্পেন বিজয় কাব্য' ও 'আদব কায়দা শিক্ষা' গ্রন্থ প্রকাশিত।

১৯১৫— (১৩২২)—রায়নন্দিনী উপন্যাস প্রকাশিত।

১৯১৬— তারাবাঈ উপন্যাস, সঙ্গীত সঞ্জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত। 'প্রেমাঞ্জলি', 'সুচিন্তা' প্রকাশিত।

১৯১৮— ফিরোজা বেগম উপন্যাস প্রকাশিত।

১৯১৯— (১৩২৬) নূর পত্রিকা, 'নূরউদ্দীন' উপন্যাস প্রকাশিত।

১৯২১— (২৫, ২৬, ২৭ সেপ্টেম্বর) সিরাজগঞ্জের জনসভায় ভাষণ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ।

১৯২৩— (২৬শে ফাল্গুন) সিরাজগঞ্জের জনসভায় সভাপতি হিসাবে সি, আর, দাসের সমালোচনা।

নবপর্যায় সাপ্তাহিক ছোলতান, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সংগে পরিচালনা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৪- সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কনফারেন্স বর্জন। সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কনফারেন্সের অনতিদূরে বঙ্গীয় আলেমের মহাসভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

১৯২৫- (২৫শে অক্টোবর) মুসলিম তরুণ সংঘের সভায় সভাপতিত্ব।

১৯২৮- (১৫ ও ১৬ই আগস্ট) নিখিল বঙ্গীয় কর্মী সম্মেলনে কলিকাতায় অ্যালবার্ট হলে সভাপতিত্ব ও ভাষণ।

১৯২৯- কাউন্সিলে সদস্যপদের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ, পরাজয় ও জামানত বাজেয়াপ্ত।

১৯৩১- আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব করার জন্য তিন মাসের জন্য কারাবরণ। ১৭ই জুলাই মৃত্যু।

সাহিত্য সম্পর্কে সমকালীন কিছু তথ্য

১৮৮০- নবীনচন্দ্র সেন-রঙ্গমতী
হেমচন্দ্র হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়- ছায়াময়ী
শিবনাথ শাস্ত্রী-মেজবৌ

১৮৮১- বিহারীলাল চক্রবর্তী-মায়াদেবী

১৮৮২- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-রাজসিংহ, দেবীচৌধুরাণী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সন্ধ্যাসংগীত
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-দশ মহাবিদ্যা
বিহারীলাল চক্রবর্তী-সাধের আসন
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-আর্যগাথা
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-স্বপ্নময়ী
প্রসন্নকুমার দাস-অন্নপূর্ণা কাব্য(১৮৮২-৮৩)

১৮৮৩- প্যারীচাঁদের মৃত্যু
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -কৃষ্ণকান্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রভাত সঙ্গীত/ ছবি ও গান /বউঠাকুরানীর হাট

১৮৮৪- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।

১৮৮৫- হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়- হুতোম প্যাচার গান
মীর মোশাররফ হোসেন-বিষাদ সিন্ধু(১৮৮৫-৯১)
নূর-অল-ঈমান- পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত।

১৮৮৬- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কড়ি ও কোমল
নবীনচন্দ্র সেন -রৈবতক
মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ-খ্রীষ্টীয় ধর্মের অসারতা

১৮৮৭- মীর মোশাররফ হোসেন-সঙ্গীত লহরী।
শেখ আবদুর রহিম-হজরত মহম্মদের জীবন চরিত।

১৮৮৮- শিবনাথ শাস্ত্রী-পুষ্পাঞ্জলি।
মীর মোশাররফ হোসেন-গোজীবন

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

১৮৮৯- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-আনন্দমঠ (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)
মীর মোশাররফ হোসেন-বেহুলা গীতাভিনয়।
রেয়াজ উদ্দীন আহমদ মাশহাদী- সমাজ ও সংস্কারক, অগ্নি কুক্কুট
১৮৯০- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-মানসী।
১৮৯১- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- বিসর্জন
নবীনচন্দ্র সেন-খৃষ্ট
আর্জুমন্দ আলী চৌধুরী-প্রেমদর্পণ
১৮৯২- স্বর্ণকুমারী দেবী-স্নেহলতা
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়-কঙ্কাবতী
১৮৯৩- নবীনচন্দ্র সেন -কুরুক্ষেত্র
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-আর্যগাথা
১৮৯৪- বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার-ফুলজানি
১৮৯৫- কায়কোবাদ -অশ্রুমালা
১৮৯৬- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-চিত্রা
নবীনচন্দ্র সেন-প্রভাস
মোজাম্মেল হক-মহর্ষি মনসুর
১৮৯৯- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কণিকা
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-আষাঢ়ে
মীর মোশাররফ হোসেন-টালা অভিনয়
মতীয়ুর রহমান খান-এজিদ বধ কাব্য
১৯০০- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-ক্ষণিকা/কথা/কাহিনী/কল্পনা
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-হাসির গান।
১৯০১- ওসমান আলী -লেখনী
১৯০২- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-চোখের বালি,
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-মন্দ্র
১৯০৩- দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-তারাবাঈ
শেখ ফজলুল করিম -লাইলী মজনু (পদ্য)/পরিত্রাণ কাব্য
১৯০৪- হেমচন্দ্রের মৃত্যু
বিহারীলালের মৃত্যু
রবীন্দ্রনাথের শিবাজী উৎসব কবিতা

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৫- বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-মতিচুর, প্রথম খণ্ড
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-বেণু ও বীণা
গিরিশ চন্দ্র ঘোষ-সিরাজদ্দৌলা (নাটক)
কায়কোবাদ-মহাশ্মশান কাব্য
মীর মোশাররফ হোসেন-বিবি খোদেজার বিবাহ/হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ/হজরত বেলালের জীবনী।
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতাপসিংহ।
আবুল মা'আলী মুহম্মদ হামিদ আলী-কাসেম বধ কাব্য।

১৯০৬- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-খেয়া/নৌকা ডুবি
মীর মোশাররফ হোসেন-মদিনার গৌরব
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-বেণু ও বীণা
মোহাম্মদ গোলাম হোসেন-বঙ্গ বীরাঙ্গনা।

১৯০৭- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-বিচিত্র প্রবন্ধ
মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর মৃত্যু।
মীর মোশাররফ হোসেন-মোসলেম বীরত্ব
ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-চাঁদ বিবি
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-হোমশিখা
মুন্সী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন-মেহের চরিত
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-আলেখ্য
আবুল মা'আলী মুহম্মদ হামিদ আলী-জয়নালোদ্ধার কাব্য।

১৯০৮- দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-নূরজাহান/মেবার পতন
সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত-তীর্থসলিল
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন- Sultana's Dream

১৯০৯- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রায়শ্চিত্ত / গোরা
নবীন সেনের মৃত্যু
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-সাজাহান
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি গঠিত হয়।

১৯১০- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-গীতাঞ্জলি
সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত-তীর্থরেণু
মীর মোশাররফ হোসেন-আমার জীবনী/বিবি কুলসুম বা আমার জীবনী
মোহাম্মদ গোলাম হোসেন-বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলমান

১৯১১- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অচলায়তন
ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-বাংলার মসনদ
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-ফুলের ফসল
অক্ষয় কুমার বড়াল-এষা

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য

১৯১২- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-জীবনস্মৃতি/ছিন্ন পত্র
মীর মোশাররফ হোসেনের মৃত্যু
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-আনন্দবিদায়/ত্রিবেণী
মোজাম্মেল হক-জাতীয় ফোয়ারা
সৈয়দ এমদাদ আলী-ডালি
আবু মাআলিয়া মোহাম্মদ নূর ইব্রাহিম আলাহী-হাইবিতত্ত্ব কাব্য
আবদুল বারি-কারবালা।
১৯১৩- রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-অভ্র আবীর
শেখ ফজলুল করিম-পথ ও পাথেয়
১৯১৪- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-উৎসর্গ/গীতিমাল্য/গীতালি
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-পরিণীতা/বিরাজ বৌ
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-তুলির লিখন
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী-ভারতে মুসলমান সভ্যতা
মোহাম্মদ নজিবর রহমান-আনোয়ারা
১৯১৫- যোগীন্দ্রনাথ বসু-পৃথ্বীরাজ
১৯১৬- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-বলাকা/চতুরঙ্গ/ঘরে বাইরে
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-পল্লীসমাজ/চন্দ্রনাথ
মোহাম্মদ নজিবর রহমান-হাসানগঙ্গা বাহমনি/গরীবের মেয়ে/দুনিয়া আর চাইনা
১৯১৭- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-দেবদাস/চরিত্রহীন/শ্রীকান্ত
কায়কোবাদ-শিবমন্দির
মোজাম্মেল হক-জোহরা (প্রকাশ ১৯০৫)
১৯১৮- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-পলাতকা
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-দত্তা/শ্রীকান্ত
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী-তুরস্কের সুলতান
যোগীন্দ্রনাথ বসু-শিবাজী
সাদেক আলী তালুকদার-হামদ বং নাত
শেখ হবিবর রহমান-কোহিনূর কাব্য
১৯১৯- ডাঃ লুৎফর রহমান-পথহারা/রায়হান
গোলাম মোস্তফা-রূপের নেশা
১৯২০- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-গৃহদাহ।
১৯২১- ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-আলমগীর
রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন-মতিচুর দ্বিতীয় খণ্ড
কাজী নজরুল ইসলাম-ব্যথার দান/বিদ্রোহী কবিতা(১৩২৮)
গোলাম মোস্তফা-ভাতাবুক

উনষাট

১৯২২- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মুক্তধারা

কাজী নজরুল ইসলাম—ধূমকেতু পত্রিকা/যুগবাণী (প্রবন্ধ)/অগ্নিবীণা

১৯২৩- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—দেনাপাওনা

কাজী নজরুল ইসলাম—ছায়ানট/দোলন চাঁপা

নুরন্নেসা খাতুন—স্বপ্নদ্রষ্টা

কায়কোবাদ—অমিয়ধারা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—বেলা শেষের গান

১৯২৪- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রক্ত করবী

শেখ ফজলল করিম—রাজর্ষি এবরাহিম

কায়কোবাদ—শ্মশান ভস্ম

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—বিদায় আরতি

কাজী নজরুল ইসলাম—বিষের বাঁশী/ভাঙার গান/[illegible]

[illegible] আবুল হোসেন—[illegible]

১৯২৫- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চির কুমার সভা

কাজী নজরুল ইসলাম—সাম্যবাদী/পুবের হাওয়া/চিত্তনামা

বুদ্ধদেব বসু—মর্মবাণী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু।

মোহাম্মদ সোবহান খান—মনোয়ারা

১৯২৬— ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রাঙ্গনে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা

ডাঃ ইমদাদুল হকের মৃত্যু।

কাজী নজরুল ইসলাম—সর্বহারা/রিক্তের বেদন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—পথের দাবী

১৯২৭— কাজী নজরুল ইসলাম—সিন্ধু হিন্দোল।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শ্রীকান্ত

মোহিতলাল মজুমদার—বিস্মরণী

ডাঃ লুৎফর রহমান—প্রীতি উপহার

১৯২৮— বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন—অবরোধ বাসিনী

কাজী নজরুল ইসলাম—বুলবুল/[illegible] জিঞ্জির

১৯২৯— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মহুয়া/যোগাযোগ/শেষের কবিতা

কাজী নজরুল ইসলাম—চোখের চাতক/চক্রবাক/সন্ধ্যা

১৯৩০— কাজী নজরুল ইসলাম —প্রলয়শিখা/চন্দ্রবিন্দু

সুধীন্দ্র নাথ দত্ত—তন্বী

আকবর উদ্দীন —মাটির মানুষ

১৯৩১— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বনবাণী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শেষপ্রশ্ন

কাজী নজরুল ইসলাম—শিউলিমালা

Dhaka University Institutional Repository

সমকালীন হিন্দু রাজনৈতিক ও অন্যান্য ঘটনা

১৮৮০-৮১ – সৈয়দ জামালউদ্দিন আফগানীর কলিকাতায় আগমন
১৮৮২- গোহত্যা নিবারণী আন্দোলন
হান্টার কমিশন, শিক্ষা বিষয়ক
১৮৮৩- ইলবার্ট বিল। স্থানীয় নির্বাচন ও নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে মুহম্মদ ইউসুফ এর মত প্রকাশ
১৮৮৫- শিক্ষা বিষয়ক ডাফরিনের মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুবিধা বাতিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব ও স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ
১৮৮৬- দিল্লীতে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা। কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন।
১৮৮৭- বিবাহ সম্মতি আইন পাশ।
১৮৯০- আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়।
১৮৯২- ইন্ডিয়া কাউন্সিল আইন আংশ-নির্বাচনের অধিকার প্রদান
১৮৯৩- মহারাষ্ট্রে তিলক প্রবর্তিত গোহত্যা নিবারণী সভা।
বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা।
বোম্বাইতে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা।
১৮৯৫- তিলক কর্তৃক শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন।
১৮৯৮- কলিকাতায় মুসলমান শিক্ষা সমিতির অধিবেশনে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী কর্তৃক প্রস্তাব পাঠ।
১৮৯৯- ইউনিভার্সিটিজ এ্যাক্ট পাশ।
১৯০৫- বঙ্গভঙ্গ। লর্ড মিন্টো গভর্নর জেনারেল ও লর্ড মর্লি ভারত সচিব।
১৯০৬ - লর্ড মিন্টোর সাথে মুসলিম ডেলিগেশনের সাক্ষাৎ। ঢাকায় মোহামেডান এডুকেশনাল
কনফারেন্সের বৈঠকে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা।
কলিকাতা কংগ্রেসে স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত।
১৯০৭- সুরাট কংগ্রেসে বিভেদ।
১৯০৮- তিলকের কারাদণ্ড।
সংবাদপত্র আইন,
সৈয়দ আমীর আলী কর্তৃক লন্ডনে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা।
১৯০৯- মর্লি মিন্টো সংস্কার ।xxxx
১৯১০- সংবাদপত্র আইন।
১৯১১- দিল্লীর দরবার
বঙ্গভঙ্গ রদ
রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর।
১৯১২- লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রাণনাশের চেষ্টা।
বলকান যুদ্ধ।
তুরস্কে মেডিকেল মিশন।
১৯১৩- মুসলিম লীগে স্বশাসন প্রস্তাব।

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনাপঞ্জি

১৯১৪- গান্ধীর ভারতে প্রত্যাবর্তন।
১৯১৪-১৮- প্রথম মহাযুদ্ধ।
১৯১৫- ভারত রক্ষা আইন।
হোমরুল লীগ।
১৯১৫-১৬- আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের কারাবরণ।
১৯১৬- লক্ষ্মৌ প্যাক্ট।
হোমরুল আন্দোলন।
বাংলা সরকারের মোহামেডান-মুসলিম শিক্ষার প্রতি [illegible] দারিদ্র্য।
১৯১৭- রাউলাট কমিশন গঠিত।
১৯১৮- মন্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট।
মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস কর্তৃক এ রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান।
১৯১৯- রাউলাট আইন পাশ।
অমৃতসরের ঘটনা।
ক্যালকাটা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন।
মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইনে পরিণত।
জমিয়তউল উলেমা-ই-হিন্দ প্রতিষ্ঠা।
প্রাদেশিক সরকারে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পি-সি-মিত্র ও নওয়াব আলী চৌধুরীকে মন্ত্রীরূপে নিয়োগ।
১৯২০- ১০ই আগস্ট সিভার্স চুক্তি।
১৯২০-২১- অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন।
মোপলা বিদ্রোহ।
১৯২২- চৌরিচৌরা ঘটনা।
১৯২৩- স্বরাজ দল।
বেঙ্গল প্যাক্ট।
কোকনাদ কংগ্রেসে স্বরাজ দলের বেঙ্গল প্যাক্ট প্রত্যাখ্যান।
১৯২৫- সি, আর দাসের মৃত্যু।
১৯২৭- সাইমন কমিশন নিয়োগ।
১৯২৮- সাইমন কমিশন।
সর্বদলীয় কনফারেন্স।
১৯২৯- সারদা আইন।
কংগ্রেস কর্তৃক স্বাধীনতা প্রস্তাব।
জিন্নাহর চৌদ্দ দফা।
১৯৩০- প্রথম আইন অমান্য আন্দোলন।
২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস।
সাইমন কমিশন রিপোর্ট।
প্রথম গোলটেবিল বৈঠক।
১৯৩১- গান্ধী আরউইন চুক্তি।
দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক।
সংবাদপত্র আইন (জরুরী ক্ষমতা)।

Dhaka University Institutional Repository

বারমুটি

পত্র পত্রিকায় শিরাজী সম্পর্কে সংবাদ তথ্য

(নিম্নোক্ত বিবরণ কাটিং বই থেকে গৃহীত। এ ছাড়া পত্র পত্রিকার নাম পরিচয় এবং তারিখবিহীন কাটিংও প্রচুর রয়েছে, এগুলো নীচে উল্লিখিত হয়নি। সংবাদের তারিখ কাটিং বইতে ইংরেজী ও বাংলায় মিশ্রভাবে রক্ষিত)।

মোহাম্মদী, ৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৮।

আজাদ, ১লা শ্রাবণ, ১৩৫২। ১৫ই বৈশাখ, ১৩৫৮। ২রা শ্রাবণ, ১৩৫৯। [illegible] শ্রাবণ, ১৩৫৯। ১লা শ্রাবণ, ১৩৬০। ১লা শ্রাবণ, ১৩৬০। ৩রা শ্রাবণ, ১৩৬০। ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৬০। ৫ই শ্রাবণ, ১৩৬০। ১১ই শ্রাবণ, ১৩৬০। ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৬০। ৩২শে আষাঢ়, ১৩৬২। ৩রা শ্রাবণ, ১৩৬২। ৫ই, ৭ই, ৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৪। ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৬৫। ১লা, ২রা শ্রাবণ, ১৩৬৮। ৭ই শ্রাবণ, ১৩৬৮। ৩০শে আষাঢ় ১৩৭১। ১লা শ্রাবণ, ১৩৭১।

Liberty, 27th July, 1931.

সঞ্জীবনী, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৩১।

মিল্লাত, ২৫শে আষাঢ়, ১৩৫৯। ২৮শে আষাঢ়, ১৩৫৯। ২রা শ্রাবণ, ১৩৫৯। ৩রা শ্রাবণ, ১৩৫৯।

পাক হিতৈষী, ২রা শ্রাবণ, ১৩৫৯।

ইনসাফ, ৩রা শ্রাবণ, ১৩৫৯। ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৫৯।

সংবাদ, ১লা শ্রাবণ, ১৩৬০। ৩রা শ্রাবণ, ১৩৬২। ২রা বৈশাখ, ১৩৭৫।

ইত্তেহাদ, ৩রা শ্রাবণ, ১৩৬২। ৬ই শ্রাবণ, ১৩৬৩।

চাষী, ৩০শে আষাঢ়, ১৩৬২। ১৪শে জুলাই, ১৯৫৭।

ইত্তেফাক, ২রা শ্রাবণ, ১৩৫৮। ২০শে জুলাই, ১৯৫৫। ৯ই শ্রাবণ, ১৩৬৪। ৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৫। ২রা শ্রাবণ, ১৩৬৭। ১লা শ্রাবণ, ১৩৬৮। ৭ই পৌষ, ১৩৭৩। ৭ই শ্রাবণ, ১৩৭৯। ১২ই মে, ১৯৬৬। ১লা শ্রাবণ, ১৯৩১। ৩রা শ্রাবণ, ১৩৭১। ২রা শ্রাবণ, ১৩৭২।

ইনসাফ, ১১ই শ্রাবণ, ১৩৬২।

দৈনিক সংগ্রাম, ২২শে চৈত্র, ১৩৭৬। ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

দৈনিক পয়গাম, ৩১শে আষাঢ়, ১৩৭১। ১লা শ্রাবণ, ১৩৭১। ৮ই আশ্বিন, ১৩৭১। ১০ই শ্রাবণ, ১৩৭১। [illegible] ফাল্গুন, ১৩৭২। ৩রা শ্রাবণ, ১৩৭৩। ১৮ই চৈত্র, ১৩৭৪। ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭০। ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩। ২৮শে আষাঢ়, ১৩৭৩। [illegible] শ্রাবণ, ১৩৭৩। ৫ই শ্রাবণ, ১৩৭৩। ৬ই শ্রাবণ, ১৩৭৩। ৮ই শ্রাবণ, ১৩৭৩। ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭৩। ২৫শে কার্তিক, ১৩৭৩। ৫ই শ্রাবণ, ১৩৭৪। ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৭৫।

Morning News-31 March, 1968.

দৈনিক পাকিস্তান, ১লা শ্রাবণ, ১৩৭১। ২রা শ্রাবণ, ১৩৭৩। ১০ই শ্রাবণ, ১৩[illegible]। ২৭শে আষাঢ়, ১৩৭৪। ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৭৪। ২রা বৈশাখ, ১৩৭৫। ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭৫। ১২ই আশ্বিন, ১৩৭৫। ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৭৬।

পাকিস্তানী খবর-বিপ্লব দিবস সংখ্যা, ১৯৬৬।

আওয়াজ, ২০শে শ্রাবণ, ১৩৭৪।

পাক জমহুরিয়াত, ২রা শ্রাবণ, ১৩৭২।

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীকুমার মিত্র মহাশয়
সমীপেষু।

আমার সালাম জানিবেন। আশা করি আপনি খোদার মর্জি পরিবারসহ কুশলে আছেন। অনেক দিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ নাই।

পত্রবাহক আমার ছাত্রীগণকে দেখিয়াছেন তাহারা লিখিতে পড়িতে এবং সঙ্গীতে কেমন অধিকার আছে। [illegible] পাঠিয়ে দেবার জন্য যে অত্যন্ত আবশ্যক [illegible] তাহার শক্তি ও [illegible] [illegible]। এখন দেশে [illegible] অধঃপতিত অবস্থায় এখনও উচ্চশিক্ষা এখনও হইতে পারে নাই।

আমি নিজে মাতৃভূমির দেশ ও জাতির জন্য [illegible] জীবনপণ [illegible] [illegible] দুঃখ ভোগ করিতেছি।

Dhaka University Institutional Repository

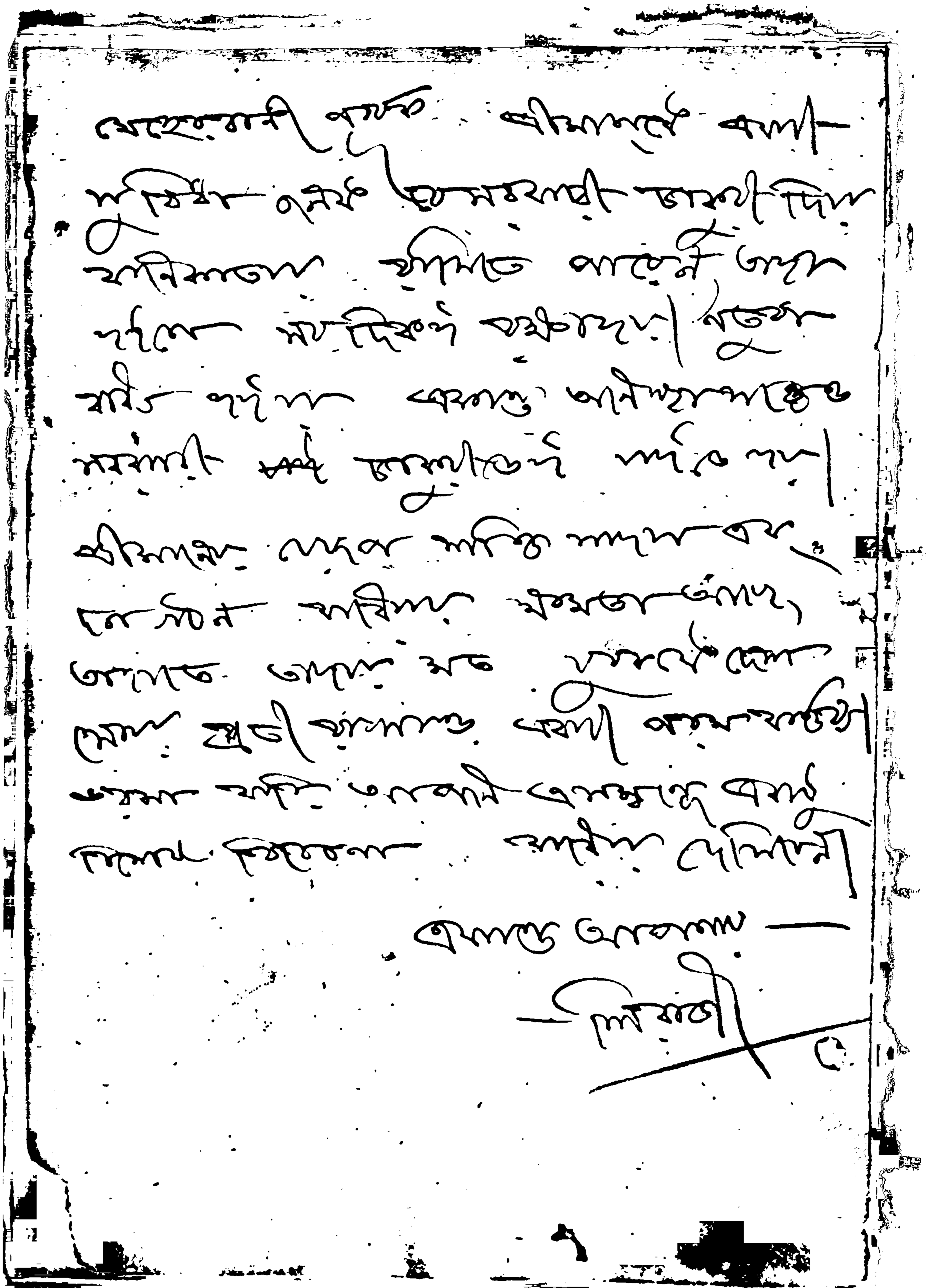

সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রী কৃষ্ণকুমার মিত্রকে লিখিত শিরাজীর ব্যক্তিগত পত্র।

কাকলী

১ম বর্ষ	২য় সংখ্যা	উষা	১৩০৫	জ্যৈষ্ঠ

৪

তোরা সবে যাবি আয়!
আমি আনিয়ে তারা,
সাজাব ধরা
মোহন শোভায়
তোরা সবে [illegible]

৫

তোরা সবে যা[illegible]
আমি যাইয়া [illegible]
আনিব ওরে
পারিজাত-চয়,
তোরা সবে যাবি আয়!

৬

তোরা [illegible] হবি আয়!
আমি মধুর গানে
মধুর তানে
মাতাব ধরায়
তোরা সখী হবি আয়।

৭

তোরা সখী হবি আয়!
আমি হইব রাজা
পালিব [illegible]
হৃদি [illegible]

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা/উষা/১৩০৫ — সিরাজীর হস্তলিখিত একখানি কবিতার পাতা

সিরাজীর [illegible]